পরিচয়

মাঘ ১৩৬৬

গোপাল হালদার
কমলকুমার মজুমদার
বিষ্ণু দে
তরুণ সেন
চিন্ময় গুহঠাকুরতা
বীরেন্দ্রনাথ সরকার
শি[illegible] কর
[illegible]রেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দেবেশ রায়
মণীন্দ্র রায়
তরুণ সান্যাল

সম্পাদক
গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

২৯শ বর্ষ ॥ মাঘ, ১৮৮১ ; ১৩৬৬ ॥ ৭ম সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

২৯ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা
মাঘ ১৮৮১ ; ১৩৬৬

আন্‌তন চেখফ

গোপাল হালদার

রুশ দেশ ও রুশ জাতির সঙ্গে আমার কালের বাঙালীদের অনেকেরই পরিচয় করিয়েছে রুশ সাহিত্য। আর শুধু রুশিয়ার নয়, নিজেদের সঙ্গেও আমরা তাতে পরিচিত হয়েছি। আসলে পরিচিত হয়েছি মানুষের সঙ্গে, আর মানুষের জীবন-সত্যের সঙ্গে। সব সাহিত্যেরই এই ব্রত। রুশ সাহিত্যে সে ব্রত সার্থকভাবে পালন করতে পেরেছে বলেই আমরা অনুবাদে-পড়া রুশ-সাহিত্যের নামেও পাগল হতাম। তাই আজও আমরা শুধু লেনিনের নামেই রুশিয়ার সম্মুখে প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে দাঁড়াই না, দাঁড়াই তার রুশ সাহিত্যিকদের নামেও। চেখফ তেমনি একটি নাম।

একটা প্রশ্ন তবু আছে—রুশ-জীবনের এই পরিণতির কী আভাস ছিল চেখফ-এর গল্পে নাট্যে? একথা তো জানি এবং অনুভব করতে পারি—সেদিনের রাজনৈতিক দল ও মতবাদ সম্বন্ধে চেখফ ছিলেন উদাসীন; অন্তত চেখফ-এর সাহিত্যিক মেজাজ ছিল মতবাদ সাহিত্যের বিরোধী। চেখফ-এর সাহিত্যের সঙ্গে তৎকালীন রুশ-জীবনের সম্পর্ক কি, এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করে নিলে সাহিত্যের সত্য ও সমাজ-সত্য সম্বন্ধে ধারণাও আরও স্পষ্ট হবার কথা।

জীবন-কথা

"সেই তরুণটিকে নিয়ে একটি গল্প লেখ,—বাপ ছিল যার ভূমি-দাস, পরে দোকান-কর্মচারী। ছিল যে গির্জার ছোকরা-গাইয়ে, বিদ্যালয়ের ছাত্র—আমলাতান্ত্রিক সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যে ছাত্রটি উঠেছিল বেড়ে।

যাকে শেখানো হয়েছিল পাদ্রির হাতে চুমো খেয়ে তাকে পুজো করতে, অন্যের মতামত নির্বিচারে মেনে নিতে আর প্রতিটি রুটির টুকরোর জন্য কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠতে। দিনের পর দিন চাবুক পড়ছে পিঠে, খালি পায়ে যায় স্কুলে, মারপিট করে অন্য ছেলেদের সঙ্গে; জীবজন্তুর উপর চালায় সে নিষ্ঠুর পীড়ন—আর ধনী আত্মীয়দের বাড়ি খাবার জন্য যার দারুণ লোলুপতা। ঈশ্বর ও মানুষ দুয়ের সম্পর্কেই সে হয়ে উঠেছিল ভণ্ড, কপটাচারী; আর তার একমাত্র কারণ এই যে, নিজের দৈন্য, নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ সচেতন। লেখ, কেমন করে সেই তরুণ তিলে তিলে তার অন্তরের ক্রীতদাসটাকে ধ্বংস করে ফেলে, আর তার পরে এক সুন্দর প্রভাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেই অনুভব করে তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে মানুষেরই রক্ত,—ক্রীতদাসের নয়।"

চেখফ যখন সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত (ইং ১৮৮৯) তখন সম্পাদক-বন্ধু সুভরিনকে লিখেছিলেন এই পত্রখানি। কেউ যদি সেই তরুণের কথা লিখতেন তাহলে তিনি লিখতেন যাঁর জীবন-কথা তিনি আন্‌তন পাবলব চেখফ। চেখফ ছাড়া আর কেউ যদি তা লিখতে পারতেন, তাহলে লিখতে পারতেন—গর্কি। অবশ্য সেই রেখাচিত্রের প্রতিটি রেখায় পড়ত এক শিশুর 'রক্ত, অশ্রু ও শ্রমের' দাগ। কারণ, চেখফ-এর কথাতেই বলতে হয়—"শৈশবে, শৈশব বলেই আমার কিছু ছিল না।" এই রক্তঝরা জীবন থেকেই তিনি তবু উদ্ধার করেছিলেন মুক্তির পথ, আর সৃষ্টি করেছিলেন শুভ্র-করুণ আলোক-ছটা। চুয়াল্লিশ বছরের এ জীবনকে সত্যই বলতে হয়—অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।

আন্‌তন পাবলব চেখফ্ জন্মেছিলেন তগন্ রগ্-শহরে ইং ১৮৬০ সালের ২৯শে জানুয়ারি। তাঁর পিতামহ ছিলেন ভূমিদাস কৃষক; কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি অর্জন করেছিলেন নিজের ও পুত্রকন্যাদের মুক্তি। নিঃসন্দেহ শক্তিমান পুরুষ ছিলেন তিনি, তাই প্রবলের ধর্মানুযায়ী ছিলেন ক্রীতদাস প্রথারও প্রবল সমর্থক। শক্তির অভাব তাঁর পুত্র পাব্‌লব ইগরোভিচ্-এরও ছিল না। পিতার অপেক্ষা বেশিই ছিল পাবলবের চণ্ডতা, দুর্ধর্ষতা, স্ত্রী-পুত্রের উপর শাসন-পীড়ন, দৌরাত্ম্য। সেই সঙ্গে ছিল না পিতার বৈষয়িক সুবুদ্ধি, কিন্তু ছিল গির্জার গানে ও মূর্তি-অঙ্কনে নিজস্ব ঝোঁক। পিতার অকথ্য পীড়ন ও দৈন্যের বোঝার সঙ্গে আন্‌তন ও তাঁর ভ্রাতারা পেয়েছিলেন এই উত্তরাধিকার।

আন্‌তন ছিলেন পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে তৃতীয় ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ দুই ভাই শক্তি থাকলেও আলস্যে, অস্থিরচিত্ততায়, সুরাশক্তিতে তা উড়িয়ে দেন—বয়ঃকনিষ্ঠ আন্‌তনের সমস্ত প্রয়াস ও সহায়তা সেদিকে ব্যর্থ হয়।

আনতনের যখন ষোলো বৎসর তখন বাপ তাঁকে তগন-রগ-এ রেখে দেনার দায়ে সপরিবারে পালিয়ে যান মস্কোতে। উপেক্ষা ও উপহাস মাথায় নিয়ে আন্‌তন তিন বৎসর পরে প্রবেশিকা পাশ করে এলেন তাঁদের কাছে, আরম্ভ করলেন চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দৈন্য-প্রপীড়িত বৃহৎ সংসারটির সমস্ত বোঝা পড়ল তাঁরই মাথায়। সেই দুর্ভার দায়িত্ব বহনের চেষ্টাতেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র আন্‌তন উনিশ বৎসর বয়সে লিখতে আরম্ভ করেন তখনকার রুশ রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকাসমূহে ছোট ছোট হাসির গল্প। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চুটকি-গল্প অজস্র লিখতে হয়েছে তাঁকে নানা নামে। সব চেয়ে বেশি লিখেছেন 'আনতোশা চেখন্‌তে' এই নামে—ইং ১৮৭৯—১৮৮৭ এই আট বছরে প্রায় চারশো গল্প, ছোট গল্প, নক্‌সা, নভেল, রিপোর্ট এভাবে লেখা হয়েছিল। এ সব লোক হাসাবার রচনার মধ্যে যে সাহিত্য-শক্তি ফুটে উঠছিল আন্‌তন চেখফ প্রথম তাতে গুরুত্ব দেন নি। লেখক হবার কথা তাঁর কল্পনায় ছিল না—একটা গোটা সংসার তিনি পালন করছেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করছেন, ভাবতেন ডাক্তার হবেন। চেখফ ডাক্তার হলেন (ইং ১৮৮৪), মস্কোর কাছে ইস্ত্রার (জেম্‌স্তভো) হাসপাতালে কাজও নিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই প্রথম রক্ত উঠল মুখে—ক্ষয় রোগের পূর্ব লক্ষণ বোঝা গেল। নিকটস্থ বাবকিনোতে গিয়ে তিনি বিশ্রাম নিলেন কিছুদিন। তাঁর দু-খণ্ড লঘু গল্পের সংগ্রহ ততদিনে (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু সাহিত্যিকের সঙ্গেও ইস্ত্রা ও ববকিনোতে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। বিশেষতঃ ডাক্তার হিসাবে পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও পল্লী-জীবনের অভিজ্ঞতা। আর সাময়িক পত্রের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে চুটকি লেখা লিখতে লিখতে তিনি আয়ত্ত করছিলেন অভাবনীয় বাক্‌-সংযম। বিদ্রূপের ভঙ্গি ছাড়িয়ে তাঁর ব্যঙ্গ-রচনায় তাই ফুটে উঠতে লাগল জীবন-রসিকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। রঙ্গোপজীবীর লঘু-রচনায় দেখা দিল সূক্ষ্ম জীবন-বোধের, দৃঢ় মূল্য-বোধের আভাস। তখনকার রঙ্গ-ব্যঙ্গের গল্পেও চেখফ-এর এ ধরনের বিকাশ তাই

লক্ষ্য করা যায়—অমর সেই মানবতার চেতনা, হালকা বিষয়ের পিছনে বেদনার ছায়া, মুখের হাসির সঙ্গে চোখের অদৃশ্য অশ্রু।

ইং ১৮৮৫তে তাই চেখফ আর এক অঙ্ক উত্তীর্ণ হলেন। সে বৎসরের লেখা 'দুর্ভাগ্য' নামে গল্পটি থেকে তা অনুভব করা যায়। ছোট গল্পটির বিষয় সামান্য : সমস্ত জেলায় গ্রিগরি পেত্রভের যেমন নাম ছিল কাঠের কাজে, তেমনি নাম ছিল মাতাল বলে। সেই গ্রিগরি মরণাপন্ন স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল। বরফ-বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চলছে। নেশায় চোখ জড়ানো। নিজেই বলছে—ডাক্তারকে সে একটা সুন্দর সিগারেট-কেস নিজের হাতে তৈরি করে দেবে পরে। চল্লিশ বছর সে ও মত্রোনা ঘর করছে এক সঙ্গে। চল্লিশ বছর ধরে বেচারীকে সে জ্বালিয়েছে। গ্রিগরি বুঝিয়ে বলছে—লোকটা সে মন্দ নয়। মত্রোনাকে সত্যই ভালোবাসে। কিন্তু মত্রোনা কি শুনছে ?···চোখে জল আসে! সত্যি, দেখতে না-দেখতে দিন কেমন ফুরিয়ে যায়। আবার যদি জীবন ফিরে পাওয়া যায়—মত্রোনাকে সে বুঝিয়ে বলত—সত্যই ভালোবাসত···।

গ্রিগরির যখন হাসপাতালে জ্ঞান হল মত্রোনা তো তার আগে গাড়িতেই শেষ হয়ে গিয়েছে, গ্রিগরির হাত-পাও বরফে খেয়ে বিনষ্ট। ডাক্তার বলছেন, "অনেক তো হয়েছে। ষাট পেরিয়ে গেছ, না ? আবার কি চাই ?···"

"হুজুর, আর ছটা বৎসর।" গ্রিগরি গুঙিয়ে ওঠে।

"কেন ?"

"পরের ঘোড়া এনেছি, ফিরিয়ে দিতে হবে। ইস্ত্রীকে গোর দিতে হবে। আর আপনাকে একটা খাশা সিগারেট কেস বানিয়ে দোব—"

ডাক্তার হাত নেড়ে তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মিস্ত্রির সে দিন গিয়েছে।

এই তো গল্প, অল্পই ঘটনা। তবু দুইটি ট্রাজিডি—স্ত্রী নেই, মিস্ত্রিরও হাত-পা গিয়েছে। কিন্তু সে ভাবছে সিগারেট-কেস বানাবে—ভাগ্যের পরিহাস। অথচ মিস্ত্রির গোটা জীবন যেন সুস্পষ্ট গল্পের ওই স্বল্প পরিসরে। আর সমস্ত মানব-নিয়তিই আভাসিত মাতাল মিস্ত্রির একটি কথায়—"দেখতে না দেখতে দিন কেমন ফুরিয়ে যায়।'

চেখফ-এরই গল্প নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প নয়। এ গল্প পড়ে

সেদিনের খ্যাতনামা লেখক গ্রিগোরিভিচ নিজ থেকে চেখফকে চিঠি লিখলেন, —তোমার শক্তি আছে। তুমি বাজে লেখা লিখে নিজেকে নষ্ট করো না। চেখফ চমকিত হলেন, সবিনয়ে জানালেন নিজের দ্বিধা-সংকোচ। অবশ্য যে প্রত্যয় চেখফ-এর নিজের মধ্যে গোপনে জন্মাচ্ছিল তা এবার প্রকাশ্যে সচেতন না হয়ে পারল না। ইং ১৮৮৫-র আরেকটি ওরূপ উল্লেখযোগ্য গল্প 'খিন্ন হৃদয়'। সন্থ পুত্রহারা গাড়োয়ান ওন' কাউকে বলতে পারে না তার মনের বেদনা— কে শোনে তার কথা? বুক ফেটে যায় তার। শেষে ঘুড়ীটাকেই বলে— "ধর, যদি তোর একটা বাচ্চা থাকত, তোর নিজের পেটের বাচ্চা ····আর ধর, হঠাৎ যদি সেই বাচ্চাটা মরে যেত—"

এটিতেও 'গল্প' কোথায়? কিন্তু হাসির আবরণের পারে এভাবেই চেখফ-এর গল্পে দেখা যায় বেদনার কুয়াসা। অভ্রান্ত লেখক চেখফ।

ইং ১৮৮৫ থেকে তাই চেখফ-এর সচেতন সাহিত্যিক সাধনা আরম্ভ হল। পরের দু বৎসরে যে সব গল্প লেখা হয়, তার মধ্যে অনেক গল্প সুবিখ্যাত। সে সময়ে 'নবয়েভ্রেমা' নামে পিতরস্‌বুর্গের দৈনিকপত্রে সে সব গল্প প্রকাশিত হত। এ পত্রেরই সম্পাদক ছিলেন সুভরিন। সামান্য নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তাঁরও জন্ম। নিজের বুদ্ধি কৌশলে ক্রমে তিনি হয়ে দাঁড়ান পত্রিকার লক্ষপতি মনিব এবং সেই সময়কার জারতন্ত্রের জঘন্য প্রতিক্রিয়ার এক সুচতুর সমর্থক। এ জাতীয় বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিতদের প্রতি চেখফ-এর বিরাগ ছিল মজ্জাগত; এরূপ কপটাচারী ও মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে বহু গল্পে বিদ্রূপও তিনি অবিরত বর্ষণ করেছেন। কিন্তু সুভরিনের কৃতিত্ব এই— চেখফ-এর লেখার মূল্য তিনি বুঝতেন। তাই তিনি চেখফ-এর সেই সুতীব্র শ্লেষকে নিজের গায়ে না মেখে বরাবর চিঠিপত্রে জানাতেন চেখফ-এর এই দৃষ্টির প্রতি নিজের সম্মতি, আর বুঝাতেন নিজের পত্রিকার নীতি-পরিচালনায় নিজের অপটুতা। এই কৌশলেই চেখফ-এর সঙ্গে সম্পর্ক তিনি বহুদিন (১৮৯৮ পর্যন্ত) বজায় রেখেছিলেন। এমনকি, চেখফ-এর মনে রুশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও খানিকটা সংশয় সে সময়ে জাগিয়ে তুলছিলেন। সুভরিনকে চেখফ বহু পত্র লিখেছিলেন—চেখফ পত্র লিখতে, গল্পের জন্য নোট টুকে রাখতে, প্লট ছকতে ছিলেন অক্লান্ত। তাঁর সে-সব চিঠি ও নোট যে অমূল্য, তা এ লেখার প্রথম উদ্ধৃতিটি থেকেই বোঝা যায়।

প্রতিষ্ঠার মুখে ইং ১৮৮৭ সালে চেখফ দক্ষিণ রুশিয়া ভ্রমণে গেলেন।

এই ভ্রমণেরই ফল 'প্রান্তর' (স্তেপে) নামক বড় গল্পটি। দিগন্ত প্রসারিত রুশ-প্রকৃতির এটি একটি মহাকাব্য, ক্যাথেরিন ম্যানসফিলড্ যাকে ইলিয়দ ও ওডেসির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ গল্প 'আলোক', 'মূর্ছা', 'জন্মদিনের মজলিস' প্রভৃতি বহু উৎকৃষ্ট গল্প বেরোয় পর বৎসর (ইং ১৮৮৮)। সুভরিন তার প্রকাশক। পিতর্সবুর্গের রাজকীয় একাদেমি অব সায়েন্স সে বৎসরই চেথফকে দিলেন সাহিত্য পারিতোষিক (পাঁচশো রুবল)। চেথফ এই রাজ-সম্মান ও মর্যাদায় মোটেই আত্মবিস্মৃত হলেন না। বরং রুশ দেশ, রুশ শিক্ষিত শ্রেণী, নিজের শক্তি ও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর বিষাদভরা প্রশ্ন বেড়েই চলল। দু বৎসর পর (ইং ১৮৯০) তিনি সাইবেরিয়ার সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে দেখতে গেলেন 'সাখালিন দ্বীপের' দ্বীপান্তরিত কয়েদীদের দণ্ডিতনিবাস। আর ফিরলেন জলপথে সিঙ্গাপুর, ভারতবর্ষ, সিংহল হয়ে সুয়েজ খাল দিয়ে। দণ্ডিত-নিবাসের অভিজ্ঞতা যে রক্ত-রেখায় তাঁর মনে গাঁথা হল তা কোনোদিন মুছে যাবার মত নয়। সাইবেরিয়া ভ্রমণ ও সাখালিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ছাড়াও '৬ নং ওয়ার্ড' প্রভৃতি গল্পেও নানাভাবে তা পরে দানা বেঁধে উঠল। সমাজ-সত্যের তা স্বাক্ষর।

ইং ১৮৯২ সালে চেথফ গেলেন নবগরদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষত্রাণে। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ভালো নয়—বারে বারে রক্ত উঠছে কাশির সঙ্গে। ডাক্তার চেথফ তার অর্থ জানতেন। তাই মস্কো ছেড়ে কাছেই পল্লী অঞ্চলে মেলথবো গ্রামে জমি ও বাড়ি কিনে তিনি সেখানে গিয়ে বাসস্থাপন করলেন। অবশ্য কাজের বিরাম ছিল না। সে জেলায় কলেরা দেখা দিলে চেথফ সর্বত্র চিকিৎসা ও বক্তৃতা করছিলেন। রোগও তাই তাকে নিষ্কৃতি দিল না। রক্ত উঠতে লাগল মাঝে মাঝে (ইং ১৮৯৩-৯৪)। ডাক্তাররা উপদেশ দিচ্ছিলেন—কিছুকাল গিয়ে ক্রাইমিয়ায় থাক, কিংবা দক্ষিণ ফ্রান্সে। কিন্তু চেথফ মেলথবোতেই রইলেন। সেখানেই ইং ১৮৯৩তে রচিত হয় তাঁর 'মঞ্চগায়িকা' (কোরাস গার্ল) প্রভৃতি গল্প আর 'সাখালিন দ্বীপ' নামে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং ইং ১৮৯৪তে 'সমুদ্র-বিহঙ্গ' (সীগাল-চখা ?) নামে প্রসিদ্ধ নাটক। দু বৎসর পরে পিতরস্‌বুর্গে এ নাটকের প্রথম অভিনয় হল, কিন্তু চেথফের নাট্যকলা মামুলী অভিনয়ে ব্যর্থ হয় না। কেউ তার তখন সমাদরও করে নি। চেথফ ভাবছিলেন —আর নাটক লিখবেন না। 'আমার জীবন', 'জন্মক্ষেত্রে' প্রভৃতি গল্প যখন ইং ১৮৯৭তে প্রকাশিত হয়, চেথফ তখন নিজের জেলায় লোক-গণনায় ও

নিজের খরচে অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত উঠল বেশি করে, ডাক্তাররা এবার স্পষ্টই বললেন, 'যক্ষ্মা'। চেখফ শীত যাপন করতে গেলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। এদিকে মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তাঁর আর গর্কির উৎসাহ তাতে। সেখানে 'সমুদ্র-বিহঙ্গ' অভিনীত হল, তা মহাসমাদর লাভ করল (১৮৯৮)। মফঃস্বলেও 'ভানিয়া খুড়ো'র সার্থক অভিনয় চলল। চেখফ-এর নাট্যকলা তখন স্বীকৃত হয়ে গেল। 'পিয়ারী' (ডার্লিং) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গল্পও এ সময়ে চেখফ লিখছেন।

ফ্রান্সের 'দ্রেফু-ব্যাপার' নিয়ে তাঁর উত্তেজনার শেষ নেই। জোলার 'প্রকৃতিবাদী' কলা-কৌশল তাঁর ভালো লাগত না। কিন্তু দ্রেফু-ব্যাপারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোলার সংগ্রাম দেখে চেখফ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন, আর ঠিক বিপরীত দিকে 'নবায় ভ্রেমায়' অন্যায়ের সমর্থন দেখে এবার (ইং ১৮৯৮) তিনি সুভরিনকে ত্যাগ করলেন।

ভগ্ন দেহ নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মত চেখফ এবার (ইং ১৮৯৮) ক্রাইমিয়ায় ইয়ালটায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন। মেলিখবোর জমি ও বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে, তিনি ইয়ালটাতে নূতন বাড়ি তৈরি করলেন (১৮৯৯)। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না—লেখা অবশ্য সমানেই চালিয়ে যান—'মহিলার সঙ্গে কুকুর', 'গিরি-কন্দরে' প্রভৃতি গল্প লেখা হল। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে পিতরস্বুর্গ একাদেমি অব সায়েন্সেস-এ তিনি সভ্য নির্বাচিত হলেন। কিন্তু দু বৎসর পরে (১৯০২) একাদেমিতে ম্যাক্সিম গর্কির নির্বাচন কর্তৃপক্ষ নাকচ করলে চেখফ-ও প্রতিবাদে সেই সভ্যপদ ত্যাগ করেন—রবীন্দ্রনাথের নাইট পদবী ত্যাগের মতই বলিষ্ঠ এই শিল্পীর প্রতিবাদ। শরীর ক্ষয় হয়ে আসছে ;— চেখফ (১৯০১) ৪১ বৎসর বয়সে বিবাহ করলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেত্রী অলগা ক্নিপারকে (মৃত্যু ১৯৫৮)। তখন সে থিয়েটারেও নব প্রণীত নাটক (১৯০০-০১) 'তিন বোন' অভিনীত হচ্ছে। এর পরে ১৯০৩এ রচিত হল 'চেরি বাগান' নাটকখানা। পর বৎসর জানুয়ারিতে মস্কো আর্ট থিয়েটারে তা অভিনীত হয়। চেখফ প্রায় তখন মৃত্যুর মুখে। জার্মানির স্বাস্থ্যনিবাস বেদেনভেলের-এ গিয়ে এক মাস কাটাতে না কাটাতেই তাঁর মৃত্যু হল (৩রা জুন, ১৯০৪)। তাঁর দেহ সমাহিত হয় মস্কোর নবদেবিচিয়ি মঠের সমাধিক্ষেত্রে।

সবিস্তারে এই জীবন-ঘটনা উল্লেখ করবার কারণ এই—লেখক চেখফ ও

মানুষ চেখফ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তাঁর ভ্রাতাদের লক্ষ্যহীন জীবনের ব্যর্থতা আর তাঁর নিজের সংহত আত্ম-গঠন—'জীবনের পরিপ্রেক্ষিতের' সন্ধান—এসব তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বিষয়। সেই জীবন ও জীবনের অভিজ্ঞতা, এ দুই বস্তুই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। এই উপজীব্যকে তিনি শিল্প সম্পদে পরিণত করেছেন যা দিয়ে তাও এ জীবনী থেকে বোঝা যায়—জীবন-প্রত্যয়, কর্মনিষ্ঠা, অনলস পরিশ্রম। আর এজন্যই তাঁর গল্পে-নাটকে দেখি অলস, বিত্তবান জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও কর্মকুণ্ঠ লক্ষ্যহীন, মধ্যবিত্তের প্রতি এত বিরাগ, এত বিদ্রূপ ; এবং সমসাময়িক রুশ বুদ্ধিজীবীদের সেই বৈক্লব্যে নিজের বিষণ্ণ-জিজ্ঞাসা। 'প্রতিভা' নামক ছোট গল্পটিতে তিনি তিনজন 'প্রতিভাবান' হবু-শিল্পীর চিত্র এঁকেছেন, —তাঁর আপন ভ্রাতা নিকোলাই-ই এ চিত্রের মূল। তিনজনেই উৎসাহে উত্তেজিত, নিঃসন্দেহ তাঁদের ভবিষ্যৎ বিরাট, যশঃ সমুজ্জ্বল। "একজনও কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ভাবছেন না—দিন যাচ্ছে, প্রতিদিনই তাঁরা চলছেন অস্তাচলের দিকে, অন্যের রুটিতেই তাঁরা উদর পূর্তি করছেন এখনো। একজনও বুঝছেন না যে, তাঁরাও সেই অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন যে নিয়মে শত শত স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার মধ্যে শেষ পর্যন্ত দু-তিনজনই মাত্র ফুটে ওঠে, অন্যেরা ঝরে যায়, মরে যায়—হয়ে থাকে শুধুই খোসা ছিবড়ে।" প্রতিভার অর্থ চেখফের নিকট পরিশ্রম—আদর্শে প্রত্যয়। তরুণ লেখক বুনিনকে প্রথম সাক্ষাতেই চেখফ বলেন, "কাজ করতে হবে, বুঝেছ।···অবিশ্রান্ত···সমস্ত জীবন ব্যাপী।"

এ জন্যই চেখফের লেখাকে সোভিয়েত-সাহিত্যের গুরু গর্কি বলেছেন, 'কর্মের কাব্য'। সে কাব্য তাঁর জীবনেরই প্রতিলিপি—সমসাময়িক কালের সংশয় থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌছানো।

চেখফের জীবন ও রুশ পটভূমি

ব্যক্তি চেখফ-এর এই জীবনপটের পিছনে ছিল রুশ জীবনের পটভূমি আর রুশ-ভূমির দিগন্তব্যাপী বিস্তার। এ বিস্তার ও সামাজিক উদ্বেলতা অবশ্য রুশ সাহিত্যের মূল স্বর। কিন্তু চেখফ-এ তার বিশেষ যে রূপটি ফুটল, নিশ্চয়ই তা তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি-অনুযায়ী। কী সেই রূপ ?

আমরা বিদেশী পাঠকেরাও লক্ষ্য না করে পারি না—চেখফ রুশ সাহিত্যেও অভিনব—তাঁর প্রকৃতি-প্রেমের জন্য। অনুবাদের বাধা ডিঙিয়েও

'প্রান্তরে' (স্তেপে) প্রভৃতি গল্পের আশ্চর্য কাব্য মহিমায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। কত স্বল্প কথায় না প্রকৃতির এক-একটি রূপ ফুটে ওঠে চেখফের হাতে। অথচ, এই প্রকৃতির পরিবেশে হার্ডি বা অন্যান্য কোনো প্রকৃতি-প্রভাবিত লেখকের মত চেখফ মানুষকে অসহায়, তুচ্ছ জীব বলেও ভাবেন নি —প্রকৃতির এই মহামহিমারই যোগ্য অধিকারী মানুষ। সুখে তার অনন্ত অধিকারী—কিন্তু কোথায় সে মানুষ? সমসাময়িক রুশ সমাজের সর্ব স্তর চেখফ-এর পরিচিত—তার হাস্য-করুণা কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তবু চেখফ ত্যাগ করতে পারেন না—কী করে সে মানুষ জন্মাবে রুশিয়ায়? কী করা যায়? কী করা যায়?...

পুশকিন-গগলের আমল থেকে গর্কি পর্যন্ত কোনো রুশ লেখক সামাজিক পটভূমি ও মূল সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন নি। তলস্তয়ও (১৮২৮-১৯১০) না, দস্তয়ভস্কিও (ইং ১৮২১-১৮৮১) না ; যদিও একজন গিয়েছিলেন কৃষক-জীবনের নিরুপকরণ সারল্য ও অপ্রতিরোধী খ্রীষ্টীয় নীতির দিকে ; আরেকজন বিপরীত মার্গে গিয়েছিলেন প্রতিক্রিয়ামূলক 'স্লাবোফিল্' (স্লাব-গোঁড়ামি) ও দুঃখ-দহন-সর্বস্ব দুঃখবাদের দিকে। তুর্গেনিফ-এর (ইং ১৮১৮-৮৩) ভরসা ছিল উদারবুদ্ধি নূতন বুদ্ধিজীবীদের উপর। তাঁরাও যে বিদ্রোহ উন্মাদনায় খণ্ডিত-চেতনা, এ কথাও বুঝেছিলেন 'পিতা-পুত্র' ও 'ঊষর ভূমির' ঔপন্যাসিক। তবু তাঁর আশা—'নামহীন রুশিয়াই' হবে রুশিয়ার মহানেতা। সে আশা মিথ্যা হয় নি। কিন্তু ইং ১৮৮০-র পরে গণতান্ত্রিক উদারতন্ত্র (নারোদনিক) দেউলে হয়ে গিয়েছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যা উপলক্ষ্য করে রুশিয়ায় তখন জঘন্যতম প্রতিক্রিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ; গণতন্ত্রী সমস্ত প্রয়াস নির্মম পীড়নে বিলুপ্ত। তাই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত গোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবীরাও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত। আন্‌তন চেখফ ও তাঁর ভ্রাতারা এই মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীরই মানুষ—তাঁর মনে এই স্ব-শ্রেণীর শিক্ষিতদের জন্য বিদ্রূপ যা ছিল তার মতই ছিল বেদনা। আর তাই সমস্ত রুশিয়ার জন্য বিষাদ—ততঃ কিম্? কোথায় সেই 'ব্যাপকনীতি', কী সেই আদর্শ? কী করা যায়—কী করা যায়? এই সন্ধিক্ষণের সংশয়, চেখফের প্রশ্ন।

ঠিক এই কারণেই চেখফ ও সেই রুশিয়াকে মনে হয় আমাদের আত্মীয়।

মানুষ কিন্তু রুশিয়ায় তখনি জন্মাচ্ছে। চোখের সম্মুখে ইং ১৮৮০ থেকে ১৯০০-এর মধ্যে সে সত্য প্রকাশিত হয় নি। লেনিন তখন প্রবুদ্ধ হয়েছেন, এই

শেষ দুই দশকে শ্রমিকশ্রেণীর সাধনা প্রারব্ধ হয়েছে। 'নামহীন রুশিয়ার' সে নাম কানে না পৌঁছালেও ক্রমেই চেখফ-এর মনে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু অগ্নি-আখরে সেই নাম যখন লেখা হল প্রথম ইং ১৯০৫-এর বিপ্লব আয়োজনে, তার পূর্বেই চেখফ-এর আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে—সেই স্থির বিদ্যুল্লেখা আনূতন দেখে যান নি—দেখতে পেয়েছেন দূর আকাশের কোণে তার ক্বচিত ইঙ্গিত।

চেখফের এই প্রত্যয়-সিদ্ধির উত্তরকাণ্ডটিই আমরা লক্ষ্য করি না।

চেখফ-এর পাঠকের কাছে চেখফ-এর সেই সাক্ষ্য সহজে স্পষ্ট হয়ে উঠত না, তার প্রধান কারণ—চেখফ-সাহিত্য সম্বন্ধে স্থির জ্ঞানের অভাব; এবং চেখফ-এর বিশিষ্ট শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পকলা। সমস্ত রুশ-সাহিত্যের মধ্যে রুশ সামাজিক লক্ষ্য, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, অতি স্পষ্ট। তা নিয়েই যেন তাঁদের সাহিত্য। কিন্তু চেখফ-এর সাহিত্যে এসে মনে হয় সে লক্ষ্য তাঁর প্রায় অগোচর; সেই সামাজিক দ্বন্দ্ব ও উদ্বেলতাও যেন তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। অথচ চেখফ যে রুশ বস্তুতন্ত্রের ধারায় মানুষ, বাস্তব নিষ্ঠাই যে তাঁর সাহিত্যিক মন্ত্র, তিনিও তা বলতেন, পাঠকও তা বোঝেন। "জীবন যেরূপ, সেরূপে তা অঙ্কিত করে বলেই সাহিত্য হয় সাহিত্য! তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য উদ্‌ঘাটন—অসঙ্কোচে ও নিষ্ঠাভরে।" এ হচ্ছে চেখফ-এরই কথা (১৮৮৭)। সত্যই তাঁর গল্পের ও নাটকের নায়ক। তাঁর কথাতেই আবার জানি, "লেখকের উদ্দেশ্য আমরা শুধু মন দিয়ে অনুভব করি না;—সমস্ত প্রাণ-চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করি সেই লক্ষ্য। শ্রেষ্ঠ লেখক বাস্তব চিত্রিত করেন; কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকটি রেখা প্রাণাবেগে, বাস্তব-বোধে অর্থগর্ভ বলে মনে হবে। তা শুধু জীবন যা আছে তারই চিত্র নয়, জীবন যা হওয়া সম্ভব, তারও কথা, আর তাতেই তুমি মুগ্ধ হও।"

শুধু তাই নয়—চেখফ-এর কোনো 'উদ্দেশ্য' নেই, বললে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন; কারণ তাঁর মতে "আদর্শহীন লেখক হচ্ছে পাকা বদমায়েস।"

সংশয় থেকে প্রত্যয়ের যাত্রী

তবু কেন চেখফ-এর লেখার কোনো উদ্দেশ্য নেই এ প্রশ্ন উঠেছে, আর তাঁর উদ্দেশ্য বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে তাঁর জীবিতকালেই।

প্রথমতঃ সমসাময়িক রুশ জীবন ও চেখফের লেখার বিশ্লেষণ পূর্বে বিশেষ

হয় নি। তা করলে দেখা যাবে—১৮৮০ পরবর্তী সেই আপাত লক্ষ্যহীনতার যুগে চেখফ কোনো মতবাদে বা কর্মপদ্ধতিতে প্রত্যয় পোষণ করতেন না। পুশকিন, গগল, তুর্গেনিফ-এর মতই তিনি ছিলেন পচধরা সম্ভ্রান্তশ্রেণী ও দুর্বৃত্ত আমলাতন্ত্রের বিরোধী। প্রথম থেকেই রঙ্গ ও বিদ্রূপের বক্র রেখায় তিনি এদেরকে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু রুশিয়ায় তাঁর সময়ে ধনিকতন্ত্রী উদ্যোগে ব্যবসাপত্রও দেখা দিয়েছে ; উদার-দৃষ্টি রুশ বুদ্ধিজীবীদের অসারতাও সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গিয়েছে ; দিগভ্রান্ত সন্ত্রাসবাদীদের উন্মত্ততাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চেখফ-এর চারদিকেই এরূপ মধ্যবিত্তের ভীড়, ঘরে-বাইরে, বন্ধুগোষ্ঠীতে সর্বত্র। এক কথায়, এ যেন বিংশ শতকের বাঙলা ও ভারতের জীবনের প্রতিচ্ছবি। চেখফ-এর চোখে বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ডহীন জীবন, লক্ষ্যহীন বাগাড়ম্বর ও আদর্শহীনতা প্রত্যক্ষ ; নিম্ন-মধ্যবিত্তের স্থূলতা, লোভ ও চাটুকারিতাও পরিষ্কার। রঙ্গে ও ব্যঙ্গে প্রথম থেকেই তিনি তাই আমলা ও সামন্তশ্রেণীর মত এই 'উদারপন্থী' মধ্যবিত্তদেরও চিত্রিত করেন। শেষ পর্যন্তও দুই শ্রেণীর কোনো শ্রেণীতেই যে তাঁর আস্থা জন্মাল না, নতুন শ্রমিকশ্রেণী সম্বন্ধেও তাঁর চেতনা শেষ পর্যন্ত সুস্থির হয় নি, তাও সত্য।

মাঝে কিছুদিন চেখফ তলস্তয়ের ভাবাদর্শেও বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন —আমরা যেমন চাই গান্ধীবাদে, সর্বোদয়ে বিশ্বাস করতে। 'ভালো মানুষ' (১৮৮৬) গল্পটিতে চেখফ-এর সেই ইঙ্গিতও দেখা যায়। ভাই ভ্লাদিমির বসে বসে লেখেন। বিধবা বোন ভেরা দেখেন, আর মনে করেন তাঁর ভাইয়ের মত উদার আদর্শবাদী মানুষ বুঝি আর নেই। কিন্তু ক্রমে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যায়—ভেরা বোঝেন আসলে ভলোদা কিছুই নয়—সবই তার জাবর কাটা, সবই মেকি, 'উদার মত' হচ্ছে পোশাকী প্রতারণা। এই বক্তব্যের মধ্যে তলস্তয়ের ভাবটা প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু সে মত যে অগ্রাহ্য 'গুজবেরি' গল্পের মধ্যেও তার ইঙ্গিত আছে—মানুষের ঐশ্বর্য চাই। চিকিৎসক-বিজ্ঞানী চেখফ বিজ্ঞানের দানকেও মিথ্যা ভাবতে পারতেন না। কাজেই তলস্তয়ের দর্শনেও (১৮৯৪ থেকে) তাঁর আস্থা রইল না—যেমন তুর্গেনিফ-এর সঙ্গে মেজাজের মিল থাকলেও তিনি সেই পচধরা উদারতন্ত্রে বিশ্বাস খুঁজে পেলেন না।

চেখফ-এর বহু গল্পই এই মধ্যবিত্তের স্থূলতা ও অকর্মণ্যতার, আদর্শ-হীনতা ও মিথ্যাচারিতার প্রতি পরিহাস। 'সরকারী কেরানির মৃত্যু'তে

বেচারী কেরানি থিয়েটারে উল্লাসের আতিশয্যে কোন্ মহামান্য হুজুরের টাকের উপরই না দেখে চাটি মেরে বসেছে। তারপর আর বেচারীর ভয় ভাবনার শেষ নেই। হুজুর সত্যই মাফ করলেন কিনা কে জানে? শেষ পর্যন্ত ভাবতে ভাবতেই ঘটল তার মৃত্যু। বিজ্ঞানী ডাক্তার অধ্যাপক ছাত্র শিক্ষক লেখক সাংবাদিক, নারী-পুরুষ,—সকল বৃত্তির এ ধরনের মধ্যবিত্ত চরিত্র শেষ পর্যন্তও চেখফ অজস্র সৃষ্টি করেছেন—জানিয়েছেন তাদের প্রতি তাঁর অনাস্থা—শুধু ব্যঙ্গ নয়, বিদ্রূপ নয়,—সঙ্গে সঙ্গে কখনো তাঁর ক্ষোভ, কখনো বিষাদ, কখনো বেদনা। রাজনীতি সম্পর্কে সংশয় 'ভানিয়া খুড়ো', 'মানসার্দের বাড়িতে', 'অজ্ঞাত মানুষের কাহিনীতে'—প্রায় শেষ পর্যন্ত—টিঁকেছিল।

কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি বোঝে—'এহ বাহ্য।' এ হচ্ছে সন্ধানীর সংশয়, আদর্শের অনুসন্ধান, 'মহৎ নীতির' জন্য লেখকের কামনা। পূর্বাপর চেখফ-এর গল্পে যা অন্তঃপ্রবাহী তা এই সত্য। যেমন, পূর্বাপর দেখি—চেখফ-এর 'সামান্য' মানুষের উপর বিশ্বাস, যে মানুষকে নগণ্য বলে চোখে পড়ে না তার শক্তি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা, আর সেই সঙ্গে যে বুদ্ধিজীবী সত্যই আদর্শবান তার প্রতিও শ্রদ্ধা, তার বিপর্যয়ে বেদনা, তার পরাজয়ে বিষাদ। এমন গল্পও অজস্র। 'শত্রু' গল্পে দেখি পুত্রশোকাতুর ডাক্তার কিরিলফকে—যার সঙ্গে লেখকের গোপন সহমর্মিতা। 'প্রজাপতি' গল্পে দেখি আর্ট ও নামের জন্য ব্যাপিকা স্ত্রীর চিত্র, আর সেই প্রেক্ষাপটেই তার অনাদৃত বিজ্ঞান-নিষ্ঠ স্বামীর মৃত্যু মহিমা। 'ভানিয়া খুড়ো'র নায়ক অস্ত্রফ মানুষের সুখসমৃদ্ধির জন্য বন রোপণে নিযুক্ত।—এরূপ বহু বহু গল্পেই এ সময়েও চেখফ-এর রাজনৈতিক মনের ঠিকানা পাওয়া যায়। তাছাড়া, সাখালিন দ্বীপের বিবরণ, 'সার্জেন্ট প্রিশিবিয়েফ'-এর মত গল্প তো আছেই—সমস্ত রুশ সমাজে 'প্রিশিবিয়েফ' হচ্ছে মূঢ়, অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীর প্রতীক—জার-রাষ্ট্রব্যবস্থারই অমানুষিকতার স্বরূপ। '৬নং ওয়ার্ড' যখন প্রকাশিত হয় (ইং ১৮৯২) রুশ শাসক-গোষ্ঠীও তখন বুঝেছিলেন—সাখালিন ভ্রমণের শেষে লেখা এই কয়েদখানার 'ছ-খাতা' হচ্ছে সমস্ত জার শাসন-ব্যবস্থারই রূপক।

সাখালিন ভ্রমণ (১৮৯০) থেকে দ্রেফু-ব্যাপার (ইং ১৮৯৮) পর্যন্ত যেন সেই সংশয় থেকে প্রত্যয়-সন্ধানের পথ। শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে চেখফ পৌছলেন তাতে তাঁর এই মনের স্বরূপ আর অস্পষ্ট থাকে না। 'তিন বোন' নাটকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে ইরিনা:

"মজুর হওয়া কী আনন্দের! খুব ভোরে উঠে রাস্তায় ভাঙবে পাথর, হবে রাখাল; অথবা শিক্ষক—শেখাবে ছাত্রদের; কিংবা হবে রেলের ইঞ্জিন চালক।"

কথাগুলি উচ্ছ্বাসই শোনায় আমাদের কানে—কিন্তু এর লেখক চেখফ জীবনে যিনি শ্রমের জোরেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। 'তিন বোনের' (ইং ১৯০০ লেখা) নায়কের কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী শুনি; "একটা, সুস্থ, শক্তিশালী প্রবল ঝড় ঘনিয়ে আসছে…আমি চলেছি কাজ করতে। আগামী পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ভিতরে প্রত্যেকটি মানুষ কাজ করবে—প্রত্যেকটি মানুষ।" 'চিলেকোঠা-ওয়ালা বাড়ির' নায়কের মতই চেখফ মানুষের মহিমা-বোধে গর্কির সগোত্র; "মানুষকে বড় মনে করতে হবে—প্রকৃতির যাবতীয় সব কিছুর চাইতে, এখন যা কিছু তার কাছে দুর্জ্ঞেয় তার চাইতে যা কিছু অজেয় তার চাইতে।" এ যে স্পুৎনিক-লুনিকের স্বপ্ন!

'চেরি বাগান' (১৯০৩) শেষ হয় তরুণী আনার আশা-আশ্বাস ভরা কথায় —"আমরা নতুন এক চেরি-বাগান করব—এর চেয়ে অনেক ভালো"— ইত্যাদি। আর চেখফ-এর শেষ গল্প 'কনের' (১৯০৩) নায়িকা নাদিয়াও সেই প্রার্থনাই জানায়—"আহা, যদি সেই উজ্জ্বল নতুন জীবন আর একটু তাড়াতাড়ি আসত যখন মানুষ নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারবে যে, সে-ই ঠিক, তারও সুখ হওয়ার, মুক্ত হওয়ার অধিকার আছে। আর, আজ হোক, কাল হোক, সেদিন আসবেই আসবে।"

১৯০৩-এর মৃত্যুমুখ চেখফ-এর শেষ বাণী! '১৯১৭'-এর কামনা।

সত্যের রসায়ন

চেখফ-এর সংশয় ও প্রত্যয় নিয়ে তথাপি যে তর্ক ওঠে তার কারণ আছে।—রুশ সাহিত্যে জীবন-জিজ্ঞাসা স্পষ্ট রূপেই তার সমাজ-জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িত,—মাঝখানে কোনো বাধা, অস্পষ্টতা তা রাখে না। রুশ কথা-সাহিত্যের কলা-কৃতিত্ব এইখানে যে, এরূপ সম্বন্ধকে স্বীকার করে তা আরও গাম্ভীর্য ও গভীরতা লাভ করেছে। বিষয় বা content তাতে স্পষ্ট ও মহৎ। চেখফ কিন্তু সেখানেই বিশিষ্ট—উদ্দেশ্যহীনতা, আদর্শহীনতা তাঁরও ঘৃণার বস্তু, তিনিও রুশ বাস্তবতারই সাধক। প্রথমতঃ কিন্তু সাহিত্যে তাঁর মতবাদ ছিল অপসন্দ। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে গল্পও তাঁর

অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয়তঃ তাঁর সাহিত্যিক মেজাজ ছিল তুর্গেনিফ-এর মত অনুগ্র; কখনো কৌতুক বিদ্রূপে প্রচ্ছন্ন, কখনো মমতায় ও করুণায় আনত, কিন্তু প্রায়ই সরস সকরুণ কবিত্বময়। আরও যা গভীর ও গুরুতর কথা—চেখফের গল্পে নাটকে প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু বা কনটেণ্ট প্রায়ই সামান্য। চোখের সামনে যে সব নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা আমরা দেখি ও অতি সাধারণ নগণ্য মানুষ যারা চোখেই পড়ে না,—চেখফ সে ঘটনার মধ্য থেকে যুগের মূল সত্যটিকে আভাসিত করেন; সেই মানুষটির মধ্যে থেকেই জীবনের অন্তঃপ্রবাহী সত্যকে তুলে আনেন। 'সাধারণের এই অসাধারণত্ব' আবিষ্কার হচ্ছে চেখফ-এর মূল সাহিত্য দৃষ্টি। এজন্যই এ সাহিত্য আরও বিচিত্র, অভিনব।

বিশ্বের কথাসাহিত্যে চেখফ-এর অবদান এই—তাঁর গল্প যেন গল্পবর্জিত, অর্থাৎ, ঘটনাহীন, প্লটশূন্য, কবিসুলভ একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা ভাবনা মাত্র। বিষয়বস্তু যা তা হয়তো সামান্য, কিন্তু তারই মধ্যে যা ভাববস্তু তা চেখফ আভাসিত করেন। শুধু ইঙ্গিতে—তার বেশি নয়। চেখফ-এর অসামান্য শিল্প-সংযম, রসবোধ, ইঙ্গিতটিকে স্পষ্ট হতেও দেবে না। রঙ্গ-প্রধান, বিদ্রূপ-প্রধান ও কবিত্ব-প্রধান, মোটের উপর এই তিন ধরনের গল্প লিখেছেন চেখফ। কিন্তু যে ধরনের গল্পই হোক, এই ব্যঞ্জনা, এই অন্তঃশীলতা (অণ্ডারকারেণ্ট) চেখফের গল্প নাটকের প্রাণ—ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র, চরিত্র উপজীব্য বিশেষ। কি গল্পে, কি নাটকে চেখফের অভীষ্ট লক্ষ্য স্পষ্ট চরিত্র ও ব্যঞ্জনার মধ্যে পরতে পরতে মিলিয়ে থাকে—গতানুগতিক দর্শকের চোখে ও গল্পের পাঠকের চোখে তা ঠেকে না। ঠেকলে—ঠেকে গিয়ে একেবারে অন্তরের অনুভূতি-লোকে। চৈতন্যের মধ্যে আর্টের লক্ষ্যবেধ অব্যর্থ; সাহিত্যের সৌভাগ্য, চেখফ শিল্পের শর ছাড়া অন্য অস্ত্রে হাতও ছোঁয়ান নি।

সমস্ত বিশ্ব-সাহিত্যে চেখফ এক অভিনব স্রষ্টা এই বিশেষ ধরনের গল্পের ও নাট্যের জন্য—যে গল্পের প্রাণব্যঞ্জনা, যে নাট্যের স্রোত অন্তঃশীল। সম্ভবতঃ আধুনিক সাহিত্যের বাহির্জীবন থেকে অন্তর্লোক যাত্রার পথে চেখফ বস্তুবাদী হয়েও একজন পথিকৃৎ। রুশ সাহিত্যে অবশ্য চেখফ অভিনব আরও অনেক কারণে—নগণ্য মানুষের প্রতি মানবিক মমতা, সাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব আবিষ্কার, গল্প ও নাট্য রূপায়ণে কৌতুক ও করুণার সরস মিশ্রণ, ভাষারীতির অসামান্য সাবলীলতা ও সরসতা—যে জন্য তলস্তয় চেখফকে বলেছেন

'গদ্যের পুশকিন্‌',—অতুলনীয় বাক্‌সংযম ও ভাব-সংযম,—এসব মানবীয় গুণ ও কলা-কুশলতার সমাবেশে চেখফ রুশ সাহিত্যেও অভিনব ও অদ্বিতীয়। আদর্শবান্‌ ও দায়িত্ববান্‌ হয়েও যেভাবে তিনি বিষয়বস্তুকে গৌণ করে, মতবাদ সম্বন্ধে অনীহা পোষণ করে, মানবীয় উদ্দেশ্যকে রস-নিবেদনের মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে প্রধানতঃ শিল্পধর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, রুশ সাহিত্যে তাও হয়তো অভিনব। সমাজজীবন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ পরিচ্ছন্ন অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে তাই মনে করা আশ্চর্য নয়—চেখফ সে সাহিত্যে বিচ্ছিন্ন ও একান্ত, সমাজ-সত্যে উদাসীন, উদ্দেশ্যহীন রসবাদী।

জীবিতকালেই সমালোচকরা চেখফকে বলেছিলেন 'রুশ সাহিত্যের যুবরাজ'—তলস্তয় তখনো বেঁচে। বাঙালী পাঠকদের নিকট চেখফ প্রথম থেকেই 'ছোট গল্পের রাজা'। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া কথাসাহিত্যে আর কাউকে আমরা চেখফের পর্যায়ে স্থান দিই না। চেখফ-এর ছোটগল্প তবু আমরা সরাসরি অনুবাদ করেছি কম। তাঁর প্রণীত ছোটগল্পের বিশেষ ধারা নানা দিক থেকে আমাদের সাহিত্যেও এসে পৌঁছেছে। ইংরেজি সাহিত্যে ক্যাথেরিন্‌ ম্যান্‌সফিল্‌ড্‌ সে ধারায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আমাদের কেউ কেউ যে তা অনুসরণ করেননি, এমন কথা বলা চলে না। বাঙলা ছোটগল্পে চেখফ-এর ধারা অনুধাবন-যোগ্যও। কারণ, ছোটগল্পে বাঙলা সাহিত্য ছোট নয়, সেখানে তার কৃতিত্ব এখনও পর্যন্ত অম্লান। কিন্তু চেখফ-এর প্রেরণা আমাদের সাহিত্যে মিশেছে নানা প্রচ্ছন্ন পথে। এই শত-বার্ষিকী বৎসরে আমরা চেখফের সঙ্গে বাঙলা ছোটগল্পের সম্পর্কও অনুসন্ধান করে দেখতে পারি। অন্ততঃ চেখফ-এর শিল্পকলা ও শিল্পচিন্তা থেকে শিক্ষা আহরণ করতে পারি—যেমন, "লেখক যদি হই তাহলে আমাকে বাঁচতে হবে জন-সমাজে।" এবং ট্রেনেও তাই যাওয়া উচিত তৃতীয় শ্রেণীতে। বুঝে নিতে হবে সাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব। "(গল্প) লিখবে তুমি সোজা কথায়। ধর, কেমন করে পিতর সেমিনোভিচ মেরিয়া ইভাজোভাকে বিয়ে করলে। এই হল সব বক্তব্য।" কেন লিখবে শুধু জীবনের পঙ্কিলতার কথা? "সুন্দরের অপেক্ষা কুৎসিত তো বেশি সত্য নয়।" আর চাই বাক্‌-সংযম। "লিপি কুশলতার অর্থ হচ্ছে যা লিখবে···তার চেয়েও বেশি যা মন্দ লেখা তা কাটবে।" "কাটো, ভাই, কাটো। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে শুরু কর···অর্ধেকটা ছেঁটে বাদ দাও।"—বাগ্‌বিলাসী ও ভাববিলাসী বাঙলা লেখকের পক্ষে লেখক-

জ্যেষ্ঠের এ হচ্ছে অবিস্মরণীয় উপদেশ। "ছোটগল্পে অতিকথনের থেকে অত্যল্প কথনও ভালো।"

সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা অবশ্য এই যে, দায়িত্ববান শিল্পী কেমন করে শিল্প ও আদর্শের দাবিকে সমন্বিত করে চেখফ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রুশ সাহিত্যকে রুশ ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে না পড়লে অবশ্য তার নিরাসক্ত-শিল্প-দৃষ্টি দেখে এ ধারণাই জন্মানো স্বাভাবিক—চেখফ বুঝি কলা-কৈবল্যের দাবিই মেনেছেন, বাস্তব জীবনের দাবি মানেন নি; সমাজের সত্য ও ইতিহাসের সত্য সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন—রুশ জীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ছিলেন আগ্রহশূন্য। অন্ততঃ এ ধরনের ধারণাই আমরা বাঙালী পাঠকেরা একদিন পোষণ করতাম—চেখফের সঙ্গে তাই আজ আমাদের পরিচয় করতে হচ্ছে নতুন করে—রুশ সাহিত্যের এক 'অবসাদ-ক্ষণের' অপরাজেয় শিল্পী-পুরুষরূপে। এ পরিচয় অনেকটা সহজ হয়েছে ভি,-এরমেলফ-এর লিখিত 'এ, পি, চেখফ'-নামক চমৎকার সাহিত্য-জীবনীখানা ইংরেজিতে সুলভ হওয়ায়। আর এ পরিচয়ের ফলে আমরা বুঝতে পারি—সমাজের সত্য যুগের সাহিত্যে রূপায়িত হয় রূপান্তরিত হয়ে;—যত সে সাহিত্য সত্য ততই অচ্ছেদ্য এই সম্বন্ধ, আবার যত তা সার্থক ততই প্রচ্ছন্ন সেই যোগাযোগ। চেখফ-এর সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাই দেখি সমাজ-সত্যের অন্তর থেকে সাহিত্যের সত্য নিষ্কাসনের রাসায়নিক পদ্ধতি, যুগের সত্যকে শিল্পীমানসে আয়ত্ত করবার সাধনা,—শিল্পীর স্বধর্মনিষ্ঠা ও সমাজ-চেতনার সমন্বয়॥

কয়েদখানা

কমলকুমার মজুমদার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হুজুর মোহনগোপাল, যথাযথ হুজুর আজ কয়েকদিন। সুতরাং প্রজা-সাধারণের যে হটকারিতায় পাগল হবার মত মন এখন তৈরি হয়নি,—অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, কিছু একটা বেগোড়, চুন খসলেই যে ঝটিতি ক্ষেপে উঠবে এমন অবস্থা হয় নি। এ কারণে যে মাত্র দুদিন অথবা তিন দিন হয়, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নিজে অতীব প্রাচীন। বড় প্রাচীন। খুব আশ্চর্যও হয়েছিলেন, যেক্ষণে তিনি জানতে পারলেন, নিরবধি কাল তিনি জীবিত। আপনার অভ্যন্তরে কে একজনা ভারী চোখ তুলে বারবার চাইতে চেষ্টা করছিল। আর সামনেই রতি পাইক কত কথা বলছিল।

তখন সম্মুখে লতাপাতার বাট করা আয়নায় আপনার চেহারা দেখবার চেষ্টা করলেন, দুটি চোখ জলজল করে উঠেছিল। খাঁড়ার খোদাই করা চোখের থেকে এ চোখ দুটি অতীব অঘোরচারী। শরীর এ মুহূর্তে ছিল না, মোরগের মত মুখটা এপাশ করলেন। একটির পর একটি দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে সংঘাত হল। ওপাশে মেহেগনির উপর, চালানীর (চেলজি) পুতুল নৃত্যরত ; কখন বা ফরাসী ঘড়ি সোনায়,—দারুন ষাঁড়ের উপর আলুলায়িত বসনে মেয়েটি সময় ধরে বসে। তালদার বাতিদানের রূপার দণ্ডে ফুলকারী করা। কভু বা ভিনিসীয় কাচের পাত্রের আয়তলোচনা মাতৃমূর্তিতে। অথবা এবার ঊর্ধ্বে।

উলঙ্গ সুন্দর বারোক সৌখীনতা, মোহনলাল এখানেই স্থির. ছিল, এখন ছিল। ভাল করে লোকটির দিকে একবার চাইলেন। এবং একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "তোরা কি জাত ?"

"বাউরী"

হাতের ছোট পুতুলটির দিকে চেয়েছিলেন, পুতুলের মুখের কাব্যধর্মী সরলতা তাঁকে বেশীক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখতে পারে নি। সহসা তাঁর, এক

ফাঁকে, মনে হয়েছিল এই পুতুলটি কেনার কথা। কোন এক ধনী বেনে-বাড়ির ছেলে, তখন প্রায় খড়ি-কাপ্তেন, আধো গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে পুতুল দেখালি, মোহনলাল তাঁকে শ'পাঁচেক টাকা দিতেই সে চলে গেল। মোহনলাল আস্তে আস্তে পুতুলটি দেখেছিলেন, এক তিলের মধ্যে এত সৌন্দর্য জগতে অনেক আছে, এটি আরখানি। তিনি গভীরভাবে পুতুলের ঠোঁটে চুম্বন করেছিলেন। তাঁর ঠোঁট পুতুলের ঠোঁট ছাড়িয়ে শূন্যতায় স্তব্ধ হয়েছিল। তিনি সুস্থ হতে পারেন নি। এখন আবার হেসে সম্মুখের লোকটির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "মুচি নোস তো ?"

"মুচি কেনে"···হুজুরের সরলতায় সে হেসেছিল।

হুজুর মোহনগোপালের মুচি মনে হওয়ার কারণ এই, যে লোকটি এতাবৎ যে কথা বা গল্প বলেছিল সেগুলিতে পচা গলিত দেহের গন্ধ। সে অনর্গল বলে গিয়েছিল, আবার শুরু করলে "আমায় দশ ঘা জুতা মারুন হুজুর, যদি মিছাই কিছু বলি, দেখন হুজুর আপনার নুন খাই—গা আমার জরা, ফাটা ফাটা দশ গা ফেলে এলাম, এ কেমন কথা আপনার নাম কেউ জানল না, পাঁহরী মৌজার কুয়োতলা বসি কাঁদলাম, আমার মনিবের লাতি গো তাকে চিনল না, তারপর ভাবলাম না চেনা দিলে হে চিনবে কেমনে ?"···তার বলার ভঙ্গিতে কেমন নাচের ভঙ্গিমা ছিল। মাঝে মাঝে হাঁটু ভাঙে, কভু শূন্যে হাত আছড়ায়। এই লোকটি রতে পাইক। চোখে তার মনসাপাতার কাজল।

মোহনগোপাল শুধু এইটুকু ভেবেছিলেন, তা কি করা যাবে। এবং বুড়ো রতিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "কি করে চিনবে"

"চিনবে মানে, উয়াদের কাঁকের মাইধরা ছানা পর্যন্তকে টুঁটি ধরি আনর তোমায় আপনাকে চিনাতে গো···রাজা চিনবি না রাস্তা চিনবি না···"

"দুঃ"

"দুঃ কি বাবু···বহুত দিন নুন খাইলাম, তাদের তাদের অখণ্ড পরমায়ু, আজও যিনি আপনার মধ্যে ভোগ দখল করে গো" বলে লাঠিশুদ্ধু কান ধরে কুর্নিশ মত করলে। এবং বললে "তাদের কি প্রেতাপ ছিল, ভয়ে তারসে লোকে কাপড়েচোপড়ে হত, প্রজাখাতক কি কথা এক সায়েব লালমুখো সদরঅলা, রাজার সঙ্গে বখেড়া করলে, সায়েব হাঁসিল হল, তার লালমুখোর অখণ্ড দোষ বল্লেক, তুয়ার রাজাকে আমি চিনি না, ব্যস খতম" বলেই বেসাট দাঁতগুলো

বার করে হাসল। "লাস তলাসী হল না কাক-শেয়ালে বহুত রক্ত খেলে, ওতলো চৌকিদার খানিক রক্ত মাথা মাটি লিয়ে মেমকে দেখালে,..."

"আঃ থাম থাম"

"আমি মিছাই বলি না হুজুর, হাঁ, এমন দোরতণ্ড ছিলেন গো, বুনেদী কত্ত বড় ঘর · কি হাঁকডাক!"

হুজুর মোহনগোপাল বুড়োর কাছ থেকে যেন পালাতে পারলে বাঁচেন, সনাতন যেখানে বসে বন্দুক সাফ করছিল, দ্রুতপদে হল ছেড়ে সেখানে, এটা ডাক-বারান্দা; একপাশে পাথরের টেবিলে, লম্বা বাক্সর ডালা খোলা, লাল বালতি হা হা করে আছে। দামী সুন্দর বন্দুকটি এক্ষন ঘাট পরান হয়েছে, হঠাৎ বাবুহুজুর বন্দুকটাকে তুলে নিলেন। নল কাঁপে বসতেই খাল্ক করে শব্দ হল। তিনি বললেন "ভব, গেলাস দিতে বল" বলে গলার চেনহারটি একটি আঙুল দিয়ে কেবলমাত্র আলগা দিলেন।

অভিজাত গৌরবের প্রতি এ কথা সত্য তার লোভ ছিল। আকর্ষণ ছিল। কেননা যেহেতু আবাল্য তিনি সাহসের নামে অনেক নীচ গল্প শুনেছেন। ছেলেবেলায়, এইরূপ একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী লোককে সর্বসময়ে খাটে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। অভিজাত গৌরবের মধ্যে একটি রূপার গেলাস, আর একমাত্র প্রজা হিসাবে একটি বিড়াল। তারপর তাঁর পিতা অল্প বয়সে বেশ্যালয়ে ভবলীলা সম্বরণ করেন। এবং তাঁরা দুই-তিনটি প্রাণী আশা পোষণ করেছিলেন, পুনর্বার জমিদারী ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এবং মোহনগোপাল অবশেষে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কোন নীচ কাজ নেই যে তাকে করতে হয়নি, আর পাঁচটা প্রভূত ধনশালী যে পথে টাকা উপার্জন করেন, তিনিও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন। এখন তিনি এখানে, রাঘবপুরে, সমস্ত প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর। সুতরাং রতে পাইকের কথা কেমন কেমন লাগলেও এ তার মনের কথা। কেননা এখানে এসেই প্রথম দিনেই তিনি কয়েদখানাটি পরিদর্শন করেছিলেন।

ব্রাণ্ডি গ্লাসটি হাতে নিয়ে মোহনগোপাল বারান্দা ছেড়ে, হলে এসে চারদিকে কি যেন তাঁর চোখ খুঁজেছিল। পরে, একটি ললিতসুন্দর চেয়ারের হাতলে বসে পিঠদানে হাতের উপর হাত রেখে মাথাটি ন্যস্ত করে বেশ কিছুকাল তাঁর কেটেছে, কখন বা তাঁর চোরা চাহনি এ সকল সৌন্দর্যের দিকে মানুষ যখন মানুষকে ভালবেসেছিল তার নিদর্শনের দিকে ঘুরেফিরে। কিন্তু

দরজার আলো আটকে রতে পাইক এখন হাটু ভেঙ্গে মহা উল্লাসে কি যেন বলছিল।

ক্রমে গোলাপের স্বাদ এ সকল কিছুর মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হল। রতে পাইককে হুজুর আর ছাড়লেন না। কেননা যেহেতু প্রজাশাসনের রীতি, চৌধুরীদের দর্পের কথা সে অনেক, অনেক জানে। নাতিহুজুর মোহনলালকে অতি সহজেই তার বংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার যত কিছু পথ আছে তার নিশানা সে দিতে পারে। রাত্রে মদ যখন মেয়েমানুষ হয়ে যায় সেইকালে তাঁকে জাগিয়ে রাখবে ইত্যাকার বিষধর গল্প কথা।

সেইদিন রাত্রেই তাঁর রূপান্তর ঘটল; শুধু মনে হল, আমি অতীব অতীতের মাংসপিণ্ডের আর একজন। ক্রমে হৃদয়ের স্থানে পেট এসে দেখা দিলে, দাঁত তাঁর ভাবপ্রণতা, নখে খুরধার হয়েছিল ভালবাসা। রতে পাইকের মুখে আলো ঠিকরে পড়েছে, আলোর অস্থিরতা রতির মুখখানাকে নিড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বারবার। "ও ভজা লাপতে, কি কপাল লোকটার গো, জগা-তারা রুইদাস তার ফোঁড় কেটেছিল; কারণ জগার বউ লাপতের সঙ্গে লষ্ট ছিল! ব্যাস, কাল হল রাজাহুজুর তার আঙুল কেটে দিলেক!"

এরপর হুজুরের ঘুম কোথায়? ঘুম সে তো রোমক সভ্যতার বাটলির যে অনায়াসে মাংসের উপর মনের উপর অনৈসর্গিক আলো খেলিয়ে দিয়ে থাকে। যাতে করে সৃষ্টি আরবার, শিশু যেমত, সেইরূপ মাই খোঁজে। ঘুম নেই, ওডিকোলনের ঝারি আর ফলদায়িনী নয়, শুধুমাত্র তিনি ইসালামীয় টিউলিপ অঙ্কিত ভিনিসীয় ঝারির দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকেন। রূপার বাতিদান বিচ্ছুরিত আলোয় ঝারির তলায় তরলতায় আশ্চর্য সৃষ্টি করে, পূর্বে হলে হয়তো মোহনলাল ভাবত, ওখানে যেন অনেক মৎস্যকন্যা! কিন্তু এতে ইদানীং কোন বংশ গৌরব নাই, মাথায় কোলনের জল, উপরে টানাপাখায় গোলাপসুন্দরী আঁকা হসহস করে যায় আসে। এতেক বৈভব, সুদীর্ঘ সৌন্দর্য, ঘুড়ি ধাইয়ের গল্পের কাছে ম্লান। ঘুড়ি ধাই, দশ বিশ মৌজায় লাট খেয়ে ফিরত তাই তার নাম, ঘুড়ি কোন এক কাতরান মেয়ের নাড়ি কাটতে গিয়েছিল—"তাকে ছেলে দিইয়ে লেখিয়ে···ছেলে বিয়োন করালে···" ···হুজুরের রক্তের স্রোতে ভোদড় উঠানামা করেছে, অধিকন্তু একথা সত্য যে শঙ্কর মাছের রূপা বাঁধান চাবুক, জুতো বা লাথিঝাটার কি ঘুম হয়!

খোলা ছাদে, এ ছাদের একপাশে দেওয়াল তোলা, সেখানে অনেক

কোন এক অতি সভ্যতার সাধনার মাধুর্য-মূর্তি। চাঁদের আলোয়, এক্ষণে রসিলা হয়ে উঠেছে, ঠোঁটের ছায়া চিবুকে বিস্তৃত! এতে করে মনে হয়, কাল তথা সময় দীনতম দীনের মতই এ-বাড়ির নিচের তলায় কিঞ্চিৎ-ভিক্ষার আশায় অপেক্ষমান।

আরামকেদারায় ফুলের ছায়া-করা মখমলের উপর মোহনগোপাল তাঁর মুখখানি ঘষলেন, সেখানে হিম ছিল। নিকটে কার্পেটে তাঁর মেয়েমানুষরা ছিট্‌কে পড়ে ঘুমায়, বাইজীরা ঘুমে কাতর তথা মদে অচেতন। অদূরে বেহারারা ঢুলছে, পড়ছে। তিনি একাই জাগ্রত। কোনক্রমে বেসামাল পায় মোহনগোপাল ছাদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলেন, কার্নিশের উপরে একটি পা তুলে দাঁড়িয়ে, তাকালেন, কার্পেটে এক ঝলক স্মৃতি ; ওপাশে স্থিতবান শাশ্বত মূর্তি নিচয়, আর পিছনে পোড়া পৃথিবী! সম্মুখে দুপুরের লাল সই দূরত্ব এখন আঁশখোয়া ধোঁয়াটে! তিনি একপাশের ঠোঁট ফাঁক করে বললেন, "সব আমার—যা খুশি···"

অপ্রকৃত ঘুম, তথাপি জয়পুরী নাচওয়ালী, আগ্রাওয়ালী মেহের উন্নিসার পা লেগে সোডার বোতল গড়িয়ে, ঘুঙুরের আওয়াজ আর রয়ে রয়ে সোডার বোতলের গুলি ছিপি গুলগুল করে উঠেছিল। হুজুর ঘুরে দাঁড়ালেন। যা কিছু চিকন, যা কিছু ফুরফুরে তা হাওয়ায় উড়ে যেতে চায়। মোহনগোপাল নিজের মুঠো খুলে কি যেন দেখতে চাইলেন ; বহুক্ষণ আগে এই দিগন্তকে পিছনে রেখে ঘুরে ঘুরে নাচছিল, বেহাগের লহেরা নিপট, ধানীও লাট লাট খেয়েছিল। মেহেরউন্নিসা হোঁদলা ভেড়ুয়াকে দেখে তিনি কেমন যেন ভীত হয়েছিলেন, ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে ভেড়ুয়াকে ধরতে গিয়ে মেহেরকে ধরে ফেলেন। মেহের আই আই করে খানিক কুকুর কাঁদুনি দিয়ে সোহাগ কামড় দিয়েছিল হুজুরের হাতে, সে-কামড়টিকে বারবার খুঁজেছিলেন।

সত্যিই তিনি কি খুঁজেছিলেন? হয়তো না। মদ ইদানীং তাকে আরও জাগ্রত করেছে, মদের রীতি তা না হলেও ধর্ম তাই ; আর তাই যদি তবে তিনি অদ্ভুতভাবেই জাগ্রত। মোহনগোপাল সঙ্কল্প করেছেন হাওয়াকে দেখবই। দূর প্রাচীন অতীতের অমোঘ পাথুরে দেওয়ালে ক্রমাগত ঢুঁ মেরে চলেছেন অতীত আমার চাই, সাক্ষাৎ অতীত। ফলে অতি সহজেই তাঁর নিজের ভিতরে একটি হাঁকপাঁক ঢুকে পড়েছে, অতিকায় গোঁয়ার মাংসপিণ্ডবৎ দিন রাত্র এইটুকু মাত্র বিচার, কোন উষ্ণতা নেই।

খাঁচা ভানার পক্ষাঘাত আনে না। নানাবিধ মুখচোরা লাজুক সৌন্দর্য তাঁর কাছে নামমাত্র হয়েছিল, তাই এখন যখন তিনি সাহস করে অথবা অসাবধানতাবশত, মূর্তিগুলির দিকে তাকালেন, দেখলেন, পরীগুলি অসম্ভব জীবন্ত। চন্দ্রালোকে নাতিসবুজ, এ পাথরের মায়া যেন বা তাঁর রক্তকে সত্যই লাল করে দিয়ে মনের মধ্যে শিশুর পরাধীনতা এনে দিতে চাইছে। ক্রমাগতই তাঁকেই কোন এক স্বপ্নালোকের দিকে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি যেন কোথায়,—টিট ন্থাড়া রক্ষার উপর দাঁড়িয়ে। একবার তাঁর মনে হয়েছিল এক ঝটকায় এসকল সরলতাকে তিনি তছনছ করে দিতে পারেন। উত্তেজনায় মোহনলাল এখন শঙ্কর মাছের চাবুক অথবা ছেঁড়া জুতা।

পরক্ষণেই তিনি যেন শুনতে পেলেন, অগনন মৌজা মহাল থেকে, এই বিরাট লোক চরাচর গড়ুরের মত করজোড়ে প্রভু প্রভু বলে উঠেছে। অদূরবর্তী কয়েদখানা থেকেও প্রাণান্ত আর্তনাদ। সকলের বুকে তাঁর নাম—এরা কারা যাদের মেরে না ফেললে জীবিত ছিল বলে লেখা যায় না। মোহনলাল জানত না, ভয়ঙ্কর হওয়ার মধ্যে এমন এক মেজাজী আনন্দ আছে। সহজ মানুষের মত উঠেই তিনি বন্দুকটা তুলে নিয়েই, ভবকে দেখতে চেষ্টা করলেন। ভব উপুড় হয়ে শুয়েছিল, কাপড় তার এলোমেলো, সেখানেই এক লাথি মারতে ভব উঠে কাপড় সামলে, চোখ কচলাতে লাগল। ভব চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলে, সামনে বন্দুকের নল, বোকার মত সরিয়ে দিতে গিয়ে শুনল তিনি কিছু বলছেন।

ভব নল দেখে ভয় পেয়েছিল। কারণ তখনও আলো দেওয়া হয়নি। মোহনগোপাল বন্দুক নিয়ে তাকে তাড়া করেছিল। বাইজী গান থামিয়ে চুপ। ভব হলঘরে ঢুকেছিল, হুজুরও এসে পড়লেন। একটি আয়নায় সহসা প্রতিফলিত ভবকে গুলি মেরেছিলেন, তারপর এক অট্টহাস্য। সেই থেকে ভব ভয়ে ভয়ে আছে। তবু এখন সাহস করে সে বন্দুকটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে, তাকে শুইয়ে দিতে গেল।

টিলার উপর দিয়ে আলো অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে, কুসুমের শীতলতা আর নেই, এখন থাক। তবু বেলেরাস্তা এখনও তপ্ত নয়। এমত সময়ে গেট পার হয়ে নাতিদীর্ঘ একটি ভীড় ক্রমে এই বিরাট বিরাট থামওয়ালা তিন-চার গাড়ি দাঁড়ানর মত প্রশস্ত গাড়িবারান্দায় এসে ঠেক খেলে। নিমাই হেলের ছেলেটি মাথা উঁচু করে "হোউ" বলে উঠেই মুখটা নীচু করে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি

সহকারে হাসতে লাগল, এর পূর্বেই গম্ভীর প্রতিধ্বনি হয়েছিল। যারা যারা বয়সী তারা তাকে তাড়া দিয়েছিল।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই, চটির ফটফট আওয়াজ শোনা গেল। এবং দেখা গেল নায়েব যে কষি বাঁধতে আঁটতে এসে উপস্থিত, একগাদা অভিবাদনের হাসির উপর দিয়ে নজর চালিয়ে নিজের কাঁধ মচকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঠিক করে বললেন, "কোন হারামজাদা রে?" বলেই দাঁতের ফাঁকে কি যেন আটকেছে, সেটাকে ছিকছিক্ শব্দ করে অদ্ভুতভাবে টানতে থাকলেন। সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন "হুজুর সবে উঠলেন, (বেলা এগারোটা) চাম তুলে লিবে…"

ইয়াসিন কার যেন কানে কানে বলেছিল "জাতে মুচি নাকি…"

নিমাই হেলের ছেলেটি বাপের নিকটে কাছ-ঘেঁষে আপনকার মাথায় হাত দুটি স্থাপন করতঃ দাঁড়াল। কিয়ৎক্ষণ চুপ, শুধুমাত্র পায়রা শব্দের বোল পড়ন নির্দয় হয়ে উঠেছিল। পুনশ্চ নায়েব বললে, "কুথাকার গেছ পাথুরে, বেহুড়ুলে (হোড়া মানুষ) গাঁ-মৌজা উজাড় করি আনছিস হে, কুকুরটাও লিয়ে এসছিস হে ‥"

রববানি কানের মধ্যে কড়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে ঝাঁকি দিতে দিতে বললে—"ই কি গো, ছেইলা ছানা রাজদর্শন করবে বটে গো, তাই লিয়ে এলাম হে, কাঙাল মানুষ রাজা দেখি নাই—রাজা দেখুক"

রাম সম্ভবত, একথা বলেছিল যে, "তুমি তো বুলবে সববাইকে লিয়ে আসতে এখন…" রামের মত নিশ্চয় আর আর সকলেরই নায়েবের ব্যবহার বেশ অবাক লেগেছিল। গতকল্য সন্ধ্যার ব্যবহারে একটু হাত কচলান ভাব ছিল।

রামের কথার উত্তর দেবার মত মন নায়েবের ছিল না, যেহেতু রববানির জবাব তার কাছে খুব লাগসই বলে মনে হয় এ কারণে যে এ সকল কথা সে নায়েব হুজুরকে বলতে পারবে এবং হুজুর এহেন কথায় বড় তুষ্ট হবেন। নায়েব বললে "লে তুরা বস, এখনই হুজুর লামবেন…হাঁ হাঁ চুটাফুটা খাস্ নাই ই ঠাঁইকে ‥সহবৎ সম্ভ্রম দেখাস ‥" বলেই চলে গেলেন, কেননা বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ানর মত তাঁর জোর ছিল না।

এখানে এইভাবে ভুঁয়ে বসাটা যদিচ খুঁতখুতে ব্যাপার, তথাপি বসতেই হল। যেহেতু সকলেই শলাপরামর্শ করে এসেছে, মনে মনে সকলেই ভেবেছিল হাঙ্গামা আটকাতেই হবে, কারণ সময় সুযোগ পালটেছে। শাজাদ সেদিন কারো কথা কাউকে ভাঙেনি।

শাজাদ খুদাতালার নাম স্মরণ করেই এসেছে, আসবে না৽এমন তো হতে পারে না। এই বোধ হয় প্রথম রুনুখগাঁয়ের লোক রাঘবপুরের তলবে এল। এখানে ছাগল-গরু চরাতে অনেকবার এসেছে, কিন্তু এইভাবে কখনও আসে নি। সত্যই তাহলে প্রমাণ হয় যে রুনুখগাঁ কমজোরই হয়েছে। এ-কথা বড় দুঃখের বটে। রুনুখগাঁয়ের রোগাপাতলা তগড়া মিলিয়ে জন পঞ্চাশেক যারা এসেছে তাদের মুখে একই ভাব; এদের চোয়াল যেন নেই, চোখ ছোটবড় হবে না। সকলেই চুপচাপ করে বসে, গুনগুনানি যদি একটু বড় হয় তৎক্ষণাৎ একে অন্য গায়ককে 'হিঃ রে' বলে চোখ মটকে ধমক দেয়। অবশ্য দু-এক দানা রস-রগড়ের কথা হয়েছে, এ ওর কানে ফিসফিস করেই বলেছে। কোন কোন শ্রোতার কাঁধে বক্তার দাড়ি লাগার জন্য, সুড়সুড়ি খেলে গিয়েছিল। শব্দ করে কেউ হাসেনি, অট্টহাস্যের মূক অভিনয় করেছিল। এক-একটা হাঁ যেন কলে খুলে নিভে যায়।

রববানিকে ইয়াসিন একটা ঢিল দিয়ে মাটি আঁচড় কাটতে কাটতে বলেছিল, "চাচা তুমি বলেছিলে, রাজবাড়ি এলেই আগে চিঁড়ে গুড় দেয়, লাস্তাপানি দেয়—সে কেমন জলপান গো? লায়েব যেমনটি দিলেক? সেই রকম না ধরে খেও মা?" ইয়াসিনের গলা জোর হয়েছিল। ফলে অনেকগুলি রেখাঙ্কিত অট্টহাস্য দেখা গেল।

এমত সময়ে সিঁড়ির উপরে দরজার কাঁচে কে যেন প্রতীয়মান হল। সাদাটে লতাপাতার কেয়ারি করা লম্বা কাঁচের সার্শিতে একটি সুন্দর মুখমণ্ডল, এবং তার রেশমের চীনে কোটের অনেকটা অংশ। এই দরজার কিছু দূরে একটি বন্ধ খড়খড়ি হঠাৎ বন্ধ হল, সেখানে ছিল মোসায়েব ভব, সে বোধ হয় ইয়াসিনের মন্তব্যের কিছুটা শুনেছিল। তাকেও সার্শিতে দেখা গেল, হুজুরকে খুশি করার নিমিত্ত সে তার শোনা কথাগুলি বলেছে। হুজুরের ভ্রূদ্বয় কুঁচকে উঠল। তিনি নায়েবকে কি যেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। প্রশ্নকালে তাঁর মুখ ছিল নায়েবের দিকে, এবং আঙুল এদের দিকে সেই সময় উঁচান ছিল।

হুজুরের রাগতভাব, বেশী আঙুল চালাতে গিয়ে সার্শিতে অসাবধানতাবশত লেগেছিল, ফলে একবার আঙুলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন "কেন কিছু দেন নি···"

নায়েব অতিমাত্রায় ভীত স্বরে বললে "জ্ঞে, ভাড়ারিকে বলিনি, কারণ এরা

তো ঠিক আমাদের প্রজা নয়।" একথা নায়েব বুদ্ধি করেই বলেছিল, যেহেতু এতেক লোকদের চিঁড়া যোগান দেওয়ার মত ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

"থামুন" বলেই বলে ফেললেন "হোক না হোক" অর্থাৎ ভাবটা এই যে আমি একজন বির:ট কিছু, রাজা। আর অন্য কোন অর্থে নয়। কিন্তু এই কথার পরই নায়েবের ধৃষ্ট উত্তর তাঁর কানে বাজল। বললেন "প্রজা নয় মানে?" যেন তিনি কামড়াতে প্রস্তুত।

"জ্ঞে, জ্ঞে, হুজুর, ওরা হুজুর…"

"ওরা হুজুর মানে আমার প্রজা…মানতেই হবে" বলেই চুপ করে থেকে কিয়ৎক্ষণ কিছু যেমন বা ভেবেছিলেন, ভাবলেন তাঁর বলা উচিত ছিল "ওদের …চৌদ্দপুরুষ মানবে" অন্তত ইত্যাকার উক্তিতে তাঁর বনেদিয়ানা স্পষ্টতর হত। নিজের কাছে তো বটেই, অধিকন্তু সমবেত সকলের কাছে। এরপর তিনি বললেন "মানাতে না জানলে কেউ মানে না" বলেই দরজা খুলতে হুকুম করলেন।

দরজাটা কিছু শব্দ করতঃ খুলে গেল। সম্মুখে হুজুর এবং তার পিছনে রূপকথার ঐশ্বর্য। হলঘরের খানিক দেখা যায়। বেহারারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটি রাজসিক চেয়ার এনেছিল, পাদানি এনে দিল, প্রকাণ্ড পাখা এল। সমবেত জনমণ্ডলী যারা এতাবৎ মাটিতে বসে ছিল তারা একে একে উঠে দাঁড়াল (সার্শির পিছনে আবির্ভাবের সময় কেউ ওঠে নি)। ইয়াসিন উঠতে গিয়ে তার কাঁধের ছেঁড়া নেতাটা (গামছা) পড়ে যাচ্ছিল। কে একজনা নাক ঝাড়তে গিয়ে স্থির হল। শুধুমাত্র শাজাদ দেহের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত উদ্ধত ভঙ্গি জোর করে খাড়া রেখেছিল, কেননা তার পেটে বুকে শীত চলে ফিরে, সে তার আপনার বাঁ হাতখানি কোমরে স্থগিত রেখেছিল।

পরীর মত মুখখানি দেখে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক, তারা 'পৃতিমা' তারা 'যাত্রার রানী' বলে তাঁকে ধরেছিল। কথঞ্চিৎ ঘোর কাটার পর, ছোট ছোট কুর্নিশ—কিছু গড় (আভূমি নয়) চঞ্চল হয়ে উঠল। হুজুর দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে আবির নয়নে দেখেছিলেন। হুসহুস করে হাতপাখা আসে যায়, ফলে কিছু লোক যখন দেখে, অন্যেরা তখন বঞ্চিত হয়।

হুজুর চেয়ারে এখন যেন ঠিকভাবে বসতে পারেন নি। প্রজা দেখে ভারী খুশি, দু-একবার গলা পরিষ্কার করলেন, নানান অস্থিরতা প্রকাশ পেল। ইতোমধ্যে শুনলেন নায়েব তারস্বরে হাঁকছে "ওরে লে গড় কর, ঈশ্বর শ্রীল

শ্রীযুক্ত রাজা ব্রজগোপাল চৌধুরী বাহাদুর হুজুরের লাতি···শ্রীল শ্রীযুত রাজা মোহনগোপাল চৌধুরী বাহাদুর তোদের বাপ-মা, লে লে” বলে নিজেই বিনয়ে পাপোশ সদৃশ হয়ে গিয়ে বললে “গরীবের মা-বাপ···”

পৃথিবীর হুজুররা সকলে মা-বাপ দুই, ফলে ক্লীবলিঙ্গ! হুজুর সলজ্জভাবে নায়েবের দিকে চেয়ে কখনও মুখ নিচু করে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। নায়েব ভুঁড়িটা যথাসম্ভব নাচিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন “হুজুর দরবার ঘরে যদি·· ”

“না · দুমিনিটে সেরে নেব” বলেই তিনি সম্মুখের ভীড়ের দিকে বেনামা নজরে চাইলেন। ইতঃপূর্বে এরূপ দুঃখময় ভীড় দেখেননি। কতগুলি অনিশ্চিত শীতে কাঁপছে। নিজের অস্থিরতায় পাদান উল্টে গেল, তিনি নিজেই তুলতে যা'চ্ছলেন, সহসা কৈলাস এসে ঠিক করে দিলে। হুজুর নিজের ব্যবহারের জন্য মর্মাহত হয়েছিলেন। হুকা-বরদার এসে একটি বিচিত্র আলবোলা রাখল অনতিদূরে, কাটগেলাসের উপর সোনার কাজ করা বৈঠা; তাতে দশ-বার নহর নল। মুখদানটা অত্যন্ত আদবকায়দায় হুজুরকে দিলে। হুজুর মোহনগোপাল যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। কস্তুরির গন্ধ পরিব্যাপ্ত হল।

হুজুর অধিক নাটকীয়ভাবে বসে মুখদানটায় টান দিলেন, পুনঃপুনঃ দিয়েছিলেন কিন্তু কোথা ধোঁয়া! তাকে কেমন যেন বা জীবন্ত রগড় বলেই বোধ হল। মুখদানটা সরাতে পারছেন না কারণ এটি অলঙ্কার, এটি অহঙ্কার। ত্বরিতে সকলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় বেয়াকুফ বলে বোধ হল। সকলেই তাঁকে যেমন অনুপযুক্ত ভাবছে। মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়েই নায়েবের কথাটা মনে হয়েছিল, সুতরাং আর আর কথা, যথা এদের সঙ্গে পুরাতন বিবাদ, যথা শাজাদের অবজ্ঞা করার কথা মনে হয়েছিল। কে যেন তাঁর ভিতরে 'মাভৈ মাভৈ' বলে একবার যেন বা হুকুম করেছিলেন, “রতি পাইক”, কিন্তু প্রকাশ্যে নানাবিধ স্বরে একটি রূঢ় পদ শোনা গেল “কয়েদখানা দেখিয়ে নিয়ে আয়।”

এমন যে নায়েব সে পর্যন্ত এই উক্তিতে যেন ধাক্কা খেয়ে গেল। ভবও যারপরনাই স্তম্ভিত! হুজুর নিজেই তার অসতর্ক মুহূর্তে পাখিরা যেমত ঘাড় কাত করে কথা শুনে, তেমনি শুনেছিলেন। মনে হয়েছিল এ গলা অনেক অন্ধকার পার হয়ে এল। তিনি বলে উঠলেন “নিয়ে যা”। কোন কিছু ভেঙে পড়বে, ভয়ঙ্কর শব্দ যেন প্রকম্পিত হল।

ইদানীং জনসমাজ অস্পষ্ট হয়েছিল, হুজুরের বাক্যে কেবলমাত্র তাদের বুকটা ধক্ করে উঠে ঢিপ্। কে একটা বাচ্চা ছেলে সর্দি টানতেই যেটুকু শব্দ হয়েছিল তাতে তারা কেঁপে উঠেছিল। এতক্ষণ কেউ কারও দিকে চায়নি। এমত সময় দুজন নীলকোর্তা পরা তকমা-লাগান লোক এসেই বললে, "চল হে।"

হাওয়া চালিত শুষ্ক পাতা যেমত চলে, তেমনি সকলেই। কিন্তু তবু ছোট বড় নানাপ্রকারের দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গিয়েছিল। ঈশ্বরকে স্মরণ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। সকলেরই মুখ নিচু, শবযাত্রায় যেরূপ দেখা যায়। গাড়িবারান্দার অন্যদিক দিয়ে বার হয়ে, যখন তারা প্রথম লতানে গোলাপযুক্ত বাতিথাম্বা পার হয়েছে, এ সময় রব্বানি কিছু পাশ কাটিয়ে শাজাদের পাশে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে…"মন মানাও গো, আমরা ছোট হই নাই…আমরা আল্লার নামে আছি…"

শাজাদ এ কথায় হেঁট মুখটা তুলে, একবার তার দিকে, অন্যবার সারা প্রকৃতির দিকে চক্রাকারে তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল, মাথা নাড়ল।

অনেকটা আসার পর, সারি সারি গুমটিঘর। তারা সকলেই গুমটিঘরের বারান্দায় উঠল। অনেক ঘরে তালা দেওয়া, সর্বশেষ ঘরটি বড় এবং এইটিই কয়েদখানা। কয়েদখানার সম্মুখে এক পিঁপে চুন ভিজান আর নানাবিধ কলিফেরানোর সরঞ্জাম; কিছু বালি, কিছু সুরকি বারান্দার নিচে মাঠে ডাঁই করা।

লোহার মোটা গরাদওয়ালা দরজা। হুড়কোতে মুঠোর মত দেখতে বেশ ভারী তালা লাগান। অসম্ভব একটা ঝাঁঝাল গন্ধ এরা সকলেই পেয়েছিল। সমস্ত ইজ্জত ভুলে সত্যই সকলেই কয়েদখানা দেখতে লাগল! গরাদে মুখ রেখে জটা খামচাতে খামচাতে শিবাই বামুন বললে, "মেলা আঁচড় মোচড় দিলে গো মিয়া।"

কারু কথা কইবার মত মন নাই, যেমন লোকে ঐতিহাসিক ফাঁকা ঘর-সমূহ দেখে, তেমনি এরা বড় চোখে দেখছিল। ছোট একটি নিশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে একজন যখন সরে আসে, অন্যজন তখন সলজ্জভাবে গরাদে মুখটা লাগিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করে। ছোট ছেলে যে কজন ছিল, তারা হামাগুড়ি দিয়ে বড়দের হাঁটুর ফাঁকে ঢুকে দেখছিল, মজার কিছু দেখা যাবে বলে চারিদিকে চাইছিল।

কয়েদখানার ছাদ খুব নিচু, উপরে ছাদ গোল হয়ে ভাঙা। খিলানের ইট খোয়া মশলার স্তর কালো হয়ে আছে। কতক চামচিকে। ছোঁড়াদের মধ্যে কে একজন 'হুক' করে উঠতেই, চামচিকে ছুটে পালাল। ছাদের গোলা ফাটের আগাছা আর কালমেঘ এতাবৎ যা হাওয়ায় নড়ছিল, তা সকল চামচিকের চোটে দুলে উঠল। ঘরের উত্তরে একটি ছোট জানালা, দেওয়ালে দেওয়ালে ইকড়িমিকড়ি ফাটাল, সেখানে ফার্ন গাছ।

শাজাদ শিবাই বামুনের হাত ধরে বললে "দেখছ গো দেখছ···।" শিবাই তার দিকে না তাকিয়ে চোখ দুটি যথেষ্ট বড় করে ছিল। শাজাদ পুনর্বার বললে, "ওগুলা হাতের ছাপ না বটে?"

দেওয়ালে ভৌতিক হাতের ছাপ, কখনও ফার্নের তলে, কখনও বা ফাটালের ধারে। মহাসাগরে নিমজ্জমানের শেষ চেষ্টাটুকু। শাজাদ ভীত হয়েছিল, দুধেল গলায় সে প্রশ্ন করলে, "এতেক হাতের সই ছাপ কেনে গো বামুন, উটা কি লিখা বটে?"

শিবাই নিরীক্ষণ করতঃ উত্তর দিলে "মনে লয় যারা ছিল ইথানে তাদের সই ছাপ হবে···উটা ভ-বা-লন্দ···কে জানে কোন শালা।"

শাজাদ কি একটা কথা বলতে চেয়েছিল, দু-একবার শিবাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলি বলি করে বললে "তুমার কি মনে লয় উয়ার···মধ্যে" বলে থেমে মাথার ফেট্টিতে ঈষৎ ঠিক দিয়ে এক দমকে বলে গেল "উয়ার মধ্যে আমার তুমারও বাপদাদার ছাপ আছে নাকি বটে··· ?" এরপর গরাদ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের হস্তদ্বয় একটির পর একটি প্রসারিত করে অতি ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। এখন তার আয়ত চোখ দুটি হাইয়ে বড় হয়ে গিয়েছিল, সে শিবাইয়ের দিকে চেয়ে পুনর্বার আপনার হাতের দিকে চেয়ে সহসা অকারণে শুঁকে দেখে বলেছিল "লাও দেখ না হে কি মনে লয় গো তুমার।"

শিবাই জটা খামচাতে খামচাতে দেওয়ালগুলির দিকে চেয়েছিল, এবং পরে শাজাদের হাতখানি অবহেলাভরে সরিয়ে বলেছিল "ই রে ক্ষ্যাপা হইছ নাকি?"

"দেখ"

"আঃ কোন পালাগানের ক্ষ্যাপা তুমি বা"

শাজাদের চোখ তখনও আপনাকার উন্মুক্ত হস্তে নিবদ্ধ। হঠাৎ মাথাটা দুলিয়ে বড় অসহায় গলায় বলেছিল "ক্ষ্যাপা হই নাই, মন মরে গো, কে যেন বলে, কেউ না কেউ ছিল?" বলে ঠোঁট কামড়ে দেওয়ালের ছাপের দিকে

তাকাল, তার মাথাটা অন্তরে দুঃখে কাঁপছিল। ইতিমধ্যে আর আর অনেকেই আপন আপন হাত দেখে কোনমতে উঁকি মেরে দেওয়ালের ছাপ দেখার চেষ্টা করে।

শাজাদ দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললে "বল হে কি বল বটে" তখনও তার হাত উন্মুক্ত।

সেই হাতের উপর একটি তড়কা চাঁটি মেরে, মিথ্যা কোপ সহকারে শিবাই বললে "লাও! ছিল তো ছিল, হা কপাড় এমন খ্যাপ্পা তো দেখি নাই, এক ছটাক আট্কল নাই—বলি ছাপ যদি এখানেই থাকত তাহলে কি জমি কি ভোগসুখ করতাম হে? জমি পতিত বলে লিখা হত হে?"

ইত্যাকার উত্তর, আশাতীত বর্ষা আনলে, এরা থৈ পেয়েছিল। খানিক চুপের পর সকলেই যাত্রাই ঢঙে মাথা দুলিয়েছিল, কেউ হাতটা মুছে নিলে পরনের তেনাতে। শাজাদ বড় বড় চোখ করে হেসে ফেলেছিল, বললে "বটে বটেক হক্ক কথা গো—আয় তোর···ধরে চুমু খাই" বলেই এতাবৎ প্রসারিত ডান হাতের উপর বাঁ হাতের শেষ-তেহাই মেরেই ছোট একটা লাফ দিল, এবং বলেছিল "বামুন আর জম্মে তুমি জজ ছিল গো, আল্লা করে তুমি একভাতারী ঘুসকী পাও।" বলেই নিমাইয়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বললে "লে লে নিমাই, ছোট জাত দেখরে, ঠাওর কর তুর বাপদাদার ছাপ কোনটা হে।"

নিমাই তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে "লাও! পুড়া কপাল হে, ঠাওর কি কারণ? উ ঠাঁই সে ছাপ লেই গো, ছিল বটে সে তো বুড়া রাজার গালে". বলেই আড়ে দেখলে পাইক কোথায়? দেখেই গম্ভীর। এ কারণে যে তার গলা একটু চড়া হয়েছিল।

নিমাইয়ের রগড় ঠমকে সকলে উচ্চৈস্বরে হাসতে গিয়ে, এক বল্গা হাস্যের ধোঁয়া ছেড়ে গলা নামিয়ে নিলে। ফলে সকলেরই গলা-কাত্রান শব্দ শোনা যায়।

শাজাদ এগিয়ে গিয়ে বললে "ওহে পারোইয়ের বাগ্দীর ছেইলা পাইক, ই কোঠা তেমন ল্যায়েক সোমত্ত লয় হে—শালীর উমর পন্তান্ন" বলেই তার তকমার দিকে তাকিয়ে বললে "আ হে, আ হে পোশাকআশাক বড় ডাগর দেখি! বড় খাসা দিইছে হে, আ হে তকমা তো বড় জবর খুব খুব, মনে লয় আর্শি বা বটে" বলেই মাথাটা নিচু করে তকমা দেখতে লাগল।

পাইক দুজনেই একটু নড়বড়ে হয়, তারা পোশাকের গর্বে কথঞ্চিৎ ন্যাকা হয়েছিল। তারা কথার গায়কিতে একটু বুনো তামাসার ইঙ্গিত পেয়েও কিছু বলেনি, কেননা যেহেতু এদের সকলকেই তারা চেনে জানে। তারা কর্তব্যের খাতিরে শুধুমাত্র নিজেদের সোজা সুঠাম রেখেছিল।

শাজাদ ইতিমধ্যে তকমায় আপনার প্রতিবিম্ব দেখে, মোচ চুমরে নিয়ে গুনগুন করে গান ধরলে :

"শাল বনে শাল পাঁউড়া
কদহুঁ গাছে কলি রে
বঁধুর গায়ে লাল গামছা
তার ছটক দেখে মরি রে"

গানের সঙ্গে সঙ্গে সে এবং আর আর সকলেই হাঁটু ভাঙতে থাকল। মাথা দুলিয়ে অনুচ্চস্বরে গানটি ধরেছিল।

পাইক নিজের মেরুদণ্ডটি খাড়া করে বললে, "ঝটপট লাও হে"

"ই কি দিল্লীর দরবার যে ঝটজলদি দেখে লুব" কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

"ই হু পাথর-চাপটি মেলার খেদা রাণীর দরবার" এটা অন্য চাপা গলা।

সকলেই তাকত ফিরে পেয়েছিল। শাজাদ তার দুই হাত দ্বারা দুই পেশী চাপড়াতে চাপড়াতে বললে "চল হে···"

আবার তারা গাড়িবারান্দায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। খুব উবল নক্সা-করা পিঠদানে মুখখানি ঠেকিয়ে রেখে হুজুর তামাক খাচ্ছিলেন। এখন কিছু ধোঁয়া বার হয়। সম্মুখে ভীড় উপস্থিত। রববানি বুড়ো আগে এবং আর সকলে তার কাছাকাছি। হুজুর দুই আঙুল দিয়ে ঠোঁট মুছে প্রশ্নমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলবোলার নল নাড়তে লাগলেন।

রববানি কুর্নিশ করতঃ বলেছিল, "দেখলাম বটে হুজুর।" তার ঠোঁটে হাসির রেখা ছিল, অন্যান্য সকলের ঠোঁটে অল্পবিস্তর ছিল। দুঃখ চেটে মুখের হাসি যেরূপ হোক, অন্তত তাচ্ছিল্য একথা হুজুর ভাবতে পারলেন না। অনেকেরই চোয়াল এখন নড়ছিল।

হুজুর মোহনগোপাল মুখদানটি দেখতে দেখতে, সহসা একবার শাজাদকে দেখে নিলেন, বেশ কিছুটা মূল্য দিয়ে এই মুখখানি মনে রাখতে হয়েছে। কিন্তু কয়েদখানা দেখানোর মধ্যে এমন এক সৌখীন আরাম ছিল যে,

নিজেকে এই প্রথম তিনি অভিজাত বলে ভাবতে পারলেন, আনন্দে চেয়ারের উপর উবু হয়ে হাঁটু তারমন বাহু জড়িয়ে ধরে বসে দুলতে ইচ্ছে করল। এ কারণে যে এই প্রথম আল ডহর, নিগূঢ় অন্ধকার ভেঙে, অতীতের মধ্যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হল। আপনকার অন্তরের বোকা-ধড়ফড়ে অস্থিরতা এখন ডাঙ্গায় উঠেছে; আপনার গোঁফের দুই পাশ একটু বিন্যস্ত করে অল্প করে মোচড় দিয়ে বললেন, "তোরা সবাই জমির দাখিলা-পাট্টা নিয়ে কাল সকালে নায়েব মশাইয়ের সঙ্গে..."

"হুজুর, দাখিলা-পাট্টা আমাদের নাই, আমরা..." রববানি ধৈর্য সহকারে একথা বললে।

"দলিল নেই, দাখিলা নেই" বলেই নায়েবের দিকে ধনুকের মত ভ্রূ উঁচু করে চাইলেন; এটা প্রশ্ন করার জন্য নয়, নিজের খুশি ঢাকবার জন্য। যেহেতু তিনি ভেবেই পাননি, যে তিনি এত চতুরভাবে কথা কইতে পারবেন, নিজের উপর বিশ্বাস বেড়েছিল। এবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন "নেই কেন?"

"জ্জে, হুজুর" বলে স্কুলের ছাত্র মনে করবার জন্য যেমন উ উঁ শব্দ করে তেমনি করেছিল, কারণ হুজুরের চতুর অজ্ঞতা দেখে সে অবাক! সে এই সঙ্গে হাতও কচলাচ্ছিল।

"আজ্ঞে আমাদের ওই ছটাক ছটাক জামি" রববানি বলতে গিয়েছিল "দলিলের থেকে জমি ছোট হুজুর—"

"ছোট হোক আর যা হোক আমি...ওর খাজনা ধার্য করতে হবে। ...যাক নায়েব মশাই, ওদের যখন ওসব নেই, এই এক কাজ করুন কে কত জমি ভোগ দখল করছে তার একটা হিসেব নিন। মৌজায় সর্বসমেত কত জমি আছে?"

"জ্জে—জ্জে..." নায়েববাবু হুজুরকে সুবিধা দিলে।

"থামুন থামুন, দেড় হাজার বিঘে রুনুখগাঁ, ঠিনকি, টাবুই মিলিয়ে গাছপালা, সড়ক ডহর টিলা খর সোঁতা বাদ দিলে তেরশো বিঘে দাঁড়ায়।

রববানি বললে, "হুজুর হিসাব যখন করছেন, তখন খয়রা গুম্‌টো লপ্ত আছে হুজুর?"

হুজুর এ-কথায় কান দেননি। মিষ্টি লাগা আঙুল শিশু যেমত চুষে, তেমনি তিনি মুখদানটি চুষে চুষে টান দিচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে উপর দিকে

ধোঁয়া ছেড়ে নিজেকে ভারী মজার তৈরি করেছিলেন, পা তাঁর নড়ছিল। এরূপ আরাম তিনি জীবনে পাননি, রতি পাইক ঠিক কথা বলে। হঠাৎ বলে ফেললেন "দেখ বাপু তোমরাই আমার এক মাত্র প্রজা যারা…" বলেই তাঁর লজ্জা হল, এরপর আড়ে নায়েব এবং এদের দেখে নিয়ে হুড় হুড় করে বলে গেলেন "তোমরা কস্মিনকালে খাজনা দাওনি, তোমাদের হয়ে আমরা দিয়েছি, ঠাকুরদাদা ভাল মানুষ ছিলেন। (নায়েব হাত দুটি কপালে ঠেকালে) তিনি বরাবর…"

বড় পাখার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। রববানি অন্যমনস্কভাবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল, তার চোখে পড়ল পাঙ্খাবরদার সনাতন আপনার কোমরের দাদ চুলকাচ্ছে, এ দৃশ্যে সে খানিকটা সোজা সিধে হয়ে দাঁড়াল, বললে "গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর, আপনার জানতে আজ্ঞা হয়, হুজুর ও-লাট কোম্পানীর ঘরে হাজা শকুনবসা পতিত বলে লিখান…" আর বলতে সক্ষম হল না রোষে আবেগে উপরন্তু বিনয়ে তার হাড় খটখট করে উঠল; প্রকাশ্যে কশ বয়ে জল আসছিল মুছে নিলে, ঘাড় তখনও নড়ে।

এ সকল লোক চোখের সামনে থাকলেও থাকার কথা নয়। দীন যারা তারা যে এতেক বিশদৃশ্য তাকে যেন ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর সত্য প্রকাশে হুজুর চেয়ারে হাস্যকরভাবে নড়েচড়ে উঠেছিলেন, গলার স্বর শুধুমাত্র লাফ দিয়ে উঠল, শুধু শোনা গেল "কি বললি রে'র—ও'ল্লিরে"। তবু তার রাগ প্রকাশ পায়নি।

"জানতে আজ্ঞা হয়, হুজুরের গোলাম আমি" বলে একদা ডাকসাইটে মানী লোক—অদ্য বৃদ্ধ রববানি মাথাটা নিচু করলে। সরু ঘ'ড়ের উপর মাথাটি নড়ে, ঘড়ির ধুকধুকির মতই চাপদাড়ি এ-পাশ ও-পাশ করছিল।

যদিচ নিমকখোর গোলামের কণ্ঠস্বর ছিল না, তথাপি রববানির কথা কইবার ধাঁচ, বাক্য ব্যবহার, যা তিনি থিয়েটারেই শুনেছেন তাঁর কানে যেন বা শিশিরের পয়ার ঢেলে দিলে। আপনার হাত দুটি দেহের সঙ্গে জুড়ে আঁট হয়েছিল, হাত ছাড়িয়ে কি যে কর্তব্য তা এক পলকে ভেবে নিতে চেষ্টা করলেন। মনে হল তিনি যেন সাবালক হয়ে উঠেছেন, দুরন্ত জন্তুর মাংসপেশী দিয়ে সমস্ত অন্তরীক্ষটা গড়া। তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলে উঠল "রাসকল যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, ফের যদি শুনি মেরে হাড় ভেঙে

দেব" গলার আওয়াজ আঁশপাট, মোরগ-কোঁকানি ছিল। সম্মুখের স্তব্ধতা দেখে বুঝলেন, এ তারই গলার স্বর। ভয় ভাঙল, দুঃখ হল, এ কারণে যে স্বরে তেমন তেমন দর্প ছিল না। মান্য লোক স্ত্রীর ছেঁড়া কাপড় দেখলে যেমত ছোট হয় তিনিও সেইরূপ আপনার অক্ষমতার জন্য হেঁট হয়েছিলেন। মন হায় হায় করে উঠল, উচিত ছিল "জুতিয়ে চামড়া তুলে নেব অথবা চাব্‌কে গতর ট্যারা করে দেব" বলা। সুতরাং কি যেন মনস্থও করেছিলেন।

সাড়া নেই, অনেক উপরে থামের ক্যাপিটাল আশ্রিত দুয়েকটা গোলা পায়রা উড়ে গেল, চামচিকে কড়িকাঠে স্থির। প্রকাণ্ড লাল নীল কাঁচের আলোটার দণ্ড লেগেছে গাড়িবারান্দার ছত্রিতে, এইটুকু দেখে পুনর্বার চোখ নামিয়ে হুজুর বললেন "আমি কোন কথা শুনতে চাই না, সব হিসেব দিয়ে যাবে—শিক্ষা-সেস রাস্তা-সেস সব দিতে হবে···

রববানি লাঠির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে "হুজুর বাবুমশায় ; আপনি রাজা বটে, আ।নার নাম লিলে দিন ভাল যায়, পেট ভরে গো···" এরপর আরও সরল মনে বললে "পতিত্‌ গুম্‌টো জমির খাজনা আবার কি হবে গো ; আপনার এত আছে, ওটা পতিত্‌ লিস্কর থাক···"

রববানির কথার মধ্যে হুজুর সাপের মত মাথা আন্দোলিত করছিলেন, কোথায় তাঁর স্বরটা সুর ধরতে পারবেন, এই জন্যই বটে। গলা ফেটে পড়ল "ফের··· -মজাদা -জুতিয়ে মুখ চাবকে চমড়া তু-তুলে নেব···" অবশেষে স্বরে বাষ্পীয় ফোঁস ছিল। এবং আপনার গলার স্বরে নিজেরই জলতেষ্টা পেয়ে গেল। নিজেই অত্যধিক ভীত, অন্ধকার ঘরে যেন বা তিনি একাকী। কখন যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা তাঁর স্মরণ ছিল না। চেয়ারে বসে চীৎকার করা বেচারীর এখনও হাত সই হয়নি।

সমবেত সকলে প্রজাখাতকে রূপান্তরিত। কেউ, মানে খেলারাম ভেবেছিল এত সুন্দর মুখ এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে কি রে!

ইংরাজ যেমন দুঃখী ভিখারীকে বুটের লাথি মেরে 'গড সেভ দি কিং' গান করে—তেমনি তারও চোরা মানসিক ভাব হয়েছে। আর কিছু পরে, এখন ফুলের ইঙ্গিত না থাকলে ভ্রমরের গুঞ্জন ছিল, সেই কারণে আর কিছু পরে বাবরের সহ্য ক্ষমতা পাবে, মাজুন খাবে আর মানুষের মাথা গড়িয়ে পড়ছে দেখবে, রক্তস্রোতে মাছ ছেড়ে দেবে, তাঁবু সরে সরে যাবে। এইরূপে ভগবান থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।

৩

তাঁর গলার স্বর এখন প্রতিধ্বনিত হল, রুনুখগাঁয়ের বৌ-ঝিরাও যেন শুনতে পেল। ছোট বড় সকলেই অধৈর্য হয়েছিল, গা অনেকেরই শক্ত হয়ে উঠেছিল। কয়েদখানা দর্শনে ক্ষিপ্ত শাজাদ ত্বরিতে দৌড়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ফেলেই ধীর হল, তার দেহ দুলেছিল। শিবাই বামুন তার জটায় বাঘনখ দ্বারা খামচালে। তার নখগুলি কি বড় বড়! ইয়াসিন পিছন থেকে দেখল, সেই নখ আর হুজুরের মুখমণ্ডল, নখগুলি যেন বাবুর মুখ ছিঁড়তে উদ্ধত। আবার বড় পাখা এসে মুখ ঢাকল।

এমত সময় ছোট একটি রূপার পাত্রে একটি টিকলো গেলাস খানিক ঈগলের পিঙ্গল দৃষ্টি! আর এক রেকাবে স্ফটিকের মত কোতিলা। হুজুর সত্বর এক চামচ কোতিলা মুখে দিয়েই, গেলাসে একটি গোদা চুমুক দিলেন, মুখ নিঙড়ে উঠল, সাহস ঝনঝন শরীরে। মুখ দিয়ে ইশারা করতেই নায়েব কান বাড়িয়ে মুখটা ছুচোর মত করলে কারণ সন্থ মদের গন্ধ! হুজুর বললেন "দাদার আমার বড় ছাতি··· (দুয়ারে বান্দিবেন হাতি, দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি) এ গান এরাই বেঁধেছিল।"

জিব কেটে না না বলে নায়েব বললে "এরা সে ঝুমুর বান্দে নাই, তারিণী ঘাটওয়ালের পরজারা—"

"ও" খুব একটা রাগ করা গেল না তবু রুক্ষ স্বরে বলেছিলেন "যতক্ষণ নাম দখল না দিচ্ছ কেউ এখান থেকে নড়তে পারবে না" বলেই তিনি উঠলেন, পেটেন্ট লেদারে আলো হেলদোল হয়, হুজুর নলটা হাতে নিয়ে দু-এক পা গেছেন এমত সময় ভব হন্তদন্ত হয়ে এসে নলটা নিল, চাকররাও অবশ্য সসব্যস্ত হয়েছিল। তারপর ভবই অত্যন্ত যত্ন সহকারে কোঁচাটা তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে।

বন্দুকওয়ালা পাইক তো ছিলই, এ ছাড়া সড়কিওয়ালারাও ছিল। নায়েব বললে "ত্যুৎ, তোরা বাপু কোন কম্মের নোস—তোদের মানুষ করতে লারবো··· ভাল করে ধরতে হয় রাজা মানুষ···"

কারও উত্তর দেবার মত মন ছিল না। শুধু শিবাই বলেছিল "লায়েববাবু, চ্যাংড়াগুলা ঘরকে যাক গোচগাছালি আছে"

নায়েব বললে···" তোরা যা খড়াকালি মাটির মানুষটাকে, যাই দেখি" বলে সে অন্তর্ধান হল।

সকলেই একের পর একজনা বসে পড়তে বাধ্য হল।

উপরে দোতলার ছোট বারান্দার লোহার কেয়ারি-করা রেলিঙের ভিতর দিয়ে দেখা যায় খোলা দরজা। হাসির শব্দ গমক খেয়ে উঠছে, এখন গানের আঁচলা শোনা যায়। বাগানদার নিখুঁত জংলা অধৈর্য শুদ্ধতায় চকচকে হয়ে উঠে। তবলার তাড়নায় কোথায় যে সে গান থৈ পাবে তা যেন ভেবেই পায় না। আবার হো হো শব্দ এবার কাহারবা "না পাকড় হাত মনমোহন কালাই চুড়িয়া টুট্ যায়েগী" তৎসহ ঘুঙুরে ফুলকো কদম র‍্যালা! এবং বুকফাটা ওয় হোয় ওয় হোয় "আয় কবুতর কি চুবুতর!" বাইয়ের ভেড়ুয়ার গলা, তারপর বা "বোট চমকী ঘটি!" এটা ভবর উক্তি।

সকলেই অনেকবার মুখ উঁচু করে উপর দিকে তাকিয়েছে, যাদের গাম্ভীর্য কম তারা নোংরা প্রশংসায় হিক করে হেসেছে। ছোট ছেলেরা ঘুমিয়ে কাতর কেন না অনেক সময় হয়েছে। সকলেই রববানি বা শাজাদের গলার স্বর শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল, কিন্তু চুপ। এখন সকলেই অস্থির; এ মনোভাবের প্রকাশ ছিল: কেউ মাটিতে চাপড় মেরেছে, কোনজন অদ্ভুত স্বর করে, ভগবানের নাম করে আলস্য ভেঙেছে। কে একজন দেহ হাতের উপর ভর করে বসেছিল, তার কনুই ভেঙেছে। কারা দুজন বাঘবন্দী খেলছিল। ইতিমধ্যে ঘোতাই বলে উঠল, "থেমটাওলী শালীরা—হে হে"

পতিতপাবন আড়মোড় দিয়ে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে থেমটাওয়ালীদের উদ্দেশ্যে বললে, "দুটি খেতে দিও, পায়ে পড়ে থাকব গো।"

একথা অন্যত্র হলে, যদি হাটেমাঠে, যদি ঝুমুরের আসরে, তখন নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এঁড়ে বেচে হাসত। এখানে সবাই হাসি থেকে মুখ সরিয়ে নিল।

এমতকালে হুজুরকে দোতলার বারান্দায় দেখা গেল। এক হাতে গেলাস অন্য হাতে পিঙ্গল টুকরো। তিনি দেখলেন, গাড়িবারান্দার আলোর প্যাঁচান দণ্ডের শেষে বিচিত্র কাঁচের আধার, তার পাশ দিয়ে দেখা যায় একটি বাচ্চা ছেলের, এখন সে জাগ্রত, তার বিবশ শুকনো মুখখানি, আর তার বড় বড় দুটি চোখ—একারণে যে সে উপর দিকে চেয়েছিল। এবং এরই আশেপাশে অনেকে। বড় ইষ্টিশানের তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম চাতালে যেমনটি দেখা যায়। হুজুর ভারী খুশি হয়েছিলেন, হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে তার হাত থেকে পিঙ্গল টুকরো খসে, এখানে ভুঁয়ে পড়ল। এটি একটি অল্প খাওয়া মাছভাজার টুকরো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের মুখখানি একটু হাঁ হয়েছিল। তবু নিম্নের

এই দুঃখীদের দেখে তাঁর ভারী আমোদ হয়, তিনি নাচের ভঙ্গি করতে করতে এখান থেকে চলে গেলেন।

মাছভাজা টুকরোর দিকে অনেকেরই নজর পড়েছিল। চোখ ভারী হয়ে উঠেছে অনেকের। কেউবা ঢোক গিলেছে, ঠোঁটে জিব বুলাতে গিয়ে কেউ থেমে গেছে। এদের কুকুরটা অবাক হয়ে দেখে, নাক কুঁচকে, উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেই সেই টুকরোটায় মুখ দিতে গেছে, সেই মুহূর্তে ঘোতাই তার ন্যাজ ধরে টান মেরেছিল, কেঁউ কেঁউ করে পিছু হাঁটতেই একটা লাঠির ঘা মাটিতে পড়ল, ভাগ্যে লাগেনি। রববানি লাঠিটা সরিয়ে নিলে। তাহলেও কুকুরটা আর্তনাদ করে উঠল। মার শালাকে—শাল্লা···কাঙাল। বিভিন্ন গলার আওয়াজ হয়েছিল। এইটুকু অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারার জন্য সকলে সরলভাবে নিশ্বাস নিতে পারল।

হুজুর যেন দেখতে আরও সুন্দর হয়েছেন, রঙ যেন অঢের গৌর। রাত্রে দেখা পাঁশ পৃথিবী যেমন বা বর্ষার ধোয়ানি গেয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এ কথা ব্যতীত, আরও যে, নিরালম্ব অশরীরী ফোয়ারা যা এতাবৎ আকাশে আকাশে ঘুরেছে ক্ষণেকেই যেনবা মাটি পেলে, ক্রমাগতই উৎসারিত জলের নৃত্যময়ী ঝঙ্কার। এ বাড়ি স্থাপত্য পদ্ধতির সঙ্গে তার চেহারাও একটা রহস্যময় মিল সৃষ্টি হল। তিনি অনেকবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, অথবা সেই সূত্রে তিনি নিজেকে ভয় পেয়েছিলেন। হঠাৎ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন "বুঝলি ভব, বেটারা খুব ঢিট হয়েছে—ভেবেছিল কোথাকার অগা এসেছে—ওরে বা রক্তে আমার জমিদারী খেলছে" বলে নিজের হাতে টুক করে একটা চিমটি কেটে হিহি করে হাসলেন। "আও পেয়ারে পঞ্জা লড় জমিদার" বলে হাসলেন।

"বাঃ হবে না, তুমি তো তবু কিছুই করলে না অন্য কেউ হলে মেরে দাবনা ভেঙে দিত।"

ভবর কথাটা শুনেই হুজুর স্থির হলেন। পরক্ষণেই তার পা নাচতে লাগল গলার হার একটু ঘুরিয়ে দিয়েই বললেন "আরে লো ভৈর্‌-বী ছোড়, দুসরা উড়াও।"

বাইজী মৃদু হেসে তার কড়ে আঙুল কামড়ে অন্য সুর ধরলে। গারা ঠুংরী "না মার কাটার নয়না বান" বলেই মহা আবেগ অনুরোধে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলে, রতনচুড়টি দেখা গেল, পরে হাতের আঙুল দিয়ে আপনার বড়

চোখের কাছে নিয়ে আকারইঙ্গিত ভাঁও করে বুঝাতে লাগল। বাইজীর মাথার ঝাপটা ঈষৎ স্থানচ্যুত হয়েছিল। হুজুর মোহনগোপাল গানে আর স্থির হতে পারলেন না।

আকাশ থেকে আমরা বহুদূরে থাকি এ কথা সত্য, কিন্তু আকাশ থেকে বহুদূরে যখন সরে যাই সে কথা ভয়ঙ্কর। এতক্ষণ বাইজীকে ডান হাতে আলিঙ্গন করেছিলেন, আধ-শোয়া রমণীর কণ্ঠে পিলু কিয়ৎপরিমাণে ফাঁকি পড়ছিল। বাধা সৃষ্টি করে বসে আছি নিজেই এ কথা মনে হতেই, তিনি হাত সরিয়ে নিলেন, রমণী পড়ে গিয়ে হাসতে লাগল। আলুলায়িত কোঁচায় পা পড়ে হুজুর কিঞ্চিৎ দুলে উঠেছিলেন ; ভব মহা তৎপরতার সঙ্গে কোঁচাটা তুলে, ঝেড়ে, তার হাতে তুলে দিয়েছিল। অসহিষ্ণুভাবে কোঁচাটা ফেলে দিয়ে হুজুর সোজা বারান্দার রেলিঙের নিকটে।

তাঁর দৃষ্টি বিরাট দুই থামের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে, একটি ওরকেরিয়ার তার পাশে রেলিঙ, সেখানে একটি স্থির, নিরীহ সুন্দর পিঙ্গল ঘোড়া। এখান থেকে বড় বাচ্চা দেখায়, এই সরল স্বভাব দেখতে তাঁর কিছু সময় নষ্ট হয়েছিল। পূর্বে এ দৃশ্যটি চোখে পড়লেও, তাঁর মন যেন ফিরিঙ্গী হয়ে উঠল, সুন্দর মুখখানি ডাকিনীতন্ত্রের উপকরণ এরূপ। চোখ ছোট ছোট করে বলতে গিয়ে, থেমে গেলেন বিড়বিড় করে উঠল ঠোঁট দুটি। একটু আওয়াজ "নায়েবকে ডাক"।

নায়েব চটি ফট্‌ফট্‌ করে উপরে এল, হুকুম নিলে, চলে গেল। হুজুর সিঁড়ির চাতালে রক্ষিত 'হিবনাস আক্রুপি' মূর্তির সাদরে গালটি টিপতে গেলেন, আঙুল ফস্কে গিয়েছিল। তার মুখে খানিকটা অর্ধভুক্ত (?) মদ্য ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে গেলেন।

গাড়িবারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে, এবং গোল মাঠের শুরু ঠিক তারই উল্টো দিকেই একটি বেশ বড় জানলা। সেখানে হুজুর দণ্ডায়মান, হাতে তার সোনার কাজকরা বন্দুক। গুলি পুরে 'খাক্ক' করে একটি শব্দ হল, কি জানি কেন তিনি তারস্বরে বলেছিলেন "ব্রাণ্ডি"।

ভব থমমত খেয়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল। ব্রাণ্ডি ঢালার শব্দের পর আর এক শব্দ হুজুরের চটি ফট্‌ফট্‌ শব্দ, এরপর পানীয় খাওয়ার শব্দ তারপর মৃদু খুরের শব্দ আর ক্বচিৎ হ্রেষাধ্বনি। ভব সোজা হতে পারল। ঘোড়াটাকে এনে নিকটের আলোর থাম্বার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

রুস্তথগাঁয়ের লোকেরা ঘোড়ার আওয়াজ শুনেছিল। একজন হ্রেষাধ্বনি শুনে, উঠি উঠি করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। থামের তালে খাড়া বেদী, হাত তিনেক চওড়া। শাজাদ তার ঘোড়া দেখতে পেলে না। একটি ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে খানিক এগিয়েই, চোখ বড় করে বললে, "চাচা আলম।"

এ কথার সঙ্গেই মদের সোরাই মুখে ঢেলে এগিয়ে পিছিয়ে, তাক করলেন। ভবও তাড়াতাড়ি একটু মদ্যপান করেই কানে আঙুল দিয়ে রইল। খুট করে আওয়াজ হল। দিক প্রকম্পিত করে মেঘগর্জন হল, সার্শি আলগা কাঁচে চিড় খেয়ে গেল। চামচিকে পায়রা ছত্রভঙ্গ হয়। এদের কুকুরটা ন্যাজ তুলে কাঁই কাঁই করে ছুটল। আর শাজাদ পাঁচিলের উপর যেন বা সাঁতার দিচ্ছে কোন দিকে যায়।

গুলির ঘায় বেচারী নিরীহ জানোয়ার লাফ দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠল, খাম্বা লগ্ন দড়ি ছিঁড়ে সাপ যেমত খেলে উঠে। মানুষের যন্ত্রণার মত আওয়াজ শোনা গেল। পুনর্বার খুট করে শব্দ, এবার সুন্দর পিঙ্গল করুণ চোখ দুটির মাঝখানে নাসারন্ধ্র ভয়ঙ্করভাবে স্ফীত, অযুত রেখা স্পষ্ট হয়, রোমকূপ গভীর, একটি ভ্রমর এ-ভয়াবহ রূপ দেখে হাওয়া। দাঁতের উপরের রেশমী রঙ যে এত হতশ্রী বিসদৃশ সে কথা লেখা নেই। সবুজ ঘাসের উপর বিশাল দেহটি লুটিয়ে পড়ল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়ো হল, এবার শ্লথ হয়ে গেল। শুধু বাতাসে তার কেশর নড়ে।

ভব কানে আঙুল দিয়েই 'হুররে' বলে লাফ দিয়ে উঠেছিল। এখন দাঁড়কাকের আর সেই কুকুরটার বিকট চীৎকার শোনা যায়। কিছু ঘুঙুরের আওয়াজ উপরের বারান্দায় স্তব্ধ হল। হুজুর নিবিষ্টতায় নিশ্বাস বন্ধ করেছিলেন, এখন বন্দুকের নল ভাঙতেই তিলিক্ করে টোটার খোল খুলে পড়ল। ভব ভয় পেয়েছিল, পরক্ষণেই টোটার খোল তুলে চুমু খেয়ে মাথা নিয়ে খেমটা নাচ নাচতে লাগল।

বাইরে বন্দুকের ধোঁয়া স্তর ভেঙে গড়ে উঠে; অনেকেই এখন বসে, বন্দুকের আওয়াজ অনেকেই চোখ বুজিয়ে বসে, ভয়ে জবুথবু। শাজাদ এখনও সেই অবস্থায় শেষ গুলির শব্দে কাটা ছাগলের মত তার দেহ চমকে উঠেছিল। এখন সে আলমের কাছে যাবার জন্যে হাঁকপাক করছে। কারা তাকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে নিলে। সে দৌড়ে যেতে গিয়ে কার গায়ে পা লেগে লাট খেয়ে পড়ে ধরাশায়ী। সে যেন ইচ্ছে করেই চিৎ হয়ে পড়ল।

মুখে মুখে আল্লা নাম, ঠাকুর ঠাকুর জপ! শাজাদ চক্ষুদ্বয় বড় করে কি যেন দেখতে চেয়েছিল। এমত সময় নিমাই হেলের ছেলে তার বাপকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, তখন শাজাদ "হা আল্লা কোন পাপে আলম গেল হে" আর বুকে চাপড় পড়তে লাগল।

হুজুর বন্দুক হাতে এখানে দেখা দিলেন, কঠোর স্বরে বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন "এটা গোকর্ণ নয় যে কে কার মেশো, এখানে আমি আছি…" আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন "আমার এখানে ঘোড়া কেউ চড়তে পাবে না… ঘোড়া মাল বইবে…।"

শাজাদ উঠে বসে ডুকরে কাঁদবার চেষ্টা করলে, অনেকেরই চোখে দীঘিজলের মায়া ছিল। শাজাদ হাত দিয়ে সর্দি অপসরণ করে একবার মাটি চাপড়ে, কাঁদবার চীৎকার করেছিল। হুজুর এতাবৎ আকাশের শান্ত মূর্তির দিকে চেয়েছিলেন, চোখ ফেরাতেই রববানির দিকে দৃষ্টি পড়ল, কোথায় যেন ঠাকুরদাদার সঙ্গে মিল ছিল, বৃদ্ধরা প্রায় একই রূপ দেখতে হয় হয়তো। সহসা নিজেকে জাগ্রত করে বললেন "এটা কাঁদবার জায়গা নয়" বলেই হুড় হুড় করে বললেন "কাল সকালেই যেন দখল হিসাব সবাই দিয়ে যায়—না হলে কয়েদে পচতে হবে।"

গরীব যারা, তারা ভারী মজার হয়, তারা মেয়েমানুষের মত হুট বলতেই কাঁদতে পারে। কিন্তু এদের দারিদ্র্যের খেসারত দিতে-করতে চোখের জল ফুরিয়েছে। একমাত্র 'ও হো হো' শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু বড় একটা ছিল না। বারুদের গন্ধ শাজাদের স্মৃতিকে আটকে ছিল।

নায়েবের গলা উঠল, আড়ষ্টতা কাটল "ওরে ওর মুখে কেউ হাত দে না, নিয়ে যা ওকে বাড়িতে" বললেন।

সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ইয়াসিন শাজাদের মুখে হাত দিতে গেল।

একমাত্র রববানি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "নায়েব আসমান আজজিও নীল গো" সে "বাবু" যোগ করেনি।

নায়েব এ-হেন সাঁইমুরশেদী কথায় ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে, হুজুরের দিকে চাইল, হুজুরের মুখখানি কেঁপে উঠেছিল।

সকলেই উঠল, শাজাদ ঘোতাইয়ের কাঁধে ঘাড় এলিয়ে দিয়েছে, ঘোতাই আর ইয়াসিন তাকে ধরে, এগিয়ে চলেছে; কে একজন ত্বরিত পায়ে এসে একটা পড়ে-থাকা গামছা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। শাজাদ ঘাড় কাত

অবস্থাতেই আলমকে দেখে তার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল। সকলে তাকে ধরে ফেললে। "হায় বাজান হায় বাজান" উক্তিতে অন্যান্য সকলে ম্রিয়মান। হঠাৎ সে মাঠে পড়ে চাপড় দিতে লাগল, আর মুখে ঘাস ছিঁড়তে লাগল, এখন সত্যিই তার চোখে জল এল।

এ সময়ও গোলাপ প্রস্ফুটিত। ঘোড়াটির চোখ কেন যে খোলা তা ভগবানই জানেন। রুনুখগাঁয়ের লোকেদের হাল্কা ছায়া ঘোড়াটির উপর দিয়ে বহমান রক্তধারার উপর দিয়ে রয়ে রয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল।

জটপাকান ভীড় হুজুর দেখলেন গেট পার হল। হুজুরের যে কি এক বিকৃত হল, হঠাৎ ঘুরেই দৌড়! হলঘরের ঐশ্বর্যের মধ্যে আপনকার ধুতির কোঁচা জড়িয়ে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টেবিলে লেগে গুলির আওয়াজ হল, ও দেওয়ালের সেজের বাতি ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল। হুজুর যেন সাহস ফিরে পেলেন, পরক্ষণেই সেহ্ব' জার্দিনিয়ে-তে অঙ্কিত সুন্দর দৃশ্যে গুলি ছুঁড়লেন। দৃশ্যটি অদ্ভুত শব্দে রূপান্তরিত হল।

তিনি ভয়ঙ্করভাবে হাসতে গেলেন কিন্তু শব্দ হল না, শুধুমাত্র একটি ভৌতিক 'হাঁ'ই মুখে স্থির হয়ে রইল, কোন শব্দ নেই দেখে ভব দরজার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। হুজুর ঘোড়া তুলছেন, আর টিপছেন। ভব কাছে এসে তাঁকে তুলে ধরতেই তিনি বললেন "ভব আমি ঘুমাব" স্বর অতীব রুগ্ন। এইটুকু সময়ের মধ্যে রঙ যেন কালো হয়ে গেছে।

ভব খানিক মদ দিল, হুজুর মুখে দিতে গিয়ে গেলাসের দিকে চেয়ে বললেন, ব্রাণ্ডি এত লাল কেন।

•

এখানটা বাথান মত, মহুয়া আর নিমে ঘেরা। সময়ের কিছু আগে মহুয়া ফুটেছে, তারই ভাতুই গন্ধ। হাওয়ায় কিছু কিছু খসে পড়ে। শাজাদ এখানে শুয়ে ঘুমায়। মাঝে মাঝে তার শরীর চমকে চমকে উঠছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা।

শিবাই বামুন এবং অন্যান্যরা মৃদুস্বরে একটি দেহেলা গান গায়, শবদাহের পোড়ার শব্দ এই গীতে বর্তমান। শ্মশানে এ গান তার গায় "যবে এ দেহ তরণী ডুবে যাবে। ও তোর ডোবা খোপে নোনা লেগে রঙ খসে পড়িবে।" দেহেলা গানের সুরে মন বড় কেমন-কেমন করে। শাজাদের চোখে জল

গড়াচ্ছিল, বুঝা গেল তার ঘুম ভেঙেছে। দু-একবার চোখ জোর করে চেপে ধরেছিল।

ঘোতাই কলসি থেকে কি যেন একটি খাবরিতে গড়িয়ে শিবাইকে দিল, শিবাই বললে, "কোম্পানীকে দাও!"

চোখ বুজিয়ে শাজাদ বলেছিল "বামুন বারুদের গন্ধ পাও" ?

"পাই"।

"কোতি এতেক শিয়াল ছিনাছিনি গো"।

"মনে লয় গোবেন্দপুর"।

গোবিন্দপুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে শাজাদ দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিল। মাথাও ঝাঁকানি দিলে, এ কারণে যে তার একটি দৃশ্য কল্পনায় এসেছিল। যথা—গোবিন্দপুরের আধা ভাগাড়, সেখানে নিশ্চয়ই আলমকে ফেলে দিয়েছে, নিশ্চয়ই মুচিরা তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে (কেন কে জানে) বালমচির নিয়েছে। অনেক সাদা হাড়ের মধ্যে সবুজ ড্যাঙ্গায় গোলাপী আলম পড়ে আছে, খুরগুলি কালো, নাক মুখ কালো। শাজাদ আর স্থির থাকতে পারল না, ভিতরটা যেন বাহিরে বার হয়ে আসতে চায়। চিক করে থুতু ফেলে, হাপরের মত কাঁপতে লাগল। ক্ষোভে রাগে অধীর। শুধু বলেছিল "আমার বুকে লাথি মেরে মেরে ফেল গো"।

ইয়াসিন বললে "ই হো, ই হো চেঁচাও কেনে, ক্যাপা হইছ হে? টান খাবে, না পাউরা···।"

"ক্ষ্যাপাই বটে রে মিয়া" বলে উঠেই খুব নিচু একটা ডালে বসে বললে, "আমি মানুষ নই মিয়া ভাই"।

ঘোতাইয়ের একটু খুকী নেশা হয়েছিল, সে চিক করে মদে-তিক্ত থুতু ফেলে বললে "আরে হে হে পরাণ তুমি আবার মানুষ ছিলে কবে হে? কোথা বুকের চাপড় মেরে হেঁতেল্ শান দিবে না, আঁচলে বান ডাকাচ্ছ।"

পাউরা মুখে ঢালতে ঢালতে হাত নাড়িয়ে বললে, "আমার বহুত পাপে আলম গেছে···আমি···"

"আহে ডরে ডুকরাইছ বল,···বিবাগী হবে বটে···" ইয়াসিন বললে, "তুমি শালা লিজ্জেই জাহান্নাম, তুমি জন্মাও নাই, তুমি শালা তরমুজী রাঢ়ীর পরণের তেনারও অধম।

"কি বললি ?" বলেই শাজাদ লাফ দিয়ে এল, খালি পেটে মদ্য পড়তেই

পেট মোচড় দিয়ে উঠেছিল, ঝপ্ করে ঘোতাইয়ের ঘাড় আর ইয়াসিনের গামছা মত কাপড়টা ধরে ফেলেছিল। ঘোতাই এ ব্যাপারে বিশ-পঞ্চাশটি ছোট ছেলের মত কেঁদে কঁকিয়ে উঠল।

শিবাই উঠে ত্বরিতে শাজাদকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "যে শালাকে মারার কথা তাকে মার গা" বলে ঠেলা দিল। শাজাদ পুনর্বার ডালে বসে স্থির হয়েছিল। তার দুটি হাতের উপর মাথাটি ন্যস্ত।

এখন চাঁদের আলো এখানে সেলাইয়ের ফোঁড় কাটা। মদ খাওয়ার আরামের শব্দ, আর মহুয়া পড়ার শব্দ ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ শাজাদ বলে উঠল "একটা যদি বন্দুক পেতাম···"

নিমাই এবং ইয়াসিন তাকে ভেংচে, কান্নার সুরে "ও হু হু হু" করে উঠেছিল। ইয়াসিন বলেছিল "মরি কি পাট্ঠা মরদ, গায়ের দরদ···সাবাস!" তারপর খুব লাগসই আবদারে গলায় বলেছিল "কেনে হে ঘোড়া মারবে কি হে?"

শাজাদ পুনর্বার চোট পেলে। তার অস্থিরতা শোনা গেল, হে হে করে লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, মাটিতে পড়েই উঠেই কার সঙ্গে যেন লড়তে লাগল, মাঝে মাঝে তারই হাপিস্-হাপিস্ শব্দ। কে একজনা মদের কলসি নিয়ে সরে গেল, যেখানে যেখানে সে আস্ফালন করে এগিয়ে যায় সেখান থেকেই লোক পাশ কাটায়। অবশেষে শোনা গেল দরদালান কাঁপান চীৎকার "দে শালা আমার 'হঁতেল"।

"থাড়াও হে, যেতে যেতে ঘুমাই পড়বে বটে" শিবাই বলেছিল।

শাজাদ তৎক্ষণাৎ একটি ঘুষিতে তার প্রত্যুত্তর করেছিল, শিবাই মুখ সরিয়ে নিলেও অল্প লেগেছিল। যেখানে লেগেছিল, সেখানে একবার হাত বুলিয়ে বললে "আর একটু পাউরা খাও হে, জোর আসে নাই, ঘুষিতে ডর আছে, খোঁপা খোঁপা লাগে"।

"মস্করা লয়, আমি যাব" শাজাদ বললে

"রাত বাড়ুক বটে, এখন তো ঘোড়া মারার মোচ্ছব শুরু হবে" ইয়াসিন বুদ্ধির কথা বললে।

সত্যই মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। হুজুর গান শুনছিলেন। সমস্ত সৌখিনতার উপর দিয়ে কে যেন লাফ দিয়ে উঠছিল। যে বুকখানি অনেক

রেখা অযুত রঙ দিয়ে তৈরি এখন ঘোড়াটি সেখানে নাল ঠোকে। ঠুকে ঠুকে অভ্যন্তরের শিকড়-লাগা ফোয়ারাটিকে ক্রমে ভেঙে ফেলতে চায়। এ দৃশ্য মদে স্থির, অসভ্য আলিঙ্গনেও মাথা তুলে উঠে। হুজুর অন্যমনস্কভাবে বন্দুকটা স্পর্শ করতঃ চেপে ধরেছিলেন।

অন্য হাতে হুজুর বাইজীকে আকর্ষণ করে নিজের হাতের উপরেই রাখলেন, বাইজীর হাত থেকে একটি মেওয়া খেয়ে চোখ তুলে তাকালেন। কোথাকার এক অনন্ত রাস্তা তার মধ্যে সমস্ত কিছু বীভৎসতা নিয়ে খাড়া হয়ে আছে, কক্ষের পর কক্ষে এখানেও প্রতি ইঙ্গিতে প্রতিবিম্ব, বিচ্ছুরণ অমোঘ নিত্যতা সৃষ্টি করেছে, পূর্বপুরুষদের প্রকাণ্ড সোনা-কোয়ারি ফ্রেমে, যেন বড় অন্ধকার।

বাইজীর গীতের মধ্যে কাঁধে ভাঙন দিয়ে তাল সমতা রাখতেই, হুজুরও চমকে উঠেই বললেন "কি মেহের, ডরতা·· ডর কেয়া"। বলে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন "আমি আছি, হাম হ্যায়"।

আয়না আর ঝাড় কলসে ঠিকরান আলোর মধ্যে এরা অটুট। এখানে একটি মুহূর্ত নেই যেখানে প্রকৃতি বর্তমান, গোলাপ সত্যিই তো আর মানুষের হাতের খেলনা নয়। এখানে কোথায় হুজুর দাঁড়াতে পারেন। মনে হয়, ওই সাদা মৃদু পুতুলটাকে গিলে ফেলি। মনে হয় গান তার স্মৃতিকে ছাপিয়ে উঠুক। হঠাৎ বাহবা দেবার নামে অসম্ভব চীৎকার করে উঠলেন। গীত চমকে থেমে গিয়েছিল।

"ভব।"

ভব তাঁর কাছে এল।

"রতি পাইক।"

"কেন?"

"ডাকাত···সে শালাকে আমি খুন করব।"

"সে কি!" বলে ঈষৎ হাসির ধমক দিল।

হুজুর বললেন "ছঃ শালা" বলে হেসে নিয়ে খুব মেয়েলী স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "ট্রেন কখন রা" বলেই একটু বেশী সাহসী হয়ে বললেন "আছ ঘরটা কেমন যেন ম্যাদাটে ম্যাদাটে লাগছে না রে ··জংলী চাকর-বাকর নিয়ে কোন কাজ হবে না, এই কদিন দেখিনি প্রত্যেকটা জিনিসে যেন সাঁঝ লেগেছে।"

"তা বটে···তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে আর—"

"আচ্ছা ভব খোড়া ভুত হয় ?"

একথায় ভব কোনো উত্তর দিতে পারল না, অথবা সে ইচ্ছা করেই উত্তর দেয়নি। গানের প্রশংসায় 'আহা' দিলে এবং এক চমক গানের কলিও সে ধরেছিল যথা—"আ কদর পিয়া রে"।

হুজুর একটি শ্বাস ত্যাগ করে পায়ের তেলোতে হাত বুলোতে লাগলেন। তিনি বোধ হয় কিছু ভাবছিলেন।

এখন অনেক রাত। সারেঙ্গীওয়ালা সারেঙ্গী জড়িয়ে শুয়ে, তার রূপার বোতামের ঝালর তাঁতে লেগে আওয়াজ তুলছিল। বাইজী তাকিয়ায় হাত রেখে, বাঙালী স্ত্রীলোকটি তাকিয়া গোট করে কালীঘাটের পটের মত। ভব শব হয়ে আছে; একমাত্র হুজুরই জাগ্রত, তিনি তার হাতের হীরার আংটি ঘোরাচ্ছিলেন। বুনো হাওয়ায় কলসের ডুবলি (ধুকধুকি) নড়ছিল। তারই কোমল নিখাদ, খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

হুজুরকে কে যেন জোর করে উঠিয়ে নিল। এ বোধ হয় কক্ষে রক্ষিত সৌখীনতার আত্মা। যা চির স্থিরতার মধ্যে এক একবার অধৈর্য হয়ে পড়ে। হুজুর নিজে কিন্তু বন্দুকটা তুলে নিলেন। একবার মাত্র থমকেছিলে, রঙিন ভাস উদ্ধৃত উড়োন-গোলাপ তাঁকে বাধা দিয়েছিল।

চাঁদের আলোতে বুড়ো মানুষের কি অসম্ভব ভৌতিক হয়, উপরন্তু যদি তার চোখ অর্ধ উন্মিলিত থাকে। রতি পাইক বুকে হাত রেখে এখানে হুজুরের ঘরে সামনে ঘুমায়। হুজুর এসেই পা দিয়ে তাকে ঠেলা মারলেন।

রতি উঠেই দেখল, সামনে বন্দুকের নল। রতি পিছনের লোকের গাত্র সুবাসে বুঝেছিল, ইনি কে।

"হুজুর" বলে মৃদু হাসবার চেষ্টা করলে।

"রতি কোথায় তোকে মারব বল ?"

রতি উঠে সহবত দেখিয়ে মুখ তুলে চাইল, ঘরে আলোয় ঝোপঝাড়ের মত মুখ। শুধু ভ্রূদ্বয় উঠে নামে।

রতি পাইক তবু হাত জোড় করে বলেছিল, "হুজুর এমন ভাগ্য কি আমার হবে।" কিন্তু বলে রতি আর দেরি করল না, কোমরের কশিটা একটু আঁট করেই দৌড়াল।

মাতৃস্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী অযুত ঐশ্বর্য ; জিহ্বাহীন অন্ধকারের সম্মুখীন অজর ঝরনার মনোহারিত্বের পাশ দিয়ে কখনও ডাইনে কখন বা বাঁয়ে রেখে ; বৃদ্ধ রতিকান্ত পাইক পলায়মান পিছনে টাল-খাওয়া মত্তপ নূতন হুজুর।

হুজুর বলেছিলেন "তুই আমার সর্বনাশ করেছিস, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন…"

তাই রতি ছুটতে ছুটতে বলে চলেছে, "আমি কি বলেছি, তাঁরা কেমন ছিলেন, তাদের দাপট, তাই বলে…এখন বলব—তাদের দাবে ভূত পালাত হাত বুনেদী খেতাবী" বলতে বলতে সে এখন সিঁড়ি দিয়ে নামল। গাড়ি বারান্দা…তারপর রাস্তা, পিছনে বাবু। কে যেন তাকে দৌড় করাচ্ছিল, না হলে এ তার পক্ষে সম্ভব নয়। রতির পক্ষেও নয়।

রতি দাঁড়াল, বললে, "একটা ঘোড়া মেরে এত ভয়, হা কপাল" এই সময় হুজুর যেই বন্দুক উঠিয়েছেন রতি আবার দৌড় মুখে তার এক কথা "একটা ঘোড়া মেরে…জমিদারী করা" এ সময় গুমটি ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল বললে "এইখানে যত বেটা মরেছে কেঁদেছে, সে শুনলে তো আঁতুড়ে মারা যেতেন, তারা ছিল মানুষ…কয়েদে যাও এখন কান্না শুনতে পাবে—তাদের মুখে তো ভাত উঠত না, কত গা জ্বালালে, কত ঠগ মেরে সাধু করলেক আর তার বংশে এমন।" রতি আর দৌড়তে পারছিল না তাই সে আর বলেছিল "না আমার মরাই ভাল বটে হুজুর তোমার গুলিতে আমায় মের না আমি গাছে ঝুলব… তোমার গুলিতে মরলে আমায় আবার জন্মাতে হবে…" হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

কয়েদখানার মধ্যে চাঁদের আলো ছিল। ফলে দরজার গরাদ মিলে, কোথায় যেন মড়ার খুলির মত। পরপর গরাদগুলি ভয়ঙ্কর দাঁত। হুজুর একবার রতির দিকে অন্যবার গরাদের দিকে চাইল। রতি কাপড় দিয়ে ঘাম মুছছে, হুজুর কয়েদখানার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফার্নের পাতা নড়ছে। ভয়ে চীৎকার করতে গিয়েই ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—দু-একজন পাইক। বললেন "রতি ওদের লণ্ঠন আনতে বল আমি নিজে কলি ফিরাব"।

একজন কলসি উপুড় করে মুখে ঢালবার চেষ্টা করলে দুয়েক ফোঁটা পড়ল। এখন রাত্র গভীর। দূরাগত চৌকিদারের "হৈ" আসে, এবং

মাদলের টিম টিম্‌ আওয়াজ। আর শুকনো পাতার কঙ্কালিক শব্দ। জন্মের আবেগ অসংখ্য বিচিত্রতায় টোপ গিলে আছে।

কীটের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কমেছে, নিশ্বাসের উষ্ণতার মধ্যে সমস্ত চরাচর।

আর একজনের উষ্ণ নিশ্বাসে অন্যে ভীত, এ কারণে যে আসন্ন দাঙ্গার উৎসাহে সকলেই কিয়ৎ পরিমাণে দুর্বল। এ ওকে ধাক্কা দেয়, অথচ পাতা খসার শব্দে, অথবা মহুয়া যখন বিচ্যুত তখন, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিম্নে এবং গাছে যেখানে চন্দ্রালোক পুষ্পিত সেখানে চকিত হয়। এ দৃষ্টি সন্দেহবাচক। কেহ আরও ভীত, মহুয়া গায়ে যদি পড়ে তবেই ন্যাজ তুলে। কেউ এই সুযোগে কিছু সাহস দেখায়, দু ঘা বসিয়ে দিয়েছিল।

শাজাদ আর এক ভূমিকায়, বাঘেলা দাপটে একবার এদিক অন্যবার আর একদিক পদশ্চারনা করে, সে কখনবা আলো-আঁধারের মধ্যবর্তী, দুই হাত উপরে তুলে হো হো করে উঠে। এরূপ যে সে কাউকে আহ্বান করছিল। এর সঙ্গে শিবাইয়ের, আর এক তান্ত্রিক স্বরে, ও হৈ লম্বোদর ওঁ খর্ব্বং স্থূল তনুং গজেন্দ্রবানেং হৈ লম্বোদর সুন্দরং প্রসন্দন্মদগন্ধ (লুব্ধ) মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলং দণ্ডঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে—হৈ—শৈলসুতাসুতঃ গনপতিং সিদ্ধিপ্রদ কামদম। হৈ লম্বোদর।

শিবাইয়ের চীৎকারে সকলেরই গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। শাজাদ চুপ, ঊর্ধ্বে হাত দুটি জোড়া করে ঝাঁকি দিয়ে বললে 'বাজান বাজান' এমত সময় কে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে এল। নেমেই খবর দিলে, সঙ্গে সঙ্গে হো, হো, লম্বোদর ইত্যাদি নানা ডাকে আক্রমণের খেদানি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। এখান থেকে রাঘবপুর অনেকদূর, তবু কেন যে তারা ছুটছে। তারাই জানে। এখনও তাদের ছত্রাকার দৌড় দেখা যায়, ধুলা উড়ে।

আর কিছু দূরে গ্রীক মন্দির যেমত। এখানে সকলেই থেমেছে, হেঁতেল শক্ত করে ধরে। অনেকেই টুকটুক মাটিকে নমস্কার করে নিয়েছিল, শাজাদ, "মা মাগো" বলে হাটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকালে ··মাথা যেন উঠতে চায় না, একটু চোখ ফিরিয়ে দেখলে ইয়াসিন। তার সম্মুখে হাত দুটি গ্রন্থের মত খোলা। সে নিত্যকর্ম আচার জানে না, তবু সে জানে ওরই মধ্যে মন থৈ পায়। আর এক কথা যে, সে যে অন্যায় তছরুপ করতে যাচ্ছে না, তার কৈফিয়ত তাকে দিতে হবে। শাজাদ ভীত হল, হাঁকলে, "হৈ লুতফর

বাপ্!" কোথায় যেন সে নালিশ পাঠাচ্ছে অর্থাৎ ইয়াসিন তাই সে ধমক দিয়েছিল।

শাজাদ, খেলারাম, শিবাই এবং সঙ্গে ইয়াসিনও ছিল এরা পিছনের দিক দিয়ে উঠে এসেছে। এ ঘরে সকলেই নিদ্রিত, ঘুম মানুষকে কি অসভ্য করে তুলে, খেলারাম হা করে চেয়েছিল। এমন সময় রতির পিছনে হুজুর বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

শাজাদের চোখ বড় করে ইশারায় সকলেই সতর্ক হয়েছিল। শিবাই 'ষাঃ' বলেই নিজের মুখ নিজে চেপে ধরল।

শাজাদ শুধু অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, ওরা কোথায়। নীচে চারজন তো?

শিবাই শুধু মাত্র জোরে নিশ্বাস ফেলে সায় দিয়েছিল। এখানে তারা চুপ করে রইল। সামনের খোলা ছাদ, দেখলে একটি লণ্ঠন নিয়ে···দুজন কারা যায়।

লণ্ঠনে দেখা গেল, হুজুরের সাদা পাগড়ি। যারা লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিল, তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আলোটা গুমোট ঘরে উঠে গেল। খিলানের একটি স্তিমিত ছায়া। সেখানে একটি লোক।

তারা নিচে নামল, এসেই দেখে দুটি লোককে কারা যেন ঘায়েল করছে। তারা আর দাঁড়াল না, সোজা বাড়ির দেওয়াল ঘেসে যখন যায় তখন গুমটি থেকে কে একজন হাঁকল—কে-হো।

তারা প্রস্তুত হবার পূর্বে এরা বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়ে গিয়েছিল, মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ে দিল, রতিকে খেলারাম কব্জা করলে। আর আর যারা রুনুখ গাঁয়ের লোক এখানে ওত পেতে ছিল তারা এসে পড়ল।

হুজুর পিপে থেকে চুন নিয়ে কয়েদখানার কলি ফেরাতে অধৈর্য। তার নিজের নামে গান তিনি গাইছিলেন "দাদার আমার বড় ছাতি দুয়ারে বান্দিবেন হাতি। দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি" বলেই না ফিরেই বললেন "আমি ভয় পাইনি"···বলে ফিরে দেখেন কে একটা লোক···। "ওরে একটু ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়···"

"মুখ মাথায় চোট দিও না" ইয়াসিন একথা বলার সঙ্গে শাজাদের হেঁতেল লাগল।

অস্ফুট চিৎকার শোনা গেল, হুজুর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পড়লেন। পা

মাটিতে সরে সরে য়েতে লাগল, রক্তাক্ত মাথাটা দেওয়ালের আগাছায় লেগে হাতের ছাপের উপর দিয়ে নামতে লাগল।

শাজাদ নিজের মুখ থেকে, চোখ থেকে ছুটে-আসা রক্তটা মুছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ফার্ন গাছে যে রক্ত লেগেছিল তা টুপ টুপ করে পড়তে লাগল। হাতের ছাপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

খেলারাম একটু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে। বললে, "হুজুর তোমার রেণ্ডীগুলো রাঢ় হল গো।"

শাজাদ বুকের কাছে কান পেতে দেখলে শ্বাস নেই। সে গম্ভীরভাবে উঠে গরাদ একটু ঠেলা দিলে। চোখ তুলে দেখলে, ইয়াসিন ঠেঁটি পরিহিত খিলানের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত তার গ্রন্থের মত খোলা কার কাছে যেন বা ক্ষমা চাইছে। যেন বলছে মানুষের বিশ্বাস হোক তিনি আছেন। ফলে মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যবধান প্রান্তর প্রান্তর হোক।

সে ও এরা

বিষ্ণু দে

রাত্রে তার জন্মলগ্ন
অন্ধকারে সে স্থির নির্ভয়।
পশুর ও মানুষের মর্ত্যলোকে প্রাথমিক তার যে উদ্বেগ
সভ্য সেই শিশুর বিষাদ, সেই মৌল নৈঃসঙ্গ্যের ত্রাস
এতই প্রবল ছিল তার, যে এখন কোনো
সৌখীন সংশয়ী ভেক্,
আম্‌দানি হঠাৎ-নবাব কোনোই বায়না
নব্যভব্য স্বার্থজাত তথাকথিত মননব্যবসায়ী কোনো প্রতিবাদ,
আবশ্যিক মৃত্যুর বা ধ্বংসের উল্লেখ
তাকে আর কাঁদায় না   হাসায় না
বড় জোর হয়তো সে বলে : ধিক্ ধিক্।
অর্বাচীন বায়সেরা গ্রাম্যতার ময়ূর ডম্বরে
যখন পশ্চিমারূপ ধরে,
সরল বাহুল্যে মাত্র ব্যর্থতায় তাকে ক্লান্ত করে।

রাত্রে তার জন্মলগ্ন।
মাতৃসম অন্ধকারে তাই সে নির্ভীক
জন্মমৃত্যু সেতুবন্ধে এসেছে তাই সে নিশ্চিত।
নূতন জন্মের নীল প্রচণ্ড বিষাদে

তার হয়েছিল কিনা চৈতন্যের উজ্জীবন
জীবজগতের আর মানবিক সব চেয়ে মৌলিক বিপ্লবে
তাই রূপান্তরে জীবনে বিপ্লবে নিঃসংশয় সে,
বিষাদ উত্তীর্ণ তার আশা,
অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-উৎসবে
অটল আশ্বাসে তার মননের লুনিক সংবিত।
তার মন বা তার জীবন অনেক দ্বান্দ্বিক মৃত্যু পার হয়ে
বহু পাপপুণ্য বহু স্বার্থ আশাহতাশার পরে
করেছি জটিলযাত্রা।
তাই তার বৈদগ্ধ্যের ভাষা, দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ তার মাত্রা
নব্যভব্য বে-শহুরে অর্ধগ্রাম্য গ্রাম্য এরা বোঝেই না
অখাদ্য বিলাসে ভরে প্রাণের মরাই,
এরা যে অজাতমৃত আজও
জন্মমৃত্যু নিয়ে কেন এদের বড়াই?

৫

এদের গন্তব্য অন্তে তার যাত্রা শুরু,
জন্মের মৃত্যুর দীর্ঘ রূপান্তরে
আদি অন্ধকার থেকে
সে যে উষাউষসীকে ডেকে দিনরাত্রি উত্তরণে
বছরে বছরে আদিম ধৈর্যের প্রাজ্ঞ আলোকে বেঁধেছে
তার বাসা॥

অভিজ্ঞান

তরুণ সেন

লোকটা কি যে এক অভিজ্ঞান পেল—
হাসিখুশি কৈশোর, প্রাণচঞ্চল যৌবন,
নিবিষ্ট হিসেবের প্রৌঢ় দিনগুলো পেরিয়ে
চৈত্রদিনের ফসল শেষ বার্ধক্যে।

ছোট্ট ছেলেটা উঠোন পেরোচ্ছে—
হাঁটি-হাঁটি পা-পা—টলছে, দুলছে।
ঠিক এমনি করেই পার হয়েছে সময়ের কোঠায়
ওর টলমল দিনগুলো—আর এই সহজ প্রত্যয়ে
কি আরামেই না কেটে গেছে দিনগুলো—
এক, দুই, তিন, আরো এমনি অনেক দিন।
কি আরামে ধুলোমুঠি ভাঙছে গড়ছে ছেলেটা।

পড়ন্ত রোদে নিজের ছায়া দেখে
কি ভেবে কুঞ্চিত হল শেষ বেলার ঘোলাটে দৃষ্টি—
আছে, আছে, আরও কিছু ছিল—
যা এক, দুই, তিন বা আরো অনেক সংখ্যার হিসেবে
কিছুতেই মেলান যাচ্ছে না।

যুবরাজ

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

এই তো এসেছি আমি, ফিরে ফিরে এসেছি আবার
মৃতের রহস্য-রাজ্যে ; দুই হাতে খুলেছি কপাট।
তির্যক রশ্মির রেখা ; কটিবন্ধে তরবারি, আর
সামনে উজ্জ্বল চিত্র, যৌবনের এই রাজ্যপাট।

আমাকে দেখতে পেয়ে জ্বলে ওঠে অজস্র জোনাকি
শূন্যবাক অন্ধকারে তারা আলো সহসা ছড়ায়,
'ফিরে এলে! এলে তুমি! ভালো আছ নাকি?'
চকিত আত্মীয়কণ্ঠ মন্ত্রমুগ্ধ আমাকে জড়ায়।

না, কিছু হয় না শেষ ; কি আশ্চর্য অমৃত আকাশে!
এখনো অনেক বাকি ; কত যুগ কেটে গেছে বুঝি,
সর্বস্ব আমার চোখে স্বপ্নের ছায়ার মতো ভাসে
স্মৃতির অতল সেচে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীটি খুঁজি।

এই তো এসেছি আমি দ্বারপ্রান্তে ; দুই হাতে খুলেছি কপাট
হৃতরাজ্যে অভিষিক্ত স্মৃতি আজ অজেয় সম্রাট।

আর একটু হলে

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

আর একটু হলে
গাছের পাতা থেকে শিশিরবিন্দু
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু সকলের চোখে চোখে
শ্রাবণের ধারা নামত
মানুষের হৃদয় বেয়ে মাটিতে।

আর একটু হলে
সমস্ত দিনের ক্লান্তি নিয়ে
ক্লান্ত দেহ ;
নিজের মুখের রক্ত দিয়ে
শিশুর মুখের দুধের জন্য
ভাগ্যের উপর ভর দিয়ে
একটি অনাথ সংসার ভাসিয়ে দিত।

আর একটু হলে
সূর্যের তাপে চন্দ্রের আলোয় গাছের ছায়ায়
বিন্দু বিন্দু রক্তে গড়া শরীর
এক-একটি অক্ষর জোড়া একটি উজ্জ্বল নাম ;
শহরের অস্থিরতা থেকে অনেক দূরে
অন্ধ কলের নিবিড় অন্ধকারে
অকস্মাৎ মুছে যেত।

আর একটু হলেই
হৃদয়ের অতল গহ্বরে
আহত কবিতা :
মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে
অসহ্য জ্বালার বহ্নি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ত ;
ছড়িয়ে পড়ত জীবনের অঙ্গীকারে অনির্বাণ শিখা !

বিবেকানন্দ

নিশীথ কর

বাঙলাদেশের বহুজনচিত্তের আকর্ষণ—বিবেকানন্দ। তাঁর ব্যক্তিত্বের আবেদন বহুমুখী। কেউ তাঁকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র বলে পূজা করে, কেউ তাঁকে উনিশ শতকের নবজাগৃতির তেজস্বী প্রতিভূ বলে শ্রদ্ধা করে, আবার কেউ স্মরণ করে তাঁর গণ-সঞ্জীবনী বাণী :

"ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

তাঁর বাণী আরও স্মরণে আসে :

"তোমরা (উচ্চ শ্রেণীরা) শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি, মেথরেরা ঝুড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝাড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। অতীতের কঙ্কালচয়। এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

এইভাবে বিবেকানন্দের রূপটি অনেক সময় রহস্যজড়িত হয়ে আসে। প্রশ্ন ওঠে—বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক পরিচয়টি কি ?

এখানে বর্তমান সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন ধারাগুলি নিয়ে একটু পর্যালোচনা করলেই প্রচলিত মতগুলির কারণ নির্দেশ করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ঐতিহাসিক রূপটি প্রকাশিত হবে।

ভারতবর্ষ আজও আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ—এখানে ধর্মের প্রভাব প্রবল, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রাধান্যও কম নয়। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপেও এ রকম অবস্থা একদিন ছিল—সেদিন ফ্রায়ার মেণ্টদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রাধান্য সেখানে অনেকাংশে মন্দীভূত। কিন্তু ভারতবর্ষে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে অল্প—ধর্মের প্রভাব প্রায় অটুট। সমস্যা-কণ্টকিত সমাজে বিজ্ঞান-আলোক যেখানে পথ উদ্ভাসিত

করে না—সেখানে ধর্মের অলৌকিক সমাধান মানুষের মনে সহজেই জেঁকে বসে। তাছাড়া এটি প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার জন্মভূমি—এখানে বেদ বেদান্তর ঐতিহ্য, সন্ন্যাসী বুদ্ধ-শঙ্কর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য মানুষের মনকে সহজে নাড়া দেয়।

তাই ধর্মান্ধ ও ধর্মমোহাবিষ্ট দেশের এক অংশের কাছে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বটি নিছক আধ্যাত্মিক। তাদের সেই অধ্যাত্মবাদের কেন্দ্র-উদ্ভূত।

'পরমপুরুষে'র লেখক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সাম্প্রতিককালে এই ধর্মমতের এক ঢেউ তুলেছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি সম্বন্ধে একাধিক বই লিখে রামকৃষ্ণ-ধর্মমতের যে প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন তার ধাক্কা থেকে ছায়াছবি ও রঙ্গালয়ও রেহাই পায় নি। বলা বাহুল্য, এই মতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুখ্য—বিবেকানন্দ গৌণ।

অপর একটি মত ঠিক উল্টো—এই মতে বিবেকানন্দ মুখ্য—শ্রীরামকৃষ্ণ গৌণ। উনিশ শতকের সংশয় ও যুক্তির প্রতীক বিবেকানন্দ, হিন্দুধর্মে সরল বিশ্বাসের প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ। তবু বিবেকানন্দ, রামমোহন-কেশব সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্মের সমাজসংস্কার ধারাটি ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী হলেন। তার কারণ, তখন খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দু অবহেলিত ও নিন্দিত। এর প্রতিবাদে ব্রাহ্ম প্রচারকদের সমালোচনার পথ অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারকে বিবেকানন্দ শ্রেয় মনে করলেন। তিনি দেশবাসীকে বললেন: "তোমরা আর্য, তোমাদের অতীতে লজ্জিত হইবার কিছুই নাই, চেতনা লাভ করিয়া আবার ভারতকে গৌরবান্বিত কর।"

পরাধীন ভারতকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তিনি সচেষ্ট হলেন। তবে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি তিনি গ্রহণ করলেন না। তিনি গ্রহণ করলেন আধ্যাত্মিক পথ। তাঁর উপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্র পরাধীনতায় নিদ্রামগ্ন জাতির কাছে দেশাত্মবোধ জাগাবার, ঘুম ভাঙ্গাবার ডাকরূপে প্রতীয়মান হল; তাঁর আধ্যাত্মিক বাণীর মর্মার্থ হল রাজনৈতিক। এ পথ হয়তো তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যে ভাবেই করুন তাঁর পথের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও প্রভাব বাস্তবক্ষেত্রে অনুভূত হয়।

এই সম্বন্ধে বিবেকানন্দ-ভক্ত প্রগতিশীল সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা মনে পড়ে। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে তিনি এক প্রবন্ধে বলেছিলেন—

"এই নবযুগের নূতন সন্ন্যাসী নূতন সুরে কথা কহে। বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতির জন্য প্রাণপণ প্রয়াসে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে। গৈরিকের ছদ্মবেশে ইনি নিশ্চয়ই রাজনৈতিক।"

আরও একটু এগিয়ে গেলেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি বললেন বিবেকানন্দই ভারতে প্রথম সোস্যালিস্ট। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর মতামত উল্লেখযোগ্য ও আলোচনা সাপেক্ষ—কারণ ইনি শুধু বিবেকানন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন, ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে, সম্পাদক ছিলেন তদানিন্তন 'যুগান্তর' পত্রিকার। এঁর পাণ্ডিত্য যেমন প্রগাঢ় তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে তাঁর পাণ্ডিত্যই অনেক সময় তাঁর বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা হানি করেছে।

সাম্প্রতিককালে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "Swami Vivekananda—Patriot-Prophet" গ্রন্থখানি বিদগ্ধ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই পুস্তকে তিনি লিখেছেন :

"Swamiji called himself a Socialist and, so far it is known, he was the first Indian to designate himself as such" (Foreward p. x.)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বলেন :

"...as early as in 1896 he (Vivekananda) was a Socialist......Thus calling himself a socialist, he adumberates the future society of India where the toilers would evolve a new civilisation. A new civilisation produced by the proletariat had been his ideal." (p. 20)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ আরও বলেন যে পৃথিবীর কেউ যখন "Dictatorship of the Proletariat" তত্ত্বের কথা শোনে নি, তখন বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন।

"The Bolshevists had not arisen as yet, and the world had not heard anything about the theory of 'Dictatorship of the Proletariat.' But strange as it is, in referring to his saying quoted from Page 401 (iv) one will find that Swamiji did foretell about the dictatorship of the proletariat when he said, 'yet a time will come when there will be the rising of the Sudra class...a time will come, when the Sudras of every country... will gain absolute supremacy in every society.' It will sound strange when one hears what is narrated to the author by Swamiji's American disciple Sister Christine that 'it was in New york during Swamiji's last visit to America he told us these things. Swamiji was walking up and down the floor and saying—first comes the rule of the Brahmanas, then

the rule of the Kshatriyas. At present the world is being ruled by the Vaishyas. Next comes the rule of the Sudras. I am wondering where the first Sudra state will be established. It must be either in Russia or in China. In both these countries the huge masses of peoples are oppressed and down-trodden." (Foreward—p. X)

অবশ্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিজে স্বীকার করেছেন যে, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের ধারণা লেনিনের মতন বৈপ্লবিক ছিল না। তবে তাঁর মতে তখনকার ঐতিহাসিক স্তরে না কি সমাজতন্ত্র বৈপ্লবিক রূপ নেয় নি—কেবল রুশিয়া ছাড়া। তবে সেখানেও শ্রমিকের একাধিপত্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দের পূর্বে (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) কেউ এই তত্ত্ব প্রকাশ করে নি—এই কথা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর পুস্তকে বলেন।

অশোভন না হলে, এখানে দু-একটি মন্তব্য প্রয়োজন। প্রথমে উল্লেখ প্রয়োজন যে ১৮৪৮ সালে লেনিনের পূর্বে কার্ল মার্কস Communist Manifesto-তে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের ধারণা দিয়েছিলেন। তাছাড়া, বিবেকানন্দের বহু পূর্বে কার্ল মার্কস ১৮৫২ সালে Dictatorship of the Proletariat-এর কথা এক লিখিত পত্রে বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। আর বিবেকানন্দের পূর্বে ভারতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯ সালে 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের ধরণা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য বঙ্কিম বা বিবেকানন্দ কেউই বৈজ্ঞানিক বা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক ছিলেন না। এঁদের সমাজতন্ত্র ছিল কাল্পনিক (Utopian) সমাজতন্ত্র। হিন্দু ধর্মের গণ্ডির মধ্যেই বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বেদান্ত ভাবের আওতার মধ্যেই শূদ্রের প্রভুত্বসম্পন্ন সমাজের কল্পনা করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়—একদিকে তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে সমাজতন্ত্র বা শূদ্র প্রভুত্বসম্পন্ন সমাজের স্বপ্ন দেখেন ; অন্যদিকে অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন আদর্শের গুণগান করেন। একদিকে তিনি বলছেন : "পশ্চাতে ফিরিও না, কেবল সামনে এগিয়ে যাও।" আবার অন্যদিকে তিনি বলছেন : "ভুলিও না নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।" কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ তিনি একদিকে বিজেতা প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টধর্মের আদর্শের বিরুদ্ধে স্বদেশের বেদ-বেদান্ত ও ভারতীয় প্রাচীন আদর্শকে তুলে ধরছেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য

বুর্জোয়া সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু রূপ ও সাম্রাজ্যলিপ্সা দেখে (শূদ্র-প্রাধান্যযুক্ত) সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছেন।

তবে বিবেকানন্দের এই যে সমাজতন্ত্রের ধারণা তা হচ্ছে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের সময় সেখানকার সোশ্যালিজম, অ্যানার্কিজম প্রভৃতি ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের ফল। বিবেকানন্দ যখন ইউরোপে ছিলেন তখন অ্যানার্কিস্ট রুশ নেতা পিটার ক্রপট্‌কিন (Peter Kropotkin) ইংলণ্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। পারীতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ক্রপট্‌কিনের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় আগ্রহান্বিত হন। এই সমস্ত কারণেই বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক মধ্যবিত্ত সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তার অল্প কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দের সমসাময়িক বহু সমাজ-সংস্কারকই ইউরোপে গিয়েছিলেন কিন্তু তদানিন্তন ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও আন্দোলনের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন নি। তাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নব-অভ্যুদয়ের সমর্থক ছিলেন। এইখানেই তাঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দের অল্প ব্যতিক্রম। তিনি "নিম্ন-মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হতে চান।" তিনি বলেছিলেন—"Upper classes are physically and morally dead"। তাঁর চিন্তার গণ্ডীতে নিম্ন-মধ্যবিত্তের একটা স্থান ছিল—যদিও মোটামুটি ভাবে বলা যায় তিনি মধ্যবিত্ত সংস্কার আন্দোলনেরই প্রতিভূ। আর এটাই বোধহয় স্বাভাবিক—কারণ বিবেকানন্দের জীবনকালে সেদিনকার ঐতিহাসিক স্তরে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের শ্রেণীগত সংগঠন গড়ে ওঠে নি।

অবশ্য তখনকার সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছিলেন; "কুলি কাহিনী" সংবাদপত্র-ও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক আন্দোলনের ধারণা ছিল না। আর তখনকার জাতীয় সংগ্রামের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন—সেখানে কৃষক শ্রমিকদের কথার কোনো স্থানই ছিল না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে ইউরোপীয় ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্ট রবার্ট আওয়েন, সেণ্ট-সাইমন, ফুরিয়ার প্রভৃতির সমাজতন্ত্রের ধারণা থেকে বিবেকানন্দের ধ্যানধারণা কিছু পৃথক ছিল। এর কারণ স্থান-কাল ভেদে সমাজতন্ত্রের কল্পনার পার্থক্য। তখনকার শিল্পপ্রধান ইংলণ্ড ফ্রান্সে নূতন পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান প্রচেষ্টায় যে সমাজতান্ত্রিক কল্পনার উদ্ভব

হয়—পরাধীন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে তার রূপ কিছু ভিন্ন ধরনের হয়। বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে যে ধর্মের প্রভাব তা বলা যেতে পারে তদানিন্তন ভারতের ধর্ম-কেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের প্রভাব আর পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির চিন্তাই বিবেকানন্দের মনে জনগণের উত্থানের চিন্তা এনে দিয়েছিল। তবে সেই গণ-উত্থানের প্রস্তুতিরূপে তিনি শ্রেণী সংগ্রামের পথ দেখতে পান নি—তিনি প্রচার, শিক্ষা, বক্তৃতা, সেবা দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের কল্পনা করেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ অন্যান্য ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিকদের থেকে ভিন্ন গোত্রীয় ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কার্ল মার্কস যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য :

"Historical action is to yield to their personal inventive action, historically created conditions of emancipation to fantastic ones, and the gradual spontaneous class organisation of the proletariat to an organisation of society specially contrived by the inventors. Future history resolves itself in their eyes into the propaganda and practical carrying out of their plans......

Hence they reject all political and especially all revolutionary action; they wish to attain their ends by peaceful means and endeavour by small experiments, necessarily doomed to failure and by the force of example to pave the way for the new social gospel.

(Marx-Engels, Selected Works Vol. I p. 62)

তবুও এ-কথা স্বীকার্য বিবেকানন্দের "মানুষ" শ্রেণী-বিবর্জিত নয়। তিনি সমাজ বিবর্তনে শ্রেণীচরিত্র লক্ষ্য করেছিলেন এবং নিম্নশ্রেণীর ভবিষ্যতে আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু তাঁর পথ শান্তিপূর্ণ প্রচারের পথই ছিল এবং সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁর শূদ্র-প্রাধান্য সমাজ কল্পনা-রাজ্যেরই বস্তু হয়ে রইল।

॥ দুই ॥

বিবেকানন্দের জীবনকাল ১৮৬২ সাল থেকে ১৯০২ সাল। তাঁর কর্মজীবন বলা যেতে পারে ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯০২ সাল। এই সময়টা হচ্ছে উনিশ শতকের শেষার্ধের ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজবিকাশের সময়—এই সময়ের বিশেষ লক্ষণগুলি হচ্ছে : সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নতুন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকাশ; ইউরোপীয় সামন্তবাদবিরোধী পুঁজিতন্ত্রের গৌরবময়

ভূমিকায় বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসা। অন্যদিকে, ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে তার শোষণ-লিপ্সার প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রতি তাদের সহানুভূতি।

বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদের আবরণ ভেদ করে এই লক্ষণগুলি তাঁর চিন্তায় ও বাণীতে প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় ও নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রগতি দেখে বলেন :

"যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল। সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল।"

বিবেকানন্দ প্রথমে আমেরিকা, ইউরোপ দর্শনে মোহাবিষ্ট হন। পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকায় মোহিত হয়ে প্রণতি জানান ফরাসী বিপ্লবের নায়ক রোবস্পীয়রকে, অভিবাদন করেন আমেরিকাকে। কিন্তু দ্বিতীয়বারে আমেরিকা গিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয় এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয়িষ্ণু রূপ দেখে তিনি ক্লিষ্ট হন। তিনি দেশবাসীকে বলেন :

"আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হইও না। ধনী-তন্ত্রীয় পাশ্চাত্ত্য সমাজ, যাহা শোষণ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা গরীবকে ধ্বংস করিয়া স্বীয় কলেবর স্ফীত করিতেছে, তাহা একদিন ফাটিয়া পড়িবে।"

তিনি আরও বলেন :

"সমস্ত পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটি আগ্নেয়গিরির উপর রহিয়াছে। তাহা কালই ফাটিতে পারে এবং টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে পারে। উহারা পৃথিবীর প্রত্যেক অলিগলিরই সন্ধান করিয়াছে কিন্তু সমাধান পায় নাই।"

বিবেকানন্দের সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা যায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনে। পরাধীন ভারতের পুনরভ্যুত্থানে তাঁর বজ্র-নির্ঘোষ ছিল তীক্ষ্ণ ও তীব্র। মোহগ্রস্ত, নিদ্রিত ভারতবাসীকে তিনি সিংহ গর্জনে ডাক দিয়ে বলেন : "উঠ, জাগো, তোমরা মৃত বা দুর্বল নও। আত্মচেতনা লাভ কর, এই মোহজাল ছিন্ন কর।" তিনি দেশবাসীকে গীতার বাণী শুনিয়ে বললেন : "হে পার্থ, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, যদি যুদ্ধে হত হও, তবে স্বর্গলাভ কর, যদি জয়লাভ কর, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ কর।" এমনকি সুদূর আমেরিকায় তিনি যে ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য যান সে

সম্বন্ধে সকলেই জানে যে তিনি ধর্মসভার জন্যই যান কিন্তু তিনি নিজে বলেছিলেন :

"তোমরা অনেকেই জান আমি ধর্ম মহাসভার জন্য আমেরিকা যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা প্রতিকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকা গিয়াছিলাম। ধর্ম মহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে তাহার খবর নেয় কে?"

এই রকম ধর্ম-বিরোধী দু-একটি কথা তিনি যেমন বলেন, ধর্ম সমর্থন করে তেমনি বহু কথা বলেন। কিন্তু সব কথারই উদ্দেশ্য ছিল গরীব দেশবাসীর উন্নতি। ধর্মকে বিদ্রূপ করে তিনি বলেছিলেন, "আমি সে ভগবানে বিশ্বাস করি না যে ভগবান আমাকে ইহজগতে খাদ্য দিতে পারে না অথচ আমাকে স্বর্গে চিরন্তন কালের জন্য আনন্দ দিবার আশ্বাস দেয়।" তিনি আরও বলেন, "যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক শুধু মহুয়া ফুল খেয়ে বেঁচে থাকে সেখানে আবার ধর্ম কি?"

আবার ঈশ্বর চেতনাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন :

"ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায় বলিয়া চারিদিকে কেন তুমি বৃথা অন্বেষণ করিতেছ! তিনি তো তোমার সম্মুখেই অবস্থিত রহিয়াছেন। নিরন্নের মধ্যে, পীড়িতের মধ্যে, আর্তের মধ্যে, পতিতের মধ্যে, অজ্ঞানীর মধ্যে, অস্পৃশ্যের মধ্যে তোমার নারায়ণ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান রহিয়াছেন। একবার জ্ঞান চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে দর্শন কর এবং এই সকল দরিদ্র-নারায়ণের পূজা ও সেবা করিয়া তোমার ইষ্ট দেবতার প্রিয় কার্য সাধন কর। তুমি ইহাদিগের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছ বলিয়া কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইও না। ইহাদিগের সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ বলিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা কর।"

তাই দেখি বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের অশিক্ষিত, পতিত, দারিদ্র-ক্লিষ্ট জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। তবু তাঁর 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয়ভাবে 'সমাজ সেবা' প্রভৃতির জন্য তাঁর ব্যক্তিত্বটি অধ্যাত্ম-জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন ভাষণ ও উক্তির রাজনৈতিক তাৎপর্য ও প্রভাব বিচার করলে তখনকার সমাজে তাঁর চিন্তার প্রগতিশীলতা স্বীকার করাতে—তাঁর প্রতি বিচার-বিশ্লেষণ অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক দোষদুষ্ট হবে না। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি আন্দোলনের সব প্রতিভূই—রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—বেদান্তবাদী

ছিলেন। বিবেকানন্দ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না—তিনি শুধু নিজেকে "প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তবাদী" বলে অভিহিত করতেন। অর্থাৎ তাত্ত্বিক বেদান্ত আলোচনায় মগ্ন না থেকে তাকে কার্যকরী রূপ দেবার চেষ্টা করেন—যার অর্থ বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সূত্রে তাই তিনি যে দু-একটি সমাজতন্ত্র ও গণ-উত্থানের কথা বলে গেছেন—সেগুলিই তাঁকে সাময়িক সমাজ-সংস্কারকদের থেকে একটু পৃথক করে রাখে।

কোনো কোনো সমালোচক বিবেকানন্দের চিন্তার সীমা নির্দেশ করে বলেন যে তাঁর ধ্যানধারণায় ও বাণীতে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য ও বেদ-বেদান্তর প্রভাব থাকায় তাঁর প্রভাব মুসলমান সমাজের ওপর ছিল না। তাঁর স্বাদেশিকতার উন্মেষ প্রচেষ্টা হিন্দু স্বাদেশিকতার উদ্ভব করে। এ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যে বিবেকানন্দ যে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের উদার ধর্মভাবের প্রচার করেন তার মধ্যে মুসলমানদের সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলেন—কোরান সম্বন্ধেও তিনি বহু কথা বলেন। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁর বাণীতে স্বভাবতই হিন্দু ভাবের প্রাধান্য ছিল।

আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বটি নানান অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ—নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ভিন্নমুখী। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় বিবেকানন্দের মধ্যে সমন্বয় হয়েছে দুটি চিন্তাধারার—একটি আধ্যাত্মিক ও অপরটি রাজনৈতিক। কিন্তু তাঁর গৈরিক, তাঁর বেদান্ত, তাঁর 'রামকৃষ্ণ মিশন'—তাঁকে পনরো আনা আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত করে রেখেছে—তাঁর রাজনৈতিক তাৎপর্যের মূল্য এক আনা মাত্র। কিন্তু এই রাজনৈতিক তাৎপর্য তাঁর জীবিতকালে এবং বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর দুই-তিন দশক পর্যন্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর দেশাত্মবোধের অগ্নিগর্ভ বাণী, তাঁর প্রবর্তিত সামন্তবাদী কুসংস্কার ও কুপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন—তাঁকে রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়ে তাঁর সমসাময়িক জাতীয় কংগ্রেস-পন্থী ও ধর্ম-সংস্কারকদের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে। এ প্রভাব রাজনৈতিক ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয় ১৯০২ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত।

বিবেকানন্দের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল—সামন্তবাদ-বিরোধী বুর্জোয়া গণতন্ত্র—কিন্তু পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের সাম্রাজ্য-লিপ্সার রূপে ক্লিষ্ট হয়ে সমাজ-তন্ত্রবাদের কল্পনা ও প্রাচীন ভারতীয় মানবিকতাপূর্ণ আদর্শের প্রশংসা। এই

শেষোক্ত চিন্তাধারা দুটির মধ্যে হয়তো অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে—এই অন্তর্দ্বন্দ্ববাদ দিলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বাধীন বুর্জোয়া সমাজ গঠনের দৃষ্টিভঙ্গি। আর এই অন্তর্দ্বন্দ্বটুকু সহানুভূতি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সেটা তদানিন্তন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের সমর্থক তো হয়ই নি—বরং সংগ্রামী রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক হয়েছে। বলা বাহুল্য বাস্তবধর্মী বিচারে এইটাই বড় কথা—অবশ্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাঁর "প্রাচীন হিন্দু আদর্শের প্রশংসা" (Hindu revivalism) মতই অসমর্থন-যোগ্য হোক্।

উনিশ শতকের শেষার্ধের যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশ শতকের প্রথমে সংগ্রামী গণতান্ত্রিক ধারা অবলম্বন করে—চরম পন্থা গ্রহণ করে—সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, সেই আন্দোলনের উপর বাংলাদেশে বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনেও তাঁর রচনাবলী প্রভাব বিস্তার করে।

প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের প্রভাব—সখারাম গণেশ দেউস্কর ও ভগ্নী নিবেদিতার মাধ্যমে সে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনুভূত হয় এবং পরোক্ষভাবে বিবেকানন্দের বিভিন্ন বাণী—সন্ত্রাসবাদীদের প্রেরণা জাগায়।

সন্ত্রাসবাদী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ('সন্ধ্যা' সম্পাদক) বলেছিলেন—"দেশের জন্য ব্যথা যদি কোনও দিন শরীরিণী হইয়া উঠে তবেই সেদিন বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারা যাইবে।"

সুভাষচন্দ্রও নিজেদেরকে "নূতন বিবেকানন্দীয় দল" বলে অভিহিত করতেন ("Life and Writings" Part 1 Page 68, 1948)। সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং সেই উক্তিতে তিনি যে কথা বলেছেন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সেইটাই বোধহয় যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

> "যদিও স্বামিজী নিজে কোন রাজনৈতিক বাণী দেন নি তবুও যাঁরা তাঁর ও তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। অন্ততঃ পক্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলা দেশের সম্পর্কে সেই ব্যাপারে বলা যায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের একাধিক সাধু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন ও রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ উদ্রেক করে। কিন্তু পরে

রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতি-নিরপেক্ষতার স্বীকৃতি দিয়ে রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে।

জাতীয় আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকার অবসানের সঙ্গে বিবেকানন্দের রাজনৈতিক প্রভাব মন্দীভূত হতে থাকে। এই শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে গণ-আন্দোলনের প্রারম্ভের সঙ্গে বিবেকানন্দের রাজনৈতিক প্রভাব অবসিত হয়। তখন থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকের ওপর জোর—ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে—বেশী পড়ে। আর আজ তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু ও তাঁদের ভক্তদের রাজনীতি-নিরপেক্ষ ধর্মীয় আদর্শের পূজনীয়ব্যক্তি মাত্র।

শুদ্ধিপত্র

'পরিচয়'-এর গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তিব্বতের নবজন্ম' প্রবন্ধটিতে অনবধানতাবশত একটি গুরুতর ভুল রয়ে গেছে। প্রকাশিত আলোচনায় প্রতিভাবান সাধু পাগ্‌স্‌পাকে প্রথম দালাই লামা বলা হয়েছে। একথা ঠিকই, কুবলাই খান্ এক মন্ত্রীপরিষদের মাধ্যমে তিব্বত শাসন করেছিলেন। এই মন্ত্রীপরিষদের নেতা ছিলেন পাগস্‌পা এবং তিনি ধর্মীয় ও প্রশাসনিক উভয়বিধ ক্ষমতারই অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইনি প্রথম দালাই লামা নন।

চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাধু ৎসোন্ খাপা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বর্তমানে প্রচলিত রূপ পীত শাখার (Yellow Sect) প্রবর্তক। তাঁর শিষ্য দ্‌গে-হ্‌দ্যান্-গ্র্যুব-পা হচ্ছেন প্রথম দালাই লামা। ১৪৭৪ সালে এঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু দু'বৎসর পরে জাত এক শিশুর মধ্যে তাঁর আত্মা নবজন্ম লাভ করেছে—এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়। এই হল পরবর্তীকালের তিব্বতী ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন অবতারবাদের শুরু।

দালাই লামা—এই নামে প্রথম পরিচিত হন তৃতীয় অবতার ব্‌সোদ্ নাম্‌স্ র্‌গ্য ম্‌ৎসো (১৫৪৩-'৮৭)। পনেরশো সাতাত্তর সালে মঙ্গোল সম্রাট আলতান খান এঁকে বজ্রধর দালাই লামা বলে সম্মানিত ও অভিহিত করেন।

১৭৯৩ সালে চীনাদের দ্বারা নির্ধারিত নীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী পরবর্তীকালে চীনা পরিচালনায় দালাই লামার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে—একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।—সম্পাদক, পরিচয়।

ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজকের পরিস্থিতি-কণ্টকিত আর বিবৃতি-বিড়ম্বিত এই যুগে ক্রিকেট সম্বন্ধে লিখতে বেশ একটু যেন স্বস্তি বোধ হচ্ছে। লিখতে যে মন চাইছে, তার প্রধান কারণ হল দুটো। এই কদিন আগে কানপুরে অস্ট্রেলিয়ান দলের সঙ্গে দ্বিতীয় 'টেস্টে' আমাদের খেলোয়াড়রা জয়ী হয়ে ভারতের মলিন মুখচন্দ্রমাকে উদ্ভাসিত করেছে, ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সম্প্রতি ক্রমাগত যে লাঞ্ছনা আমাদের সহ্য করতে হয়েছে তাকে দূর করার সম্ভাবনা দেখিয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে দলীপসিংজীর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা নেভিল কার্ডস্-এর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল: বাংলাভাষায় এমন লেখা আমরা কবে দেখব!

ক্রিকেট-লেখক হিসাবে নেভিলকার্ডস্ হলেন একেবারে অনন্য; আর কারও লেখায় ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল এমন শোভা নিয়ে দেখা দিয়েছে বলে জানি না। দুটি বিষয়ে তাঁর লেখার খ্যাতি; এক হল ক্রিকেট, আর দ্বিতীয় হল সঙ্গীত। তাল, মান, লয়ের কারবার যা শোনা যায় শুধু তাই নিয়ে নয়, যা শোনা যায় না, তা নিয়েও। সঙ্গীত আর ক্রিকেটের যে নৈকট্য, তা হয়তো একটু মন দিয়ে ভাবলে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

জবরদস্ত বন্ধুবান্ধব এ সব কথায় পলায়নী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে রুষ্ট হবেন। কিন্তু লৌকিক শাস্ত্রেই তো বলে যে অনেক সময় পালিয়ে বাঁচা যায়। সঙ্গীতেরই মতো ক্রিকেটের মধ্যে হয়তো এই পলায়নী ভাব কতকটা আছে; প্রচুর অবসর নিয়ে সেই অবসরের চর্চা উভয় ব্যাপারেই একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে ক্রিকেটের উপর আমাদের অনেকে খড়্গহস্ত ছিলেন। "ছিলেন" বলছি এজন্য যে রাজনীতিকেরা কানপুরে ভারতীয় দলের জয় নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন—আশ্বাস হচ্ছে যে ক্রিকেটের নামে যাঁরা নাসিকাকুঞ্চন করতেন, তাঁরা হয়তো একটু ভোল বদলানো দরকার মনে করছেন।

নিজেই যখন রাজনীতি ব্যাপারে লিপ্ত রয়েছি, তখন আমার পক্ষে রাজনীতিকদের সম্বন্ধে এই কটাক্ষ অবান্তর ও অসঙ্গত মনে হতে পারে।

কিন্তু বড় দুঃখেই এভাবে লিখতে হয়েছে। হয়তো অনেকেরই স্মরণ হবে যে বছর চারেক আগে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান রায় কয়েকজন পার্শ্বচরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন যে কলকাতার ইডন্ গার্ডন্সে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি সর্বৈব খেলার জন্য একটা স্টেডিয়ম বানানো হবে। যে অকর্মণ্যেরা রঞ্জি স্টেডিয়ম্‌কে অসম্পূর্ণ করে রেখেছে, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া এবং কলকাতার মানুষের বহুদিনের কামনা স্টেডিয়ম তৈরি করে সুখ্যাতি পাওয়া, এই দুই পাখি একঢিলে মারার মতলব তখন বেশ এগিয়েছিল। আমার বেশ মনে আছে যে ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের বড় কর্তা শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ ফতোয়া দিলেন যে শীঘ্রই ইডন্ গার্ডন্সে হরেক রকম খেলাধুলার জন্য "composite stadium" তৈরি করা হচ্ছে। কলকাতার লোক ফুটবল পাগল, সুতরাং স্টেডিয়মের দরকার যখন খুবই বেশী, তখন যেখানে হোক, যেমন করে হোক, স্টেডিয়ম বানানো হোক, এই হিসাব করে এবং কংগ্রেসদল একাই যাতে স্টেডিয়ম তৈরির জন্য বাহবা না পায়, সেজন্য তখন ডাইনে এবং বাঁয়ে যত পার্টি আছে, তারা কেউই "composite" স্টেডিয়মের বিরোধিতা করল না। তারা সবাই ভুলে গেল যে আমাদের এই নরম মাটির দেশে একই 'পিচ্'-এ ছ'মাস ফুটবল খেলার পর ক্রিকেটের দফা রফা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ভুলে গেল যে কলকাতায় ভালো জিনিস যখন প্রায়ই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তখন ক্রিকেটের পক্ষে সব চেয়ে সরেশ যে 'পিচ্' এখানে রয়েছে তাকে নষ্ট করা একটা রীতিমতো অপরাধ। যাই হোক্, সুযোগ বুঝে বিধানবাবু এগিয়ে চললেন, ইডন্ গার্ডন্‌স্ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি বলে দিল্লীতে তদ্বির করলেন, দুনিয়ার মধ্যে সেরা এই ক্রিকেট 'পিচ্'-এর দিন ফুরিয়ে এসেছে বুঝে ক্রিকেটের প্রতি যাদের প্রকৃত দরদ তারা অসহায় বোধ করলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে তখনকার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি, কেন্দ্রের একজন ডেপুটি মন্ত্রী (যিনি পূর্বে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে নেমেছিলেন) আমায় বললেন যে কংগ্রেস দলে বিধানবাবু এমনই হোমরাচোমরা ব্যক্তি যে তাঁর জেদকে ঠেকানো বিশেষ মুশকিল আর প্রধান মন্ত্রীর কানে কথাটা ভালো করে না তুললে উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রীকে দিয়েই হস্তক্ষেপ করানো হয়েছিল। ইডন্ গার্ডন্সের 'পিচ্' বাঁচল এইভাবে, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে সাহায্য মেলেনি, বরঞ্চ সে তরফ থেকে এসেছিল বাধা।

যাই হোক, এ সব কথা লিখতে বসিনি, একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এসে গেল। কানপুর টেস্ট্ ম্যাচে জাসু পাটেলের বোলিং আর আমাদের ভারতীয় দলের জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সুলক্ষণ দেখে এমন কথাই লিখতে মন যায় যাতে অপ্রসন্নতা কেটে গিয়ে ক্রিকেটের জাদুকরীর ছোঁওয়া একটু মেলে।

ছেলেবেলায় আমাদের বইয়ে ঠাসা বাড়িতে একখণ্ড "The Jubilee Book of Cricket" খুঁজে পেয়েছিলাম ; লেখক স্বয়ং রঞ্জিৎসিংজী। বাড়ির উঠোনে এবং সামনে গলিতে জায়গা সংকুলান হলেও শীতকালে পরিত্যক্ত টেনিস বল নিয়ে ক্রিকেট চলত ; তাকে 'বেলে-খেলা' বলাই উচিত, কিন্তু নাওয়া-খাওয়া ভুলে তাতেই প্রায় মেতে থাকা যেত। আর মাঝে মাঝে শনি-রবিবার বাবার সঙ্গে ঈডন্ গার্ডন্‌সেও যাওয়া হত ; খেলা বিশেষ না বুঝলেও ক্রিকেট মাঠের তখনকার আবহাওয়ার সঙ্গে ছেলেবেলাতেই পরিচয় হয়েছিল।

ফুটবলের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই ক্রিকেটের বেলায় বলা চলে যে আমাদের স্বাদেশিকতাকে স্ফুরণ ও বর্ধন করতে এ-সব খেলার অবদান কম ছিল না। ইংরেজদের নিছক নিজস্ব খেলাতে আমাদের দেশের লোকের কৃতিত্ব দেখে বা তার গল্প শুনে তখন বুক দশহাত হত। এখনও মনে আছে, ঈডন্ গার্ডন্‌সে খেলা দেখতে দেখতে কিংবা অবসরের সময় চারদিকে গল্প হচ্ছে বোম্বাইয়ের Quadrangular সম্বন্ধে—তখন হিন্দু, মুসলিম, পার্শী আর ইয়োরোপীয় এই চার 'জিম্‌খানায়' খেলা হত, দেশের সেরা খেলোয়াড়রা চারদিক থেকে বোম্বাইয়ে জড়ো হতেন। কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কিংবা ঝালচানা চিবোবার ফাঁকে গল্প হচ্ছে—ভিঠল আর নাইডুর ব্যাটিং কিংবা ওয়ার্ডেন আর বালুর বোলিং বিষয়ে। পুরানো কালের সমঝদাররা হয়তো বলছেন সে সব দিনের কথা যখন বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড হ্যারিস কলকাতায় ক্রিকেট টীম নিয়ে এসেছেন, কিংবা স্বয়ং রঞ্জি কলকাতায় খেলেছেন, কিংবা নাটোর আর কুচবিহারের মহারাজা ফ্র্যাণ্ট টারাণ্ট আর বিধু মুখার্জি আর মণি দাস প্রভৃতি মহারথীদের ক্রিকেট মাঠে নামবার সুবিধা করে দিচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ান টারাণ্ট (Tarrant) বিলাতে মিড্‌ল্‌সেক্সের হয়ে খেলেছিলেন ; সেকালে তিনি ক্রিকেটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চৌকস্ খেলোয়ারদের মধ্যে একজন ছিলেন। আবছা মনে হচ্ছে যেন টারাণ্টকে বল দিতে দেখেছি ; বিধু মুখার্জির ব্যাটিং সম্বন্ধে গল্পই শুনেছি, চোখে কিছু

দেখা যায় নি ; আর মণি দাস তো সেদিন পর্যন্ত ছিলেন, ক্রিকেট এবং ফুটবলে তাঁকে অনেকবারই দেখেছি—বেশ মনে পড়ে ১৯২৭ সালে এম, সি, সি দল যখন প্রথম এদেশে আসে, তখন বিশ্ববিখ্যাত বোলার মারিস টেট্ এক বলে মণি দাসের উইকেট উপড়ে ফেলায় আমাদের কত কষ্ট হয়েছিল।

আজকাল দেশবিদেশের টীম এখানে আসে, টেস্ট ম্যাচের পুরো রেওয়াজ চলেছে। কিন্তু তখন আমাদের অল্পে তুষ্ট থাকতে হত ; 'বেঙ্গলি স্কুল্স্', 'ব্রিটিশ স্কুল্স্', 'অ্যাংলোইণ্ডিয়ান স্কুল্স্', এদের খেলা ছিল তখনকার সবচেয়ে বড় ব্যাপার—রঞ্জি ট্রোফির মারুফত প্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা তো সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে। বোম্বাইয়ের 'কোয়াড্রাঙ্গুলার' ছিল ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ঘটনা—তবে আমরা যখন স্কুলের উপরকার ক্লাসে পড়ি তখন বুঝি নাগপুরে হয়েছিল 'ট্রায়াঙ্গুলার' খেলা, সেখানে নাম করেন বাংলার হেমাঙ্গবাবু, বোধ হয় বিধু মুখার্জির পর সবচেয়ে খ্যাতিমান বাঙালী ক্রিকেটার ইনি। হেমাঙ্গবাবুকে খেলতে আমরা দেখেছি (ফুটবলেও ইনি রীতিমতো কৃতী), ব্যাটিং, বোলিং এবং ফীল্ডিং-এ এঁর সমকক্ষ ছিল খুব কম। মনে পড়ে একদিন হেমাঙ্গবাবুকে ইডন্ গার্ডন্সে দেখি তাঁর পুরানো কলেজ বিদ্যাসাগরের হয়ে খেলতে। সে খেলায় নেমেছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, যিনি একদিকে ছিলেন রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের টীকাকার আর অন্যদিকে বাংলাদেশে ক্রিকেটের প্রসারে সর্বাগ্রগণ্য। শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘকায় এই বৃদ্ধ উইকেটে দাঁড়াতেন ব্যাট কাঁধে নিয়ে, দেখে মনে হত যেন ডব্লু, জি, গ্রেস্ আবার এদেশে জন্ম নিয়েছেন। বাংলার ক্রিকেটে এই রায় বংশের অবদান অবিস্মরণীয়—বোলিং কুশলী অধ্যাপক শৈলজা রায়, ব্যাটিং এবং উইকেট-কীপিং-এ পারদর্শী নীরজা রায় প্রভৃতি গুণধরের নাম মনে পড়ছে।

খেলাধুলা যে শুধু একটা খেয়াল বা সাময়িক প্রমোদের ব্যাপার নয়, খেলা নিয়ে যে অভিনিবেশ দরকার, নিষ্ঠা, সাধনা পর্যন্ত প্রয়োজন, একথা বাঙালীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন একজন, যাঁকে সবাই আজ ভুলে যাচ্ছে, অথচ ময়দানে যাঁর প্রস্তরমূর্তি গড়া আমাদের কর্তব্য। তিনি হলেন দুখীরামবাবু ; O. Mazumdar তাঁর এই পোশাকী নামটা বড় কারও জানার দরকার ছিল না। এরিয়ান্স্ ক্লাবের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা এই সরল, নিরহঙ্কার মানুষটির প্রায় তুলনা মেলে না। বাইসাইক্লে হেলান দিয়ে ছোটখাটো মানুষটি ময়দানে আর

ঈডন্ গার্ড্ন্সে নিজের হাতে গড়া ছেলেদের খেলা দেখতেন, আর ক্রিকেটে তিনি জোর দিতেন ঠিক সেই গুণের উপর, যে গুণগুলোকে আমরা প্রায়ই অবহেলা করে থাকি। আজও পর্যন্ত আমাদের খেলায় একটা মারাত্মক দোষ হল আলসেমি—ব্যাট করতে গিয়ে বলের গতি লক্ষ্য করার ধৈর্য না থাকায় তাই আমাদের আঙুল কামড়াতে হয়, বল দিতে গিয়ে যাতে তার দৈর্ঘ্যে (length) ঘাট্তি না পড়ে অথচ বলের উপর আঙুলের কাজ পুরোপুরি থাকে সেদিকে নজর আমরা প্রায়ই হারিয়ে বসি, ফীল্ডিং-এর সময় আমরা সাধারণতঃ তৈরি থাকি না, হয়তো বা আশা করি যে বলটা যেন মাঠের অন্য কোন দিকে ছুটে যায়! ভাবের ঘরে চুরি করলে যেমন তার ফল ভোগ করতে হয়, তেমনই মনের কোণে হয়তো অজ্ঞাতে এই আলসেমি থাকলে ক্রিকেটে তার দাম দিতে হয়—এর দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অনেক রয়েছে। এরই বিরুদ্ধে ছুথীরামবাবু রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ; সঙ্গতি স্বল্প হলেও তাঁর চেষ্টার দাম তাই খুব বেশী।

কলকাতায় তখন মুশকিল এই যে খেলার মেয়াদ একদিন কিংবা আধদিন মাত্র। তারই মধ্যে ধৈর্য ধরে খেলার তেমন প্রয়োজন ছিল না বলে ক্রিকেটের কতকগুলো বড় গুণ আমরা অনেকেই আয়ত্ত করতে পারিনি। ভালো খেলোয়াড়রা আমাদের অনেকেই তাই রীতিমতো মেজাজী লোক ; হাত খুলে গেলে কয়েকটা খাসা 'মার' তাঁরা দেখাবেন বটে, কিন্তু টিকে থাকবেন কতক্ষণ তা নিয়ে সর্বদাই সংশয় থাকবে—চমৎকার মারের সঙ্গে সঙ্গেই দু-একটা আনাড়ী খোঁচা কিংবা অধৈর্য হয়ে ক্যাচ তুলে দিয়ে তাঁরা পালা শেষ করবেন। এই রোগ শুধু বাঙালীর নয়, আমাদের দেশের প্রায় সব এলাকায় ক্রিকেটারদের বেলায় দেখা গিয়েছে—গণেশ বসু থেকে নির্মল চ্যাটার্জিকে (আজকের খেলোয়াড়দের নাম ইচ্ছা করেই বাদ রাখছি) আমরা দেখেছি। কিন্তু এঁদের চেয়ে অনেক সরেশ খেলোয়াড় মুস্তাক আলীর মতো গুণী এই রোগ থেকে মুক্ত ছিলেন না। আজকাল তবু দু-একজন ব্যাট্স্ম্যান আছেন যাঁরা ভরসা হয় শুরুতেই নেমে কিছুক্ষণ টিকবেন এবং কিছু রান্ করবেন। কিন্তু প্রায় অর্জুনের মতো মনঃসংযোগ নিয়ে বল লক্ষ্য করার যে দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডের হবস্ আর সাট্‌ক্লিফ, কিংবা অস্ট্রেলিয়ার উড্‌ফুল আর পন্সফোর্ড রেখে গেছেন, তার ধারে-কাছেও আমরা ঘেঁষার চেষ্টা পারতপক্ষে করতাম না। সাম্প্রতিক যুগে আমাদের বিজয় মার্চেণ্ট (এবং কিছু পরিমাণে বিজয় হাজারে) এই গুণ

আয়ত্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই নেভিল কার্ডস্ একবার বলেছিলেন (যদিও অন্য কয়েকটা কারণও ছিল) যে মার্চেণ্ট হলেন আমাদের একমাত্র 'সাহেব' খেলোয়াড় ("India's only European")।

তুথীরামবাবুর শিক্ষকতায় তদানীন্তন এরিয়ান্স ক্লাব জরুরী খেলায় প্রথম ব্যাটস্‌ম্যানদের কিভাবে সাবধানে খেলতে হয় তার পরিচয় দিত। ছনে মজুমদার, এম, মুখার্জি, আর (ফকির) মুখার্জি প্রভৃতি দর্শকদের খুশী হয়তো করতে পারতেন না, কিন্তু রান্ অতি স্তিমিত হারে করলেও উইকেট থেকে তাঁদের হটানো ছিল বেজায় শক্ত। মনে আছে একবার ক্যালকাটার উদ্ধত ক্যাপটেন, তখনকার একজন প্রকৃত ভালো খেলোয়াড় ল্যাগডেন ধৈর্য হারিয়ে একেবারে চটে উঠে 'আণ্ডার হ্যাণ্ড' বল দিতে লাগলেন—ক্রিকেটের আইনে নাকি তাতে বাধে না, কিন্তু নীতিতে আর সৌজন্যে বাধে। যাই হোক, এরিয়ান্সের খেলায় আত্মরক্ষার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তা যদি আমাদের তেজী ব্যাট্‌স্‌ম্যানরা একটু আয়ত্ত করতেন তো সুফল ঘটত, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে খুব বেশী ফল আশা করাই অসঙ্গত হত।

ল্যাগডেন কিন্তু খেলতেন ভালো, ব্যাট্‌স্‌ম্যান হিসাবে হাত ছিল একেবারে দরাজ। ইংলণ্ডে তিনি সারে কাউন্টির ক্যাপটেন ছিলেন, এদেশে টাকা করতে না এলে হয়তো কালে ইংলণ্ডেরও টেস্ট ক্যাপটেন হতে পারতেন। সাহেবদের মধ্যে ভালো খেলোয়াড় তখন বেশ দেখা যেত ; এ, এল, হোজি (Hosie) আগে খেলেছিলেন হ্যাম্পশায়ারে ; আই, পি, এফ, ক্যাম্পবেল সারে-তে ; সি, পি, জন্‌স্টন্ কেণ্টে। এদের খেলা সত্যই দর্শনীয় ছিল, যেমন ছিল এদেরই কিছু পরে কেণ্টের টি, সি, লংফিল্‌ড্ কিংবা এফ, এম, গার্নেটের খেলা। বোম্বাইয়ে এরা যেতেন কোয়াড্রাঙ্গুলারে খেলতে ; সেখানেই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ক্রিকেটের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত।

কলকাতার ফিরিঙ্গীদের মধ্যে আগে হকি এবং ক্রিকেটেও চমৎকার খেলোয়াড় দেখা দিত ; এখন কেমন যেন তাদের খেলা ম্রিয়মান হয়ে এসেছে। কার্বেরী, গাই ফোর্ড, গল্‌ব্রেথ-প্রভৃতির নাম অনেকের মনে পড়বে। মুসলমান ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে আসাদ আলীর কথা ; কলকাতা কাস্টম্‌সের হয়ে হকিতে তো ইনি ছিলেন একেবারে অদ্বিতীয় ফরোয়ার্ড। ক্লাবগুলোর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল এরিয়ান্স, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহামেডান, পার্শী, মোহনবাগান, কিছু পরে ঈস্ট বেঙ্গল, ভবানীপুর,

কালিঘাট প্রভৃতি এগিয়ে চলল। রায় এবং বসু পরিবার ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়নের শিরদাঁড়া ; কার্তিক বসু, গণেশ বসু প্রভৃতির খেলা ভুলে যাওয়ার জিনিস নয়। এখনকার কজন জানে যে মোহনবাগানের হাবুল সরকার, গোষ্ঠ পাল ক্রিকেটেও কৃতী? সর্বভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বাঙালীদের মধ্যে প্রকৃত নাম করেছেন শুঁটে ব্যানার্জি, প্রবীর সেন আর পঙ্কজ রায়। কিন্তু অবস্থা অনুকূল থাকলে আরও অনেকে যে ক্রিকেটের খাতায় সোনা না হলেও রূপোর অক্ষরে নাম লিখে যেতে পারতেন, তাতে সন্দেহ নেই।

কথা বলতে গেলে ফুরোয় না, আর আজকের যাঁরা পাঠক তাঁদের এ সব কথা শুনতে বিশেষ আগ্রহ না থাকতে পারে। কিন্তু একটু ক্লান্তিকর হলেও আগের দিনের কথায় হয়তো কিছু দাম আছে। তিন-চার-পাঁচ দিনের খেলা এখন প্রায়ই হচ্ছে, সেঞ্চুরীরও ছড়াছড়ি। কিন্তু ভাবতে মজা লাগছে যে একসময় আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম ঈডন্ গার্ডন্‌সে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাট্‌স্‌ম্যান যেন সেঞ্চুরী করতে পারে। পূর্বেই বলেছি যে খেলার আগ্রহের সঙ্গে আমাদের স্বাদেশিকতা তখন একেবারে মিশে ছিল। যাই হোক, একদিনে দুই ইনিংস্ খেলা যখন নিয়ম, তখন সেঞ্চুরী সহজ ছিল না। অবশ্য সাহেবরা প্রায়ই করত ; তাদের ধন্যবাদ যে অনেক ভালো মার তারা আমাদের দেখিয়েছে। ক্যাম্পবেলের অতি দ্রুত দৌড়, হোজির আত্মবিশ্বাস, ল্যাগডেনের বলের উপর প্রচণ্ড প্রহার, 'এক্‌স্‌ট্রা-কভার' দিয়ে ন্যাটা জন্‌স্টনের একেবারে বিদ্যুৎগতি 'ড্রাইভ', সহজে ভুলে যাওয়ায় জিনিস নয়। ঈডন্ গার্ডন্‌সে দিশী হাতের সেঞ্চুরী না দেখে আমরা যখন ক্ষুব্ধ, তখন মনে আছে (বৎসরটা মনে নেই) একদিন মাদ্রাজ থেকে এক দল এল, ক্যালকাটার সঙ্গে খেলতে, আর তাদের মধ্যে পি, এ, কনিকম্ বলে একজন বেশ অবলীলাক্রমে সেঞ্চুরী করলেন—তখন এঁর খুব খ্যাতি, তারপর যেন নিভে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে সেই টীম কিংবা অন্য টীম (ঠিক মনে নেই) ক্যালকাটাকে ৫৯ রানে খতম করে দিল। বোধ হয় গোপালন্ নামে রীতিমতো মাথায় ঝুঁটি বাঁধা এক বোলার এই কাজে সব চেয়ে আগুয়ান হয়েছিলেন।

প্রথম যখন এদেশে এম, সি, সি-র আগমন ঘটল তখন তা নিয়ে সর্বত্র চাঞ্চল্য হয়েছিল খুব (১৯২৭)। ঈডন্ গার্ডন্‌সে কদিন ধরে খেলা—বাঙালী আর ফিরিঙ্গীদের মিলিত টীমের সঙ্গে একদিন, ব্রিটিশ টীমের সঙ্গে একদিন, আর সারা ভারত টীমের সঙ্গে তিনদিন। এম, সি, সি টীমের

ক্যাপ্‌টেন ছিলেন গিলিগান, আর দলে নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন মরিস টেট, স্যাণ্ডহাম, ব্রাউন, গেয়ারী, অ্যাস্টিল, পার্সন্‌স্‌ প্রভৃতি। বাঙালী আর ফিরিঙ্গীদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ আশা ছিল না। তবুও অতটা ব্যর্থতার জন্য আমরা তৈরি ছিলাম না। একা ব্রাউন আউট হতে এম, সি, সি খেলা শেষ করল, স্যাণ্ডহাম করেছিলেন সেঞ্চুরী—'লেট্‌ কাট' ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত, বেঁটে মানুষটি অব্যর্থ চোখের ভরসায় পিছু হটে এসে বলকে একটু এগুতে দিয়ে একেবারে তলোয়ারের ঘায়ে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন বহুবার। সারে কাউন্টিতে হব্‌সের জুড়ি যে তিনি তা প্রমাণ করলেন। আমাদের নামকরা ব্যাটসম্যান প্রায় সবাই ব্যর্থ হলেন, কেবল নীরজা রায় এবং 'তাড়ু' মারের জন্য বিখ্যাত হাবুল মিত্র নির্ভীকভাবে ব্যাট চালিয়ে কিছুটা মান রাখলেন। হারলাম যে আমরা, তাতে আশ্চর্য হওয়া ঠিক নয়, কারণ, হারলাম আমরা সকলে—সর্ব ভারতীয় টীমও বেশ বিস্তৃত ব্যবধানে পরাজিত হল।

যে সি, কে, নাইডুর খ্যাতিতে তখন দেশ ভরপূর, তাঁর খেলা দেখবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। বোম্বাইয়ে হিন্দু জিমখানা মাঠে (তখনও ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ম তৈরি হয় নি) নাইডু এম, সি, সি-র বিরুদ্ধে করেছিলেন ১৬৬ রান—তার মধ্যে ছিল এগারোটা ওভার বাউণ্ডারী আর চৌদ্দটা বাউণ্ডারী! কলকাতার ঈডন্‌ গার্ডন্‌স্‌ হল ক্রিকেটের পীঠস্থান। এর মসৃণ, সুন্দর পিচের তুলনা নেই—কিন্তু এ-মাঠ যেন নাইডুর পক্ষে 'পয়া' নয়। যাই হোক, তিনি আউট হলেন মাত্র নটি রান করে (ন'য়ের গাঁট পার হওয়া সম্বন্ধে দর্শকদের মধ্যে কত জল্পনা চলে)। কিন্তু তারই মধ্যে 'লেগ'-এর দিকে এমন একটি 'গ্লান্‌স্‌' দিয়েছিলেন, যেন অতর্কে তড়িৎস্পর্শে বল বাউণ্ডারী পার হয়ে গেল, যে তা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। এ এমন ধরনের একটি মার যা হল প্রকৃতই শিল্পগুণাক্রান্ত—নিখুঁত ঝল্‌সানির এ-ছবি যার হাত থেকে বেরোয়, তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা—যে কুহক রঞ্জির কব্জি থেকে বেরিয়ে ইংলণ্ডকে চমৎকৃত করেছিল, তার মন্ত্র যেন এঁরও একেবারে অজানা নয়।

উচ্ছ্বাস হয়ে পড়ছে বলে একটু সংযত হতে চাইছি, কিন্তু এই উচ্ছ্বাস উদ্রেক করতে পারে বলেই তো ক্রিকেটের সার্থকতা—একেবারে পুরানো যুগের কথা জানি না। কিন্তু ম্যাকার্টনে, উলে, ব্র্যাডমান থেকে হ্যামণ্ড,

হটন্, পিটার মে, উঈক্‌স্, ওয়ারেল, নীল হার্ভে প্রভৃতির খেলায় মাঝে মাঝে যে আলো ঝলসে উঠেছে, মুহূর্তের এক ভগ্নাংশকে যা সোনায় মুড়িয়ে দিয়েছে আর মানুষের মনকে ক্ষণেকের জন্যই পরম পরিতৃপ্তি দিয়েছে, তা নিয়ে উচ্ছ্বাস তো অসঙ্গত হতে পারে না।

এই সেদিন নেভিল কার্ডস্ লিখেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের হয়ে টেস্ট ম্যাচে নেমে দলীপ সিংজীর খেলার কথা—"ত্রিশ বছর হয়ে গেল, কিন্তু বেশ মনে পড়ছে সেদিন বিকেলের রোদের মতোই দলীপের ব্যাটিং চারদিক আলো করেছিল।" সব চেয়ে উঁচু স্তরে উঠে আমাদের ভারতীয় ব্যাটিং একটা যেন নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে তাঁর মনকে বারবার নাড়া দিয়েছে। বোলার বলে যাঁর খ্যাতি সেই অমর সিং যখন ১৯৩২ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ব্যাট করেন তখন কার্ডস্ দেখেছিলেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ইন্দ্রজাল। ১৯৩৬ সালে বিজয় মার্চেণ্ট এবং মুস্তাক আলী যখন একত্র রেকর্ড সৃষ্টি করেন, তখন আবার অপরূপ ভাষায় তার বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন—মার্চেণ্ট তোমাদের মধ্যে 'সাহেব', তার গুণের অন্ত নেই, কিন্তু তোমাদের একান্ত নিজস্ব একটা ধারা আছে সেটা হঠাৎ দেখা যায় মুস্তাকের ভঙ্গীতে, তাকে হেলায় হারিও না, এ-কথাই তিনি বারবার বলেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত শুধু নিষ্ঠা আর অনুশীলনের জোরে নাইডু যে গুণকে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, বোম্বাইয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্ট ম্যাচে একেবারে মনোহারী সেঞ্চুরী করে এবং বারবার প্রতিভার প্রস্ফুরণ দেখিয়েও অমরনাথের মতো খেলোয়াড় সে গুণ বজায় রাখতে পারেন নি। দুঃখ হয় এই দেখে যে যাদের তূণে ছিল অনেকগুলো অস্ত্র, যারা নানান ঢঙে মার দেখিয়ে মাঠকে আলো করে রাখতে পারার ইঙ্গিত দেখিয়েছে, সেই উম্‌রিগর বা মঞ্জরেকর-এর মতো কৃতী হয়তো সুযোগ কিংবা অধ্যবসায়ের অভাবে আমাদের আশা পূরণ করতে পারছেন না।

উইস্‌ডেন-এর খাতায় ক্রিকেটের শিরোপা-পাওয়া বলে যাদের সম্মান করা হয়েছে তার মধ্যে আছেন নাইডু, মার্চেণ্ট আর মানকড়। ক্রিকেটের কীর্তিকথায় রঞ্জিৎ সিংজীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবাসীর স্থান অল্প হলেও নগণ্য একেবারে নয়। ইংলণ্ডের খেলায় আছে এক ধরনের গাম্ভীর্য—অনুষ্ঠানে যাতে ত্রুটি না ঘটে, মন্ত্রোচ্চারণ যাতে বিকৃত না হয়, ব্যবস্থাপনা যেন নিখুঁত হয়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আর তাদের কৃতিত্বও বিপুল।

অস্ট্রেলিয়ার খেলা আরও স্বচ্ছ, আরও শাণিত, কিন্তু ইংলণ্ডের মতো নিয়মিত নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় লক্ষ্য করা যাবে সরল প্রাণের উচ্ছলতা, মনের সহজ একাগ্রতা, আর দুঃখ সুখের তড়িৎ প্রতিফলন। পাকিস্তানের তরুণ দলে ইংলণ্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ধারা কতকটা পরিমাণে যেন আজ মিশেছে মনে হয়। ভারত সম্বন্ধে কিছু বলতে সংকোচ হয়; একদা আমরা ছিলাম মেজাজী, উত্তুঙ্গ প্রতিভার সঙ্গে আমাদের খেলায় মিশে থাকত অমার্জনীয় শৈথিল্য, তাই পরাজিত হয়েও আমরা কখনও অপমানিত হই নি —কিন্তু আজ যেন আমরা সদা সংকুচিত, অনিশ্চিত, ত্রস্ত, আত্মশক্তি-বিষয়ে একান্ত অচেতন। কানপুর টেস্টে বিজয় যদি নূতন্ অধ্যায়ের সূচনা করে তো তার চেয়ে আনন্দের বস্তু অল্পই থাকবে।

১৯৩২ সালে ইংলণ্ডে যখন ভারতীয় ক্রিকেটাররা যান তখনকার কথা বেশ মনে পড়ছে। লর্ডস্ মাঠে প্রথম খেলায় নেমে নাইডু সেঞ্চুরী করলেন; কাগজে লিখল যে তাড়াতাড়ি রান দরকার হলে সারা দুনিয়ার টীমে নাইডুকে চাই-ই চাই। অলিতে-গলিতে ছোট ছেলেরা ইটের উইকেট বানিয়ে ক্রিকেট খেলছে—কেউ বলছে আমি হ্যামণ্ড আর কেউ বলছে আমি না-য়ু-ডু (Nayudu)। আমাদের টীমে নাইডু একক নন একেবারে; সঙ্গে ছিলেন ওয়াজির আলী, নাজির আলী, মহম্মদ নিসার, নাওমল, জহাঙ্গীর খান, অমর সিং, লাল সিং প্রভৃতি। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, ক্ষিপ্রতায়, কৌশলে এই টীম সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছিল। ধীর, সুস্থির, নির্ভুল পদ্ধতিতে ব্যাট করতেন ওয়াজির; তিনি যেন ছিলেন মার্চেন্টের পুরোধা। আজ আমরা দ্রুত বোলিং-এর ভয়ে কাঁপি, একজনও প্রকৃত 'ফাস্ট' বোলার দেখাতে পারি না। কিন্তু সেদিন ছিলেন নিসার, যাঁর "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ" উপস্থিতি মাঠের চেহারাকে যেন বদলে দিত, বিপুল দেহে অমন ক্ষিপ্রগতিতে এবং সুকৌশলে বল যে কত ভালো দেওয়া যায় তা ছিল দেখবার মতো। তাঁরই সহযোগী অমর সিংয়েরও তুলনা আজ পর্যন্ত এদেশে মিলল না। ফীল্ডিং-এ ১৯৩২ সালের টীম ছিল চমৎকার; বোধ হয় লাল সিং এ ক্ষেত্রে ছিলেন সব চেয়ে কৃতী। নাজির আলী ব্যাট, বল এবং ফীল্ডিং তিন ব্যাপারেই ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। জহাঙ্গীর খাঁনের কৃতিত্বও ভুলবার নয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে সেই টীমের এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যাতে পরাজয়ও গ্লানি বহন করে আনত না।

ফাস্ট্ বোলিং সম্পর্কে আজকের ভীতি খারাপ লাগে এই জন্য যে এক সময় আমরা ফাস্ট্ বোলিংকেই পছন্দ করতাম, স্লো বোলিংয়েই কতকটা হতভম্ব হতাম। আমাদের বোলাররা অধিকাংশ ছিলেন 'মিডিয়ম্ ফাস্ট্' কিংবা 'ফাস্ট্'। এই সেদিনও শুঁটে ব্যানার্জি তাঁর গুণের পরিচয় দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। মনে আছে ১৯২৭ সালে আমাদের একমাত্র 'স্লো' বোলার (ভারতীয় টীমে) ছিলেন পার্শী মেহের হোমজী। আজ একেবারে ফাস্ট্ বোলিং ব্যাপারে আমাদের দুর্ভিক্ষ পড়ে গেছে। একটা অজুহাত শুনি যে পঞ্জাবের মতো উত্তরভারতীয় অঞ্চলে শীত বেশী বলে সেখানে মেহনতী ফাস্ট্ বোলারের সন্ধান পাওয়া সহজ, কিন্তু পঞ্জাবের একাংশ আজ পাকিস্তানে বলে আমাদের বিপদ ঘটেছে। এ কথা হয় তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, কিন্তু বিশ্বাস করা শক্ত যে বোম্বাইয়ের গরমে যারা ক্রিকেট খেলে এবং চমৎকার খেলে, তারা চেষ্টা করে জোরে বল দেওয়া আয়ত্ত করতে পারে না। মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে থেকে অনেক ভালো ক্রিকেটার এসেছে ; তারা পরিশ্রমী নয় তা বিশ্বাস করি না। পঞ্জাব ছাড়াও রাজস্থানে, কোন কোন তেলুগু ও তামিল এলাকায়, কুর্গের মতো জায়গায় প্রকৃত পরিশ্রমী, দীর্ঘকায় ব্যক্তির অভাব নেই ; তাদের মধ্যে বোলার খুঁজে পাওয়া যায় না? বাংলাদেশে আমরা অনেকেই হ্রস্বদেহ হতে পারি, কিন্তু শুঁটে ব্যানার্জিকে তো বাঙালীদের মধ্যে ব্যতিক্রম বলা যায় না। ফাস্ট বোলারের অভাবের কারণ আছে অন্যত্র, কিন্তু এ-বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তা কোথাও নেই, যাদের হাতে ক্রিকেট ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার রয়েছে সেই কণ্ট্রোল বোর্ডের তো নিশ্চয়ই নেই।

ক্রিকেটের ক্ষেত্রে পাকিস্তান যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তা দেখে একটু ঈর্ষা হলেও আনন্দ হয়। পাকিস্তান আর ভারত তো প্রকৃত প্রস্তাবে স্বতন্ত্র নয়। আজ সারা দুনিয়া থেকে বাছাই করা টীমে হানিফ মহম্মদ কিংবা ফজল মাহমুদ জায়গা পাবেন। ভারতের কেউ বোধ হয় পাবেন না (বর্তমানে অস্তমিত সুভাষ গুপ্তে কিংবা জাসু প্যাটেল কি চমক জাগিয়ে চলতে পারবেন ?)। তাহলেও পাকিস্তান যদি আগুয়ান্ হতে পারে তো ভারতের পিছিয়ে পড়ে থাকা নিশ্চয়ই অনিবার্য নয়।

খেলার ধারা সম্ভবত সব দেশেই আজ বদলেছে, আর তাই সর্বত্র অভিযোগ শোনা যাবে যে আগেকার মতো "stroke play" আর দেখা যায় না—

লার্‌উডের পিস্তল-ছোঁড়া বলের সামনে দাঁড়িয়ে চমৎকার মার দেখাতে যারা পিছপাও হত না, তাদের উত্তরাধিকারীরা যেন কেউ আজ নেই। হয়তো আজকের জীবন আগের চেয়ে জটিল বলে ক্রিকেটেও তার ছায়া পড়েছে—যে ইংলণ্ডে পেশাদার খেলোয়াড়রা বহু বৎসর ধরে খেলতেন, তাঁদের মধ্যেও যেন ক্লান্তি এসেছে, হব্‌সের মতো একাদিক্রমে খেলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আর মিলছে না, আর আমাদের নাইডু যে বৃদ্ধ অবস্থাতেও খেলেছেন (হয়তো আজও কোথাও খেলছেন) তা যেন একটা রহস্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া এককালে যাঁরা ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এখন তাঁরা আর নেই। ইন্দোরের সৈন্যবাহিনীতে নাইডু, মুস্তাক প্রভৃতি কাজ নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলার চর্চা করেছেন। ওয়াজির, নাজির প্রভৃতি ভূপালে কাজ করেছেন অর্থাৎ ক্রিকেট খেলেই অন্নদাতাকে তুষ্ট রেখেছেন। এই রাজা-বাদশার দল আর আগেকার অবস্থায় নেই ; বাংলাদেশে নাটোর আর কুচবিহারের কল্যাণে যে ক্রিকেটের উৎকর্ষ বাড়বে, তার সম্ভাবনা নেই। ক্রিকেটের সংবর্ধন উদ্দেশ্যে বিকল্প ব্যবস্থার তাই প্রয়োজন।

এ-ব্যাপারে বহুজনের যে আগ্রহ নেই তা প্রমাণ হয়েছিল যখন ঈড্‌ন্ গার্ডন্‌সের অদ্বিতীয় ক্রিকেট পিচ্ বিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু আবার যখন টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য রাত জেগে 'কিউ' করে টিকিট কেনার খবর আসে তখন মনে হয় যে আশা হারানো ভুল হবে। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে ভিড় লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে হুজুগপ্রিয়ের দল সেখানে জড়ো হয়েছে, সাজপোশাক আর চেহারার পারিপাট্য দেখা বা দেখানোই অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য, ক্রিকেট হল গৌণ। ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কারণে যাঁরা খেলার মাঠে ভিড় বাড়ান তাঁদের আটকে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু যাদের বাস্তবিকই ক্রিকেট বিষয়ে আগ্রহ আছে তাঁরা যদি একটু সচেতন হন আর তাঁদের সংখ্যা যদি ক্রমশ বাড়ে তো ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার হয়তো নয়।

সোসালিস্ট দুনিয়ার নেতা সোভিয়েট দেশ আজ টেনিসের মতো খেলাকে বুর্জোয়া বিলাস বলে উড়িয়ে না দিয়ে তাকে আয়ত্ত করে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে চলেছে। এক সময় ছিল যখন সত্যই সোভিয়েটের মতো দেশের পক্ষে টেনিস খেলা ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করে তার ব্যাপক অনুশীলনের ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। আজ সেদিন আর নেই। হয়তো অনতিবিলম্বে সোভিয়েট দেশে ক্রিকেটের প্রসার ও প্রগতি আমরা দেখতে পাব। ক্রিকেটের যদি

কোন একান্ত নিজস্ব সৌন্দর্য থাকে তো অবসর অপ্রতুল হলে সে খেলা কঠিন বলে তাকে বর্জন করা সমীচীন নয়। আমরা তো এমনই সমাজ চাই যেখানে সকলে পরিশ্রম করবেন কিন্তু সকলেরই যথেষ্ট অবসর থাকবে। সেই অবসর-সমৃদ্ধ নবসমাজে ক্রিকেটের মতো খেলার স্থান থাকবে না তো থাকবে কার?

এদেশের কন্ট্রোলবোর্ডের কুকীর্তির পরিচয় দিতে গেলে তো প্রকাণ্ড প্রবন্ধ ফাঁদার দরকার পড়ে। সাধারণের কাছে আজ তা অজানা নয়, কিন্তু পরিতাপ এই যে দুষ্কৃতি নিবারণ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে তেমন চেতনাও নেই, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে সে চেতনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা তেমন হয় নি। কিন্তু বোর্ডের তুচ্ছ ক্ষুদ্রতা নিয়ে আলোচনা আমার লক্ষ্য নয়। আশা এই যে ক্রিকেট ক্ষেত্রে যে মালিন্য আজ জমে রয়েছে তা যেন অচিরে অপনোদিত হয়। আরও আশা যে ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে আমাদের মন যেন জেগে ওঠে, রৌদ্রোদ্ভাসিত প্রান্তরে বহুজনের একত্রিত প্রচেষ্টায় সামান্য ক্রীড়নকের স্পর্শে নিখুঁত সৌন্দর্যের মায়া যখন রচিত হয় তখন আমাদের আবেগ যেন স্পন্দিত হয়ে উঠতে পারে, মনের প্রমোদ যেন শিল্পাস্বাদের মহিমাকে কথঞ্চিৎ বহন করে আনতে পারে।

ভ্রম সংশোধন

পৌষ সংখ্যায় সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় লিখিত কবিতাটিতে ভ্রমক্রমে ছাপা হয়েছে :

"অচৈতন্যে মধ্যরাত্রি। দীর্ঘদিন যন্ত্রণার দাহে
সে তো শুধু ভস্মরাশি। এতদিনে এলে তুমি!
হয়তো বা থাকবে না কোনো স্বপ্ন। মিছে তুমি এলে ভোরে
বিষাদিনী, বিষণ্ণশীকরে। ভাব নাকি এই মুখ।"

শুদ্ধপাঠ :

"অচৈতন্যে মধ্যরাত্রি। দীর্ঘদিন যন্ত্রণার দাহে
সে তো শুধু ভস্মরাশি। এতদিনে এলে তুমি! ভোরে
হয়তো বা থাকবে না কোনো স্বপ্ন। মিছে তুমি এলে
বিষাদিনী, বিষণ্ণশীকরে। ভাব নাকি এই মুখ।"

—সম্পাদক, পরিচয়

পুস্তক পরিচয়

অভিযাত্রী ॥ ননীমাধব চৌধুরী। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। চার টাকা ॥

স্বাধীনতা লাভের পর, আমাদের স্বভাবগত হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে 'চাঞ্চল্যময়' কয়েকটি উপন্যাস লেখা হল। স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিতে উপন্যাস রচনা করতে হলে ইতিহাস সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা, দেশ ও সমাজের অবস্থা সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও ইতিহাসের সূত্রকে সামাজিক অবস্থায় প্রয়োগ করতে যে গভীর দর্শন প্রয়োজন—তার কোনো কিছুই এ সব লেখায় বড় দেখা গেল না। মনে হল, এ শতাব্দীর প্রথম পর্বের গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের বিষয়ের নিমিত্ত একটি জলীয় প্যাচপেচে ভূমির সৃষ্টি করা। এ-সময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গোপাল হালদারের একদা ও পরবর্তীকালে ননী ভৌমিকের ধুলোমাটি।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী উনিশ শতাব্দীর শেষ থেকে স্বাধীনতা-লাভ পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী সুদীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী লিখতে বসেছেন। সুতরাং স্বভাবতই ইতিপূর্বে যথাক্রমে প্রকাশিত তাঁর 'রাজনগর', 'দেবানন্দ' ও 'স্ফুলিঙ্গ'-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত 'অভিযাত্রী' সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। আলোচ্য উপন্যাস চতুষ্টয়ের কালসীমা এই শতকের প্রথম উনিশ বৎসর। "বাংলায় তিন পুরুষ তরুণতরুণী এ গল্পের হিরো এবং হিরোইন।" এত বড় প্রচেষ্টার কোনো সমালোচনা এত ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়,—বর্তমান সমালোচকের একমাত্র কাজ—রোমান্স-প্রিয় বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি এমন একটি প্রচেষ্টার প্রতি আকর্ষণ করা, যাতে পাঠকের সুপ্ত বাসনা চরিতার্থ করে কৃতী হবার চাতুরি নেই, যাতে সমস্যাকে এড়িয়ে সুখপাঠ্যতার তারল্যে ডুববার কোনো ষড়যন্ত্র নেই—আছে গবেষকের গভীরতা, স্বদেশপ্রেমিকের আবেগ, ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ।

প্রথম উপন্যাস রাজনগরের প্রথমার্ধ লেখক উপক্রমণিকা হিসেবে ব্যবহার করেছেন, শেষার্ধের কাহিনী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের বরিশালের কনফারেন্স

পর্যন্ত বিস্তৃত। জমিদারপুত্র প্রসন্নের মারফত লেখক নৈপুণ্যের সঙ্গে যুগসন্ধির আদর্শ দ্বন্দ্বের (conflict of ideas) চিত্র এঁকেছেন। জমিদারের পুত্র ধর্মে ও নারীতে নিজের সন্তুষ্টি সন্ধান করে, অবশেষে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপরের অংশের নায়ক প্রসন্নের ভাই ইন্দ্র। লেখক বিশ্লেষণ করছেন—"প্রসন্নকে বুঝিতে রাজনগরের সমাজের কোনো অসুবিধা ছিল না, কিন্তু এই তিন বছরে যাহারা কিছু বড় হইয়া কৈশোরে ও যৌবনে পা দিল তাহাদিগকে বুঝিতে এই অসুবিধার অন্ত রহিল না।" বরিশাল কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের উপর জঘন্য দমননীতির তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা এ উপন্যাসের ইতিহাস অংশের ও ইন্দ্র-লক্ষ্মীর বিবাহ, দেবানন্দের জেল—এ উপন্যাসের কাহিনী অংশের সমাপ্তি।

পরবর্তী উপন্যাস দেবানন্দ। নায়কের সঙ্গে সঙ্গে লেখকও কলকাতার রাজনীতির ক্ষেত্রে এসেছেন। আর সেই সুযোগে সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন। নায়ক এখানে মিছিলের একজন মানুষ মাত্র। সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্, বেঙ্গলীকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আন্দোলন, কংগ্রেসের মডারেট ও এক্সট্রিমিস্টদের মধ্যে মত-বিরোধ, বঙ্গভঙ্গ, দেশে গুপ্ত-বিপ্লবী আন্দোলন, ধর্মকে রাজনীতির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার, হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ, সারা ভারত-ব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচেষ্টা, পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ—ইত্যাদি প্রসারিত সংকীর্ণ, গভীর-অগভীর নানা স্রোতের বর্ণনার শেষে মানিকতলা বোমার মামলায় ও দেবানন্দের আন্দামান নির্বাসনে উপন্যাস শেষ।

তৃতীয় উপন্যাস স্ফুলিঙ্গের সময় ১৯০৮ থেকে ১৯১৪। এ উপন্যাসের কাহিনীতে তারাপুরের দীননাথের পরিবার প্রথম এল। দীননাথের ভাই রঘুনাথ ১৯০৬-৭ সালের ধার্মিক বিপ্লবী, আর, দীননাথের মধ্যমপুত্র আদিনাথ ১৯১৪-১৯ সালের কর্মী-বিপ্লবী। মাঝখানে আছেন ব্রজনাথ—বুদ্ধিজীবী। বিশেষ করে ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ এই ছ-সাত বৎসর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন মডারেট-এক্সট্রিমিস্ট দলের বিরোধের ইতিহাস, পুরোনো পথে অবিশ্বাস অথচ নতুন পথ সম্বন্ধে অনিশ্চিতি. বিপ্লববাদের দিকে অনিবার্যভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঠেলে দিল। সুতরাং এ পর্বের প্রধান চরিত্র দুজন বুদ্ধিবাদী—ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্র, আর একজন গঠনমূলক কর্মী—ইন্দ্র। কাহিনী এগিয়েছে লক্ষ্মীর সন্তানের জন্ম ও ব্রজ-সরস্বতীর বিবাহ কেন্দ্র করে।

চতুর্থ উপন্যাস অভিযাত্রী ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের চেষ্টা ও ব্যর্থতা এবং ইণ্ডিয়া ডিফেন্স অ্যাক্টের বন্দীদের ডিটেনশন ক্যাম্পের জীবনকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে। সমান্তরালভাবে আছে তখনকার বাংলাদেশের আর একপ্রকার বুদ্ধিবাদী আন্দোলনের ধারা—ইবসেনি সোসিয়ালিজমের চর্চা। 'a new star, a bright star' মিঃ গান্ধীর প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শেষ।

এটি উপন্যাসের চুম্বক। চুম্বকও বোধহয় নয়। কারণ এই উপন্যাস চতুষ্টয়ের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখক তৎকালীন দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন খবরের কাগজের সংবাদ, সম্পাদকীয়, বিভিন্ন সরকারি কমিশনের রিপোর্ট উদ্ধার করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন। তার সার সংক্ষেপ সম্ভব নয়। ননীমাধববাবু প্রমাণ ছাড়া একটি লাইনও লেখেন না। আর সেই প্রমাণ এত যে, কখনো-কখনো মনে হয় লেখক বোধহয় গল্পের ছদ্মবেশে ইতিহাস বলছেন। আর এই তথ্য সন্নিবেশ লেখক করেছেন খুব কৌশলের সঙ্গে কখনো আড্ডা-মজলিশের কথাবার্তায়, কখনো দেশকর্মীর ডায়েরিতে, কখনো ঐতিহাসিক গবেষকের পাঠে। এত তথ্য ও তথ্য-সন্নিবেশের কৌশলের প্রতি লেখকের মনোযোগে মনে হতে পারে অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেন। অবশ্য তথ্য সন্নিবেশ করেই লেখক সরে যান নি ; তাঁর বিশ্বাসানুযায়ী বিশ্লেষণও তিনি করেছেন। সামান্য দু-একটা উদাহরণ দেয়া যাক।

"মডারেটরা বলছেন নৌরজী যখন স্বরাজ কথা ব্যবহার করেন (১৯০৬) তখন তাঁর মনে ছিল কলোনিয়াল সেল্‌ফ্‌ গভর্নমেণ্ট।...মডারেট দলের বক্তব্য—'Some day in the future there would be a compromise or treaty between ourselves and Englishmen and as a condition of that treaty we shall get colonial Self-Government'। ......মডারেট স্কুলের এই পজিশানকে ন্যাশনালিস্ট স্কুল চ্যালেঞ্জ করছে। ...ন্যাশনালিস্টরা কি করতে চান সে কথা শোন :—'The presentation of liberty to the people is the most important work of nationalism and national education, the destination of moderatism, the advocacy of boycott, the furtherance of forms of passive resistence are the accessories of this work....এই সম্ভাবনার কথা

মনে রেখে গভর্নমেণ্ট নিজেদের দল ভারি করবার চেষ্টা করছে। কেমন করে? রিফর্মসের লোভ দেখিয়ে··· 'The reforms confine with a bid for the sympathy of the landed aristocracy and indecently showy having of Muhammadan allegiance।' লক্ষ্যে পৌছুবার পর কি হবে এ নিয়ে নেশনালিস্টদের মধ্যে ছুটো দল দেখা যায়। প্রথম দলকে ···ইনটেলিকচুয়ালস বলা যায়···লেফট উইং হচ্ছে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার দল; তাদের মতে—সমগ্র বিপ্লব না হলে লক্ষ্যে পৌছুনো যায় না।"—এটি লেখকের বিশ্লেষণ পদ্ধতির একটি উদাহরণমাত্র। মনে হতে পারে এ-ও একরকমের তথ্য-সন্নিবেশই মাত্র। লেখক কোনো কারণ আবিষ্কারে বা সিদ্ধান্তে পৌছুতে ব্যগ্র নন। কিন্তু তথ্য সন্নিবেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

ব্যক্তি-চরিত্রের কথা নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। চরিত্রকে শ্রেণী-প্রতিনিধিত্বের ভূমিকায় না-এনে, পুরোপুরি ন্যারেশনের ভঙ্গিতে সমগ্র-সমাজকে চিত্রিত করার চেষ্টা লেখক করেছেন। ফলে ইন্দ্র-দেবানন্দ, লক্ষ্মী-সরস্বতী-ব্রজনাথ-সোমনাথ—প্রত্যেকেই ভালো। কিন্তু এর মধ্যে-ও লেখক শরৎ-সুন্দরীর চরিত্র এঁকেছেন। এই ধর্মভীরু হিন্দু বিধবা মেয়েকে জোর করে অত্যাচারী দারোগা স্বামীর ঘর করতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর জীবন থেকে তিনি শিক্ষা পেলেন। মেয়ের আত্মহত্যা, পুত্রসম দেবরের বন্দীদশায় মৃত্যু, মধ্যমপুত্রের নিরুদ্দেশে তিনি শেষে এমন অবস্থায় এসে পৌছলেন যে তাঁর ছোট ছেলেকে ভালোবেসে একটি মেয়ে তাঁর বাড়িতে এসে উঠলে তিনি তাঁকে বুক দিয়ে আগলালেন—কোনো সংস্কার বাধা দিতে পারল না।—ছোটখাট চিত্র অঙ্কনে ননীমাধববাবু পারদর্শী, মাত্র কয়েকটি রেখায় তিনি জগদ্ধাত্রীর বা লক্ষ্মী বা অলকার চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। অলকার চোখের ভারী পাতাকে লেখক নানা সময় নানাভাবে ব্যবহার করে নিজের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছেন। গান্ধীজির নতুন আন্দোলনের মুখে বর্তমান উপন্যাস সমাপ্ত। আমরা পরবর্তীকালের আরো জটিল, আরো বিস্তৃত ও আরও গভীর আন্দোলনের পরিচয় তাঁর উপন্যাসে পাবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করব।

দেবেশ রায়

একা এবং কয়েকজন ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশক। দাম দু টাকা।

সম্প্রতি কয়েক বছরে যাঁরা কাব্য রচনা করে বিশিষ্টতা লাভ করেছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। 'একা এবং কয়েকজন' তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন। কিন্তু এর মধ্যেই আধুনিক বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক (চতুর্থ?) পর্যায়ের প্রবণতা এবং আলোচ্য কবির স্বাতন্ত্র্যের আভাস সম্যভাবে উপস্থিত।

বাংলা কবিতার এ পর্যায়ের প্রধান কৃতিত্ব মনে হয় আঙ্গিকের দিকে। তরুণতম কবিও এখন আঙ্গিকের ব্যবহারে নিপুণতা, এমন কি অভিনবত্ব দেখাচ্ছেন। তিরিশ বছরের মনন-সাধনায় 'আধুনিক' কবিতা বাংলাদেশের একমাত্র কবিতা হয়ে উঠছে।

কিন্তু কাব্যপ্রকরণের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ ছাড়া এ পর্যায়ের কবিতা আমাদের সামনে নতুন কিছু উপস্থিত করেছে কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে। কবিতার ক্ষেত্রে আঙ্গিকের অভিনবত্ব যে কেবল আলঙ্কারিকেরই খোরাক জোগায় না, সে বিষয়ে আমি সচেতন। কেননা কবিতায় বক্তব্য বলতে যা বোঝায়, তা শুধু কবিতার দেহ অবলম্বন করেই উপস্থিত হতে পারে। এবং সেই কারণে আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যও অস্পষ্টভাবে হলেও নতুন বক্তব্যেরই আভাস দেয়; আর আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্তকেও আরো একটু প্রসারিত করে। কিন্তু কাব্য-পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন এসব ক্ষেত্রে যা হতে পারত তা যেন ঠিক হয় নি, কিসের যেন অভাব থেকে গেছে। এই অপূর্ণতার কারণ বক্তব্যের ক্ষীণতা বা তার তুচ্ছতা।

অথচ বিশেষ এক সময়ের কবিরা দল বেঁধে আমাদের হতাশ করেছেন, এমন অভিযোগও আজগুবি। তা যদি হয় তবে বুঝতে হবে সমাজের মধ্যেই কোনো অসুস্থতা দেখা দিয়েছে, যার ফলে সাহিত্যের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ দ্বিধাগ্রস্ত।

একালের বেশির ভাগ কবিই দেখা যাচ্ছে যন্ত্রণাবোধ, নিঃসঙ্গতা এবং হতাশার ভারে পীড়িত। আর এই জন্যেই তাঁদের বক্তব্যে এসেছে এক ধরনের শব্দময় বোবা অস্পষ্টতা, কখনো বা দায়িত্বহীনতা। আবার যৌবনের আহত আত্মাভিমানে কেউ কেউ হয়তো বেপরোয়া হয়ে উঠতেও ইতস্তত করেন না। কিন্তু তাঁদের উচ্চহাসির নিচেও যে কান্নার আভাস খেলে যায়, তা আমাদের কান এড়ায় না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় এই যুগলক্ষণগুলি কমবেশি প্রায় সবই উপস্থিত। প্রধান পার্থক্য এই যে তিনি দায়িত্ববান কবি। আর এই দায়িত্ববোধের ফলেই যন্ত্রণার মরুভূমিতে আত্মসমর্পণ না করে তিনি বলতে পারেন।

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও গভীরে যাও বুকের হলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভরে, তবু ফেরাও মুখ
গভীরে যাও গভীরে যাও দুহাতে ধরো আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

কিংবা প্রাথমিক 'প্রার্থনা'য়—

আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হব তিমির শিকারে
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।
অথচ সমরাহত আপাত বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে
বর্তমান ভীত চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।

দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি স্তব্ধ করে কালচিহ্ন ভবিষ্য অপার
হৃৎস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝঙ্কার।
নির্মম মুহূর্ত ছুঁয়ে বাঁচার বঞ্চনা স'য়ে স'য়ে
আমাকে স্বাক্ষর দাও নবীন যৌবন, সমারোহে।

এ থেকে কবির মূল প্রবণতা কোন দিকে তার হদিশ পাওয়া যায়। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু সরল ভাষায় প্রার্থনা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। জীবনের জটিল পথে নেমে সংকল্প ও সিদ্ধির মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান তাও কিছুটা পরখ করেছেন। তাই কখনো তিনি 'আত্মকাহিনী'র বেনামে বলেন—

চোখের আড়ালে এসে চলে যায় বর্ষা শরৎ
যাকে চাই তাকে ভুলে গিয়ে শুধু খুঁজে ফিরি পথ।

কখনো বা দূরস্থিত মধ্য বয়সের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—

রক্তে আর তেজ নেই, দুচোখে সমুদ্র আরো গভীর অতল,
নীলের নেশায় ডুবে—সে শুধুই পেল অশ্রুজল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি অভীপ্সায় তিনি অবিচলিতভাবেই বলতে পারেন—

তোমার হাতে তুলে দিলাম এতদিনের ক্লান্তি
এবার পাবো দিনের স্বাদ রাতের হিমস্পর্শ
আমাকে দাও দুঃখ, দাও দুঃখময় হর্ষ
তোমাকে জানি, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি।

উপরের আলোচনা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো একটি গুণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। সে হল তাঁর স্পষ্টতা। বক্তব্যের স্থিরতা থেকেই অবশ্য তাঁর এই স্বচ্ছতা এসেছে রচনায়, কিন্তু অনেকগুলি কবিতায় তিনি গল্পের কাঠামো ব্যবহার কারছেন এও অন্যতম কারণ। নিছক আবেগ বা মনোভাব নির্ভর কবিতার পাশাপাশি এ ধরনের গল্প আভাসিত কবিতার চর্চা করে লেখক নিজের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আরো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন। 'বিবৃতি' নামক কবিতাটি বলিষ্ঠতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং আমাদের আত্মপ্রতারণার প্রতি কশাঘাতে অনন্য। কিন্তু এই কবিতারই পাল্টা দিকের ছবি 'পিপাসার ঋতু' কেমন ফিকে ফিকে লাগে।

আসলে প্রেমের ব্যাপারে সামাজিক সুবিচারের বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ থাকলেও, প্রেমপ্রার্থী ও প্রেমাস্পদার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহিলাটির অসুবিধার বিষয়ে তিনি সচেতন বলে মনে হয় না। প্রেমাস্পদাকে তাই তিনি বলেন,

…সুকুমার মৃণাল-শরীরে
ফোটালে বিষাক্ত পদ্ম ছদ্মবেশী মাধুর্যেতে মেশা
অনায়াসলভ্য মণি রেখে দিলে দুর্গ দিয়ে ঘিরে।

কিংবা প্রেমিকার প্রেমহীন আত্মদানের বিষয়ে বীতরাগ হয়ে 'শীত কি ছুঁয়েছে তাকে' প্রশ্ন তুলেও ছবি আঁকার সময়ে মনের ব্যাপারে কান না দিয়ে নিজেই দেহের বর্ণনায় সরস হয়ে ওঠেন—

প্রেয়সীর নাম বলবো, সে হয়তো ঘুমন্ত এখন
একলা ঘরে, বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখ ঈষৎ রক্তাভ,
ত্রস্ত বেশ, নিঃশ্বাসের সঙ্গে দুলছে দৃঢ় দুটি স্তন ;
আমি তো এখনি তাকে, ইচ্ছে হলে দুই হাতে পাবো।

এই অনুরাগ-অভিমানের টানাপোড়েন এবং তীর্যক ভাষণের বৈদগ্ধ্য বয়ঃসন্ধিরই অবদান। এ সব বৈপরীত্যকে ছাড়িয়ে এলেও প্রেমের সমস্যা সরল হয়ে যায় না, কেননা প্রেম আমরণ সাধনার ধন। প্রেমের এই সঞ্জীবনী ক্ষমতার বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও যে অবহিত তার প্রমাণ, প্রেমের অভাবে 'এ যুগের হুলুস্থুল দানবী প্রতিভা'ও ঠাণ্ডা পেয়ালার মত পড়ে থাকে তা তিনি জানেন এবং অন্যত্র অগাধ আন্তরিকতার সুরে বলতে পারেন :

মধ্যরাত্রে মাতালের মত ঘোরে দুরন্ত বাতাস
স্খলিত গানের মত ঠিক্‌রে ওঠে রাতপাখির ডাক
শিয়রের পাশে যেন জেগে বসে আছে সর্বনাশ
অনুগত মার্জারের মত নীল চোখ স্তব্ধ-বাক।

তোমার শরীরে ঘুম তুষারের স্তূপের মতন
গলে যাও মূর্তিমতী জীবনের শান্তির নির্ঝরে
বুক থেকে একটি শুভ্র সূর্যমুখী করো সমর্পণ
আমাকে বাঁচাও তুমি হত্যাকারী অন্ধকার ঘরে।

এ আকুতি যদি তিনি জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন, অদূর ভবিষ্যতেই তাহলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি পালনের গৌরব অর্জন করবেন।

মণীন্দ্র রায়

পত্রিকা প্রসঙ্গ

একতা ১৯৫৯॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা। সম্পাদক : সুনীল ঘোষ, দ্বিজেন ভট্টাচার্য, সঞ্জয় চন্দ্র ॥

'একতা' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের দিবাবিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত বার্ষিক মুদ্রিত সঙ্কলন। বাংলা দেশের এই বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রীদের মানসিক উত্তরাধিকার, সৃজনশীল মনীষার উৎকর্ষ এবং তৎসহিত রুচি, অনুরাগ ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রকাশ এই বার্ষিক সঙ্কলনে পাওয়া গেল। পত্রিকাটিতে বাংলা, ইংরাজি, হিন্দী ও উর্দু বিভাগ আছে। বাংলা বিভাগটিতে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে চিন্তার মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। অরুণ সেন, দ্বিজেন ভট্টাচার্য ও পদ্মনাভ দাশগুপ্তের নিবন্ধগুলি পাঠ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুশিও হওয়া যায়। এই প্রবন্ধগুলি ছাড়াও, অন্যান্য কিছু রচনা রয়েছে, যেগুলি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত দেখলে আশ্চর্য হতাম না। বাংলা প্রবন্ধে ভাষা বিষয়ক কিছু নিরীক্ষাও চোখে পড়ে, তবে কখনও কখনও ছাত্রপত্রিকাসুলভ তারল্যও লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের যে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ করবার সীমাবদ্ধ অধিকার পান, তাঁরা যে অবহেলায় তা বিনষ্টে ব্রতী নন, তাঁদের মুখপত্রের চিন্তাশীল রচনাগুলিই তার প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মনীষা বিষয়ে একশ্রেণীর ব্যক্তিদের যে নিয়মিত কুৎসা প্রচার চলেছে, প্রবন্ধগুলি তার মূর্ত প্রতিবাদ বলে মনে হবে। কবি হিসাবে উৎপলকুমার বসু, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং গল্পলেখক হিসাবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ প্রভৃতি পূর্বেই আমাদের পরিচিত। প্রাসঙ্গিক বিভাগে বিভিন্ন মূল্যবান প্রসঙ্গ আলোচনায় দীপেন সেনগুপ্ত (শিশিরবাবু ও তুলসী লাহিড়ীর তিরোধানে), কে. জে ক্লিস্টাস (এপস্টাইন প্রসঙ্গে), দিলীপকুমার নন্দী (রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী), সুভদ্র সেন (বিষ্ণু দের পঞ্চাশ বছর পূর্তি), অরুণ সেন (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের 'পরবাসী' কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে) বিভিন্ন নাতিদীর্ঘ সন্দর্ভ

রচনা করেছেন। কখনও কখনও এ বিভাগে আড়ষ্ট বাংলা ছাড়া আলোচনা-গুলি পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে।

ইংরাজি বিভাগে নিবন্ধগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাকাডেমিক জীবনের ছাপ পড়েছে। তবে শ্রীমতী কেতকী কুশারী-কৃত জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ যথার্থই উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলি, প্রচ্ছদপদ ও রচনা সাজানোর মধ্যে কোনও একটি বাংলা ত্রৈমাসিকের প্রভাব যেন বড় বেশি চোখে পড়ে। পূর্ব-সম্পাদকের তালিকা হঠাৎ তুলে দেওয়ার অর্থ বোঝা গেল না।

কিন্তু সবশেষে পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের তুলির কাজ ও বিভিন্ন রচনা নিয়ে উপস্থিত এই সঙ্কলনটির সম্পাদনার কাজে সম্পাদক তিনজনকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়।

তরুণ সান্যাল

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

বর্ষীয়ান্ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যিক-সমাজের একটি সম্মানিত স্থান শূন্য হয়ে পড়ল। বয়স হলেও উপেন্দ্রবাবু সাহিত্যের সকল আহ্বানেই সাড়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, আর তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবস্থার ও মজলিসী মেজাজ নতুন কালের কাছে পুরনো দিনের হাওয়া বহন করে আনত। ওকালতি ত্যাগ করে তিনি 'বিচিত্রার' সম্পাদক রূপে কলিকাতায় এসে অধিষ্ঠিত হন। 'বিচিত্রার' অন্যান্য লেখকের মত আমারাও তখনি তাঁর মধুর ব্যবহারের পরিচয় পাই। বাঙলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিচিত্রার' প্রকাশও একটা তুচ্ছ ঘটনা নয়—যদিও 'বিচিত্রা' আজ অতীতের অধ্যায়। ইদানীং তিনি সম্পাদনা করতেন 'গল্প ভারতী'। তবু 'রাজপথ' প্রভৃতি উপন্যাস ও স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে উপেন্দ্রনাথের পরিচয় একালেও থাকবে। কিন্তু সভা-সমিতিতে একটি শূন্য আসন মনে পড়িয়ে দেবে। তিনি আর নেই।

ভারতবিদ্যার পণ্ডিত-জ্যেষ্ঠ এল, ডি, বার্নেট্-এর ৮৮ বৎসরে মৃত্যু হয়েছে। যেদিন কলিকাতায় এ সংবাদ আসে তার পূর্বদিন (১লা ফেব্রুয়ারি) এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সভায় তাঁকে পদক উপহার দেওয়া হয়—এইটুকু আমাদেরই পক্ষে ভাগ্যের কথা। ভারতবর্ষের বর্তমান ভারতবিদ্যাবিদ্ কৃতী পণ্ডিতরা অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র—ডাক্তার সুশীলকুমার দে, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এই অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও শিষ্যহিতৈষণার কথা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করেন। অধ্যাধক বার্নেট্ বহু মূল গ্রন্থের সম্পাদক; ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি বিভাগের সংরক্ষক হিসাবে পুস্তক তালিকার সঙ্কলয়িতা, ইউরোপীয় ও হিব্রু ভাষা ছাড়াও ভারতীয় বহুভাষা বিশেষ করে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। ভারতবাসী আজ নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কারে প্রায় স্বপ্রতিষ্ঠ; তথাপি এই পূর্বগামী ও সহগামী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট চিরদিনই আমাদের ঋষিঋণ স্বীকার করতে হবে।

ধর্মাশোকের পথে

সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি ভরোশিলফ ও মন্ত্রী কজলফ ও ফুর্ৎসেভা প্রতি সোভিয়েত নেতৃগণের সম্বর্ধনায় নয়াদিল্লী উৎসব মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কলকাতা বুলগানিন-খ্রুশ্চফের সম্বর্ধনার মত বিরাট অভিনন্দনোৎসবে এ সময়ে উদ্বেলিত হবার অবকাশ পায় নি, সে কৃতিত্ব পশ্চিম বাঙলার সরকারী উৎসব উদ্যোক্তাদের। 'মিছিলের শহর' কলকাতার বাড়াবাড়ি তবু যে একেবারে বন্ধ হয় না, তার প্রমাণ সেদিনের দমদম থেকে রাজভবন পর্যন্ত ফুটপাতের জন-সমাবেশ।

পৃথিবী-ব্যাপী মানুষের দৃষ্টি আজ সোভিয়েত নেতৃত্বের উপর। যাঁরা স্পুৎনিক-লুনিকের অধিকারী তাঁরা স্বেচ্ছায় সর্বাঙ্গীণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উত্থাপণ করছেন, এবং অপর শক্তিদের অপেক্ষা না রেখে নিজেদের সৈন্যসংখ্যাও হ্রাস করছেন। অবশ্য এ ব্যাপারেও সোভিয়েত দুরভিসন্ধির সন্ধান পাওয়া মোটেই সন্ধানীদের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। যেমন, ধ্বংসাস্ত্রের যে ধারায় উন্নতি সাধিত হয়েছে, তাতে সৈন্য পোষণ বাহুল্য হয়ে পড়ছে। অস্ত্রপণ্ডিতেরা—ও কাগুজে পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এ গবেষণা করছেন, সাধারণ মানুষ ততক্ষণ জিজ্ঞাসা করে—মারণাস্ত্রের উন্নতি সোভিয়েতেই শুধু সাধিত হচ্ছে এমন নয়। তথাপি দ্য-গল্-এর মত দেউলে জাতির কর্তারাও সাহারায় আণবিক বোমা ফাটাচ্ছেন কেন? যে-বুদ্ধি সোভিয়েতে হচ্ছে, সে-বুদ্ধি আমেরিকা ও তার পোষ্যদের হয় না কেন? আডেনাউর-এর দেশে আসে না কেন?

অশোক ব্যতীত পৃথিবীতে কোনো বিজয়ী সম্রাটের কথা শোনা যায় না যিনি শক্তির অধিকারী হয়েও যুদ্ধ চিরতরে বর্জন করেছেন। তবে পৃথিবীতে এমন শক্তিধরের কথাও জানা গেল যাঁরা অস্ত্রত্যাগ করে বিশ্বশান্তির ও বিশ্বমৈত্রীর জন্য উদ্যোগী। অনেক অহিংসার গবেষণার অপেক্ষা এই অতি বাস্তব শান্তির প্রয়াস যদি আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নয়।

সিক্যুলারি পরীক্ষা

অধিক আশান্বিত হবার মত কারণ নেই, বর্ষান্তে জার্মানি, ব্রিটেন, আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত য়িহুদী প্রার্থনাগৃহের গায়ে ও য়িহুদী সমাজ-ভবনে

'স্বস্তিকা' ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানের করাচীও তাতে পিছনে যায় নি, তাও লক্ষণীয়। পশ্চিম জার্মানির শাসক-গোষ্ঠীতে পুরাতন নাৎসি কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং সৈন্য বিভাগে হিট্‌লারী বীরেরা নায়কত্ব লাভ করেছে। আর যাই হোক, যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের বিরাগের চিহ্ন দেখা যায় না; 'জাতি-বিদ্বেষের' বিষয়েও তাদের অরুচি ধরেছে এমন মনে হয় না। পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে সংযোগ যতই বাক-বিস্তার দৌলতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই যোগকে বিয়োগে পরিণত করার কৌশল সে পরিমাণে কমছে না। আত্মবিরোধও এ সভ্যতার একটা মূল সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার তা স্বীকার করতেই হবে। হয়তো সংস্কৃতিরই বেশি দুর্ভাগ্যের কথা। মানুষের মনুষ্যত্ব ক্ষণে ক্ষণেই বিকারগ্রস্ত হয়। আজকের সাময়িক সোভিয়েত-প্রীতি কালই যে চীন-ভীতির মত কোনো দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে ভারতবাসীর মনকে আবার সন্দিগ্ধ ও বিষাক্ত করবার চেষ্টা করবে না, তা কে বলবে? এই তো ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নায়কেরা ক্যাথালিক চার্চ ও মোস্‌লেম লীগের ধর্মান্ধতার নিশান উড়িয়ে কেরলায় ধর্মহীন কমিউনিস্টদের জনসমর্থন কেড়ে নিতে না পারলেও—ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কেরলকে সিক্যুলারিটির ভারমুক্ত করেছেন। ভারতবর্ষ শুধু 'ধর্মের' দেশ নয়—'ধ্যানের'ও দেশ; অতএব যীশু ও আল্লা, 'মোস্‌লেম লীগ' ও 'জনসঙ্ঘ', 'কংগ্রেস' ও 'পি-এস্‌-পি', সবই যদি পদ্মনাভনের নেতৃত্বে ভারত-ব্যাপী ধর্মরাজ্য স্থাপনে এবার অগ্রসর নাও হন, তবু 'ধর্ম' ও 'জাতের' জয়যাত্রা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে পুনরারম্ভ হচ্ছে।

রাজনীতিক ফলাফল যাই হোক, ভারতবর্ষে সংস্কৃতির পরীক্ষা ঘনিয়ে উঠছে, তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই।

গোপাল হালদার

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—সত্য গুপ্ত ; ভারতীয় ; ২৯, নর্থ রেঞ্জ, কলকাতা-১৭

৪। প্রকাশক—„ „ „ „ „ „ „

৫। সম্পাদকদ্বয়—(ক) গোপাল হালদার ; ভারতীয়
(খ) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; ভারতীয়
২৬।৩ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মুলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা ঃ—

১। গোপাল হালদার, ফ্লাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা ১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৩৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলকাতা ৪ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা ১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা ২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা ২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৩ ফার্ন রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা ১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ঈস্ট রোড, যাদবপুর কলোনি, কলকাতা ৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩১এ লেক্ অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৬ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা ১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ৭এফ রিমাউন্ট রোড, কলকাতা ২৭ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা ২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, ৯৭, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা ১৯ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলকাতা ১৯ ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, ১৪এ।৭৯

ওয়েস্টার্ন এক্সটেনশন এরিয়া, নয়াদিল্লী ৫ ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস কলকাতা ২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি ফিরোজ শাহ্‌ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা ৬ ॥

সূচীপত্র

২৯শ বর্ষ ॥ ফাল্গুন, ১৮৮১ ; ১৩৬৬ ॥ ৮ম সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

২৯ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
ফাল্গুন ১৮৮১ ; ১৩৬৬

নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ

লুই আরাগঁ

[১৮১৫ সালের ১৯শে থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্সে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এই সময়ে নেপোলিয়ন এলবা থেকে ফিরে পারী শহরে প্রবেশ করলেন এবং অষ্টাদশ লুই পালালেন উত্তর দিকে। এই সপ্তাহের ঘটনাবলী নিয়ে লুই আরাগঁ "La Semaine Sainte" বা "পবিত্র সপ্তাহ" নামে একটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। ফ্রান্সের সাহিত্যিক মহল এক বাক্যে আরাগঁর উপন্যাসটিকে মহৎ সাহিত্যকীর্তি বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। "পারী সাহিত্য পত্র" কাগজে মোরিয়াক লিখলেন : "এই বই লিখে আরাগঁ আবার সাহিত্যিকদের মধ্যে ফিরে এলেন ; ত্রিশ বছর ধরে পার্টি ফ্রান্সের একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চিন্তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল ; আরাগঁ যে কমিউনিজম বর্জন করেছেন এমন নয় তবে তিনি এবার পার্টি থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।" মোরিয়াকের কথাই কি ঠিক ? আরাগঁ পার্টির অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন এবং আর্টের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বর্জন করেছেন বলেই কি তাঁর এই সাহিত্যিক সাফল্য ? বর্তমান প্রবন্ধে আরাগঁ নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রবন্ধটির ইংরাজী অনুবাদ বেরিয়েছে "Mainstream" পত্রিকায়। প্রবন্ধটির মাঝের অংশে আরাগঁ নিজের বিভিন্ন লেখা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকিটার অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হল। আশা করা যাচ্ছে, আরাগঁর বক্তব্য কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট, সকলকেই ভাবিয়ে তুলবে।—সম্পাদক]

অনেক লেখক আছেন যাঁরা লেখেন এমনভাবে যেন তাঁরা কখনও ভুল করেন নি। এঁরা অবশ্য নানা জাতের। কারুর লেখার ভাবখানা এমন যেন তাঁদের লেখার ভিতর দিয়ে পরম পিতা ঈশ্বর স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করছেন ; কেউ কেউ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, নিয়তি তাঁদের গলায় সাহিত্যিক জীনিয়াসের বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছে ; আবার কেউ কেউ কমিউনিজম সম্বন্ধে এমন ভঙ্গিতে লেখেন যেন তাঁরা একেবারে জেনে ফেলেছেন কমিউনিজম কি ছিল, কি হয়েছে এবং কি হতে চলেছে। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একমত নন, তাঁদের সম্বন্ধে এই সব লেখকদের মনে আছে অবজ্ঞা, কৃপাদৃষ্টি। অন্যের লেখা যে তাঁরা পড়েন এমন নয়—কী দরকার পড়ার!

পাতা উল্টেই তাঁরা নির্ঘাৎ বুঝে ফেলেন অপরাপর লেখকরা কি ভাবছেন।

এই ভাবভঙ্গি আমার কাছে অগ্রাহ্য। বহু লোক বহু পথ ধরে আলোর দিকে যাত্রা করে চলেছে ; কেউবা চলেছেন ভীরু পদক্ষেপে, কেউবা চলেছেন পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ে ভরা শক্ত পা ফেলে। এঁদের সকলের সব পথ সম্বন্ধেই আমার কৌতূহলের অন্ত নেই। এও বিশ্বাস করি যে, আমি যতটুকু যা সত্যদৃষ্টি লাভ করেছি, তারও কোনো মূল্য নেই যদি আমিই কেবল হই তার এক ও অদ্বিতীয় অধিকারী। চক্ষুহীনদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলে গর্ব অনুভব করা দূরে থাক, আমি মনে করি যে, এমন দৃষ্টিশক্তির কোনো মূল্যই নেই যার কোনো ভাগীদার নেই।

নতুন গলার আওয়াজ আমি কান পেতে শুনি। যা কিছু ঘটছে সাহিত্যে —যেটা আমার পেশা—সে সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ অসীম। আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক মানুষই লাভ করেছে কোনো না কোনো খণ্ডসত্য এবং সত্যের সেই বিশেষ খণ্ডটিকে আমি না পেয়ে থাকতেও পারি। প্রত্যেক মানুষই চলেছে সত্যের দিকে তার নিজস্ব চলনে, এবং যদিই বা চোখে পড়ে তার পদস্খলন, তৎক্ষণাৎ স্মরণ করি নিজে কত ভুল পা ফেলেছি এবং এখনও কত ভুল পা ফেলতে পারি।

শুধু নিজের চিন্তা সম্বন্ধেই কুতূহলী হওয়া যদি আমার কাছে অর্থহীন হয়, আরো কত বড় পাগলামি হবে এই বিশ্বাস যে, আর একজনের চিন্তা একেবারে খাঁপে খাপে মিলে যাবে আমার চিন্তার সঙ্গে। জগৎকে এইভাবেই দেখি যে, জগতের মূলে রয়েছে বিপরীত জিনিসের বিরোধ। এটি এমন সব নরনারীর জগৎ, যাদের পরস্পরের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে, যারা জানেই না তারা নিজেরা কি, যদি না অপরের সহিত তাদের বিরোধ বাধে। এ জগতে ছায়া ছাড়া আলো নেই। সুতরাং আলোছায়ার খেলা যে বইয়ে নেই, তার কোনো মানেই হয় না। এমন বই না খোলাই উচিত। প্রাণহীন, শিলীভূত চিত্রের দ্বারা মানুষের আত্মাকে ভোলাতে যাওয়ার মতো বিপজ্জনক কাজ আর কিছুই নেই। এই যদি চান যে, আপনাকে অবিরত কেবল ভরসার কথা শোনানো হবে—এমন সব কথা যা আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগাবে না এবং যে-সব কথা আপনি আগে থাকতেই জেনে নিয়েছেন— তাহলে আমাকে দিয়ে আপনার চলবে না। কয়েক শত পৃষ্ঠার মধ্যে যে

সাহিত্য জীবনের সব কিছু বিপদ, আপদ ও সমস্যাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তাকেই তো বলে ইউটোপীয় সাহিত্য। ইউটোপীয়ত্ব বড় ছলনাময়। ওটা লোকেদের ঘুম পাড়ায় এবং ঘুম ভেঙে যখন তারা বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের অবস্থাটা হয় সেই সব স্বপ্নচারীদের মতো, ঘুমের ঘোরে যারা একেবারে ছাদের কিনারার কাছে এসে পড়েছে এবং ছাদ থেকে পড়ে যাদের নির্ঘাৎ মৃত্যু।

গত পঁচিশ বছর ধরে আমার এই অহঙ্কার চলে আসছে যে, সমাজ সম্বন্ধে আমার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটা যে রকমের, অর্থাৎ আমি যেমন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, বাস্তববাদী আর্ট সম্বন্ধে ঠিক তারই অনুরূপ একটা ধারণা আমি পোষণ করি। এই ধারণাটিকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ। এটি এমন একটা ধারণা নয় যার কোনোদিন কোনো নড়চড় হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ কাকে বলে? যদি এই প্রশ্নের শেষ ও চিরন্তন উত্তর চান, তাহলে এ বিষয়ে প্রচলিত সূত্রগুলিকে মুখস্থ করতে হবে। কার্যতঃ দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ জিনিসটিকে হরেক রকমে ব্যাখ্যা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে এই নাম নিয়ে যা লেখা হয় তা বেশ একটু খেলো ধরনের বাস্তববাদ—কিংবা হয়তো মোটেই বাস্তববাদ নয়। তা হয়ত একটা ফটো তোলার কায়দা, একপ্রকার প্রাকৃতিকবাদ; অথবা বলা যায় তা লোককলার একটা খেলো সংস্করণ এবং তারই গায়ে লেখক জুড়ে দেন "খাঁটি শ্রমিক"-এর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একটা তথাকথিত কমিউনিস্ট সুনীতি। সম্প্রতি এক প্রবন্ধে Pierre Daix বেশ চমৎকার ভাবে এই ধরনের বইকে বর্ণনা করেছেন "বাৎসল্যপরায়ণ" বলে।

এই রকমের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ আমার জন্য নয়। আমার কারবার সেই সব মানুষ নিয়ে যাদের ভাগ্য নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, যাদের মন আগে থাকতেই ওই জিনিসটা মেনে নেয় নি যেটাকে তারা মনে করে রাজনৈতিক প্রয়োজন বলে। যে সব বই মোটেই এ রকম ভান করে না যে তারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই সব বইয়েই আমি এমন সব জিনিস খুঁজে পেয়েছি যেগুলিকে অবিকল সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আলোয় পরীক্ষা করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং নিজেকে বাড়াতে পেরেছি। আমার সব কিছু বিশ্বাসের ফলে যেটিকে আমি সকল আর্টের শেষ লক্ষ্য বলে মনে করি, সেই সমাজতান্ত্রিক

বাস্তববাদের দিকে এই সব বইই আমার বিচারশক্তিকে চালিত করেছে। যে পথের সন্ধান করছি তা খুঁজে পেতে যে লেখক অজ্ঞাতে আমাকে সাহায্য করছেন, মতামতের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো মিল না থাকতেও পারে; এমনকি তাঁর ধ্যানধারণা হয়তো আমাকে শত্রুর মতো আঘাত করতেও পারে।

বড় দুঃখ হয় তাঁদের দেখলে যাঁরা নিজের ধ্যানধারণা ছাড়া অন্য কিছু বইয়ের মধ্যে দেখলে সইতে পারেন না, যাঁরা বিরোধী ধ্যানধারণার মধ্যে এমন কিছু পান না যা তাঁদের নিজেদের ধ্যানধারণার প্রসার ঘটাতে পারে। এমন সব লোক আছেন যাঁরা ছোট্ট একটা মোলায়েম, নির্বিরোধ জগৎ গড়েন। তাঁরা চান ভিন্ন মতের বই একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে শুধু ইউটোপিয়া সম্বন্ধে বই পড়তে। এতে করে শুধু সাহিত্যই নয়, মানুষের চিন্তার পদ্ধতিটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেখানটায় লেশমাত্র মতভেদ নেই সেখান থেকেই যদি সাহিত্য শুরু করতে হয়, শুধু এমন সাহিত্যই যদি চাই যা মত ও পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবে না, তাহলে কেবল স্বমতালম্বীদের জন্যই লেখকদের লিখতে হবে। তাহলে শ্রেণী-স্বার্থের অতিশয় তর্কাধীন সাফাইয়ের আড়ালে সাহিত্যের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে, তার বিশ্ব-সম্পৃক্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

একথা বলছি না যে, সাহিত্যে কদাচ শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত নয়। সাহিত্যিকদের রচনায় সর্বদাই একটা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। প্রশ্নটা শুধু এইটুকু যে, শ্রেণীটি কোন্ শ্রেণী। কিন্তু লেখকের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এমন সব মূল্য সৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, যা তাঁর শ্রেণীসীমানার বাইরেও স্বীকৃতিলাভ করবে। বুর্জোয়া সাহিত্য এমন অসংখ্য বই সৃষ্টি করেছে যেগুলি সেই সব নরনারীর মনে মূল্যবান প্রেরণা জুগিয়েছে যাঁরা মোটেই বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক নন। এর উল্টোটাও কেন যে না ঘটবে তার কোনো কারণ নেই। দুই ক্ষেত্রেই রচনাটির জাতীয় চরিত্রই হবে তার মূল্যায়নের মাপকাঠি। রচনাকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে জাতীয় সাহিত্যভূমিতে স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ সার্থক সাহিত্য সমসাময়িকদের সহিত সম্পর্কবিহীন কোনো পরম পুরুষের লেখা নয়। সমসাময়িক সাহিত্যের গর্ভ থেকে এবং জাতির সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকেই ভাল বই জন্মায়। যে লেখক অল্প বুদ্ধির বশে সাহিত্যের জাতীয় জন্মভূমির সহিত নিজের লেখার

বিচ্ছেদ ঘটতে দেন, তিনি অপরাপর লেখকদের স্বার্থকে নয়, নিজের স্বার্থকেই আঘাত করেন। যে পরিবেশে শ্বাসগ্রহণের দ্বারা শিল্পকৃতি বেঁচে থাকতে পারে, তার থেকে যে লেখক নিজেকে বঞ্চিত করেন, তাঁকে দেখে মনে হয় যেন জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠে খাবি খাচ্ছে।

অতীতে সাহিত্যের যে সব শাখা গড়ে উঠেছিল তারা প্রত্যেকেই নিজেদের এক-একটি অচলায়তন রচনা করেছিল। যা কিছু নিজেদের সঙ্গে মিলত না তাকেই তারা নরকস্থ করত। ঘরের লোক ছাড়া বাইরের সবার সঙ্গেই চলত তাদের বিবাদ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এই রকম অচলায়তনের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না। এইখানটায় সাহিত্যের অতীত শাখাগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই চলতে পারে এবং নিজের বিরোধী জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে, এমনকি, আত্মস্থ করতেও তা সক্ষম। কেননা কোন বিশেষ স্টাইলের জয়লাভের পরিবর্তে জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের লক্ষ্য। আমি জানি যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের বড়াই করেন তাঁরা অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন না—কিন্তু এ বিষয়ে আমি অসহায়।

আমার মতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে এইভাবে দেখা ছেলেমানুষী যেন একটি যুধ্যমান শিল্পপদ্ধতি নিজের চারিপাশে ব্যূহ রচনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি গণ্ডীবদ্ধ নয়। আমার বিশ্বাস যিনি এই শিল্পপদ্ধতির অধিকারী বলে গর্ববোধ করেন, তাঁর উচিত এই পদ্ধতির সাহায্যে নিজের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করে তোলা। তা করতে গেলে এমনটি চলবে না যেন নিজের বেড়া দেওয়া একটুখানি জমিতেই বিচরণ করছি। সর্বসাধারণের জন্য যে জমি রাখা হয়েছে তার যেখানে যেখানে উৎকৃষ্ট তৃণের সম্ভাবনা বিদ্যমান, সর্বত্র বিচরণ করতে হবে—অবশ্য গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে সর্বদা সবিচারে কিছু বর্জনও আবশ্যক।

সাহিত্যের অভিযানে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অগ্রণী বাহিনী কিন্তু তাই বলে মনে ভাববেন না যেন অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আপন এবং "পর", এই দুই ভাগে যদি সাহিত্যকে ভাগ করেন তাহলে সাহিত্যের জীবন্ত দেহটার অঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটবে এবং আপনি যে বাহিনীটার বড়াই করছেন, তা হয়ে পড়বে একটি কর্তিত ও মৃত অঙ্গ বিশেষ। সাহিত্যের

অগ্রণী বাহিনীর সঙ্গে সমগ্র সাহিত্যের যোগসূত্র যদি ছিন্ন করে দেন, তাহলে যাঁরা অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখছেন এবং যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সহিত তাঁদের নিজ নিজ শিল্পকর্মের উপাদানগত ঐক্য সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন, আপনার বাহিনীতে তাঁদের যোগদান কি করে দেখতে পাবেন? ফলে সাহিত্যের অধঃপতন ঘটবে না, ঘটবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অধঃপতন। সরু মোটা নানা গলায় অন্যেরা ঠিক এই কথাটাই বরাবর আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন; অর্থাৎ কি না সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ টিঁকবে না এবং যাঁরা এটিকে ভজনা করছেন তাঁরাও এটিকে ছেড়ে দেবেন, যেমন ধরুন আমি নিজে।

এইবার বাস্তববাদ সম্বন্ধে বলব।

১৮৮৩ সালে "সাহিত্যে বাস্তববাদ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক নিবন্ধে বিরাট ইংরেজ ঔপন্যাসিক রবার্ট লুই স্টিভেনসন লিখেছিলেন: "গত শতাব্দীর তুলনায় আজকের সাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তার মূলে রয়েছে সাহিত্যকর্মে বিস্তারের প্রবর্তন।" স্টিভেনসনের উক্তিটিকে তাঁর সমগ্র লেখাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে তবেই তার পূর্ণ অর্থগ্রহণ সম্ভব। তবে বিস্তার (detail) কথাটিকে তিনি কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় স্টিভেনসন কি বলতে চান। শিল্পকলায় পর্যবেক্ষণের অস্তিত্ব অবশ্য সর্বকালেই দেখা গিয়েছে। যেমন ধরুন মধ্যযুগের চিত্রকলায় পর্যবেক্ষণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়; কিংবা ধরুন অষ্টাদশ শতাব্দীতে (বা যে কোনো শতাব্দীতে) এমন কোনো উপন্যাস লেখা হয়নি যার মধ্যে কিছু না কিছু বাস্তবানুগ পর্যবেক্ষণ নেই।

কিন্তু বিস্তার অন্য জিনিস। বিস্তারণই এক শ্রেণীর রোমাণ্টিকবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এইখানটাতেই রোমাণ্টিকবাদের সহিত চিরায়তবাদের অমূর্তায়নের পার্থক্য। স্টিভেনসন নিজে অবশ্য উঁচুদরের বাস্তববাদী। কিন্তু স্বভাবতই তিনি স্বযুগের পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। বিস্তারতন্ত্রের সহিত স্টিভেনসনের বিবাদের কারণ প্রাকৃতিকবাদী শিল্পকলায় আলোকচিত্রসুলভ খুঁটিনাটির অতিপ্রাচুর্য। (স্টিভেনসন ভুল করে বাস্তববাদকে প্রাকৃতিকবাদের সহিত এক করে ফেলেছেন; তাঁর মতে বাস্তববাদ রোমাণ্টিকবাদের একপ্রকার বিকৃতি)।

স্টিভেনসন যে বিস্তার শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেই শব্দটিকে আমি কি-

ভাবে বুঝেছি তা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। অতীতের অ-বাস্তববাদী শিল্পকলায় দেখা যায় যে, শিল্পীর পক্ষে খুঁটিনাটিকে পরিহার করে চলা অসম্ভব ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় Vezelay-এর খিলানে ও চ্যাপেলে, তৎকালীন স্বর্গ-নরকের বর্ণনায়, ভাস্কর্যের রূপায়নে, নৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সাহিত্যিক উল্লেখে। Breughel-এর উদ্ভট কল্পনাময় দৃশ্যাবলীও খুঁটিনাটির দিক থেকে বেশ বাস্তববাদী। কিন্তু চিরায়তবাদ, এবং বিশেষ করে ফরাসী চিরায়তবাদ, বর্ণনাকে পর্যবসিত করল একটা সেকেলে কৌশলে। চিরায়ত-বাদের সিংহাসনে বসল আইডিয়া (অর্থাৎ বিশদ পর্যবেক্ষণের অন্তরালে অবস্থিত তথাকথিত থিসিস)। তাই চিরায়তবাদ হয়ে উঠল রোমাণ্টিকবাদের বিরোধী। রোমাণ্টিকবাদের ভিতর দিয়েই ঘটেছিল বিস্তারের পুনর্জন্ম, হোক তা গথিক অথবা সমসাময়িক, স্কট অথবা বালজাক। এই বিবর্তনের শেষ প্রান্তবিন্দু জোলা। তাঁর হাতে, অন্ততঃ গোড়ার দিকে, বিস্তারণ কার্যটি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মনোভাবের বিরোধী একটা সমালোচনামূলক ও রাজনৈতিক চেহারা লাভ করল।

প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত প্রাকৃতিকবাদী শিল্পকলায় বিস্তারণ-প্রক্রিয়া সমগ্র শিল্পকৃতির ভারবর্ধন না করে ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াল নিজেই নিজের চরম উদ্দেশ্য —এবং ফলে গাছই বড় হয়ে উঠল, বন চলে গেল চোখের আড়ালে। বিংশ শতাব্দীতেই হোক বা অন্য কোনো যুগেই হোক, এমন শিল্পকলা সৃষ্টি করা কখনও সম্ভব হয়নি যা বিস্তার, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে চলতে পেরেছে। যে-সব শিল্পকৃতিকে বাস্তববাদ থেকে সবচেয়ে দূরের জিনিস বলে মনে হয় তাদের ক্ষেত্রেও বিস্তারণের একটা মুখ্য ভূমিকা বিদ্যমান; এমনকি, এই সকল শিল্পকর্মেই দেখা যায় সমগ্র দৃশ্যে খুঁটিনাটির সর্বাধিক প্রাধান্য। বিগ্রহবাদীদের বা সাররিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে একথা বলছি না; প্রুস্ট বা জয়েসের বিরুদ্ধেও নয়। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, বাস্তববাদের বিরুদ্ধে ভিন্নমতাবলম্বীরা অনেক মৌলিক বিশ্বাস ঘোষণা করেন বটে, কিন্তু এই সব ঘোষণার সাথী হিসাবে যে শিল্পকর্ম আবির্ভূত হয় তা বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে বেশী দূর চলতে পারে না। তফাতটা শুধু এইটুকু যে, বাস্তববাদী শিল্পকলা খণ্ড খণ্ড বস্তুসত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কিন্তু অ-বাস্তববাদী শিল্প তা করতে নারাজ। অ-বাস্তববাদী শিল্পের বিস্তারকার্যে খুঁটিনাটির সামগ্রিক তাৎপর্যটিকে বাদ দিয়ে খণ্ডিত খুঁটিনাটিকেই জয়যুক্ত করা হয়।

শিল্পজগতের লড়াইয়ে যে প্রশ্ন ওঠে তা উদ্ভাবন বনাম পর্যবেক্ষণ-এর প্রশ্ন নয়। বিশুদ্ধ উদ্ভাবন অস্তিত্বহীন ; অন্যদিকে পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কোনো শিল্পই চলতে পারে না। আসল প্রশ্নটি এই যে, শিল্পকৃতির প্রকৃত তাৎপর্যের উপরই জোর দেওয়া হবে না তার তুচ্ছ ডালপালার উপরে। শিল্পের জগতে স্বাধীনতা বলতে বরাবর এই জিনিসটাই বুঝিয়েছে যে, শিল্পকর্মকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে ; অন্যদিকে শিল্পীর দাসত্ব উদ্ভূত হয়েছে সেই সব বহিঃশক্তির চাপে যারা চেষ্টা করেছে পর্যবেক্ষণকে সীমিত করতে এবং শিল্পকৃতিকে শিল্পী যে অর্থের দ্বারা মণ্ডিত করতে চান তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে।

শিল্পকলা বরাবরই স্বাধীনতার জন্য বিরাট লড়াই চালিয়ে এসেছে। যাঁরা এই স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চেয়েছেন, তাঁদের চোখে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিস্তারণ কার্যটি অনেক সময়েই বিপজ্জনক মনে হয়েছে কেননা বিস্তারণের দ্বারা এমন সব ব্যাপার ফুটে বেরনোর সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে যেগুলি নীরবে চেপে যাওয়াই এই সব ভদ্রলোকের অধিকতর মনঃপূত। আবার যখনই এঁরা আবিষ্কার করেন যে, শিল্পী বিশদ পর্যবেক্ষণের মধ্যে ডুবে থাকলে নিজের লড়াইয়ের ব্যাপারটিকে বেমালুম ভুলে যাবেন এবং বিস্তারের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলে তাঁর চোখে এই কথা বলে ঠুলি পরিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য হবে যে তাঁকে খুঁটিনাটি দেখার সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে, তখনই শিল্পীর স্বাধীনতার শত্রুরা বিস্তারণকেই নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ হিসাবে অবলম্বন করেছেন। এই সব লোকেরা সর্বদা সৃজনশীল উদ্ভাবকদের বুলি ধার করেন সৃজনশীলতাকে খোঁড়া করে দেওয়ার জন্য।

এই ঘটনাই ঘটেছে প্রাকৃতিকবাদ বা তথাকথিত "এক চাকলা জীবন" বলতে যা বোঝায় তার ইতিহাসে। সামগ্রিক তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত বর্ণনা-রাশির দ্বারা সৃষ্টির প্রেরণাকে সীমিত করার জন্য প্রাকৃতিকবাদকে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং গলা মেলাতে হয় ওই আওয়াজের সঙ্গে যে, "শিল্পের জন্যই শিল্প।" শিল্পের এই কৈবল্যবাদী ব্যখ্যা অবলম্বন করলে শিল্পীর পক্ষে পারিবারিক অ্যালবাম রচনা করা ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না। হাসি পায় এই অ্যালবামটিকে দেখলে যখন চোখে পড়ে মূর্তিগুলির সেকেলে পোশাকপরিচ্ছদ কিংবা যখন নজরে আসে, সেকালের সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে এই পরিবারটির সত্যকার চেহারা অকস্মাৎ কি রকম ফুটে বেরিয়েছে। ইস্রায়েলের ভগবান একদা মানবমূর্তির অঙ্কনকে নিষিদ্ধ করে

দিয়েছিলেন কিন্তু পরে, 'ভাল হোক, মন্দ হোক, এই নিষেধাজ্ঞাকে বলবৎ করার ক্ষমতাটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী চায় পারিবারিক চিত্র সংগ্রহ করতে এবং তাই তার শিল্পীদের শুধু এই কাজেই লাগিয়ে রাখতে চায়।

শিল্পে কি কি জিনিস অনুমোদন করা হবে তার চরিত্র যখনই বদলায় তখনই শিল্পীর স্বাধীনতা নতুন করে বিপন্ন হয়ে পড়ে। মনে হয় বুঝি বা শিল্পের নতুন অভিব্যক্তির সঙ্গে তাল রেখেই নতুন নিয়মকানুন (sanctions) রচিত হচ্ছে কিন্তু কার্যতঃ তার উদ্দেশ্য হল শিল্পীর স্বাধীনতাকে খর্ব করা। একদা যে-সব কথা মানুষের মুখ দিয়ে বেরলে কেউ সহ্য করত না সেই সব কথা পশুপক্ষীকে দিয়ে বলানো হল। মহৎ সাহিত্যিক উদ্ভাবন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি ধরুন লেখকরা অনন্তকাল ধরে শুধু Roman de Renart-এর আবিষ্কারটারই চর্বিতচর্বণ করতেন? তাহলে যে-সব বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন করাই উদ্ভাবনটির উদ্দেশ্য ছিল, তাদের কাছেই কি লেখকদের নতিস্বীকার ঘটত না? সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই এই ব্যাপারটি দেখা যায়—আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বটে, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও বটে।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আমরা পেয়ে আসছি বেশ একটা নতুন জিনিস, অর্থাৎ কাব্যে ফরাসী ছন্দের প্রবর্তন যাতে করে জনসাধারণের কানে কাব্যের আবেদন অর্থপূর্ণ হয়। পুরাতন লাতিন ছন্দ কেউ বুঝত না, অন্ততঃ অশিক্ষিতেরা। সমান মাত্রার গোনাগুনতি লাইনের সঙ্গে অন্ত্য মিল যুক্ত হয়ে শব্দের পর শব্দের এমন মালা গাঁথা হল যা মানুষের চেতনা ও স্মৃতি থেকে কোনোদিন মুছে যাওয়ার নয়। (ঘটনাটি যখন ঘটল তখন পুস্তকের প্রচলন হয় নি এবং সমাজের অধিকাংশ লোক পড়তে জানত না।) কাব্যে গীতিকলার উদ্ভব ঘটল এই বিশেষ সামাজিক অবস্থায় কিন্তু তার গুরুত্ব এমনই বেড়ে গেল যে ওই সামাজিক অবস্থার তিরোধানের বহু শতাব্দী পরেও গীতধর্মী কাব্য টিঁকে রইল। বইয়ের আবিষ্কার ঘটল, একই বই লাখে লাখে ছাপার কৌশল উদ্ভাবিত হল, জিনিস মনে রাখার শতেক রকম কৌশল অবলম্বিত হল কিন্তু গীতিকাব্যের জাদু টিঁকে রইল।

কিন্তু গানের ছন্দ উপায় হিসাবে বিবেচিত না হয়ে ক্রমশই হয়ে পড়ল কবিতা লেখার উদ্দেশ্য। তখন আর তার বিশেষ কোনো তাৎপর্য রইল না।

পুনরায় উঠল কবির স্বাধীনতার প্রশ্ন। সুতরাং যখন কবিরা সনাতন গীতিছন্দ বর্জন করে তথাকথিত vers libre বা বাঁধনছেঁড়া মুক্ত ছন্দে কবিতা লিখতে লাগলেন, তখন অবশ্যই তাঁরা শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনার দ্বারাই চালিত হন নি। কাব্যের এই রূপগত স্বাধীনতা কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে হয়ে দাঁড়াল কবির স্বাধীনতার উপর নতুন এক শৃঙ্খল। গীতরূপের পরিহার ব্যাপারটা হয়ে পড়ল কলাকৈবল্যেরই অন্যতর অভিব্যক্তি এবং নিয়মিত ছন্দে কবিতা লেখার অননুমোদন রীতিমতো একটা অত্যাচারে পরিণত হল। ত্রিশ বছর আগে এই সমস্যাটা আমার কাছে প্রথম উপস্থিত হয়: কবিতার প্রকৃত অর্থকে কিভাবে অপরের মনে সঞ্চারিত করা যায়? অপণ্ডিত লোকেরা যাতে আমার কথায় কান দেয় তার জন্য গীতরূপ অবলম্বন করা উচিত হবে কি? অবশ্য মানি যে, এ বিষয়ে জনমতের একটা প্রকাণ্ড প্রভাব আছে এবং সমালোচক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এই জনমতটি সৃষ্টি করেন। তীরধনুক যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর কিউপিডের নিত্যসঙ্গী, মুক্ত ছন্দের সহিত সমসাময়িক কাব্যের সম্পর্কটাও প্রায় তেমনই। আমি এই সমসাময়িক স্টাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। গানের মতো করে কবিতা লিখে চললাম, অর্থাৎ কিনা সনাতন ফরাসী কাব্যের কায়দায় অমুক্ত ছন্দে, যাতে করে অপণ্ডিত লোকেরা তার রস উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু অন্যান্য স্টাইলেও কবিতা লেখা আমি কোনোদিন বন্ধ করি নি। সম্প্রতি বলা হয়েছে, আমার নানা "স্ববিরোধ"-এর একটা দৃষ্টান্ত এই যে, আমার মুক্ত ছন্দে লেখা ও অমুক্ত ছন্দে লেখা কবিতার পারস্পরিক অনুপাত ১৯৪৩ সাল থেকে কেবলই বদলাচ্ছে। আমার স্বাধীনতাটা ঠিক এইখানেই যে এসব ব্যাপারে কারুর কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই—কোনো একটা বিশেষ আঙ্গিকের কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিইনি। আঙ্গিক আমার কাছে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র। আমার শ্রোতা কারা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা কি রকম, এবং তাদের কাছে আমি কি বলতে চাই, এই সব বিবেচনার দ্বারাই ঠিক হবে আমার বক্তব্যের গড়নটা কি ধরনের হবে। আসল ব্যাপারটা হল শ্রোতাদের মনোযোগের ও স্মৃতির নাগাল পাওয়া, এক মাধ্যমে না হয় অন্য মাধ্যমে শব্দের পর শব্দকে এমন অবিস্মরণীয়ভাবে গেঁথে দেওয়া যাতে লেখকের চিন্তাধারা মানুষের মনে প্রবেশ করতে পারে এবং মানুষকে বদলাতে পারে—ঠিক যেমন বিজ্ঞান মানুষের কর্মপদ্ধতিকে বদলে

দিচ্ছে ; ঠিক যেমন শিল্পকলার নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে সমাজ বদলে চলেছে।

কাব্যের যে সব বৈপরীত্য দেখা যায় তা উপন্যাস জগতের বৈপরীত্যের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। যাঁদের মাধ্যমে কাব্যে বিস্তারের প্রবেশ ঘটেছে তাঁরা অনেকে মোটেই নিজেদের বাস্তববাদী লেখক বলে মনে করেন না। যেমন ধরুন Guillaume Apollinaire। তিনি বিগ্রহবাদী ঐতিহ্যের কবি। অথচ যে-সকল শব্দ কাব্যে এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, যেগুলিকে এলুয়ার বলেছেন "অকারণে নিষিদ্ধ শব্দ", সেই-সব শব্দকে এই বিগ্রহবাদী কবিই সবচেয়ে অধিক সংখ্যায় কাব্যজগতে চালু করেছেন। তিনিই সমসাময়িক অধুনাতন বিস্তারকর্মের জন্মদাতা। বাঁধের আগল খুলে তিনি জীবনের মুক্তধারা বইয়ে দিলেন কাব্যক্ষেত্রের আনাচেকানাচে। কথিত ভাষার জগৎ থেকে লিখিত ভাষার জগতে চলাচলের পথটি তিনি উন্মুক্ত করলেন। জীবনের বহু বাস্তব সত্যকে অপরিশুদ্ধ অবস্থায় তিনি কাব্যের এতদিনকার কায়েমী দরবারে ঢুকতে দিলেন।

এই ধরনের গীতিকাব্যগত বিস্তার ঐকান্তিক উদ্ভাবনপ্রীতি ও সৃজনানুরাগ থেকেই জন্মলাভ করেছে। এর সঙ্গে স্টিভেনসন কথিত আলোকচিত্রের খুঁটিনাটি তথা প্রাকৃতিকবাদী বর্ণনাবিস্তারের কোনো মিল নেই। আধুনিক সাহিত্যে যে বিস্তারের আবির্ভাব ঘটেছে তা মানুষের বিবেকেরই বাহন। তা আলোকচিত্রের মতো হুবহু অনুলিখন নয়। বরং তা জীবনের পরিবর্তনশীল বস্তুসত্যেরই মুসাবিদা।

তাই বলছিলাম, আধুনিক বাস্তববাদের বহুবিধ উৎস। এক উৎস ও অন্য উৎস অনেক ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী। বর্তমান শতাব্দীর শিল্পকলা খুঁটিনাটির দাস নয়। বরং তা অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা খুঁটিনাটিকে কাজে লাগাতে ও শাসন করতে শিখেছে। আজ কেউ যদি প্রাকৃতিকবাদী পর্যবেক্ষক হতে চান তাতে ক্ষতি নেই তবে এই শর্তে যে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটি উদ্দেশ্য না হয়ে উপায় হিসাবেই অবলম্বিত হবে ; কিংবা যদি কেউ দাবি করেন যে তিনি আইডিয়ালিস্ট (অবশ্য কথাটার সাহিত্যিক অর্থে), এই দাবিও অগ্রাহ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ভাষাগত পরীক্ষানিরীক্ষা উদ্দেশ্যস্বরূপ না হয়ে আইডিয়াকে প্রকাশ করার উপায়স্বরূপ হয়ে থাকে।

প্রায়ই আলোচনা ওঠে এ বিষয়ে যে আজকাল আমরা দেখছি একটা নতুন রকমের রোমান্টিকবাদ, না একটা নতুন রকমের চিরায়তবাদ? আমি নিজে এই উভয়সংকটের মধ্যে আটকে থাকতে রাজী নই। আগামী কালের মানুষ যেমন রোমান্টিকবাদ থেকে, তেমনই চিরায়তবাদ থেকে নিজের যা দরকার বেছে নেবেন। মানুষ কাল যে কাজ করেছে আজ তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করবেন না। কিন্তু তাঁর পক্ষে অভিজ্ঞতার মূল্যকে এই কারণেই অস্বীকার করা হবে ছেলেমানুষী যে, তা রোমান্টিক অথবা চিরায়ত, প্রাকৃতিকবাদী অথবা বিগ্রহবাদী। বাস্তবতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্বকালীন অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার এই নতুন বিচার-সূত্রটির মধ্যেই রয়েছে নতুন শিল্পকলা বিরাজ করছে। এই নতুন শিল্পকলা অবশ্যই নতুন রকমের এক বাস্তববাদ। তা যুগপৎ বৃক্ষ ও অরণ্য, উভয়কেই চিত্রিত করে এবং জেনে-শুনে বেশ সজ্ঞানেই করে। এই বাস্তববাদ খুব সক্রিয়। শিল্পের জন্যই শিল্প, এমনতরো অহেতুকী শিল্পকলার সঙ্গে তার আকাশপাতাল প্রভেদ। এই বাস্তববাদ মানুষকে সাহায্য করে, তাকে পথ চলতে আলো দেখায়, তার অগ্রগতির দিশা নির্ণয় করে এবং সর্বদা তার অভিযানের শীর্ষদেশে অবস্থান করে।

অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, শিল্পীর মনে মানবপ্রগতির স্বরূপ সম্বন্ধে উপলব্ধি বিদ্যমান; শিল্পী জানেন তাঁর অভিযান কোন কোন শক্তির দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে এবং মানবের বিবর্তন আজ কোন নতুন স্তরে উপনীত। আমি জানি একথা শুনে কেউই বিস্মিত হবেন না যে আমার কাছে এবং আরো অসংখ্য লোকের কাছে এই নতুন স্তরটির নাম সমাজতন্ত্র। সুতরাং স্বভাবতই নতুন বাস্তববাদ নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামে অভিহিত করেছে। সমাজতন্ত্র কথাটাই হল সমস্ত ব্যাপারটির চাবিকাঠি।

একথা ঠিক যে নতুন শিল্পকলার এই নামকরণ সোভিয়েত ইউনিয়নেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। তারপর আমরা সকলেই নিজ নিজ দেশে নতুন বাস্তব-বাদের ওই নামটাই গ্রহণ করেছি। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে জার্মান দর্শন ও জার্মান সাহিত্য থেকেই আমরা রোমান্টিকবাদের নাম ও সংজ্ঞার্থ গ্রহণ করেছি? প্রতিটি যুগেই মানবিক মননপ্রবাহ যেখানে সম্ভব সেখানেই নিজের ধনরত্ন আহরণ করে এসেছে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদ যে অবস্থায় বিকশিত হয়েছিল, ফ্রান্সে সে অবস্থা অবিদ্যমান। সবচেয়ে বড় তফাত এই যে, সমাজতন্ত্র যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রতন্ত্র, তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে গোড়া থেকেই শিল্পীর সহিত সমাজের নেতাদের বোঝাপড়াই হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ভিত্তি; কিন্তু ফ্রান্সে বর্তমান সামাজিক অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বিরোধী শিল্পকলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

এটাই সোভিয়েত ইউনিয়নে ও ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পার্থক্যের মূল কারণ। এই পার্থক্যকে অস্বীকার করার কোনো মানে হয় না। এদেশে এবং ওদেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে ধারণার যে বিরোধিতা দেখা যায়, এই পার্থক্যই তার কারণ। কিন্তু তাই বলে সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। বিরাট এক নতুন ধরনের পাঠক-সাধারণ সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা দিয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। যে শিল্পী নিজের রচনার প্রভাব ও আয়ু সম্বন্ধে চিন্তিত, তাঁকে এই মূল সত্যটির সহিত মোকাবিলা করতেই হবে।

যাই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়নেই বলুন আর অন্যত্রই বলুন, আমি তর্কাতীত সত্য বলে মানতে প্রস্তুত নই যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কোনো বিশেষ থিসিস প্রমাণিত বলে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে এ যুক্তির মূল্য নেই যে সর্ব-সম্মতিক্রমে কোনো কিছু মেনে নেওয়া হয়েছে বলেই তার প্রমাত্ব প্রশ্নাতীত। বরং লেনিনের কথাই ঠিক যে শিল্পকলাগত ব্যাপারকে ভোটে দেওয়া চলে না। এ-প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মতো একটা ধারণার কোনো জাতীয় সীমানা থাকা উচিত নয়। একটা ছাঁচে ফেলে তার সংজ্ঞার্থকে শাশ্বত ও অনমনীয় করে ফেলা উচিত নয়। সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দাবি করে যে, রচনাকে প্রতিপদে মূলনীতির দ্বারা যাচাই করতে হবে। শুধু যে নীতির ও ফলাফলের দিক থেকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পুনঃপরীক্ষা আবশ্যক তাই নয়; বরং আরো বেশী আবশ্যক বাইরেকার, এমনকি, বিরোধী অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে পুনর্বার যাচাই করা। এর ভিতর দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ মহনীয় হয়ে উঠবে: এটা প্রমাণিত হবে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ওই সব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে ও আলোকিত করতে সক্ষম; তাদের মধ্যে যা মানবপ্রগতির সহিত সমান্তরাল তাকে গ্রহণ করতে ও আত্মস্থ করতে সক্ষম। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে গড়েপিটে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেয় নি; আমরা তাকে যা করে তুলব, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তাই-ই। তার শিকড় রয়েছে আমাদের অতীতের বিশাল ঐতিহ্যে। কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলতে এমন জিনিস বোঝেন যার অতীতে কোনো শিকড় থাকবে না; কিন্তু এই শিকড়কে কেটে ফেললে উপরকার ডালপালাও শুকিয়ে যাবে। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পিছনে রয়েছে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা অতীত ঐতিহ্যকে জিইয়ে রাখতে চায় ও আলোকিত করতে চায় এবং যা নিজের অনুচরদের অনুমতি দেয় অতীতের চিন্তাধারা থেকে পুষ্টিগ্রহণ করতে। শুধু ফরমুলা চিবিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাঁচতে পারে না। তার বৃদ্ধির জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ও সাহিত্যেরও বৃদ্ধি ও প্রসার দরকার। ভিক্তর হুগো তাঁর "উইলিয়ম শেক্সপিয়ার" গ্রন্থের শেষে ইতিহাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন:

"এটা খুব পরিষ্কার যে, ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে ; এতদিন শুধু তথ্যের দীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিহাস লেখা হয়েছে ; এইবার নীতির দিক থেকে ইতিহাস লেখার সময় এসেছে।"

পুরাতন সমালোচনার সহিত নতুন সমালোচনার সম্পর্ক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যায়।

এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, ঘটনার ও কাজের বাইরে ইতিহাসের কোনো অস্তিত্ব নেই ; হুগো তা ভাল করেই জানতেন। কিন্তু এই প্রতিভাশালী লেখক এই সত্যকেই আমাদের কাছে সরলভাবে উপস্থিত করেছেন যে, শুধু তথ্যের স্তূপ রচনা করাটা হবে এক প্রকার ঐতিহাসিক প্রাকৃতিকবাদ ; নীতির দিক থেকে তথ্যগুলি চিন্তিত, সংগঠিত ও আলোকিত হওয়া দরকার। আমি অবশ্য ইতিহাসের আলোচনা করছি না। সাহিত্যেরই আলোচনা করছি। তবু দুই ক্ষেত্রে একই সমস্যা ; তাই হুগোর বচন উদ্ধৃত করলাম। সমালোচকের কাছে সাহিত্যের গ্রন্থরাজিই সাহিত্যের তথ্য ; এবং সময়ে সময়ে নীতির নামে, যেমন ধরুন সমাজতন্ত্রের নামে, যাঁরা তথ্যকে উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের বিরুদ্ধে যাওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে যে সমালোচক সমাজতন্ত্রের নীতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁর পক্ষে সাহিত্যের তথ্যগুলিকে—অর্থাৎ গ্রন্থগুলিকে—সমাজতন্ত্রের কাঠামোয় ফেলে বিচার করা দরকার। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জগৎ থেকে এগিয়ে গিয়ে মানবসাধারণের সংগ্রামে অংশগ্রহণের পথে লেখকের অগ্রগতি সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীর এক অংশ। এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক সমালোচকের হাতে এক মহৎ দায়িত্ব ন্যস্ত এবং পাঠক হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই এক-একজন সমালোচক—উৎসাহের সহিত গ্রহণই করি পঠিত পুস্তকটিকে অথবা বর্জনই করি।

একথা বলছি এই জন্য যে, যাঁরা বই না পড়ে সমালোচনা করেন তাঁদের চেয়েও সেই সব সমালোচকরা আমার কাছে বেশী সন্দেহভাজন যাঁদের দাবি এমনধারা যে তা কেউ মেটাতে পারে না। এই ধরনের লোক সর্বদাই আমাদের চারিপাশে রয়েছেন। যখন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে সমালোচনা করেন, তখন আমি বেশী চিন্তিত হই না। কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ি যখন দেখি যে, যিনি আমাদের ঘরের লোক অর্থাৎ প্রগতিশীল সমালোচক, তিনিও ক্রমাগতই দাবি করছেন যে দৃশ্যপট আরো একটু চড়ানো হোক। কিছুতেই তাঁর মনে পছন্দ হয় না। কবিতা বা উপন্যাস তাঁর চোখে কখনই যথেষ্ট বাস্তববাদী বা যথেষ্ট সমাজতান্ত্রিক বলে মনে হয় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এমন উঁচু ডালের ফল নয় যা একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে। তা এইখানেই রয়েছে আমাদের মধ্যেই। আসল কথা হল, জিনিসটি কি তা জানা এবং তার দেখা পেলে তাকে চিনতে পারা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা একটু চওড়া রকমের।

আমার বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের এইভাবে চলা উচিত. যাতে অগ্রণী বাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছেদ না ঘটে ; যাতে জাতীয় সাহিত্যের ক্রমান্বয় সংরক্ষিত হয় এবং অন্যান্য প্রকাশভঙ্গির সহিত তার সম্পর্ক দাক্ষিণ্য-যুক্ত হয়। এটা করতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের দিকে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে পারবে না ; তা হয়ে রইবে একটি সাম্প্রদায়িক, পণ্ডিতী শিল্পকলা এবং বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে তা এমন সাহিত্য ও শিল্পকৃতি সৃষ্টি করতে পারবে না যার ধাপ বেয়ে আমরা ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হতে পারি।

বুঝতে পারছি যে, আমার এই সব কথার এমন ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব যে এতে করে কমিউনিজম সংগ্রাম বলতে যা বোঝে, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম, তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তা একেবারেই অননুমোদনীয়। তাই সবিনয়ে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Cahiers du Communisme পত্রিকায় প্রকাশিত এবং আংশিকভাবে প্রাভদা কাগজে পুনর্মুদ্রিত লরাঁ কাসানোভার একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই :

"...পার্টি একথা জানে যে, ফ্রান্সের মতো দেশে পার্টি যদি প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে একটি অদ্বিতীয় মার্কসীয় ভাবসমষ্টিতে পর্যবসিত করে বা করছে বলে মনে হয়, তাতে বিপদ ঘটবে। তার ফলে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিক্রিয়তা প্রগতিশীল ভাবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং যে ভাব-বিনিময় পরস্পরের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, তার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। অনেক কমরেড অপরের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন করতে খুবই রাজী কিন্তু এই রাজনৈতিক মৈত্রীর কাঠামোর মধ্যে কোনোরূপ ভাববিনিময় করতে তাঁরা যেন নারাজ বলে মনে হয়। তাঁরা রাজনীতিকে ভাবাদর্শ থেকে কৃত্রিম উপায়ে আলাদা করে ফেলেন, যেমনটি করেন সুবিধাবাদীরা অপরাপর উদ্দেশ্যে। পার্টি এটা একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে যে, মার্কস যে কাজটি কদাচ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে অবিকল সেই কাজটি করাই হয়েছে পার্টির দোষ : অর্থাৎ কিনা সারা জগতের সামনে তত্ত্ববাগীশরূপে নিজেদের দাঁড় করিয়ে এই বলে চেঁচানো ; "ইহাই সত্য। বিশ্বজন, নতজানু হও।"

আমি এই প্রবন্ধে যা বলেছি তার সঙ্গে কাসানোভার চিন্তাধারার খুব বেশী অমিল নেই। যে সংগ্রামে আমি বরাবর অংশগ্রহণ করে এসেছি তার স্লোগানটাই আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। কাসানোভার চেয়ে আমি অবশ্য আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে রোমান্টিকবাদ সম্বন্ধে আমার ধারণার কথাই পুনর্বার বলব। রোমান্টিকবাদের উৎপত্তি ও স্টাইল বিচিত্র। সমসাময়িক ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ গড়ে তোলার ব্যাপারে রোমান্টিকবাদকে ব্যবহার করা আবশ্যক। কারা কারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করে, তাদের একটা তালিকা রচনার

দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ "ইউনিয়ন" নয় এবং তাতে আপনার "যোগদান" অসম্ভব। এই ভুল ধারণাও আপনাকে ছাড়তে হবে যে, কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্ভব। তারপর এ কথাও ঠিক যে, যাঁরা নিজেদের গায়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের টিকিট লাগিয়ে দেন না, যাঁরা এর নিন্দা করেন, তাঁদের রচনাতেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূল জিনিসটি থাকতে পারে, যদিও অন্যান্য বিপরীত ধারণার সহিত মিশ্রিত হয়ে।

সুতরাং ব্যাপারটিকে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। আমরা সমাজতন্ত্রের যুগের লেখক একথা জানি বা নাই জানি। আমাদের কাজের স্টাইলটা কি হবে, কিভাবে লিখব, তার নানা পথের বাছবিচার করে যেটিকে চাই বেছে নিতে আমরা অবশ্যই পারি। কিন্তু যে পথই অবলম্বন করি না কেন, যদি লেনিনের এই তত্ত্ব সত্য হয় যে আর্ট জীবনেরই প্রতিফলন—এবং আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ—তাহলে আমাদের ভিতর দিয়ে অবশ্যই আমাদের নিজেদের যুগটাই প্রতিফলিত হচ্ছে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কখনও হয়তো বাঁকাচোরাভাবে, এমন কি উদ্ভটভাবে, আমাদের লেখার ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে মানবের অভিযানই প্রতিফলিত হচ্ছে। সাহিত্যের অসংখ্য তথ্যকে এবং শিল্পকলার অজস্র খুঁটিনাটিকে ঐক্য ও সংহতি দেওয়ার জন্য যে ধারণার প্রয়োজন তার নাম সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ। এই ধারণার সাহায্যে লেখক নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে শিল্পকলার অফুরন্ত বিস্তারকে ব্যাখ্যা করেন, তাকে তাৎপর্যময় ও শক্তিমান করে তোলেন এবং তাকে মানবের অগ্রগতির সহিত একীভূত করেন। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের মতো শিল্পকলাও বহু বিচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের সমষ্টিমাত্র নয়। অপরে যা উদ্ভাবন করেছেন তার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না, তাকেও অর্থপূর্ণ করে তোলা আমাদের কর্তব্য। যে-সব বাস্তববাদী এমন এক বাস্তববাদের বড়াই করেন যা বৈজ্ঞানিক এবং যার একটি আভ্যন্তরীণ লজিক আছে, তাঁদের কাজ হল মানবের বিবর্তনের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করে সমবেতভাবে সাহিত্যের ও শিল্পকলার ক্রমান্বয়তাকে সংগঠিত করা। আমি যদি আমার নিজের লেখা দিয়ে এবং অপরের লেখার প্রতি মনোযোগ দিয়ে এই কাজে সামান্য কিছুও সাহায্য করে থাকি তাহলে বুঝব যে আমি আমার জীবনের ও শক্তির সদ্ব্যবহার করেছি; তাহলে এই চরিতার্থতা বোধ জন্মাবে যে আমার নিজের কাজের ক্ষেত্রে দৈবক্রমে একদা যেখানে নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম সেখান থেকে বিশ্বমানবের লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছি। আজকের অর্ধেক বয়সে সেদিন নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে চলার যে সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম তা অপরিবর্তনীয়।

অর্ধোন্নত অর্থনীতি ও অগ্রগমনের সমস্যা

তরুণ সান্যাল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘটনা এশিয়া ও আফ্রিকার পদানত দেশগুলির মুক্তিসংগ্রাম এবং সাফল্য। অর্থনীতির তত্ত্বের জগতেও তাই সর্বাপেক্ষা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হল, এই অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগমনের কল্পনা। এ নিয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ, নিবন্ধ রচনা চলেছে, তথ্যের ও তত্ত্বের ভারে এমনকি কেতাবিয়ানা চিন্তারও প্রকাশ চলেছে। পরিকল্পনামুখী দেশগুলির তাই সঠিকভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে যে, কোন পন্থায় অতি দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগমন সম্ভব।

এ পর্যন্ত যতগুলি অর্থনৈতিক তত্ত্ব মানবজাতির ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তার সবগুলিই কোনও শ্রেণী (বা কয়েকটি শ্রেণীর) প্রয়োজন সিদ্ধ করবার তাগিদেই সৃষ্ট। অর্ধোন্নত (বা অনুন্নত) দেশগুলির অগ্রগমন-পরিকল্পনার প্রয়োজনে যে বস্তুগুলি খাড়া করা হচ্ছে, তাতেও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শিত হচ্ছে। ধ্রুপদী অবাধ-প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত মালিকানার ধনতন্ত্র; বা মাইজী পুনরভ্যুদয়ের বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া গোষ্ঠীর (zybatsu) ধনতন্ত্র বা মিশ্র-অর্থনীতির ধোঁয়াটে আস্তরণ বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে জনগণতন্ত্রের পন্থায় অগ্রগতি সম্ভব হবে কিনা; সেটাই বিবেচ্য। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগমনের তত্ত্ব পর্যালোচনা করতে আধুনিক হ্যারড, ডোমার লিয়নটিয়েফ, জোন রবিনসন, কুরিহারা প্রভৃতির নাম যেমন কথায় কথায় স্মরণ করতে হয়, তেমনি অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্কসের তত্ত্ব পুনরায় মূল্যায়ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

সম্প্রতি আমাদের হাতে পল বারানের Political Economy of Growth গ্রন্থটি এসেছে। গ্রন্থটিতে অ্যাকাডেমিক অর্থনীতিবিদদের প্রিয় কথা, অধ্যাপক রবিনস্ যা ব্যবহার করেছিলেন 'উদ্দেশ্য বিষয়ে অর্থনীতি নিষ্ক্রিয়'—

The Political Economy of Growth : Paul A Baran : People's Publishing House : Price : Rs. 15.

সযত্নে এই লেখক তা বর্জন করেছেন। ফলে, এমন সামাজিক বিন্যাসের কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছে, যা একান্তভাবেই অনুন্নত দেশে ধনবাদী অর্থনীতি গঠনের পরিপন্থী অথচ পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের নীতি নিয়ামক।

সাধারণ পথ চলতি মানুষের কাছে জাতীয় নেতারা যে আপ্তবাক্যটি রাখেন, তা হল 'অধিক সঞ্চয় কর'। অর্থাৎ রাস্তার মানুষগুলির ব্যক্তিগত সঞ্চয় কণিকার বিন্দু বিন্দু যোগফলে সামাজিকভাবে যে বৃহৎ সঞ্চয় হবে, তাতে বহু মূলধনগঠন করা সম্ভব। পল বারানের গ্রন্থটি পড়তে গেলে প্রথমেই মনে হবে, বৃহৎ একটি সম্ভাব্য সঞ্চয়ের দিকে নজর না দিয়ে আমরা চোখ ফিরিয়ে রয়েছি অন্য দিকে। পল বারান গ্রন্থটির পরিচ্ছেদ বিন্যাসের নামকরণের মধ্যেই, তাঁর তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করবার চুম্বকটি রেখেছেন, যথা: (১) অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের তত্ত্ব, (২) স্থাণুত্ব ও একচেটিয়া ধনতন্ত্রে চলিষ্ণুতা, (৩) পশ্চাৎবর্তীতার মূল বিষয়ক, (৪) পশ্চাৎবর্তীতার গঠনধর্মীতার লক্ষ্যে, (৫) খাড়াই উত্থান।

প্রসঙ্গতঃ একথা স্বীকৃত যে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক অগ্রগমনকেই নীতি আলোচনায় মূল বিষয় বলে ভেবেছিলেন। সে-যুগে জঙ্গমত্বই চিন্ত্য ছিল, কিন্তু যথাসময়ে যখন ধনতন্ত্র শিকড় গেড়ে নিতে সম্ভব হল, সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া চিন্তাধারায় অনুরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেল। ফলে 'নব্য ধ্রুপদী'দের 'অন্য বিষয়গুলি যখন স্থির' প্রাকসিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থনীতির জগতে বাজার মূল্যের খণ্ড বিশ্লেষণ সহজেই স্বীকৃত পন্থা হয়ে গেল। অর্থনীতির সাধারণ ভারসাম্যের দিকে আলোচনা করতে গিয়েও (যেমন অস্ট্রীয় অর্থনীতিবিদগণ) প্রান্তিক আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিল। সুতরাং, মজুরের মজুরি হ্রাস করে পূর্ণ কর্মসংস্থানের তত্ত্ব, স্বেচ্ছাকৃত বেকারীই যে একমাত্র বেকারীত্বের সত্যতা—এ সবই বলা বাহুল্য বাস্তবের দিকে চোখ ফিরিয়ে তত্ত্বের জন্য তত্ত্বর পণ্ডিতীতে পর্যবসিত হল। অর্থনৈতিক জঙ্গমত্বের রথচক্রতলে যে ঐতিহাসিকভাবে সব সময়েই সমাজের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনৈতিক সংগঠন, উৎপাদনের প্রভাবশালী গঠন পরিমণ্ডল, বণ্টন ও ভোগ—সব কিছুই যে দারুণভাবে পরিবর্তিত হয়, একথাটা নব্য ধ্রুপদীরা অবশ্যই ভুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সামাজিক বা

অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির একটি বৈশিষ্ট হল যে, একবার যদি স্থাণুত্ব অর্জন হয়েছে—কী আর নড়বার নাম না করাই ভাল। তাই, ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অযৌক্তিকতা, সীমাবদ্ধতা এবং (সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পূর্বে) ধনবাদ যে একটি অন্তবর্তী পর্যায় যখন জানা গেল, নব্য ক্রুপদীরা সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও ইতিহাস ভুলতে চাইলেন। তাই মার্কস বলেছিলেন "অর্থবিজ্ঞানীরা আমাদের নিকটে নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে উৎপাদনের অয়ন ব্যাখ্যা করেন ; তাঁহারা যাহা ব্যাখ্যা করেন না, যাহা হউক, তাহা হইতেছে যে, কিরূপে এই শর্তগুলি নিজেরাই উৎপাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ কিনা, যে ঐতিহাসিক আন্দোলন উহাদের রূপ দিয়াছে।" কিন্তু ধনতন্ত্রের তখনও আভ্যন্তরীন-ভাবে বহু ভাঙাগড়া চলেছে। উনিশ শতকের শেষাশেষি ধনতন্ত্রের প্রথম স্তরের শিল্পায়ন সমাপ্ত হয়ে এসেছে। অঙ্গার ও বাষ্পীয় শিল্পশৈলির মাধ্যমে ভারীশিল্প, উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব—এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার স্বর্গ ও ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব হরণ হয়ে একচেটিয়া, নতুন বাজার-লোভী দস্তুর, লোভী, হিংস্র ও যুদ্ধনিপুণ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কত অল্প সময়ের মধ্যে চীন-জাপান যুদ্ধ, স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ, বুয়র যুদ্ধ, বক্সার বিদ্রোহ দমনের রক্তলোলুপতা, রুশ-জাপান যুদ্ধ, ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব, ১৯১১-১২ সালের চীন বিপ্লব এবং সর্বোপরি প্রথম মহাযুদ্ধ, কেমন এ শতাব্দীর সূচনাতেই দিকে দিকে রণধ্বনি মুখর করে তুলেছে! পল বারান এক্ষেত্রে একটি চমৎকার সূচকসংখ্যাপঞ্জী ব্যবহার করেছেন। এবং যুযুধান শক্তির পরিমাণ, মৃতের সংখ্যা, যুদ্ধ সম্পর্কীয় দেশগুলির সংখ্যা এবং সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় যুযুধান সংখ্যায় পরিমাপ সংযুক্ত এই সূচকে দেখা গেল :

শতাব্দী	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
সূচক	১৮	২৪	৬০	১০০	১৮০	৫০০	৩৭০	১২০	৩০০০

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহারুশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় অর্থ-নৈতিক সংকটজনিত নাভিশ্বাস, জন মেনার্ড কীনসের 'কর্মসংস্থান, সুদ ও অর্থের সাধারণ তত্ত্ব (১৯৩৬)' 'সাধু' ধনতন্ত্রের বিকাশ বিষয়ে সন্দীহান করে তুলল। অবশ্য কীনস্ চমৎকারভাবে দেখালেন যে, যেহেতু 'দীর্ঘকালে আমরা সবাই মৃত', অতএব স্বল্পসময়ের অর্থনীতি আলোচনা করা ভালো। সরকারী

হস্তক্ষেপ এ বিষয়ে ঔষধ বলেও স্বীকার করা হল, বলা বাহুল্য ধনতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনেই। অর্থাৎ কীনসীয় তত্ত্বে স্বীকৃত হল—ধনবাদের অস্থিতি, জড়ত্বের দিকে গতিপ্রবণতা, অর্থনীতিতে মানুষ ও বস্তুসমূহের ব্যবহার ক্রমশ জটিল অর্থে অবনয়ন। নব্য ধ্রুপদীদের সতীত্বের প্রতি আর মর্যাদা না দিয়ে, অর্থনীতির সাংগঠনিক গতিপ্রগতি এবং শ্রেণী সম্পর্ক, আয় বিভাজন, রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং আরও বহু অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের 'বহির্দেশীয়' বিষয় স্বীকৃতি লাভ করল।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলিতে নতুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিতে মুক্তি-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বিজয়ী দেশগুলি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মপ্রচেষ্টা বাড়িয়ে চলেছে। তাই এই আন্দোলন পর্যুদস্ত করার কী নিদারুণ সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা! হ্যারড-ডোমার প্রভৃতি অর্থবিদ-সংখ্যাতাত্ত্বিকের যত দ্রুত উন্নতির কল্পনা প্রকাশ করেছেন, বলা বাহুল্য, ধনতান্ত্রিক উপায়ে তা করা এই দেশগুলিতে আদৌ সম্ভব নয়। আবার, এই অনুন্নত দেশগুলির উন্নতি, উন্নত (অর্থাৎ পুরনো ধনতান্ত্রিক) দেশগুলির স্বার্থেরও পরিপন্থী। তাই ছলে, বলে, কৌশলে, এই দেশগুলির অগ্রগমন ব্যাহত করার কত রকম চেষ্টা চলেছে। বলা হয়, পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রগমন 'গণতন্ত্র'কে হত্যা করে, সুতরাং (মাকিন) খয়রাতি অথবা/এবং ঋণের সাহায্যের ভিত্তিতে গঠন চলুক। অবশ্য অত্যল্প যে জাতীয় আয় এতে বৃদ্ধি পাবে, তা হু হু করে বেড়ে চলা জনসংখ্যার চাপে, স্থানীয় সরকারের দুষ্কার্যে, শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা অর্থ নয়ছয় করা, কিছু অংশ মুনাফারূপে পশ্চিমী দেশে প্রত্যাবর্তন—সব মিলে তার দ্বারা এমন কিছু স্বর্গ উদ্ধার হবে না। কিন্তু প্রচলিত শাসকশ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, নইলে বৃহৎ বাজার ভেঙে পড়বে, ধনবাদের আভ্যন্তরীন বৈপরীত্য তীব্র করে তুলবে। তাই পশ্চিমী ধনবাদীরা যেমন মুখে বলছেন যে খয়রাতি সাহার্য্য বা ঋণদানের মাধ্যমে প্রাচ্যের দেশগুলির অগ্রগমন সাফল্যমণ্ডিত হবে, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঐ সমস্ত প্রাচ্যের দেশগুলির এমন সামাজিক অংশের সঙ্গে আঁতাত করছেন যে, স্পষ্টই বোঝা যায় এ সাহায্য অর্ধোন্নত দেশগুলিতে শাসনক্ষমতাকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যদান মাত্র।

একটু তত্ত্বজ্ঞ কেতাবী অর্থনীতিবিদদের নিকটে আর্থিক বিকাশের প্রশ্ন

আরও জটিল। তাঁদের মতে (১) গতিমূলক শর্তের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের এমন কোনও নির্দিষ্ট পন্থা পাওয়া যায় না যার ফলে সম্পদসমূহের যুক্তিপূর্ণ নির্বাচন-মূলক নিয়োযনে সাফল্য হবে। (২) অর্ধোন্নত দেশের শ্রমসমাজের কার্য-কারিতার দুর্বলতা, (৩) স্বদেশে সাংগঠনিক ও পরিচালনার প্রতিভার অভাব, (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেনদেনের অসৌসাম্য—এ সবই দেখিয়ে দেয় যে, অনুন্নত দেশের অগ্রগমন মানচিত্রহীন সাগরে পাড়ি দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। এই নেতি আলোচনার আরেক কোটিতে আছেন নব্য ম্যালথাসপন্থীরা। তাঁদের মতে, জনসংখ্যার বর্ধমান চাপ বন্ধ না হলে, প্রগতি মূল্যহীন।

কিন্তু অর্থনৈতিক প্রগতি কী! পল বারানের মতে, অর্থনৈতিক প্রগতি (বা উন্নয়ন) হল নির্ধারিত সময়ে মাথাপিছু বাস্তব দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। প্রসঙ্গতঃ তিনি কলিন ক্লার্কের উক্তিও স্মরণ করেছেন। "অর্থনৈতিক প্রগতিকে সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, সহজ কথায় ইহা হইল আর্থিক কল্যাণবৃদ্ধি। পিগুকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়—প্রাথমিক মতে, সেই সমস্ত দ্রব্য ও সেবার বাহুল্য যাহাদের সাধারণতঃ মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় হয়।" (অর্থনৈতিক প্রগতির শর্তাবলী, পৃঃ ১)। অবশ্য বারান উপরোক্ত সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেন নি, কারণ, (১) বহু দ্রব্য আছে, যাদের উৎপাদন (যেমন সমরায়োজন) আর্থিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু আর্থিক প্রগতির সঙ্গে যুক্ত ; (২) বহু কল্যাণ-মূলক সেবা ইত্যাদি (যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পথঘাট, সাঁকো) অর্থের দ্বারা বিনিময় হয় না। আবার অনেক দ্রব্য বা সেবা আমরা ভোগ করি যা অর্থনৈতিক কল্যাণে আসে না (যেমন, পেটেণ্ট ঔষধ, সৌন্দর্য-প্রদর্শনী, মাদক দ্রব্য প্রভৃতি) ; (৩) আর্থিক কল্যাণবৃদ্ধি উৎপাদন না বাড়িয়েও সম্ভব (যেমন বণ্টন পরিবর্তন করে) ; যদিও আর্থিক উন্নতি যত কম খরচে হয় ততই ভালো, কিন্তু বেশি খরচেও যদি বেশি উৎপাদন অর্থনীতি ধারণ করতে সক্ষম হয়, তবে আর্থিক অগ্রগমন ঘটছে বলা চলে। সুতরাং সহজবোধ্য আলোচনায় নিম্নলিখিত নীতিগুলি মনে রাখাই যুক্তিযুক্ত ; (১) সমগ্র বা এগ্রিগেট সম্পদ নিয়োগ—সংগঠন এবং/অথবা শিল্পশৈলী পরিবর্তন ব্যতীতই ব্যাপ্ত হতে পারে ; (২) প্রতি একক কর্মে নিযুক্ত সম্পদ পিছু উৎপাদিকা, সংগঠনের পটুত্বের পরিবর্তনের ফলে বাড়তে পারে ; (৩) সমাজের 'যন্ত্রবাহু' বাড়তে পারে ; অর্থাৎ (ক) পুরনো ধ্বস্ত মূলধনের বদলে নতুন এবং/অথবা নতুন (যান্ত্রিকভাবে উন্নত বা অপরিবর্তিত) মূলধন প্রাক্তন অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অবশ্য প্রথম

তিনটি পন্থা—১, ২ এবং ৩ (ক) এর মাধ্যমে নীট মূলধন গঠন সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু নীট বিনিয়োগ তখনই কার্যকরী হতে পারে, যখন সমাজের সমগ্র উৎপাদিত দ্রব্য—বর্তমান ভোগ এবং ঐ সময়ে উৎপাদনজনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য ব্যয়ের যোগফলের চাইতে বেশি হবে। সুতরাং, আয়তনে ও নীট লগ্নির প্রকৃতিতে, কোনও নির্দিষ্ট সময়ে, আয় বৃদ্ধি—অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও নিয়োগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

পল বারান অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত আলোচনা করতে গিয়ে ঘটমান উদ্বৃত্ত (ঘটমান উৎপাদন হতে ঘটমান ভোগের বিয়োগফল) এবং সম্ভাবিত উদ্বৃত্তের (যে দ্রব্য উৎপাদন করা দত্ত প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক পরিবেশে সম্ভব, সেই পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্য হতে প্রয়োজনীয় ভোগের বিয়োগফল) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত সঞ্চয়নের জন্য সামাজিক বহু বিস্তৃত পরিবর্তন ধরে নিতে হবে, নতুন বণ্টনের ব্যবস্থা গড়ে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথমত সমাজের বেশি ভোগ (উন্নত আয় গোষ্ঠীর), দ্বিতীয়ত অযৌক্তিক এবং উড়নচণ্ডী সংগঠনের দাক্ষিণ্যে দ্রব্য নষ্ট; তৃতীয়ত অনুৎপাদক ব্যক্তিদের ভোগের জন্য দ্রব্য নষ্ট; এবং চতুর্থতঃ বেকারীর জন্য উৎপাদন নষ্ট প্রাথমিক-ভাবে যা ধনবাদী উৎপাদনের নৈরাজ্য ও কার্যকরী চাহিদাহীনতার জন্য ঘটে—সমস্তই এই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এসে পড়ে।

সুতরাং উদ্বৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, তথাকথিত উন্নত অর্থনীতিগুলি কি বর্তমানে আর্থিক উদ্বৃত্ত বিষয়ে নতুন কিছু ভাবছে? বরং উন্নত দেশগুলিতে যত বেকার মূলধন জড়ত্ব পাচ্ছে তত সমরায়োজন, পুনরস্ত্রসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান চালাবার চেষ্টা চলেছে। "বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের জয়যাত্রা, ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া, জোর দিয়া বলিতেছে যে, মূলধনী সম্পত্তিগুলি পরিত্যক্ত স্তূপ হইতে চলিয়াছে। গঠনমূলক ধ্বংসকাণ্ড গতিশীল অর্থনীতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে; প্রকাণ্ড মূলধন লগ্নির সুযোগ গড়িয়া উঠিতেছে।" [ই. এ. সোয়ান সন এবং ইপিস্কীউড—অর্থনৈতিক স্থাণুত্বেয় অগ্রগতি, (উদ্ধৃত বারান, পৃ ৪৬১)] বারানের মতে একচেটিয়া যুদ্ধবাদীরা আর বৃহৎ যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, কিন্তু আর্থিক উদ্বৃত্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে উৎপাদনে ব্যয়িত হবে, সঙ্গে সঙ্গে জনগণমন ভীতিতে আকণ্ঠ ক্লিষ্ট রেখে, মধ্যে মধ্যে দেশান্তরে

পুলিশী ব্যবস্থা চালু করে সাধারণ উন্নতি বজায় রাখার চেষ্টা চলবে। যদিও কীনস্ বলেছিলেন যে আভ্যন্তরীণ পূর্ণকর্মসংস্থান যদি দেশগুলি করতে পারে তবে অন্যদেশের বিরুদ্ধে স্বার্থ সংঘাতের প্রয়োজন হবে না (সাধারণতত্ত্ব পৃ ৩৮২)। পল বারান, কীনসেরই সুযোগ্যা শিষ্যা শ্রীযুক্তা যোন রবিনসনের বক্তব্য এ-স্থলে ব্যবহার করেছেন "বর্তমান যুগে, কোনও সরকারের ক্ষমতা এবং ঈপ্সা উভয়ই ধনবাদের বৃহৎ অসুবিধাগুলি দূর করিতে রহিয়া থাকিলে, ইহাকে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিবার ঈপ্সা এবং ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, যে সরকারগুলির (এই) ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার মত শক্তি রহিয়াছে তাহাদের অসুবিধাগুলি দূর করিবার কোনও ইচ্ছা নাই" (ইকনমিক জর্নাল। ১৯৩৬, পৃ ৬৯৩)। কী বৈপরীত্য !

পশ্চাৎবর্তীতার মূল আলোচনা প্রসঙ্গে পল বারান ভারতবর্ষে ইংরেজ-শোষণ ও শাসন লিপিবদ্ধ করেছেন। বারান দেখিয়েছেন, কীভাবে ভারত হতে লুঠতরাজের সোনামুক্তা গ্রেট ব্রিটেনের আর্থিক উন্নতির ধারক হয়েছে। বারান দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ যদি নিজে বিকাশলাভ করত, তবে পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্য রকম হত। উইলিয়ম ডিগবী তাঁর "প্রসপারাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে বলেছেন, পলাশি হতে ওয়াটারলু পর্যন্ত ভারত হতে লুণ্ঠনের পরিমাণ ৫০ কোটি থেকে ১০০ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু, ঐ লুণ্ঠনের পরিমাণ কত তীব্র ছিল তা বুঝতে হলে, জানতে হবে যে ঐ সময়ে ভারতে ব্রিটিশ যৌথ মূলধন-কারবারীদের মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

বারানের মতে 'অর্ধোন্নত দেশ' বলতে বুঝব এমন দেশ, যেখানে উৎপাদন পরিমাণ কম, এবং এগুলিতে মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির কর্মে নিয়োজন অসম্পূর্ণ, অথবা একেবারেই নিয়োজন হয় নাই। এ দেশগুলিতে ধনতন্ত্র আবিষ্কার বা অন্যান্য আবশ্যিক কর্মে তো আত্মবিস্তার করেই নাই, বরং আর্থিক জড়ত্ব, মান্ধাতার আমলের শিল্পশৈলী এবং সামাজিক পশ্চাৎবর্তীতা তার প্রতিনিধি। এসব দেশে আর্থিক উদ্বৃত্ত তো কম বটেই, উপরন্তু উৎপাদনশীল জনমণ্ডলীর ভোগবিন্যাস একেবারে নিম্নস্তরের, এমনকি বলা যেতে পারে প্রাণধারণের উপকরণ হিসাবেও বিন্যাস সর্বনিম্ন স্তরের। এই দেশগুলির মূল উপজীবিকা কৃষি, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতখণ্ডে চাষোপযোগী

জমিও খণ্ডিত, আবার নিজেদের ভরণপোষণের জন্যই যে এই প্রাথমিক উপজীবিকায় নিযুক্ত কর্মীরা উৎপাদন করছে তাই নয়, উৎপাদনের একটি মোটা অংশ খাজনা বা কর (অথবা উভয়ই) হিসাবে ব্যয় হয়। এদের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ এতই কম যে বিশাল জনসংখ্যা জমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও এমন কিছু উৎপাদন হ্রাস পাবে না। গুণগতভাবে জীবিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে, বৃহৎ অংশই অর্ধ-বেকার বা লুক্কায়িত-ভাবে বেকার।

অতএব, যদি অর্ধোন্নত দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থাগত উপকরণ বিষয়ে আলোচনা করা যায়, তবে আরও নতুন আরেকটি দিক আমাদের নজরে পড়ে। উৎপাদনের পরিবেশে যেমন আমরা দেখলাম—ক্ষুদ্র জোতে স্বল্প উৎপাদন, তেমনি জমির মালিকানা যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূ-স্বামীর, অতএব নতুন যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যেমন অসম্ভব জোতের খণ্ডতা ও সীমাবদ্ধ উৎপাদন ও স্বল্পআয়ের দাক্ষিণ্যে; তেমনি ভূমির উৎপাদিকাও সার, সেচ প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে একান্তই স্বল্প। যদিও কৃষিবিভাগে উৎপাদিত আর্থিক উদ্‌বৃত্ত দেশের সব উৎপাদনের অন্তত অর্ধাংশ, তবুও বিভিন্নপথে অনুৎপাদক ব্যয়ের পর উন্নতির কোনো দরজাই খোলা থাকে না। শুধু খামার জাতীয় বৃহৎ উৎপাদন বৃহৎ বাগিচাগুলিতেই দেখা যায়, এবং মালিকের মুনাফার পরিমাণ এখানে কিন্তু যৎসামান্য নয়। সেক্ষেত্রে যেমন বৃহৎ খামার, তেমনি মূলধনের পরিমাণও তো স্বল্প নয়! এবার অবশ্য কেউ বলতে পারেন, তবে চাষীর হাতেই জমি দেওয়া হোক, খণ্ড খণ্ড জোতে বিভক্ত করে। পল বারানের মতে, রাজনৈতিক রণধ্বনিতে তা যতটা বর্ণাঢ্যই দেখাক, বস্তুতঃ তার পরবর্তী ফল নিতান্তই অন্য হতে পারে। বৃহৎ উৎপাদনের ফলপ্রসূতা যেমন এক্ষেত্রে রইল না, তেমনি হয়তো ভূস্বামীকে বেশি বেশি খাজনা দেওয়াও যেমন বন্ধ হল, হয়তো প্রাথমিকভাবে ব্যয়যোগ্য হস্তধৃত আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি হল; কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ অবিলম্বেই পূর্বের দারিদ্র্য ফিরিয়ে আনবে। এর ফলে বিপনণজাত বিক্রয় ব্যবস্থাও শহরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু ভূমিবিপ্লবেই যে কিছু হবে না বারান সেটা পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছেন। উন্নত দেশগুলিতেও অবশ্য এক সময় পাশাপাশি ভূমিবিপ্লব ও ভূমিপ্রতিবিপ্লব চলেছিল। অর্থাৎ সামন্তপ্রথা ভঙ্গজাত প্রাথমিক কৃষি-বিপ্লবের পশ্চাতে এল কৃষিক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের বৃহৎ খামার-ব্যবস্থা। এমনকি, দ্বিতীয়তঃ,

শারীরিক শক্তি নিয়োগের মাধ্যমেও উদ্বৃত্ত জনমণ্ডলীকে শিল্পে কাজ করার পথ পরিষ্কার করা (সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে যারা রইল তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা), তৃতীয়তঃ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষির প্রয়োজনে যন্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থার পথ তৈরি করা হল। অতএব অর্ধোন্নত দেশগুলিতে বারানের সমাধান এক্ষেত্রে চাষীর যথার্থ অভীপ্সালাঞ্ছন, 'চাষীর হাতে জমি দেওয়া', পাশাপাশি বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্মতভাবে সমবায় গঠন—স্বাধীন এবং উৎপাদকের দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রগতভাবে উন্নত খামার।

দরিদ্র অর্ধোন্নত পিছিয়ে-পড়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অ-কৃষি অংশ দেশের একটি বৃহৎ আর্থিক উদ্বৃত্ত দখল করে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিভিন্ন দখলদার চরিত্র রয়েছে। প্রথমত, ব্যবসায়ীরা, মহাজন এবং নানা ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী রয়েছে, যারা হয়তো গ্রামে থাকে কিন্তু কৃষি উৎপাদনের জন্য মুখ্য ভূমিকা নেই ; পরন্তু নানা উপায়ে, হাজার রকম পন্থায় উৎপাদনের মোটা অংশ করায়ত্ত করে, কিন্তু এই ভূমিকাগুলির মধ্যে মধ্য-ব্যবসায়ীর সংখ্যা যেহেতু ক্রমশ বেড়েই চলে, দেখা যায় গড়ে হয়তো আয় খুব বেশি নয়, কিন্তু উৎপাদন না করা, ব্যবসার মাধ্যমে সমস্ত উপার্জনের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নয়। গ্রামের বেকার কৃষকের ভরণপোষণ নির্ভর করে; দু মুঠো খেয়ে বাঁচার পারিবারিক আয়ের অংশ থেকে, বাকি অংশের বিরাট পরিমাণ তো বিভিন্নধর্মী খাজনারূপে জমির মালিকের পাওনা। শহরে ছোটবড় ব্যবসায়ীর ঝাঁকের আয় নির্ভর করে, যে-উদ্বৃত্ত চাষী রাখতে পারে না তারই উপর। তবেই দেখা গেল, কেমন পন্থায়, একটি স্বদেশী বিরাট উৎপাদনের অংশ, অর্থনীতিতে "পরগাছা" অংশগুলির ভোগে লাগল, কিন্তু সে সঞ্চয় উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত হল না। ব্যবসায়ীর কাছে জমি কেনাই মুখ্য লক্ষ্য বলে মনে হবে, খাজনার পরিমাণ যেখানে উচ্চ, অথচ শিল্পে লগ্নির ঝুঁকিও নেই। অথবা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী ব্যবসায়ীদের তল্পীবাহক শিল্পায়নে, আমদানী-রপ্তানী, ঋণ দেওয়া এবং ফাটকাবাজী করাও লোভনীয়। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে যে সংকীর্ণ বাজারও রয়েছে, তার প্রভূত্বও একচেটিয়া পুঁজির। পল বারান দেখিয়েছেন যে, এই একচেটিয়া মালিকানায় জাত আয় উন্নত দেশের মত মূলধন বৃদ্ধির সহায়তা করে না, বরং জমির উড়নচণ্ডী মালিকদের মতই নানা অনুৎপাদক পন্থায় ব্যয় হয়ে যায়, উপরন্তু একটি বিশাল অংশ বিদেশী অংশীদারদের

কাছে যায়, বাকি অংশ খাজনার লোভে জমি কেনা, নানা রকম ব্যবসাদারীরা ব্যাপারীর কারবারে, সুদগ্রহণে ও ফাটকাবাজীতে লগ্নি হয়। পুরোপুরি বিদেশী মালিক যখন দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রবেশ করে, দেখা যায় তারা মোটা মাইনের কর্মচারী রাখে, যারা আয় ও সঞ্চয় বিদেশে পাঠায়, এরা যখন রপ্তানীদ্রব্য তৈরি করে, ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ে। এই মূলধনের মালিকদের লগ্নিগত তাৎপর্য অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, জবরদস্তি করে দখল করা বা স্বল্পমূল্যে কিনে নেওয়া বাগিচার জমি বা খনি প্রভৃতিতে তারা মূলধন লগ্নি প্রথমে একেবারেই সামান্য করেছিল, এবং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি মুনাফার অংশ হতেই সহজে সম্ভব হয়েছে, বিদেশ থেকে বেশি কিছুই আনতে হয়নি। তাই এখন দেখা যায়, পশ্চিমা মালিকরা ব্যক্তিগত মালিকানার পবিত্রতা উচ্চারণে কী গদগদ। চলতি লগ্নিমূলক বিদেশী তৎপরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব আলোচনায় বারান বলেন যে, খনি প্রভৃতিতে দেশী শ্রমিক সংখ্যার পরিমাণ যাই হোক না কেন, কোম্পানীর মূল আয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ তারা মজুরি হিসাবে পায়। উপরন্তু যন্ত্রগত জ্ঞানে অভিজ্ঞ থাকায় বিদেশী মালিকের নিজের দেশের লোকজন উচ্চ-পদস্থ থাকে, সুতরাং তাদের আয়ের মোটা অংশটাই বিদেশে চলে যায়, এবং স্বদেশী শ্রমিকদের দ্রব্যের চাহিদা হলেও, দূর বাজার থেকে আনা প্রয়োজন, তাই সে চাহিদার উপযুক্ত উত্তর দিতে স্বদেশী যোগানও বৃদ্ধি পায় না। তাছাড়া মোটা অংশ প্রতি বছর মুনাফা ও সুদ হিসাবে বিদেশে চলে যায়। উপরন্তু, কৃষির বাইরে যে উদ্‌বৃত্ত ভোগকারী রয়েছে, তা হল রাষ্ট্র। বারান রাষ্ট্রীয়ভাবে, জাতীয় আয়ের বিশাল তহবিল তছরুপের নানা সংবাদ পরিবেশন করেছেন, যাতে বলা যায় রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক অর্ধোন্নত দেশে প্রায়শই শিল্পায়ন সংগঠিত করতে সক্ষম হয় না।

বারান অর্ধোন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধিগত সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যার বাহুল্যই সমস্যা নয়, পরন্তু একচেটিয়া ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদই সমস্যা সৃষ্টির কারণ। জনসংখ্যার বিশালতা শাপে বর করা সম্ভব, তাও তিনি দেখিয়েছেন।

অবশেষে, বারান খাড়াই উত্থানের বিষয় আলোচনা করেছেন।

ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে পশ্চিমী পৃষ্ঠপোষকতায় অনুন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা জনপ্রিয় আন্দোলনগুলিকে দমন

করবার জন্য অস্ত্রসজ্জা বাড়ায়, উপরন্তু সমাজতন্ত্রের উন্নত কর্মপ্রচেষ্টাকে নিন্দা করার জন্য ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার প্রভৃতির রক্ষাকার্যে সোচ্চার হয়। সুতরাং, সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য পন্থায় অনুন্নত দেশগুলির বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু অনুন্নত দেশে এইরূপ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ জটিল। শুধুমাত্র যে সারাদেশে ব্যাপ্তভাবে উৎপাদন-শক্তিগুলিকেই বিকশিত করতে হবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও পরিবর্তিত করতে হবে।

পুরাতন সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গঠনের ফলে প্রাথমিকভাবেই সম্ভাব্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে। অনুৎপাদক ভোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশাল পরিমান উদ্বৃত্ত সমাজের হাতে আসবে। অনুৎপাদক শ্রমে যথা ব্যবসা, দালালী, মহাজনী, নিশীথ আড্ডা ঘরে, হোটেলে, দোকানে ইত্যাদি ইত্যাদি অনুৎপাদক স্থানে যারা ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের নতুন উৎপাদক-কর্মে নিয়োগ সম্ভব হবে। বেকারদের তো কথাই ওঠে না। এ সমস্ত গড়বার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ সংগঠন প্রয়োজন। দ্রুত শিল্প-বিকাশের জন্য মূলশিল্প ও যানবাহনের দিকে প্রাথমিক নজর দিতে হবে। শিল্পায়নের পাশে পাশেই কৃষিরও তুমুল বিকাশ সম্ভব হবে এবং পরিকল্পনার মধ্যে পরিচালনাজাত পরিকল্পিত সঞ্চয়, পুনরায় শিল্পায়নের বিনিয়োগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। বিপ্লবের ফলে বা পরিকল্পনামূলক সমাজতন্ত্রী উৎপাদনের প্রাথমিক যুগে উৎপাদন, সহসা গণ্ডগোলের ফলে কমে যেতে পারে, কিংবা ব্যক্তির নোংরা ভূমিকাও কখনও নজরে পড়তে পারে। কিন্তু উৎপাদনের অর্গল মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আপদ দূরে যাবে।

ক্রুশ্চেভ রিপোর্টের স্টালিনের কার্যকলাপ সম্পর্কীয় বক্তব্য প্রসঙ্গে বারান বলেন, স্টালিন বা তাঁর হাতের পুতুলদের খারাপ কাজের অভিযোগ সমাজ-তন্ত্রের উপর আনা যায় না। যে রাজনৈতিক অবস্থা বিদেশী আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিঘাত বিধ্বত পিছিয়ে-পড়া দেশে পড়িমড়ি ছুটে আত্মবিকাশের অস্থিরতার ফলে জন্ম নেয় সেই অবস্থাই এর জন্য দায়ী। পরিশেষে তিনি এ থেকে শিক্ষা নিতে বলেন: "Socialism in backward and under developed countries has a powerful tendency to become a backward and under developed Socialism." বারান পশ্চিমী দেশ-গুলির সামনেও সম্পূর্ণ উন্নত ভবিষ্যতের যে ছবি রেখেছেন, তা সমাজতন্ত্রের।

অতিদূর আলোরেখা

মণীন্দ্র রায়

যেন কোনো বনের কিনারে
আজ নয়, অন্য জন্মে, আমি যৌবনের
সহজ নেশায় মেতে সারাদিন চড়ুইভাতির
আনন্দের কোলাহলে কাটিয়েছি বেলা।
বিকেলে কী ঘুম এল, হঠাৎ জাগার পরে দেখি—
ওরা নেই, ভেঙে গেছে মেলা!

ছড়ানো কাগজ, পাতা, শূন্য টিন, নেভানো উনুন,
বহু পোড়া কাঠ, ছাই, এমন কি শালের মঞ্জরী
যা তোমাকে দিয়েছি সকালে, সব ফেলে
সবাই ফিরেছে, তুমি—তুমিও গিয়েছ সহচরী

মুহূর্তেই পৃথিবীর চেহারা বদলায়
চারিদিকে ঋজু শাল, হাওয়া নেই শূন্যতার বুকে
গম্ভীর মাদল বাজে স্থির অন্ধকারে।
মনে হল একা আমি, উৎসবের দিন
অতিদূর আলোরেখা, কোনো ঘরে আর স্মৃতি নেই,
তুমিও ভুলেছ একেবারে॥

মুগ্ধতা উচ্ছ্বসিত

শিবশম্ভু পাল

আমার উচ্ছ্বাস তোমরা ক্ষমা করো। নিসর্গসুন্দরী,
বনে উপবনে যত পাখী আছে সম্মিলিত করে হেসে ওঠ
দিনান্তের পারে ওই চকিত দর্শন পাওয়া আকাশের দেশে
দাঁড়াও আঁখির আগে, বিবশ অঙ্গের সামনে উদ্‌ভাসিত জ্যোতি।

মরি যদি সেও ভালো তোমাদের সন্নিধানে এসে
জীবন্ত বাহারি যেন যূথচারি কতগুলি রূপবতী মেয়ে
গায়ে গায়ে ঢলে পড়া, প্রগলভতা, রঙে রঙে শিশুচিত্র শোভা
মাত্রায় শাসিত নয়, তবু এক অনুপম শিল্পসৃষ্টি পরিব্যাপ্ত দেখে
গুহায় ফেরার পথে সুনির্মল হই।

তারপর দেয়ালে দেয়ালে
উজ্জ্বল সাদার স্তর পড়ে আছে দেখতে অভিলাষী।
টাটকা চুনের গন্ধে কুসুমের গন্ধ মিশে যাবে, চিন্তা করি।

ভিনগাঁয়ের

রণজিৎ সিংহ

ভিনগাঁয়ের ঢ্যাঙা লোকটা ফিরে গেল।
তার কাঁধের সেই কিম্ভূত ঝোলায়
রাজ্যের খোশমেজাজি গল্প
ডোরাকাটা রঙের জড়োয়ায়
তুড়ুক তুলতুল হেঁয়ালি।

জাগায় স্বপ্নে অবিশ্বাস্য সুদূরে হারিয়ে গিয়ে
বুকের কোন পাথার থেকে
সে কথা উপড়ে আনত
রোদবৃষ্টির নক্সিতে
বুনত বারোমাসের পালা।
এই গ্রাম দুলে উঠত।

ও চলে যেতে
গ'লে পড়ল কান্নায়
তারপর চোখ মুছে
দিগ্বিদিকে দিশেহারা ছুটল এই গ্রাম :

কোথায়, কোন মুখে গেল হে
আমার দরদিয়া!

প্রার্থনীয় আলো

অনিরুদ্ধ কর

কোটি কোটি মণি জ্বলছে অন্ধকার খনির গহ্বরে।

উর্ধ্বদেশে—শতছিন্ন চন্দ্রাতপে ঝরে পড়ছে কণা
কণা তপোভ্রষ্ট আলো ; অলৌকিক নিষ্ঠুরতা নীল
বড় নীল নির্বিকার ধাতব শরীর। উচ্চৈঃস্বরে
কথা বলছে আগন্তুক হাওয়া ; ধীরে, তীর্থের সলিল
ব্যতিরেকে যজ্ঞকর্ম হবে না সমাধা, হে প্রার্থনা
তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এস, পূত জাতিস্মর
প্রেমের কবচ আমি বেঁধে দেই দক্ষিণ বাহুতে,
বামহস্তে কমণ্ডলু পূর্ণ কর পূর্বপুরুষের
তর্পনের জলে, যাত্রাকালে নাসারন্ধ্রে নিশ্বাসের
গতি বুঝে পদক্ষেপ কর, নিলে নিশ্বাস আয়ুতে
আগন্তুক হাওয়া আনবে গজ বাজী রথ ধনুঃশর

মৃত্যুর খণ্ডিত দুই রাজ্যদ্বয় পর্যটিত হলে
অচিন জহুরী দেখবে কর্মব্যস্ত স্নিগ্ধ উৎসবের
অলংকৃত কারুকার্যে। অতঃপর অশ্রুজলে
পদপ্রক্ষালন কর হে প্রার্থনা দিগ্বিজয়ী, ছাখ অরণ্যের
মধ্যে আলো, আলো, আলো, আলোর নির্ঝরে
কোটি কোটি মণি জ্বলছে আলোকিত খনির অন্তরে।

একটা মামুলি গল্প

সুলেখা সান্যাল

দরজাটা বন্ধ ছিল অভ্যস্ত নিয়মের বাইরে, এমনকি ওরা আসবে জানা থাকা সত্ত্বেও। কেন বন্ধ করে রেখেছিল সে কথা সরমা নিজেও হয়তো জানত না। হয়তো দরজা খুলতে যাবার আগে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া যাবে কিংবা আঙুলগুলোর মৃদু কাঁপুনিকে একটা মুহূর্তের শক্তিতে শক্ত করে নেবে ভেবেছিল। হয়তো কিছুই না, এমনি, কিংবা সোমেশের হাতের পরিচিত কড়ানাড়ার শব্দটা শুনতে পাবে বলে। নইলে কেবলই কেন একথাটা তার মনে হচ্ছে—একটা অনির্দেশ্য আশংকার মত মনে হচ্ছে—আজই শেষ। এবাড়ির দরজার কড়ায় আর কোনোদিন পরিচিত হাতখানা পড়বে না। কেন তা সে জানে না। কত কেনর উত্তরই তো তার জীবনে মেলেনি, কত কেনই তো চোখের জলে, মনের বিস্ময়ে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে।

দুপুরে কাজ থেকে সাইকেল নিয়ে রোদে ঘামতে ঘামতে এসে অধৈর্য হাতে কড়া নেড়ে ঢুকে উত্তপ্ত গলায় সোমেশ বলেছিল, 'কেন এই মেয়েটা বোঝে না বল তো? কেন? আমি তো ওকে স্পষ্ট করে বলেছি, নিষ্ঠুরের মত বলেছি তবু কি ওর লজ্জা নেই, ওর রাগ নেই; অভিমান নেই! তবু কেন ও আসছে? আর আসছে আজই, আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই! তোমার সঙ্গেই বা ও দেখা করতে চায় কেন!'—ছটফট করতে করতে আরও নিষ্ঠুরের মতো চিঠিটাকে সরমার মুখে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শক্ত গলায় সোমেশ বলেছিল, 'দেখি টাইমটেবিলটা, এখখুনি যে ট্রেন পাই তাতেই রওনা হব। ওকে এখানে আসতে আমি দেব না।'

সরমা টাইমটেবিল দেয়নি। সোমেশকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে চিঠিটা পড়া শেষ করে ওর দুই বিরক্তিমাখা চোখের দিকে চোখ তুলে করুণ একটু হেসে বলেছিল, 'আমার একটা কথা রাখবে, সোমেশ?'

চোখ নামিয়ে সোমেশ বলেছিল, 'বল'।

'ওকে আসতে বাধা দিয়ো না। এলে আমার কাছে শুধু পৌঁছে দিয়ো। কেমন ?'

'আমি পারব না' উদ্ধত আর শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সোমেশ, 'আমি কি জানি না কেন ও আসছে ? কেন ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়! ও তোমাকে অপমান করবে—অভিশাপ দেবে, তোমার নামে কুৎসা রটাবে, তোমার মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে যাবে এ আমি জানি।'

সরমা তার সেই অভ্যস্ত ক্লান্ত, বিষণ্ণ হাসি হেসেছিল, 'তাতে আমার কি সোমেশ ? কুৎসা, গালাগালি, অপমান এটা কি আমার পক্ষে খুব ভয়ঙ্কর একটা কথা ?'

'তুমি যে এখনও সুস্থ হওনি। মানসিক যন্ত্রণা তোমাকে যে কি করে দেয় তাকি আমি দেখিনি ? ও যে তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে না তা কে জানে। না না শোন…', উত্তেজিত উত্তপ্ততা থেকে একটা অসহায় নিরুপায়-হতাশায় ভেঙে পড়ে সোমেশ বলেছিল, 'শোন, আমি তো তোমার কাছে কিছুই চাই না—কিছুই না। সাধারণ মানুষের মতো কোনো স্বপ্ন নয়, কোনো সুখের আকাঙ্ক্ষা নয়। মাধবীকে সে কথা আমি কতবার বলেছি—বলেছি তুমি যা ভাবছ তা নয়; তুমি যা ভেবেছ তা নয়, কী তাও আমি জানি না। কিন্তু তোমার ওই ঘরবাঁধার স্বপ্ন থেকে আমাকে মুক্তি দাও। আঃ, মেয়েটা কী যে বোকা! কী অদ্ভুত সাধারণ সুতোয় বাঁধা ওদের মনের জোড়গুলো! তার উত্তরে ও আমাকে কি বলেছিল জান…?'

"জানি। বলেছিল 'বাজে কথা তোমার। মিথ্যের ওপর একটা সূক্ষ্মতার আবরণ দিয়ে তাকে মহিমাময় করে তোলবার চেষ্টা। এ সব বুজরুকী'। তাই না সোমেশ ?'

'তুমি এ কথা কি করে জানলে সরমা ?'—উত্তপ্ত সোমেশের মুখটা বিস্ময়ে, বেদনায় কোমল হয়ে এসেছিল নিমেষে।

সরমা আবার হেসে উঠেছিল 'আমিও কি একদিন এই কথাটাই বলিনি ? আঃ, তুমি বড় ভুলে যাও, সেই যে, 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ'! তাইতো বলছি ওকে আসতে দাও। ও যদি আমাকে অপমান করতে চায় করুক, অভিশাপ দেয় দিক, তবু ও আমাকে দেখুক। ওকে আমার কাছে একটু কাঁদতে দাও।. তারপর… ।'

৩

'তারপর ? ও যদি তোমার কাছে অসম্ভব কিছু দাবি করে ? যদি তুমি তাতে রাজি হও ? যদি··· !'—ছট্‌ফট্‌ করে উঠেছিল সোমেশ।

'কি দাবি করবে—কতখানি ? আমার এমন কি আছে যা আমি ত্যাগ করতে পারি না সোমেশ ? কি ?'

স্তম্ভিত, ব্যথিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় সোমেশকে সরমাই হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, 'তোমার টিফিনের সময় শেষ হয়ে গেছে। অফিস যাও, পাগলামি কোরো না। আর সন্ধ্যেবেলা ওর ট্রেনটা অ্যাটেণ্ড করবে। নতুন জায়গা, ওকে বিপদে ফেলো না। ওর প্রতি এটুকু সৌজন্য থেকে সরে দাঁড়ালে আমি কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করব না।'

সোমেশ যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়েছিল—দাঁড়িয়েছিল একেবারে সরমার মুখোমুখি। ওর লম্বা-চওড়া দেহটার সামনে সরমাকে দেখাচ্ছিল এতটুকু কিন্তু তবু যেন ও পৌছুতে পারল না সরমার চোখের সামনে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা ঘাসের ফুলের মতো আকুতিতে ভরে উঠল তার সমগ্র সত্তা।' একেবারে কান্না-ভেজা গলায় সে বলেছিল, 'যাব আমি—স্টেশনে যাব। ওকে পৌছেও দেব তোমার দরজায়। কিন্তু সরমা! এতটুকু দয়া করো আমাকে—কোনো অসম্ভব দাবিকে মেনে নিয়ো না তুমি। আমি আবারও বলছি আমি কিছুই চাইনে—শুধু তুমি বেঁচে থাক, শুধু তোমার অস্তিত্বকে আমি যেন অনুভব করতে পারি—শুধু এইটুকু ভিক্ষে আমাকে দিয়ো'—তারপর ঝড়ের মতো বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

আঃ, কতক্ষণের জমানো চোখের জল এতক্ষণে ভেঙে পড়েছিল সরমার। দরজা-জানলা বন্ধ অন্ধকার ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে কান্নার প্লাবন বয়ে গিয়েছিল অনেকদিন পরে। বিস্মৃতপ্রায় অতীতটা এসে চোখের সামনে জুড়ে বসল আর অন্ধকার ঘরটার চারিপাশে ঘিরে ঘিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল একটা অভিমান, একটা দাবি, একটা ঝড়ের মতো চলে যাওয়া।

তারপর বিকেল কেটেছে। বিকেলে নদীর ধারে বেড়িয়েও এসেছে সে, আর পড়ন্ত সূর্যের দিকে, পরিচিত বটগাছটার দিকে, সন্ধ্যার আসন্ন ছায়ার দিকে তাকিয়ে অনেকদিন পরে হঠাৎ তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। মনে হয়েছিল কেন নয় ? কেন সেই সুখ আমি পাব না যা মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে শূন্যতা থেকে আনন্দের আকাশে। কেন আমার সব এমন করে

শেষ হয়ে যাবে! কেন আমি বাঁচব না। হাসব না। ভালোবাসব না। শুধু অকারণ আনন্দে খুশি হয়ে উঠতে পারব না! কেন! আঃ, আবার সেই কেন ?

ক্লান্ত মন্থর পায়ে বাসায় ফিরে এসে সে প্রতিষ্ঠানের কাগজ-পত্র নিয়ে একটু বসেছিল। পরশু তার কাজে যোগ দেবার দিন। দুমাস ছুটি ফুরিয়ে গেছে কিন্তু শরীর সুস্থ হয় নি। ডাক্তার বলেছেন কাজ করা তার উচিত নয়। ডাক্তার যা বলেন নি তাও সে জানে। জানে, মৃত্যুকে সে যে কোনো সময় ডেকে আনতে পারে যদি মানসিক শান্তিতে না থাকে, যদি অবহেলা করে নিজেকে।

এতদিন সে কথা ভেবে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। বারেবারে মৃত্যুর কথা এত স্বাভাবিকভাবে বলেছে যে মাকে কাঁদিয়েছে, বোনকে কাঁদিয়েছে আর বারেবারে চঞ্চল করে তুলেছে একটা বত্রিশ বছরের মনকে। সোমেশ একেবারে ভেঙে ভেঙে পড়ে অনুনয় করেছে তাকে, 'ও কথা তুমি আর বলো না সরমা। বরং বলো কি করলে তুমি ভালো থাকবে। যদি আমার জন্যে কোথাও তোমার এতটুকু ক্ষোভের কারণ ঘটে,—আমি তবে আসব না তোমার কাছে—দূরে থাকব। এমন কোনো ঘটনা ঘটতে দেব না যাতে তুমি কষ্ট পাও।'

কী যে আনন্দ লাগত সেই ভেঙে পড়া কষ্ট দেখতে। '—আমি সরমা! আমার এই পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি দেহটা। আমার এই ব্যথিত একটা মন আর আমার চারিপাশের কিছু কাজ, কিছু গল্প, কিছু অতীত, কিছু বর্তমান আর নিরুত্তর ভবিষ্যৎ—একে টিঁকিয়ে রাখবার জন্যে কী যন্ত্রণাকাতর প্রয়াস—কী ব্যাকুলতা!' 'আমি কিছু চাই না—কেবল তুমি বাঁচ—তুমি থাক'।

এই নিয়ে সেদিন পর্যন্ত সোমেশকে সে কত কষ্ট দিয়েছে—কত ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, উপহাস। এতটুকু মায়া হয়নি, নিদারুণ আনন্দে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে চেয়েছে ওর মনটাকে, দেখতে চেয়েছে মায়ের বলি-রেখাঙ্কিত মুখের উদ্বেগাকুল ব্যস্ততা, ছোটোবোনের দুহাত বাড়ানো ভালোবাসার ব্যাগ্রতা।

কিন্তু এই মুহূর্ত! অন্ধকার ঘরটায় সেতারে টান দিয়ে বুকের মধ্যেকার কান্না-চাপা সুরটা যেই গুনগুনিয়ে উঠল অমনি এক আতঙ্ক তাকে চেপে ধরল! 'দিন ফুরায়ে যাবে জানি, পৌঁছে ঘাটে দেব আনি—আমার দুঃখ দিনের রক্ত-কমল তোমার করুণ পায়ে···।' এ কথা কতবার সে বাজিয়েছে ইচ্ছে

করে করে সোমেশকে দুঃখ দেবার জন্যে। আর আজ, সেই সুরটাই বাজাতে গিয়ে আতঙ্কে তার দম বন্ধ হয়ে এল। ভয়ের একটা নিষ্ঠুর হাত তার হৃদপিণ্ডটাকে যেন বারেবারে চেপে ধরে ছেঁচড়ে দিতে লাগল, আর সেতারের ওপর মাথা রেখে অস্ফুট উচ্চারণে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করল তার, জীবনকে দেখতে ইচ্ছে করল, সুখ—আনন্দ সব কিছু পেতে ইচ্ছে করল, ইচ্ছে করল নতুন একটা জীবন সৃষ্টি করতে। সাংসারিক সুখগুলো একমুহূর্তে তার সামনে আনন্দের তরঙ্গ তুলে নাচতে লাগল আর সরমা যেন গলে জল হয়ে গেল তাদের কোমল, ছোটো ছোটো মধুর স্পর্শে।

চোখের জল আঁচলে মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিল সে! অন্ধকারকে তার ভয় হল। আশ্চর্য! এতক্ষণ কী করে এই অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে বসে বসে সেতারে দুঃখের সুর তুলছিল ভেবেই পেল না। না! মৃত্যু না! জীবন! তাকে বাঁচতে হবে—যে অর্থে ভালোবাসা, সেই অর্থে। যে অর্থে সুখ, সেই অর্থে।

আলো-জ্বালা ঘরে বসে বসে একবার সে একটা খুশির সুর তুলতে গেল সেতারে। হাসিমুখে মনে মনে বললে; 'খুশি হও যদি তুমি, তবে শোন সোমেশ, শোন।'

আর তখনই দরজার কড়াটা নড়ে উঠল।—এ হাত সোমেশের নয়।—অপরিচিত আর অধৈর্য। সেতারটা নামিয়ে রেখে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল সরমা। ঠিক এই জন্যেই কি দরজাটা বন্ধ ছিল! ঝি মনার মাও তো খুলতে পারে, তাহলে তো আর একটু সময় পাওয়া যায়। মনের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া সমস্ত তালগুলোকে এক করা যায়।

না থাক। দরজাটা নিজেই খুলে দেবে সে।

অল্প অল্প ছায়ায়-আলোয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা করুণ, কোমল মুখের মেয়ে। যত অধৈর্য হয়ে ও দরজায় হাত রেখেছিল, দরজা খোলবার পর তত যেন স্থির আর শান্ত হয়ে গেছে। ট্রেনে এসেছে—সামনের চুলগুলো কপালে, গালে এসে পড়েছে। সুন্দর দুটো চোখের নিচে জোর করে মুছে ফেলা জলের দাগের লালচে ছোপ—কেঁদেছে একটু আগে। হয়তো সারা রাস্তা, হয়তো সোমেশের কাছে—অভিমানের না অভিশাপের, রাগের না অনুরাগের, ঘৃণার না ভালোবাসার সরমা কেমন করে বুঝবে তা! সে শুধু

বলে, 'এস মাধবী।'...আর সেই অধৈর্য আর শান্ত, ম্লান আর বিষণ্ণ মূর্তিটা ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢোকে। সরমার বসবার ঘরে একটা চৌকি, গোটা দুই মোড়া, একটা খোলা সেতার ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই তবু মাধবী বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই প্রায় খালি ঘরটাই দেখতে থাকে। যেন কিসের একটা স্পর্শ নেবার চেষ্টা করছে সে সমস্ত সত্তা দিয়ে—কি যেন বুঝে নিতে চেষ্টা করছে সরমার দিকে চোখ না তুলেই। তার দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে সারা ঘরখানা দেখে শেষে সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে থাকে—ভীরু মানুষের মত কাঁপতে থাকে ঠোঁট।

সরমা তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে, বলে, 'বসবে না মাধবী? চা করতে বলেছি, একটু বিশ্রাম করে চা খাও।'

হাত-মুখ ধুয়ে সরমার একখানা শাড়ি পরে স্থির হয়ে বসে মাধবীর ছোটো ছোটো চুমুকে চা খাওয়া দেখে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মমতায়, সহানুভূতিতে গলে গলে যেতে থাকে সরমার মন। মেয়েটা কী সুন্দর, কী কোমল! পেলব মুখের রেখায় ওর এতটুকু ভাঁজ পড়েনি এখনও। প্রথম ফোটা ফুলের অকৃত্রিম অমলিনতায় ভরা ওর সারা শরীরের রেখাগুলো—নিটোল একটা মুক্তোর মতো সুন্দর। চেহারা নয়, রঙ নয়, চোখ-মুখ-নাক কিছু নয়—সব মিলিয়ে সুন্দর প্রথম দল-মেলা পদ্মের মতো ওর যৌবন। যা সরমার জীবন থেকে চলে গেছে—যা জীবনে কবে এল, কবে গেল সে জানতেও পারল না। তার দীর্ঘ বত্রিশ বছরটা যেন হঠাৎ ক্ষয়ে ক্ষয়ে মুছে মুছে লুপ্ত হয়ে যেতে চাইল এই মুহূর্তে। ওর কপালের ওপরকার চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে সরমা বলল, 'তুমি কী সুন্দর মাধবী! সোমেশ যা বলেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।' আর সেই মুহূর্তেই ফুঁসে উঠল মাধবীর মুছে ফেলা চোখের জল, 'কিন্তু কি হল তাতে। একদিন এই রূপের প্রশংসা সোমেশ তো কম করেনি কিন্তু আজ সে নাকি অরূপের সন্ধান পেয়েছে, এ রূপে তার আর প্রয়োজন নেই।'

আর তখনই সেতারের তার কেটে যাওয়ার মতো ছিঁড়ে গেল সরমারও মনের সেই মোহটা। যে তারুণ্য আর যৌবনের উদারতা তাকে ভরসা দিচ্ছিল তা হঠাৎ নির্দয় হয়ে উঠল। তা এবার নিজের প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। মাধবী তাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। কোনো মোহে মুগ্ধ করতে সে আসেনি। কোনো অগ্রজার স্নেহ-মমতার স্পর্শ নিতে অধীর

হাতে দরজার কড়া নাড়েনি। সে সরমাকে একটা কথা বোঝাতে এসেছে—সে কথাটা সোমেশ। একটা যৌবন একটা বিগতযৌবনের মুখোমুখি হতে এসেছে, জীবনের দাবির আসন থেকে সরে যাবার আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে। তাই মাধবী তাকে কোনো সুযোগ দেবে না। কোনো মোহ না, মায়া না, মতিভ্রমও তার হয়নি। তার দাবির ভাষা আছে—তা স্পষ্ট, বলিষ্ঠ, হয়তো নির্দয়ও কিন্তু তা অস্পষ্ট অন্ধকার কিছুতেই নয়।

সেতারটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কোনো বিশেষ গুণ দেখলেই সোমেশ চিরকাল মুগ্ধ হয়। আপনার অনায়াসপটুত্বের প্রশংসা যে কতবার শুনেছি ওর মুখে'।

'তুমিও তো ভালো বাজাতে পার মাধবী—সোমেশই বলেছিল'।

'হ্যাঁ, পারি এটাই জানতাম অনেকদিন পর্যন্ত কিন্তু আজকাল সোমেশকে দেখে মনে হচ্ছে আসলে পারি না। একই লোকের কাছে একটা জিনিস এক সময় হচ্ছে মনে হয়, আবার হচ্ছে না মনে হয় কেমন করে সরমাদি ?'

মাধবীর কোমল মুখের ভাঁজগুলো ভেঙে ভেঙে কেমন করে কঠোর হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, তা দেখতে দেখতে ম্লান হাসে সরমা, 'তোমার বয়েস যে মোটে বাইশ মাধবী। সবে এই বছর এম. এ. পাশ করেছ যে—কেমন করে সব কথা বুঝবে তুমি ?'

মুখের ভাঙা ভাঙা রেখাগুলোকে একজায়গায় জড়ো করে এনে একটুখানি শব্দ করে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে মাধবীও এবার। 'আবার সেই বয়েসের অহংকার আপনাদের। ঠিক আমার স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মতো এই কথাটাই বলতে চান তো 'আর একটু বয়স হোক'। আশ্চর্য! বয়স বাড়লে তো লজ্জা হয়—অহঙ্কার আসে কিসে!'

একটু বুঝি আহত হল সরমার মন কিন্তু মুখে তার ছায়া পড়তে সে দিল না, বলল, 'বয়েসের নয় মাধবী, অভিজ্ঞতার কথা বলছি আমি। আর তা অহংকারও নয়, কারো জীবনে তা যন্ত্রণা, কারো জীবনে তা আলো।'

সদ্য ফোটা ফুলটা ঝরে যাবার আগের মুহূর্তে যেমন শিউরে ওঠে বাতাসের স্পর্শে তেমনি বিশীর্ণ গলায় মাধবী বলল, 'আর সেই অভিজ্ঞতার যন্ত্রণাটা বুঝি আমাকে দিয়েও টের পাওয়াতে চান সরমাদি, তাই সোমেশকে আপনি

কেড়ে নিচ্ছেন আমার কাছ থেকে! তাই ওকে আপনি এমন করে ভুলিয়ে দিলেন! আপনার চারিদিকে ছড়ানো কেবল কতকগুলো অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণা, অসুখ আর ব্যথা—বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভারে ক্লান্ত হয়ে যৌবনকে বিসর্জন দিয়ে আজ আপনি এই হয়েছেন—জীবনের আপনার নিশ্চয়তা নেই তাও জানি। কিন্তু সে তো করুণার জিনিস! এর পাকে আপনি সোমেশকে জড়ালেন কেন? কি দিতে পারবেন আপনি ওকে? খুব নিষ্ঠুরের মতো বলছি আমি, আমার মনের অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু একথা আপনি ছাড়াই বা কে বুঝবে সরমাদি?'—একরাশ জল ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগলো মাধবীর গাল বেয়ে, কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল ওর দেহ, দুহাতে মুখ ঢেকে কান্না বিকৃত গলায় বলতে লাগল 'সোমেশকে না পেলে আমি বাঁচব না সরমাদি, আমি মরে যাব। আমি আত্মহত্যা করব আর সে মৃত্যুর জন্যে দায়ী থাকবেন আপনি।'

সরমা হাসতে চাইল—একটা মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসতে পারলে সে খুশি হত এই মামুলি চির-পুরনো কথাটা শুনে। কিন্তু সে হাসল না—চোখেও তার জল এল না। কেবল চোখের সামনে সেই অন্ধ আসক্তিটা, সেই সন্ধ্যেবেলার অপ্রত্যাশিত আনন্দটা, সেই বাঁচার ইচ্ছেটা মুহূর্তে প্রচণ্ড কলরব করে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। বুকের যন্ত্রণাটা সারা শরীরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল—। মাধবীর মুখটা তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এলো। মাধবী তা জানলো না—জানলে ভয় পেতো। সে জানলো না যে সরমার জন্যে যে মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে তার অনেকগুলো রূপের মধ্যে এটা একটা। এমনি অনেক মৃত্যুকে দুহাতে সরাতে সরাতে এমন একদিন আসবে যেদিন সরমা আর পারবে না। জানে না মাধবী, জানলে অত কাঁদতে পারতো না। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সোজা করে সরমা চেঁচিয়ে ডাকলো তার ঝিকে ভাঙাগলায়, 'মনুর মা, ওঘর থেকে আমার ওষুধের শিশিটা দিয়ে যাও শিগ্গির।'

মনুর মা জানে কোথায় তার ওষুধ থাকে—সে জানে কেন সরমা এ ওষুধ খায়। সে জানে সরমার কথা বলা বারন, পরিশ্রম করা বারন, তবু সে কথা বলে, তবু সে পরিশ্রম করে। আর আজ বেশি কথাও বলেনি, পরিশ্রমও করেনি তবু কেন তার এমন হল এটাই বুঝতে না পেরে ওষুধ দিতে দিতে সে জ্বলন্ত চোখে মাধবীর দিকে তাকাল। তার সেই রূঢ়, উদ্বিগ্ন মুখের দিকে

মাধবীর চোখ পড়ল না—সরমার চোখ পড়ল, পড়ে সে বিরক্ত হল। বলল, 'মনুর মা, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়, আমাদের ভাত রান্নাঘরে ঢাকা থাক। বসে থেকে আমাকে অযথা রাগিও না কিন্তু।'

মাধবীকে বাধা দেওয়া চলবে না। ওর সব কথা যদি না শোনা যায়—ওর অশ্রুনির্ঝরিণীর একেবারে তলার পাথরটা যদি কুড়িয়ে আনা না যায় তবে কি লাভ!

সোমেশ রাগ করে উঠত, বলত, 'তোমার ওই এক কথা—আরও শোন, ভালো করে শোন, হয়তো গভীর কিছু আছে। নেই—নেই, কিছু নেই, চকচকে পাথর, হীরে বলে ভুল হবার কোনো কারণ ছিল না। বলবে তবু কেন একদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম? সে পাথর হাতে নিয়েও চমকে ওঠে না মানুষ?'

সরমা সেই গভীরতাকে তবুও খুঁজতে চায়। কেঁদে কেঁদে শান্ত হলে ও নিজেই বলবে।

মনুর মার সব কাজ শেষ হয়ে শব্দ থেমে গেছে—রাত বাড়ছে। অনেকক্ষণ থেকে একটা কথাও বলেনি মাধবী—সরমাও না। পুরনো দিনগুলোই বুঝি ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছিল বত্রিশ আর বাইশ বছরের দুটো জীবনের সামনে। তারপর কখন এক সময় যেন কথা বলতে শুরু করেছে সরমা নিজেই; সেই একদিনের কথা যেদিন আত্মহত্যার কথা বলেনি কিন্তু মনে মনে ভেবেছিল ঠিক এই কথাটাই 'আমি বাঁচব না—বাঁচব না আমি।' একটা অসহ্য কষ্টে ছেয়ে গিয়েছিল মন। প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জলের সমুদ্র বইয়ে দিয়েছিল সে। সে মুখের রেখাগুলো ব্যথায় ভেঙে ভেঙে বেঁকেচুরে চুরমার হয়ে যেত। দুর্বল কাঁপা কাঁপা হাতে সরমার মাথায় হাত বুলতো আর কী অনুপায়ের মতো, অসহায়ের মতো কাঁপত ওর চোখের পাতা, ভেতর থেকে অসহ্য উচ্ছ্বাসে ফেটে ফেটে যেত ওর বুকটা। কিন্তু তবু তো কিছুই হল না। মাধবীর মতো সমস্যা সরমার হয়তো ছিল না—কারো কাছে তাকে ছুটে যেতে হয়নি মুখোমুখি হতে। কিন্তু তাতেই বা কি। কি লাভ হল তাতে। 'পারছি না—পারছি না' এই অনুপায় স্বীকারোক্তিটাকে কি সরানো গিয়েছিল টান দিয়ে!

মাধবী বড় বড় চোখ তুলে শুনল, ওর নিজের চোখের জলের ধারা

কখন একসময় শুকিয়ে গেছে শুনতে শুনতে। এবার ওর গলায় লেগেছে কৈশোরের অকৃত্রিম বিস্ময়ের স্বর, 'কাঁদলেন শুধু আর তারপর অত ভালো লোকটাকে ফেলে, সব ত্যাগ করে চলে এলেন? অদ্ভুত তো!'

'আজ ভাবি সেদিন কাঁদাটাও আমার উচিত হয়নি মাধবী। কিন্তু সে তো আজ থেকে অনেকদিন আগে ভাই—সেদিন কত ছোটোই না হয়েছিলাম।'

'কিন্তু কেন এলেন? আপনার কি কোনো দাবিই ছিল না?'—এ যেন মাধবী নয়, চোদ্দবছরের একটা জেদ ধরা মেয়ের গলায় কথা বলছে অন্য কেউ।

হাসতে চেষ্টা করে সরমা বলে, 'কিসের দাবি মাধবী? দয়া, মায়া, করুণা পাবার দাবি? কিন্তু তারপর?'

'তারপর কি?—' ছটফটিয়ে মাধবী প্রশ্ন করল, 'উনি তো আর কাউকে চাননি—আপনাকে তো চলে আসতে বলেন নি, তবু কেন চলে এলেন আপনি?'

সরমা হাসল নিশ্বব্দে উত্তর না দিয়ে।

'আচ্ছা, উনি পরে কিছু বললেন না? ডাকলেন না? এমন তো হতে পারে যে ভুল হয়েছিল ওঁর—সাময়িকভাবে হয়তো মানুষের?'

আবার ম্লান, তিক্ত হাসি হাসল সরমা। আঃ সোমেশ, তোমার কথাই ঠিক। অশ্রুনির্ঝরিণীর আর কত নিচে নামবে সরমা! সে পাথরটা কোথায়—কোথায়!

তবু হাসিমুখে বলে, 'উনি জানতেন যে ডাকলে আমি ফিরতাম না, নতুন করে ভালোবাসার কথা বললেও না। ভালোবাসার রূপ বদলায় মাধবী—। মনটা বদ্ধ জলা নয়।'

'আশ্চর্য! আপনার কথার সঙ্গে সোমেশের কথার কি মিল! ভালোবাসার রূপ বদলায়—সে শুর পার হয় এ সব কথা কখনও শুনিনি ওর মুখে। সেই তখনকার সোমেশ! যখন আমার খোলা চুলের মধ্যে হাত ভরে দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে যেত। যখন আমার মাথায়—মুখে কী গভীর শান্ত আর করুণ হাতে আলতো করে স্পর্শ করত। ভালোবাসার এও তো এক রূপ সরমাদি। আমার দেহের দরজায় সেদিন ওর মন বাঁধা থাকত। ও আমাকে নিয়ে কবিতা লিখত, আমাকে পাশে পেলে যে ও খুশি হয়ে উঠত, সে কি

ভালোবাসা নয় সরমাদি? সেদিনতো এই মাধবীই ছিল ওর সব, আর আজ···।'

ধীরে ধীরে, গর্ত থেকে মাথা-তোলা আহত সাপের মতো হঠাৎ মাধবীর বড় বড় চোখদুটো কুঁচকে ছোটো হয়ে মুখটা যেন ঘৃণায়, যন্ত্রণায়, বেদনায় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায়। আলোর কাঁচে মাথা ঠুকে ঠুকে মরা একটা পোকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ও নিজের মনে বলতে থাকে, 'আর আজ ওই একই সোমেশের করুণ, সুকুমার মুখটা যেন বাজে পোড়া তালগাছের মতো রিক্ত আর রুক্ষ হয়ে গেছে। ও কবিতা লেখে না। ও রোদ-জলা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখে। ও কচি ঘাসের ওপর জ্যোৎস্নার আলোয় আমাকে পাশে পেয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্য কথা বলে যায়। তার সঙ্গে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো মিল নেই—তা আমি শুনতে চাই না। আজকাল ও গভীরতার কথা বলে'—বলে অনুচ্চ শব্দ করে মাধবী হঠাৎ হেসে উঠল। হেসে উঠে ওর বাইশ-তেইশ বছরের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল পার হয়ে চলে গেল অনেক দূরে—অনেক দূরে। রোদে পোড়া দীর্ঘদিনের বৃষ্টিহীন আকাশ যেমন করে তাকিয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে তেমনি করে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'আর বলে আপনার কথা। ওর ক্লান্তি আসে না, লজ্জা করে না, ভয় করে না। আশ্চর্য!'

ক্লান্তগলায় সরমা বলে এবার, 'ছিঃ, তুমি সোমেশকে ভুল বুঝেছ মাধবী।'

'ছিঃ!'—ফুঁসে উঠল আবার মাধবী, 'আপনি আমাকে ধিক্কার দিচ্ছেন সরমাদি—দিন। তবু আমাকে যদি ক্ষমা করেন তাহলে এই কথাই আমি আপনাকে বলব যে যাঁকে আপনি নিজের মনের কতকগুলো বানানো কল্পনায় ছেড়ে এসেছেন তাঁকে আপনি সত্যি ভালোবাসতেন না—তাহলে আমার অবস্থা বুঝতেন।'

রাত বাড়ছে—বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে জানলার বাইরে। সেই বাইরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের একটু টুকরো যেন দুজনের মনের ওপর ছিটকে পড়েছে। মাধবীর হাতের ঘড়িতে বারোটা। অভিযোগটা শুনে অকৃত্রিম হাসিতে মুখ ভরিয়ে সরমা হাত ধরে ওকে খাবার জায়গায় টেনে নিয়ে এল।

খেতে বসে আবার কাঁদতে লাগল মাধবী—একটা ভাতও সে খেল না—সরমাও না। বলল, 'জানেন সরমাদি, সোমেশ স্টেশনে আনতে গিয়েছিল

আমাকে। ওর চোখদুটো দেখে এই প্রথম ভয় পেলাম আমি—ওর চোখে কিসের দৃষ্টি? ওকে কি আপনি হিপ্‌নোটাইজ করেছেন?'

সরমা আবার বলে, 'ছিঃ ছিঃ মাধবী, সোমেশকে তুমি সত্তাবিহীন, অসহায়, অনুপায় একটা জালে জড়ানো মানুষ বলে মনে করছ কি করে? মানুষের কি পরিবর্তন হয় না? শোন'—মাধবীর হাতে জল ঢেলে দিয়ে হাত ধরে পাতা বিছানায় বসিয়ে একটা শপথ উচ্চারণ করার মতো, একটা প্রকাণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মতো, একটা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো আবেগে সরমা বলল, 'সোমেশকে তুমি চেয়ো না মাধবী—ওর এই পরিবর্তনকে তুমি স্বীকার করো।'

ব্যঙ্গের একটা হাসি ছুঁড়ে দিল মাধবী তার উত্তরে, 'কারণ আপনি স্বীকার করেছিলেন এবং সেটা সত্যি কী বুঝবার জন্যেও থেমে দাঁড়ান নি একবার! আপনার বত্রিশবছরের রুক্ষতা আর বঞ্চনার হিসাবের মধ্যে আমাকেও না নিতে পারলে শান্তি নেই বুঝি?'

সরমার চোখের সামনে আবার সব কিছু দুলে উঠল। আঙুলগুলো কাঁপছে। যে কথা কিছুতেই বলা যেত না সেই কথাই এবারে বলবার জন্যে প্রস্তুত করে নিল সে মনকে।

'শোন মাধবী, তুমি এখনও অনেক ছোটো, বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে তবু বলি, কাকে চাও তুমি? একটা মানুষের দেহকে? সে হয়তো তোমাকে দয়া দেবে, মায়া দেবে, করুণা দেবে কিন্তু তোমাকে দেখে তার চোখে নতুন কোনো আলো যে জ্বলবে না। তোমার পাশে থেকেও সে তোমাকে ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাবে—তুমি পড়ে থাকবে তার মনের যাত্রাপথের একপাশে ধুলোয় ধূসর হয়ে। তোমার মন তাতে ভরবে মাধবী?'

মাধবী এবার যেন ধমক দিয়ে ওঠে নিজের মনের আশঙ্কার গলা টিপে মারার জন্যে—যেমন অন্ধকার ঘরে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মানুষ, 'চুপ করুন সরমাদি, আপনার পায়ে পড়ি। আপনার মনের হতাশার বোঝা আমার মনের ওপর চাপাবেন না দয়া করে। দয়া-মায়া-করুণা-স্নেহ এগুলো তো ভালোবাসারই নামান্তর—ওগুলোর মধ্যে দিয়েই ভালোবাসা আসে, ভালোবাসা থেকেই ওগুলো আসে। আপনাদের অর্থে যেমন ভালোবাসা রূপ পরিবর্তন করে—আমাদের অর্থেও করে সরমাদি। আপনারা খোঁজেন গভীরতাকে—আমরা খুঁজি সুখকে।'

'সুখ!'—সরমা এই প্রথম হিংস্র হয়ে উঠল। বাইশ আর বত্রিশ বছরের দুটো দাঁড়িপাল্লার ওজনের ভারটা ততক্ষণে যেন পীড়িত করে তুলেছে তাকে। তারও গলায় ব্যঙ্গের স্বর লাগল, 'সুখ! কি সে সুখের সংজ্ঞা মাধবী?'

শরতের আকাশের মত ঝক্‌মকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে সরমার চোখের দৃষ্টিকে বিদ্ধ করতে করতে মাধবী বলল স্পষ্ট গলায়, 'জাগতিক অর্থে যা হল সন্তান, যা হল বিত্ত, যা হল যৌবন—যার একটাও আপনার নেই, হবে না।'

হয়তো একবার শিউরে উঠেছিল সরমা নিজেরই অজান্তে কিন্তু সে একমুহূর্ত, তারপরেই অবার ক্ষুরধার হয়ে উঠল তার গলা, 'কিন্তু তারপর?'

'তারপর'—বাসায় বাচ্চাদের পাহারা দিতে দিতে গাছ বেয়ে ওঠা সাপটাকে দেখে যেমন তীক্ষ্ণ, বুকফাটা গলায় চেঁচাতে থাকে মা-পাখিটা তেমনি গলায় মাধবী বলল, 'কি তারপর?'

'শূন্যতা! সব কিছুর মাঝখানে বসেও, পুত্র, বিত্ত, যৌবন—সব কিছুর মাঝখান থেকেও উঠে উঠে আসা সেই nothingness? তাকে নিয়ে কি করবে মাধবী? জীবনে খুব জিতেছি বলে গর্ব করতে পারবে কি?'

'সে শূন্যতাকে জয় করব আমি। ভালোবাসার জন্যে এটুকু আমি নীলকণ্ঠের মতো সহ্য করব—করবই'—বলে হাত মুঠো করে মাধবী চুপ করে বসে রইল।

নিস্তব্ধ হয়ে গেছে ঘরটা কথার তরঙ্গ থেমে গিয়ে। আলোটা ওদের পিঠের দিকে, তারই একটা চিল্‌তে সরমার কানের পাশে, চুলের গোছায়, মুখে, কপালের একটা পাশে এসে পড়েছে। মাধবী, সেই আলো-অন্ধকার মাখানো মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে হঠাৎ একরাশ ঝরা শিউলির মতো সরমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে যেন হাহাকার করে উঠল, 'সরমাদি, আপনি আমাকে সেই শূন্যতার আতঙ্ক থেকে বাঁচান। আপনি পারবেন। আপনার মন্ত্র সোমেশের চোখে, সে মন্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে ওকে ওর সেই পুরনো দিনে ফিরিয়ে দিন। আপনি ওকেও বাঁচান।'

সরমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। হাত ধরে মাধবীকে উঠিয়ে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত রেখে সরমা বলল, 'সোমেশকে তুমি এখান থেকে নিয়ে যেতে পার না মাধবী—তোমাদের পরিবেশে?'

শক্ত হয়ে, মাথা নেড়ে মাধবী কাঁদতে লাগল, 'না, ও যাবে না।

ও আপনাকে ছেড়ে যাবে না। আপনি অসুস্থ, অনুপায়, অসহায়—এই কথাই ও আমাকে বলেছে।'

চোখের জলে সব ঝাপ্‌সা হয়ে এল। ভীরু গলায় সরমা বলল 'তবে তুমি কি চাও মাধবী?'

'আপনি চলে যান এখান থেকে। ওর সামনে থেকে সরে যান। এমন তো কত মানুষের জীবনে হয়। কিছুদিন হয়তো ভাববে আপনার কথা কিন্তু তারপর ওকে আমি সুখী করে তুলব—অসুস্থতা থেকে সুস্থ করে তোলার মতো। কারণ আমার অনেক দেবার আছে, অনেক পাবার আছে।'

যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে সরমা, দেওয়ালের ছায়ায় মনে হচ্ছে একরাশ পাকা চুল মাথায় নিয়ে হতাশ-যৌবনা কোন্ এক বৃদ্ধা ঠোঁট নাড়ছে, 'আমাকে চলে যেতে বলছ! কিন্তু কোথায় যাব আমি? নতুন করে আবার···', হতাশায় ভেঙে-পড়া গলার স্বর, যেন দিশা হারিয়ে এক জন শূন্য প্রান্তরে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তার কোথাও এতটুকু ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, লোকালয় নেই। মাধবী কি শুনতে পাচ্ছে সেই স্বর? এক যন্ত্রণা-করুণ হতাশা-গভীর আর্তি! মাধবীর মুখ দেখে তা বোঝা যায় কি যায় না। সঙ্গে সঙ্গে সরমা আবার সচকিত হয়ে-নড়ে বসল। চোখ মুছে আবার তৈরি করে নিল নিজেকে, 'কিন্তু তাতেও যদি কিছু না হয় মাধবী? যদি ও কেবল আমাকেই খুঁজে বেড়ায়? যদি আমার চলে যাওয়ার শূন্যতাটাই ওকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে আর কোথাও তার তল পাওয়া যায় না —তাহলে?'

শক্ত হয়ে মাথা নেড়ে মাধবী বলে, 'সে হয় না সরমাদি—ওইগুলোই হল আপনাদের বানানো মন-ভোলানো কথা। কাব্য-সাহিত্যের কথা। বাস্তবে তা হয় না। কেন হয় না তা আপনার বাইশ বছরে যদি এতদিন না বুঝে থাকেন বত্রিশবছরে আজ আর বুঝবেন না। মা পুত্র-শোক ভোলে আর সুখী হবার সমস্ত উপকরণগুলো হাতের কাছে গোছানো থাকা সত্ত্বেও একটা মন কি চিরকালই না-পাওয়া জিনিসের দিকে ছুটে মরে? সরে যাওয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে মরে যাওয়ার মতই ভীষণ যেমন হয়ে ওঠে আবার শোকের মতই ধীরে ধীরে সেটা সহণীয়ও হয়ে ওঠে সরমাদি।'

রাত দুটো বেজে গেছে—ক্লান্তিতে সরমার মাথা ঘুরছিল, আস্তে আস্তে

বিছানায় শুয়ে পড়ল সে—নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাধবী দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল, 'সরমাদি আপনি অসুস্থ, আপনি অসহায়। আমি কত যে নিষ্ঠুরের মতো কথা বলেছি আপনাকে। কিন্তু সরমাদি—সোমেশকে হারানোর দুঃখ কি তার চেয়েও নিষ্ঠুর নয়? সরমাদি, আপনি আমার চেয়ে অনেক মহৎ, অনেক বড়। যে অর্থে জীবন বোঝায় সে অর্থে সোমেশ তো আপনাকে পাবে না—ব্যর্থ হয়ে যাবে একটা যৌবন, পৌরুষ আর ভবিষ্যৎ! সরমাদি!'

সে কথা সরমার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না—সে আপন মনে অনুচ্চ ক্লান্তস্বরে বলে চলল, 'তাই হবে মাধবী, তোমাকে কথা দিলাম চলে যাব আমি। সোমেশ আর কোনোদিন আমাকে খুঁজে পাবে না। ও যদি দুঃখ পায় তবে তুমি ভুলিয়ে দিয়ো সে দুঃখ, কারণ তোমাদের অনেক আছে। আমার জন্যে তোমারও কিন্তু সেদিন কষ্ট হবে মাধবী। হবে না?'—মাধবীর মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরে সে ম্লান হাসি হাসতে চাইল আর মাধবীর কান্না আরও ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। বালিশে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে লাগল অজস্রধারায় 'শুধু যদি সোমেশকে ভুলতে পারতাম—যদি সত্যিই পারতাম ওকে না চাইবার মনের জোর তাহলে আমি বাঁচতাম—বাঁচতাম। আমার ভয় করছে—আমি কি পাগল হয়ে গেছি সরমাদি। আঃ, চাইনে, চাইনে আমি সোমেশকে! সরমাদি আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার কথা···।'

হঠাৎ ভয়-পাওয়া গলায় ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে সে কথা শেষ করতে না দিয়ে সরমা বলল, 'মাধবী পাগলাম করো না। তোমার মতো মানুষের দরকার আছে সোমেশের জীবনে, নইলে সব অপচয় হয়ে যাবে যে! কি পাবে ও আমার কাছে? দিনে দিনে কেবল রুক্ষ, কর্কশ, প্রাণহীন মরুভূমি হয়ে উঠবে ভেতরের উত্তাপে। আঃ, ওর সন্ন্যাসীর মতো কঠোর মুখটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে—ভীষণ মনে পড়ছে! কেঁদো না মাধবী, সোমেশ নিশ্চয়ই বুঝে নেবে তোমাকে, কেঁদো না, ঘুমোও'—মায়ের মত স্নেহে আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে কাঁদা মাধবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সরমা। এক সময় ওর কান্না বন্ধ হয়ে এল, স্থির হয়ে এল সারা দেহ, ঘুমিয়ে পড়ল সরমারই কোলের ওপর একখানা হাত রেখে।

রাত শেষ হয়ে আসছিল। গভীর ঘুম থেকে পাশ ফিরে শুতে শুতে আচ্ছন্নতার মধ্যে সেতারের সুর মাধবীর ঘুমকে আরও গভীর করে তুলল—তার দুঃখের রাতগুলো যেন কেঁদে কেঁদে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। ভারি সুখের একটা হাসি মাধবীর ঠোঁটে অনেকক্ষণ ধরে খেলা করে করে মিলিয়ে গেল সোমেশ হয়ে, 'ইস্, সোমেশকে ছাড়া আমি পারব না, কিছুতেই না—না!'

সোমেশ,

আমি মাধবীর মধ্যে গভীরতার খোঁজে অনেকদূর গেলাম কিন্তু আসল পাথরটাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। ওরা সুখ বলে একটা যে জিনিসকে বোঝে, অনেক বুঝে সে সুখে আমরা যদি সুখী না হই তাতে তো ওদের দোষ নেই, তাকে মানতে না পারা আমাদেরই অক্ষমতা। তোমাকে মাধবীদের দরকার। আমার বিনা কাজের নিমন্ত্রণে তোমার জাগতিক কোন্ লাভটা হত সোমেশ? হয়তো আমাদের দুজনের হিসেবে ভুল ছিল—অন্তত আমার তো বটেই। ভুলটা শোধরাবার ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম।

আর একটা কথা। যেদিন মাধবী এসেছিল ঠিক সেই সন্ধ্যে বেলাতেই আমার হঠাৎ ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে হয়েছিল—মাধবীদেরই অর্থে।

—সরমা

খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোচ্ছিল সরমা। মনুর মা রোজকার মতো চা করে ডেকে তুলতে ঘরে ঢুকেছিল—ওর আজ কাজে যোগ দেবার দিন জানা ছিল বলেই। তারপরেই সে কেঁদে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। সোমেশের মেসেই সে যে প্রথম গিয়েছিল বুদ্ধি করে এই কথাটা মনে করে সোমেশ মনুর মার ওপর ভারি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল সব দুঃখ ভুলে। কারণ অনেক লোকজন, চেঁচামেচি, জল্পনা-কল্পনা জমবার আগেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলতে পেরেছিল। জানত পাবে—পেয়েছিল চিঠিটা! আর তারপর সরমার নিদ্রিত মুখটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়েও ওর বুকের মধ্যে কান্নার তরঙ্গ ওঠেনি, যন্ত্রণার ওঠা-পড়া ছিল না, ছিল মরুভূমির সেই তপ্ততা—যা সরমা ওকে একদিন অনুভব করিয়েছিল। বলত, 'সোমেশ, কি মনে হয় জান? আমি আর তুমি দুজনে দুটো ঘাসফুল—ফুটেছি আচম্‌কা এক

মরুভূমিতে। ঘাসফুল ফুটো একমুহূর্তের একটা মিথ্যে—শূন্যতাটাই সত্যি।' বলত, 'জান সোমেশ, এক এক সময় মনে হয় সালোমির মত আমার আবরণের এক একটা স্তর একটা একটা করে খসে পড়বে—আমার জীবনে কিছুই অপরিহার্য হবে না। আমাকে সব দিয়ে বুঝতে হবে।'

চারিপাশে অনেক লোক—সোমেশ যেন একটা চলন্ত জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশ দিয়ে জল্পনা-গুজব, সহানুভূতি আর দীর্ঘনিশ্বাস সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সরে সরে যাচ্ছে। 'কটা বড়ি খেয়েছিল' —কে যেন জিজ্ঞেস করছে। মনুর মা জানে না। দিদিমণি ঘুমের ওষুধ মাঝে মাঝে খেত—আর একটা ওষুধ খেত যখন খুব শরীর খারাপ লাগত। 'বড়ি, না সেই ওষুধটা?'—মনুর মা কাঁদতে কাঁদতে খুঁজে খুঁজে ওষুধের শিশি আর বড়ির প্যাকেট দুটোই সবাইয়ের সামনে এনে রাখল। দুটোই প্রায় খালি—কোন্‌টা বোঝা গেল না। সুতরাং জল্পনা বাড়ল।

প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী এসে গেছেন। ছেলেমেয়েরা এসেছে, অন্য সহকর্মীরা—একটা বিরাট জটলা। একটা অন্ধকারের সমুদ্র যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠছে চারিপাশ থেকে। একঘর বারান্দা-ভরা লোকের জল্পনা আর গুজব, রটনা আর আলোচনার হাতে সরমার দেহটাকে সঁপে দিয়ে সোমেশ বেরিয়ে এল, 'এ ছাড়া আর কি আমার জন্যে করবার কিছুই রেখে যেতে পারলে না সরমা? আঃ, কী নিষ্ঠুর তুমি!'—তারপর রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ মনে হল ফিরে যায়—একটা হিংস্র আক্রোশে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় সরমাকে।

যেদিকে সূর্য ওঠে

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

তরাইয়ের কোলে বসে ছোটবেলা থেকেই 'ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'র একটা আভাস মানসনেত্রের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তরাই হল বাংলা, বিহার এবং হিমালয়ের সঙ্গমক্ষেত্র। তার প্রান্তরে, বন্দরে, চা-বাগানে, শহরের পথে ভীড় করে চলে নানা ধরনের আর নানা জাতের মানুষ। শহরের বুকের উপর দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত ছিল দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ। সকাল আর সন্ধ্যায় দার্জিলিং মেলের সময় আলোয় ঝলমল-করা স্টেশন সরগরম হয়ে উঠত। সকালে কলকাতা থেকে গাড়ি আসে। সাদা মুখের নরনারী প্রাতঃরাশ শেষ করে ছোট লাইনের গাড়িতে চেপে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করে। সাহেবী কেতাদুরস্ত কালা আদমিদের দেখাও পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে। সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে কলকাতা অভিমুখে। এই দুটি সময় স্টেশনে কাটানো আমাদের বয়সী ছেলেদের কাছে এক বিচিত্র আকর্ষণের ব্যাপার ছিল। কখনও কখনও হঠাৎ এইভাবে দেশের প্রাতঃস্মরণীয়দের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, আচার্য জগদীশচন্দ্র ইত্যাদিকে দেখেছি এইভাবে। রবিবার হাটের দিন মফঃস্বল থেকে দলে দলে লোক শহরে আসে। রাস্তায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলে চা-বাগানের কালো চেহারার শক্ত-সমর্থ খাটো কাপড়-পরা কুলি মেয়েপুরুষ, নেংটি-পরা সরল গরীব রাজবংশী চাষী আর 'মেখলা'-পরা কৃষক বধূ। নেপালীরা দার্জিলিং রেলপথে শ্রমিকের কাজ করে। শীতকালে মেচী নদীর ওপার থেকে দুর্গম অরণ্য এবং পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে আসে সুদূর নেপালের বস্তির দুঃস্থ নরনারী। ঠাণ্ডার সময়টা তারা সমতলে থেকে কোনোরকমে জীবিকার ব্যবস্থা করে নেবে। ওরা খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় বা নদীর ধারে শুকনো পাতা আর কাঠকুটো দিয়ে আগুন জেলে রাত কাটায়। বসন্তের আভাষে আবার ফিরে যাবে পাহাড়ের কোলে সেই গ্রাম জনপদে। কেউ কেউ হয়তো এখানেই থেকে যাবে। শৈলশিখরের

তুহিন প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য গরিব 'ভুটে'রাও এই সময় তিব্বত ছেড়ে নীচে নেমে আসে। তাদের এক একটি দল তরাইতে এসে পৌছায়। নীচের শীতে তাদের আগুন জ্বালাবার দরকার করে না। ঘুমের সময় এলে স্বচ্ছন্দ আয়াসে মাঠের বুকে হাত-পা ছড়িয়ে দেয়। বিচিত্র রং ও আকারের 'বক্কু'পরা লোকগুলি দুর্বোধ্য ভাষায় গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে। কেউ কেউ মন্ত্র পড়ে 'মানে পেমে হুঁ' এবং হাতের ধর্মচক্র সমাজে ঘুরিয়ে চলে। কেউবা মুখোশ পরে তিব্বতের লোকনৃত্যের নমুনা দেখায়। একেবারে ছোটবেলায় তরাইয়ের এই মানুষগুলিকে দেখেছি শুধু বিস্ময় আর কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে। ক্রমে ক্রমে এরাই ব্যথিত মানবতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। ওদেরই সেবায় জীবনের সার্থকতা লাভের কথা উপলব্ধি করতে শুরু করি।

একটি লোক সেই উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অতি সাধারণ সরকারী কর্মচারী। সাবজেলের কেরানীর কাজ করতেন বলে তিনি আমাদের কাছে 'জেলারদা' বলে পরিচিত ছিলেন। চাকুরির মত শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকেও তাঁর কোনো কৌলীন্য ছিল না। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি ছিলেন দস্তুরমত 'হীরো'। কেননা আমরা দেখতাম যে শহরের সমস্ত বারোয়ারী অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের চাবিকাঠি তাঁর হাতে, বিশেষ করে সেই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান—যেগুলি আমাদের বয়সী ছেলেদের কাছে প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল। আমরা দেখতাম 'জেলারদা' না হলে তরাই পাবলিক লাইব্রেরী খোলা হয় না। তখন সবে নাটক-নভেল পড়তে শিখেছি। বৌদিদের নাম করে সেগুলি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলি। যদি জেলারদা সদয় না হন তবে ইচ্ছামত বই আনা চলে না। শহরের সৌখিন রঙ্গমঞ্চ 'মিত্র সম্মিলনী'তে তখনও দর্শকদের জন্য স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ গড়ে ওঠে নি। অভিনয় উপলক্ষে শামিয়ানা টাঙিয়ে বসার ব্যবস্থা হত। সে সমস্ত ব্যাপারে দেখতাম তিনি অগ্রণী। আবার সেই অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ-পথে তিনিই প্রহরী এবং প্রোগ্রাম বিতরণের ভার তাঁরই হাতে। কারও বাড়িতে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, উৎসবে, নিমন্ত্রণে, পরিবেশনে সেই একই লোক এগিয়ে আসতেন। এমন ক্ষমতাশালী লোকটি ছিলেন সদাপ্রফুল্ল এবং অত্যন্ত স্নেহকোমল। তাঁর কাছে ছেলেদের দ্বার ছিল অবারিত এবং কিশোর মনের রঙিন ফানুষগুলির কথা অকপটে ব্যক্ত করা যেত। আজ আমাদের

শহরের অতীত ইতিহাস উল্লেখের সময় তাঁর কথা সবাই ভুলে যায়। আর না ভুললেও হয়তো স্থানীয় দিকপালদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারণের কথা কেউ ভাবে না। কেনইবা ভাববে? সে মানুষটির যা কিছু অবদান ছিল তা শুধু সেবায়—অর্থ নয়, সামাজিক প্রতিপত্তিতে নয়, জ্ঞানে নয়। মানুষের সেবা, তাও নীরবে। দেখেছি রাস্তার ধারে পড়ে-থাকা সহায়-সম্বলহীন রোগীকে নির্বিকারে কোলে তুলে নিয়ে সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে দিতে। কারও বাড়িতে কঠিন অসুখ হলে রাতের পর রাত জেগে শুশ্রূষা করতেও দেখেছি। এহেন লোকটি যেদিন আমাদের দুই-তিন বন্ধুকে সঙ্গী হতে ডাক দিলেন সেদিন সাড়া দিতে একটুও দেরি করি নি। দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ থেকে শুরু করে সমাজসেবার অনেক কাজে এমনিভাবে হাতে খড়ি হয়েছে।

বাইরে কাজের মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত তা ধীরে ধীরে অন্তরে আদর্শের রূপ নিতে শুরু করে। ঘরের আবহাওয়ার প্রভাবে চিন্তা আর ধারণায় সেদিন ধর্মের রং খুব বেশী করেই লেগেছিল কিন্তু তা কর্ম বা জীবন-বিমুখ করে নি। জেলারদার প্রেরণায় একবার আমাদের সমবয়সী ছাত্রদের মধ্যে এক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়। তাতে পুরস্কার পাই—অরবিন্দের 'কর্মযোগ'। সৌভাগ্যক্রমে আর একজন বয়স্ক অথচ ছেলেদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেন এমন একজন দরদী মানুষ, কর্মযোগের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে আমাদের বৈঠক বসা শুরু হল। সুখেনবাবুর ব্যাখ্যায় সেবাব্রতের দিকটিই বড় হয়ে ওঠে। পরে জেনেছি যে সে-যুগে বিপ্লবী তরুণদের কাছে 'কর্মযোগে'র ঐ ব্যাখ্যাটিই ছিল প্রধান। তা মায়াবাদ এবং দৈবের উপর অসহায় নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। তাই বইখানির উপর পড়েছিল পুলিশের খরদৃষ্টি। সুখেনবাবুর সঙ্গে কোনো বিপ্লবী দলের সম্পর্ক ছিল বলে কোনোদিন শুনি নি। তাঁকে শহরের জীবনে কোনো ব্যাপারে বেশী উৎসাহ নিতেও দেখিনি। বিপত্নীক মানুষ, বই নিয়ে অবসর সময় কাটাতেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের ডেকে দিতেন জ্ঞানের সন্ধান। তিনি আমাদের শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণীও শোনাতেন। ওঁদের শিক্ষায় মানবতার আবেদনটাই আমাদের সামনে তুলে ধরতেন জোরালোভাবে। সেখানে শুনেছিলাম জাতিধর্ম, উচ্চনীচ, ছোঁয়াছুয়ির ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত মানুষের মধ্যে দেবতাকে

দেখার উদাত্ত আহ্বান। আমার শোয়ার ঘরের কাঠের বেড়ার গায়ে টাঙানো ছিল শ্রীচৈতন্যের পাশাপাশি দক্ষিণেশ্বরের আত্মভোলা সাধক এবং তাঁর মানসপুত্র বিবেকানন্দের ছবি। দাদারা তাঁদের দেবতারূপে পূজা করতেন। সুখেনবাবুর শিক্ষার ফলে ওঁরা দেবতার আসন ছেড়ে এলেন মনের অত্যন্ত কাছে। মানবপ্রেমিক মহাপুরুষ রূপে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তো ছিল সে যুগের যুবক ও কিশোর সমাজের প্রধান সম্বল। তাতে পেয়েছি শক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ, মানুষ মাত্রেরই মর্যাদা সম্বন্ধে দৃপ্ত ঘোষণা এবং কর্মের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার অমোঘ আহ্বান। শুনেছিলাম দাস মনোভাব, মোহ ও ভীরুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বজ্রনাদ। সেই বয়সে যুগধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের বাণীকে পাথেয় করে অগ্রসর হয়েছি। পেয়েছি বড় ভাইয়ের জীবনের ব্যর্থতাবোধ থেকে মুক্তির নির্দেশ। আধ্যাত্মিকতা অন্তরমুখিন করেছে কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে নি। যৌবনে পা দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে মন যখন হয়ে উঠতে থাকে আত্মসচেতন এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে থাকে তখন তার নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা বুঝি খুব বড় হয়। নিজেকে ভাবে যেন এক অনাবিষ্কৃত জগতের অভিযাত্রী, সেখান থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদ আহরণ করে এনে পৃথিবীকে উপহার দেবে। যে সব কাহিনী মনে গভীর রেখাপাত করে তাদের নায়কের ছাঁচে নিজের ভাবী চেহারাকে গড়ে তুলতে চায়। তাই বুঝি সেদিনের কল্পনায় চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের পাশে এসে দাঁড়ায় অমিতাভ বুদ্ধের জ্যোতির্ময় ছায়া-মূর্তি। মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার সাধনায় তিনি খুঁজেছিলেন জ্ঞানের পথে মুক্তি। দাদার মুখে নিত্য শোনা জপের মন্ত্র 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' নতুন অর্থ পরিগ্রহ করে। জ্ঞানের জ্যোতি কবে অজ্ঞানের তমসাকে দূর করে দেখা দেবে? কবে হবে 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'?

ইতিমধ্যে মানুষের সেবার ধারণাটার মোড় ঘুরে যায়। তরাইয়ের সেই মানুষগুলির এক নতুন চেহারা দেখতে পাই। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ হিমালয়ের পদপ্রান্তে এসে আছড়ে পড়েছিল। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলও উঠেছিল বিক্ষুব্ধ হয়ে। গোর্খানেতা দলবাহাদুর গিরির কথা অল্পদিনের মধ্যে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। নেপালী-ভাষী জনতার মধ্যে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। ফলে জেলার কর্তা ডেপুটি কমিশনার তাঁর উপর হুকুম জারি করেন যে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর জেলা

ছেড়ে যেতে হবে। দলবাহাদুর সে আদেশ অমান্য করে কারাবরণ করেন। আমাদের শহরে তখনও সংগঠিত আন্দোলন বা সভা-শোভাযাত্রার হিড়িক শুরু হয় নি। শুধু জন দুই-তিন লোক বে-পরোয়া হয়ে উঠে গ্রেপ্তার বরণ করেন। কিন্তু তাতেই জনচিত্তে চাঞ্চল্যের আলোড়ন উঠেছিল। বন্দীদের দেখার জন্য কাছারিতে এবং বিচারের পর তাঁদের অন্যত্র পাঠানোর সময় স্টেশনে মানুষের ভীড় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন কয়েকদিনের বেশী স্থায়ী হয় নি। তার তরঙ্গ যেন জোয়ারের বেগে এসেছে এবং তেমনিভাবে ফিরে চলে গেছে। তবু দেশজোড়া স্বাধীনতার উন্মাদনা মানুষের মনে ছাপ রেখে যায়। কোথায় সে কিভাবে চিহ্ন রেখে গেছে তার সবটুকু কি সবার চোখে ধরা পড়ে! কিছুদিন পরে একটি ঘটনায় সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। চা-বাগানের নিরীহ স্বভাবের ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী কুলিরা সেই ঘটনার নায়ক। বোবা মানুষগুলিকে ভদ্রলোকেরা ধাঙড় বলে জানেন। কথাটার আদি অর্থ যাই হোক না কেন, ভদ্রলোকদের কাছে তা নেহাত নির্বোধ জংলী মানুষের সমার্থবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের চা-বাগানের বাইরের দুনিয়ায় দেখা যায় শুধু হাটের দিনগুলিতে। মাটিগড়া, শালবাড়ি, বাগডোগরা, নকসালবাড়ি, পানিঘাটার হাটগুলিতে ওদের ভীড়ে পা ফেলা দুষ্কর হয়। তারা অতি সাধারণ দু-একটা সওদা কেনে। মেয়েরা কেনে পুঁতির মালা বা নাকে কিংবা কানে পরার পুঁতির গয়না। তারপর হয়তো সবাই মিলে দেশী মদের দোকানে সপ্তাহের মেহনত জলকরা পয়সা ঢেলে দিয়ে আসে। দিনের পর দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও পশুর মত লাঞ্ছনাময় জীবনে ঐ ছিল তাদের একটু বৈচিত্র্য। একে তো ঘরে তৈরি 'হাড়িয়া' খাওয়াটা উপজাতিদের মধ্যে বহু প্রচলিত রীতি। তার উপর বাগানের মালিক ও মদের দোকানদার নানা কৌশলে মানুষগুলিকে বিষভাণ্ডের দিকে আকর্ষণ করে। শান্ত ভীরু স্বভাবের মানুষগুলি ফরসা জামাকাপড়-পরা লোক দেখলে সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। আচম্বিতে একদিন সেই ভীতু মানুষগুলি কি কারণে যেন ক্ষেপে গিয়ে মাটিগড়ার হাটে মহাজনদের গদি লুট করে বসল। তার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংস্রব ছিল না। তবু আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদা রাখতে বহু সশস্ত্র পুলিশের আমদানী হল। মহকুমা আদালতে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলে। লুটের খবরে শহরের বিত্তবানের দল বেশ কিছুদিনের

জন্য আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন মনে আছে।. এই ঘটনা মনে একটা ছাপ রেখে যায়। ভাবি, যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা দূরে থাকুক, সে-কথা ভাবতেও বুঝি ভয় পায় তারা হঠাৎ বে-পরোয়া হয়ে উঠল কি কারণে? ঘুমন্ত দৈত্যের নিদ্রাভঙ্গের যে-কথা শুনেছি তা কি এই রকম?

চা-বাগানের কুলিদের মতই অবজ্ঞাত, পায়ের তলায় পড়া রাজবংশীদের ভিতর থেকে-ওঠা একজন লোক সেই সময়ে গোটা তরাইয়ের ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে ছিল লবণ ডাকাত। তার কর্মক্ষেত্র ছিল মেচী নদী পার হয়ে নেপালের তরাই অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। সত্য-মিথ্যা জানি না, লোকমুখে তার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সে নাকি ধনী মহাজন ও জোতদারদের বাড়িতে ছাড়া ডাকাতি করত না এবং অনেকক্ষেত্রে লুটের ধন গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। সেই লোকটি যখন ধরা পড়ল ও তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল তখন তাকে দেখার আগ্রহে কাছারিতে তিলধারণের স্থান হত না। এই দুটি ঘটনায় মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। সমাজের নীচের তলার লোকগুলির বুকের অন্তরালেও তাহলে আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহ লুকিয়ে আছে। তারা শুধু চাপা কান্নায় সব কিছু সয়ে যায় না। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে অগ্নি উদ্‌গিরণ করতে পারে। সেদিন হয়তো পরিষ্কার করে অত কথা বুঝি নি তবু সেইরকম একটা উপলব্ধির দিকে এগিয়েছিলাম।

অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের শহরে প্রায় সবাই তার কথা ভুলতে বসেছিল। আবার আলোড়ন জাগল ডিউক অফ কনটের আগমন উপলক্ষে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভেবেছিল সম্রাটের প্রতিনিধির সম্মানে ভারতবাসীর মজ্জাগত রাজভক্তি উথলে উঠে বিদ্রোহের মনোভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু হল তার বিপরীত। আর একবার দেশবাসীর কণ্ঠে বিদ্রোহের সুস্পষ্ট ঘোষণা উচ্চারিত হল। ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ মিছিলে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত আলোড়িত হয়ে উঠল। তার প্রতিধ্বনি শুনলাম এবার অত্যন্ত কাছে, আমাদের স্কুলের প্রাঙ্গণে। ডিউকের সম্মানে ছেলেদের মেডেল বিতরণ করা হবে। প্রধান শিক্ষকের আদেশে আমরা মাঠে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ উপরের শ্রেণীর জন-কয়েক ছাত্র মেডেল নিতে অস্বীকার করে বসল। শিক্ষকদের রক্তচক্ষু আর শাসানি তাদের মাথা নোয়াতে পারল না। প্রধান

শিক্ষক বেত্রাঘাতে জন-দুই ছাত্রের শরীরে রাজভক্তির চিহ্ন এঁকে দিলেন। তারা সকলের চোখের সামনে মাথা উঁচু রেখে দৃপ্তপদক্ষেপে স্কুল ছেড়ে চলে গেল। আমরা তখন অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখেছি, মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার সাহস হয় নি। শাস্তির ভয়ে চোখের জল চেপে রেখেছি। তবু সেই দিনটি স্মৃতিতে যে অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখে গেছে তা আজও ক্ষীণ হয় নি।

দিন কেটে চলে। এতদিনে একজন মনের মত সঙ্গী জুটে যায়। সে হল শশাঙ্ক। তার মামা ছিলেন আমাদের গৃহচিকিৎসক। শশাঙ্ক মামার বাড়ি থেকে পড়বে বলে এখানকার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বলিষ্ঠ চেহারা এবং অত্যন্ত রাগী মেজাজের এই প্রবীণ চিকিৎসকটিকে রোগীরা অত্যন্ত ভয় করত। আমাদের কাছেও তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ যম। তরাইয়ের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তেতো ওষুধগুলি বিনা ওজর-আপত্তিতে গলাধঃকরণ করেছি শুধু সেই ডাক্তারবাবুকে ডাকা হবে শুনে। চিকিৎসা, অর্থোপার্জন এবং নিছক দৈহিক তাগিদগুলি মেটানো ছাড়া তিনি আর কিছু জানতেন বলে কেউ ধারণাও করতে পারে নি। সেই লোকটির বুকেও স্বাধীনতার প্রেরণা ফল্গুধারার মত লুকিয়ে থাকতে পারে সে-কথা কে ভেবেছিল? অথচ তাঁরই গোপন আলমারী থেকে শাশাঙ্ক একদিন আবিষ্কার করল 'বাংলার বিপ্লববাদ', 'নির্বাসিতের আত্মকথা' এবং ঐ ধরনের আরো কয়েকখানা বই। দুই বন্ধুতে লুকিয়ে সেগুলি পড়ে ফেলি। স্কুল লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়ি যোগীন্দ্র গুপ্তর কাব্য 'শিবাজী' ও 'পৃথ্বীরাজ'। শশাঙ্ক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' সংগ্রহ করে আনে। কিছুদিন আগে 'দেবী চৌধুরাণী' পড়ার সুযোগ হয়েছিল। 'দেবী চৌধুরাণী'র নায়ক-নায়িকাদের তো ঘরের কাছের মানুষ বলে মনে হত। বৈকুণ্ঠপুরের বন শিভোক রোডের দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে। খরস্রোতা তিস্তা রংপুরে পৌঁছে পরিণত হয়েছে বেগবতী নদীতে। আর দেবীর পাইক বরকন্দাজেরা ছিল রাজবংশী চাষীদেরই পূর্বপুরুষ। তাই 'আনন্দ মঠ'কেও সহজে আপন করে নিতে পারি। ভাবি 'পদচিহ্ন' গ্রাম ছিল বুঝি বনের ঠিক ওপারে আর তার মধ্যেই ছিল মাতৃমুক্তিব্রতী সন্ন্যাসীদের গোপন কেন্দ্র। আমি আর শশাঙ্ক দুজনেই ছিলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভক্ত। 'জেলারদা'র দয়ায় তাঁর প্রায় সব বইগুলিই পড়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে পাই ভাষায় কাব্য এবং বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে

দেশপ্রেম এবং মনুষ্যত্বের আবেদনের অপূর্ব সমাবেশ। এইভাবে নানা দিক থেকে কানে বেজে ওঠে পরাধীনতার শিকল ছেঁড়ার ডাক। মানুষের সেবা, দেশজননী এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি ভালবাসার যে ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করেছে তাতে এবার সুস্পষ্টভাবে বিদ্রোহের রং লাগে। বিদেশী প্রভুর ঔদ্ধত্যের নমুনা চোখে দেখেছি। দেশবাসীর নিত্যনূতন অবমাননার খবর শুনে মন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। এবার উপলব্ধি করি যে পরাধীন দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করাই হল মানবপ্রেমকে সার্থক করার শ্রেষ্ঠ পথ।

দুই সঙ্গী মিলে কত জল্পনা করি। অতীত ইতিহাসের মহানায়কদের কীর্তিকলাপ আর নিজেদের ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে দেখি কত দিবাস্বপ্ন। দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে কোনো শীতের দুপুরে চলে যাই শুকনা ফরেস্টের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের উপরে। পিচ বাঁধান হিলকার্ট রোড ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। বাঁপাশে শালবনে ঢাকা টিলাটি সমতলের সঙ্গে পাহাড়ের সীমানা নির্দেশ করে। কার্ট রোডেরই একপাশ ধরে রেলপথ চলেছে সর্পিল গতিতে। দুধারে ঘন বন ঝিল্লীরবে মুখরিত। বনের গহন ভেদ করে দৃষ্টি বেশীদূর চলে না। মাইল দুয়েক অগ্রসর হওয়ার পর মোড় ঘুরে হঠাৎ দেখা যায় যে পাহাড়ের বেশ কিছুটা উপরে উঠে এসেছি। উপরে মিঠাইডাঁরার ঠিক ওপারে তিনধরিয়া পাহাড়ের চূড়ায় সাদা মেঘের দল জমতে শুরু করেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সমতল ভূমির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কল্পনায় সামনে এসে দাঁড়ান অরণ্যচারী গুরুগোবিন্দ। সত্যের সন্ধানের জন্য তিনি বনবাস বেছে নিয়েছিলেন। তারপর শিখদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই মন্ত্র যার বলে 'লক্ষপরাণে শঙ্কা না জাগে, না রাখে কাহার ঋণ। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'। আর আসেন ছত্রপতি শিবাজী। তাঁরও ছেলেবেলা কেটেছে এমনই পাহাড়ে জঙ্গলে এবং গোর্খাদেরই মত কঠিন পরিশ্রমী মাওয়ালীদের মধ্যে। সূর্য অস্তাচলের দিকে হেলে পড়ে। দুই বন্ধু সমতলের দিকে ফিরি। ফেরার সময় যেন সঙ্গ নেন আনন্দমঠের সেই সন্তান বীরের দল। পাহাড়কে পিছনে ফেলে শুকনা স্টেশন ছাড়িয়ে যখন এগিয়ে এসেছি ততক্ষণে মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে। বনের পর দুপাশে অবারিত মাঠ। দূরে অরণ্যের রহস্যলোক। শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী। নির্জন পথে শশাঙ্ক গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে 'বন্দে মাতরম্'। সমস্ত শরীর এবং অনুভূতি জুড়ে নামে এক বিচিত্র শিহরের বন্যা।

জন কর্নফোর্ড :. তিরিশের লাল তারা

স্পেনে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দিতে ছুটে গেলেন ক্যামব্রিজের তরুণ শিক্ষার্থী জন কর্নফোর্ড। একটি মহৎ বিশ্বাসের জন্য আত্মদান করে এই তরুণ শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করলেন। বিপ্লবের আদর্শে কর্নফোর্ডের প্রত্যয়ে কোনো দ্বিধা ছিল না। ১৯৩৬ সালে তিনি তাঁর কলেজের অধ্যাপকের কাছে চিঠি লিখে গেলেন : 'বৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীরূপে পদত্যাগ করবার জন্য এই চিঠি লিখছি আপনাকে। এই চিঠি যখন আপনার হাতে গিয়ে পড়বে আমি ততক্ষণে ফ্যাসিবিরোধী সেনাবাহিনীতে আমার ইউনিটে আবার যোগ দিয়েছি। এই গ্রীষ্মে আমি সেই বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে যুদ্ধ করছি।' ফ্যাসিস্ত ফ্র্যাঙ্কোর বাহিনীর বিরুদ্ধে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য আমরা হারিয়েছি কয়েকটি প্রতিভা-দীপ্ত প্রাণ—কডওয়েল, রালফ ফক্স এবং তরুণ কর্নফোর্ড। ক্যামব্রিজে থাকতেই কর্নফোর্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। নিরুপদ্রব, চিরাচরিত অস্তিত্বে তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। সহপাঠীদের বলতেন : I am learning to live by living। এই প্রাণচঞ্চল যুবক তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে একদিন পারী থেকে রাত্রির ট্রেনে রওনা হলেন সৈনিকের বেশে। গন্তব্যস্থল মাদ্রিদ। সঙ্গে এক ভল্যুম 'ক্যাপিটাল' ও অনেকে বিস্মিত হবেন, সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলো। কর্নফোর্ড বলতেন : The worst thing about this war is not discomfort, nor even danger, but boredom। সুখী স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় যাঁর অনিচ্ছা, অফুরন্ত প্রাণসম্পদ আর আদর্শের প্রেরণায় দিনরাত জ্বলে যুদ্ধক্ষেত্রকেও তাঁর একঘেয়ে মনে হত। মৃত্যু বরণ করে, বিপ্লবের আগুন চিরকালের জন্য প্রজ্জ্বলিত রেখে, কর্নফোর্ড এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। কর্নফোর্ড বিশ্বাস করতেন বিপ্লব অপরিহার্য, প্রশ্নাতীত সত্য। খ্রীষ্টানুরাগীদের কাছে যেমন নিশ্চিত

* Communism Was My Waking Time : John Cornford ; Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1958. (Distributor : National Book Agency Pr. Ltd., Cal.-12)

প্রত্যয় রিসারেকশন। কর্নফোর্ড বিপ্লবের শ্রেণী-শত্রুদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাঁর এই বিরোধ ও ব্যবধানে কোনো দুর্বলতা ছিল না, দ্বিধা তো নয়ই। ক্যামব্রিজে তাঁর সহযোগী ভিক্টর কিরনান ঠিকই লিখেছেন: কর্নফোর্ডের জীবনপ্রত্যয়ের আসল প্রতীক ছিল ব্যারিকেড। তিনি প্রতিরোধের শিল্পী। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পৃথিবীর কোন জিনিসটা তাঁকে সবচেয়ে মানসিক আনন্দ দেয়। তিনি ক্ষণকালে চিন্তা করে বলেছিলেন: কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের অস্তিত্ব। মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমাজবাদীদের মতো শুধুমাত্র মানবিক আবেদনের তাগিদেই কর্নফোর্ড এই মহান আদর্শের অংশীদার হন নি। অর্থহীন ভাবপ্রবণতা আর মানসিক দুর্বলতার প্রতি, লেনিনের মতোই, তাঁর ছিল আন্তরিক ঘৃণা। কমিউনিস্ট অন্দোলনের মধ্যেই একমাত্র তিনি নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পেয়ে-ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, ফাসিস্তদের গুলিতে কর্নফোর্ড অকালে প্রাণ হারালেন। ১৯৩৮ সালে প্যাট্‌ স্লোন জন কর্নফোর্ডের একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সেই গ্রন্থটি থেকে কয়েকটি নির্বাচিত অংশ মস্কো থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নামকরণে কর্নফোর্ডের একটি কবিতার স্মরণীয় পংক্তিই ব্যবহৃত। স্পেনের রণাঙ্গনে, ফাসিস্তদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তরুণ কর্নফোর্ড সগৌরবে লিখলেন:

> Though Communism was my waking time.
> Always before the lights of home
> Shone clear and steady and full in view
> Here, if you fall, there's help for you
> Now, with my Party, I stand quite alone.

কমিউনিজমের আলোকে কর্নফোর্ডের চেতনার জাগরণ। স্বল্পায়ু জীবনে তিনি সামান্য যা কিছু লিখে গেছেন তার মধ্যেই এই প্রতিভাবান তরুণ বিপ্লবীর অবিনশ্বর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ত্রিশের যুগের ইয়োরোপীয় সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে কর্নফোর্ডের একটি আলোচনা আজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সত্যের আলোকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। সে-যুগের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অডেন, চার্লস ম্যাজ, স্টিফেন স্পেণ্ডার, সেসিল ডে লুইস, রিচার্ড গুডম্যান ও কেম্পের কবিতায় ধনতান্ত্রিক সমাজের ভাঙন ও নতুন সমাজবাদী ...যিত হয়েছিল। বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটিকে বেছে

নেবার তাগিদ তখন জরুরী হয়ে পরেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকে পরে মত বদল করে স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। কর্নফোর্ড বলছেন, বুর্জোয়া চরিত্রের এই দোলাচলবৃত্তিকে তুলে ধরাই বিপ্লবী সাহিত্যিক্যের প্রধান দায়িত্ব। স্পেণ্ডার দায় মোচন করে বললেন, কবিতায় বিপ্লব চলে না। কারণ, তাঁর মতে, মানুষের সর্ববিধ কাজকর্মের মধ্যে কবিতা লেখাটা হল সবচেয়ে কম বিপ্লববাদী। কবিতা, তিনি বলছেন, আপনাতে আপনিই সম্পূর্ণ ; যদি তার বক্তব্য আমাদের এই বিভ্রান্ত আবেগের জগতে উপচে পড়ে, তাহলেই তার চরিত্র নষ্ট হল, সেটা আর কবিতা রইল না। কর্নফোর্ড তার জবাবে বলেছেন, বুর্জোয়া লেখকরা মনে করেন শিল্প ও জীবনের মধ্যে একটা বিরোধ রয়েছে। শিল্পের জগৎ, বুর্জোয়াদের ধারণা, একটা অমূর্ত অধ্যাত্ম- জগৎ, তার সঙ্গে এই প্রতিদিনের জীবনের কোনো যোগ নেই। এই মৌল বিভ্রান্তিই বুর্জোয়া লেখকদের 'নিরপেক্ষতা' ও বিপ্লবী লেখকের বাস্তবানুগতার বিরোধ তৈরি করেছে।

এই নিরপেক্ষতা, বুর্জোয়া লেখকদের আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রতারণার একটি স্থল। বাস্তববাদী লেখক-সমাজের 'নির্লিপ্ত দর্শক' হতে পারেন না। তাঁকে সমাজের বিপ্লবী সংগ্রামের অংশীদার হতে হবে। স্পেণ্ডার বলেছেন, কবিতা রচনাতেই কবিতার সমস্যার সমাধান। কর্নফোর্ড চার্লস ম্যাজের বক্তব্য সমর্থন করে বললেন, কবিতা যে সমস্যা সমাধান করে সেটা কবিতার নয়, কবির নিজের। এই বস্তুজগৎই, কবির পক্ষেও, একমাত্র জগৎ এবং এই জগৎই কবিতার জগৎ।

সমাজবাদী বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও বামপন্থী প্রগতিবাদীদের রচনায় অনেক সময় স্বতঃবিরোধ দেখা দেয়। কর্নফোর্ড ছাত্র বয়সেই এই সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন। প্রশ্নটি নেড়েচেড়ে দেখেছেন। তিনি বলছেন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে এঁরা স্বশ্রেণী ত্যাগ করলেও, তাঁদের রচনা মুখ্যতঃ নিজের পরিত্যক্ত শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই। লেখক হিসেবে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন, সেটা সরাসরি বিপ্লবী কবিতা রচনার পরিপন্থী। প্রতিদিনের অস্তিত্বের সংগ্রামে, সমবেত আন্দোলনে যোগ দিয়েই একমাত্র এই প্রতিকূলতার বেষ্টনী তাঁরা অতিক্রম করতে পারেন। ডে লুইস নজির দেখাতেন, লরেন্স শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত লেখক হলেও, শ্রমিকশ্রেণীর লেখক হতে পারেন নি। দোষটা শ্রমিকশ্রেণীর নয়। লরেন্স নিজেকে স্ব-শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। তিনি আর শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন নি। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এক ধরনের মোহ থাকে যে বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের থেকে পৃথক একটি স্থায়ী শ্রেণীর লোক তাঁরা। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামে সংকট যত তীব্র হয়, এই স্বতন্ত্র শ্রেণীর অস্তিত্বও ততই হয়ে ওঠে বিপন্ন। বুর্জোয়া অথবা সর্বহারা একটি শ্রেণীর সঙ্গে তাদের হাত মেলাতে হয়।

কর্নফোর্ডের বিচ্ছিন্ন রচনাংশে এই সিদ্ধান্তগুলো আমি পেয়েছি। তাঁর নিজের কয়েকটি কবিতাও এই গ্রন্থে সংকলিত। জীবনসত্যকে তিনি সহজেই কাব্যসত্যের সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। কারণ জীবনের ভিতরে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রতায় প্রবেশ করেছিলেন। ট্রাডিশনের নামে মৃত সংস্কার ও প্রাণহীন পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে নিজের কবিতার বিষয়বস্তু করেন নি। মাদ্রিদে ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যেও তিনি কবিতা লিখেছেন। এবং সে কাব্য কর্নফোর্ডের তাবৎ আকুলতা ও আশ্বাসে ভরপুর :

We are the future. The last fight let us face.

কর্নফোর্ডের এই তাজা বিশ্বাসে কোনোদিন দ্বিধা প্রবেশ করে নি। ফ্রাঙ্কোর ঘাঁটি আক্রমণের আগের রাত্রিতে কর্নফোর্ড ভবিতব্যের মতোই লিখলেন :

Time present is a cataract whose force
Breaks down the banks even at its source
And history forming in our hand's
Not plasticine but roaring sands,
Yet we must swing it to its final course.

[Full Moon at TIERZ]

কর্নফোর্ড, আমাদের দুর্ভাগ্য, খুব বেশি লিখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তিনি ভেবেছেন অনেক, প্রত্যক্ষ বিপ্লবের জন্য কাজ করেছেন আরও অনেক। তাঁর চিন্তা- ও জীবনযাপনের মধ্যে, প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। তাঁর প্রাণপ্রাচুর্য কবিতায়, প্রবন্ধে ও চিঠিতে উপচে পড়েছে। তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মতো ঘোলাটে আদর্শবাদের ছলনায় তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি। স্টিফেন স্পেণ্ডারদের চাতুরির চোরাবালিতে তিনি পা মাড়ান নি। এই বৈপ্লবিক উদ্ধত্যই কর্নফোর্ডের

চরিত্রকে সমকালীনদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। ঐতিহ্যের অবক্ষয়ের মূলে যে সাহস, চরিত্র ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা বিশুদ্ধ প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রেরণা দিতে পারে কর্নফোর্ড ছিলেন সে-সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। ১৯৩১ সালে মায়ের কাছে লেখা কয়েকটি পত্রগুচ্ছে কর্নফোর্ডের এই অভিমত স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। তাঁর বিদুষী মা এক চিঠিতে লিখেছিলেন, একজন কবি প্রত্যেক কবিতায় নিজস্ব কয়েকটি পংক্তি মাত্র লিখবেন। অবশিষ্ট পংক্তি আসবে ট্রাডিশন থেকে। কর্নফোর্ড তাঁর অভিমত খণ্ডন করে লিখলেন :

For poets writing just after a revival of tradition this seems to be all right, but for poets in the decadence of a tradition it is impossible (Could the poets of the Romantic Revival have let the tradition of Pope and Dryden communicate for them ?) and this age seems to me just such an age of decadence of tradition.

ঐতিহ্যের অবক্ষয়ের যুগে প্রগতিশীল সাহিত্যিকের দায়িত্ব নতুন ঐতিহ্য তৈরি করা। আমাদের দেশে উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন যেভাবে নতুন কাব্যের ঐতিহ্য গড়েছিলেন। কর্নফোর্ডের জীবনে ও কাব্যে এই নতুন পৃথিবীর স্বরের আকুলতা অপূর্ব বাচনভঙ্গিতে উজ্জ্বল অবিস্মরণীয়তা লাভ করেছে। তিনি জানতেন আত্মদানের জন্যই তাঁর জন্ম। সুস্থ, পরিচ্ছন্ন পৃথিবীর স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর ঘাতকদের হাতে তিনি প্রাণ হারালেন। কিন্তু রেখে গেলেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী উত্তরাধিকার :

And if bad luck should lay my strength
Into the shallow grave,
Remember all the good you can :
Don't forget my love.

[To Margot Heineman]

কর্নফোর্ড আমাদের মনে, আগামী কালের মানুষের মনে নিরবধি কাল বেঁচে থাকবেন।

কৃষ্ণ ধর

নীল বোর

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আজকাল প্রত্যেক বছরই বিদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এ দেশে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এবারে তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব-বিশ্রুত প্রৌঢ় বিজ্ঞানী নিল বোর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক আহূত হয়ে তিনি কলিকাতায় আসেন ও সেনেটে, অ্যাসোসিয়েসন সভায় ও নিউক্লিয়র ফিজিক্স আলয়ে বক্তৃতা দেন। এই মহাবিজ্ঞানীর দর্শন লাভে ও তাঁর বক্তৃতা শুনে কলিকাতাবাসী ধন্য হয়েছে।

শিক্ষিত সমাজে বোরের নাম অবিদিত নয় বললে ভুল হবে না। বিশ শতকের শুরুতে পদার্থ-বিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটে ও নব্য বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, বোর সেই বিপ্লবযজ্ঞের একজন পুরোহিত-প্রধান। প্লাঙ্ক যেমন কোয়াণ্টাম বা শক্তি-কণাবাদ, আইনস্টাইন যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি ও কাল গতি ভর প্রভৃতির সাপেক্ষতা ও রাদারফোর্ড যেমন কেন্দ্রিন বিদ্যুতিন সমাবেশে পরাণুর গঠন আবিষ্কার করে বিজ্ঞানে বিপ্লব সূচিত করেন, বোরও তেমনি প্লাঙ্কের কোয়াণ্টামকে রাদারফোর্ডের পরাণু গঠনে প্রয়োগ করে বিপ্লব স্থায়ী ও নব্য বিজ্ঞানের যাত্রা জয়যুক্ত করেন।

উনিশ শতকের আদিতে, ১৮০৮ অব্দে ইংরাজ-বিজ্ঞানী ড্যাল্টন অণু-পরাণু সমাবেশে পদার্থের সংগঠন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সম্পাদিত করেন। ড্যাল্টনের পরাণু হোল পদার্থবস্তুর সর্বশেষ ও ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য ব্যষ্টি। মৌল পদার্থের সংখ্যানুযায়ী মৌল পরাণু হোল বিরানব্বইটি ও তাদের যৌগিক-বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অণুর উদ্ভব। এর প্রায় একশ বছর পরে একদিকে ইউরেনিয়ম-খনিজের ও রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ও ঐগুলি থেকে নির্গত অ্যালফা, বিটা ও গামা রশ্মি আর অপরদিকে এক্সরে ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুতিনের আবিষ্কার ফলে পরাণুই পদার্থের অবিভাজ্য বস্তু—এ-মত বর্জিত হোল। ১৯১১ অব্দে রাদারফোর্ড ঘোষণা ও প্রমাণিত করলেন যে পরাণু মৌল-ব্যষ্টি নয়; তারও উপাদান ও স্থাপত্য আছে। পরাণু হোল যেন এক স্বল্পাকৃতি সৌরমণ্ডল,

যার কেন্দ্রে আছে গুরুভর পজিটিভ কেন্দ্রিন ও তাকে প্রদক্ষিণ রত লঘু-ভর নেগেটিভ বিদ্যুতিন,—এক থেকে বিরানব্বই সংখ্যক। কক্ষের আয়তন কেন্দ্রিন-বিদ্যুতিন আয়তনের লক্ষ-কোটি গুণ।

রাদারফোর্ড-কল্প পরাণু তেজস্ক্রিয়তা ব্যাখ্যায় প্রধানাংশে কৃতসিদ্ধ হলেও অন্য এক বিষয়ে অসিদ্ধ হোল। হাইড্রোজেনের বর্ণালিতে,—অন্যত্রও—একটা সমাবেশ শৃঙ্খলা দেখা যায় বিজ্ঞানীরা যার কোন অর্থ খুঁজে পান নি। রাদারফোর্ড কর্তৃক পরাণু স্থাপত্য আবিষ্কারে আশা হয়েছিল সে অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু তা নির্মূল হোল। প্রচলিত গণিতানুসারে এই প্রদক্ষিণ বড় বিদ্যুতিন আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করতে বাধ্য ও সেই আলোকের বর্ণালিতে পূর্বোক্ত শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকা উচিত। এদিকে আবার প্রদক্ষিণ ফলে বিদ্যুতিন-কক্ষ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে কেন্দ্রিনে বিলীন ও তার ফলে পরাণুর লোপ অনিবার্য হওয়ার কথা। অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরাণু রশ্মি দিতে ও সেই সঙ্গে লুপ্ত হতে বাধ্য।

এ হেঁয়ালির সমস্যাপূরণ করলেন নিল বোর, রাদারফোর্ডের আবিষ্কারের দু'বছর পরে। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন রাদারফোর্ড বর্ণিত পরাণু-স্থাপত্য ঠিকই ; কিন্তু ইলেক্ট্রন কক্ষের অঙ্ক গণনায় প্রাচীন গণিত বাতিল করে আশ্রয় নিতে হবে প্লাঙ্ক উদ্ভাবিত নব্য-গণিতের,—কোয়ান্টামের।

বোর সিদ্ধান্তের বিবরণ দেওয়ার পূর্বে কোয়ান্টাম বিষয়ে যৎকিঞ্চিত বলা দরকার। কোয়ান্টাম বিধির তাৎপর্য হল তাপ-বিকীরণ শক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন না মনে করে তাকে গণ্য করা উচিত কণাসমষ্টি রূপে। এই সিদ্ধান্তে প্লাঙ্ক উপনীত হন ১৯০০ অব্দে তাপ বিকীরণের একটা বিসদৃশতার সূত্র সন্ধানে। প্রত্যক্ষের সঙ্গে হিসাবের বিসদৃশতার মীমাংসার জন্য ইতিপূর্বে লর্ড রেলে, উইন, বোলজমান প্রভৃতি এক একটি মীমাংসা দাখিল করেন। তন্মধ্যে বোলজমানের সূত্রই হয়েছিল সমীচিন। এই সূত্রের সমর্থন সন্ধানে প্লাঙ্ক এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিকীরণের শক্তি আসলে শক্তি-কণার সমষ্টি। একটা সহজ সূত্রও তিনি আবিষ্কার করেন,—সে হল বিকীরণের স্পন্দন বা তরঙ্গ সংখ্যাকে একটা অভিন্ন অঙ্ক—যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'প্লাঙ্কাঙ্ক'—দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে তার শক্তি মাত্রা। শক্তিকে কণারূপে গণ্য করা সে সময়ের পক্ষে এমনই অর্বাচীন ছিল যে স্বয়ং প্লাঙ্ক তাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। অবশেষে একে সংশয়মুক্ত করে

অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করলেন পাঁচ বছর পরে, ১৯০৫ অব্দে, আইনস্টাইন। তিনি আলোকপাতে ধাতুগাত্র থেকে ইলেক্ট্রন মোচন হওয়ার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যায় প্লাঙ্ক-এর কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব প্রয়োগ করেন ও সেই থেকে এই অভিনব তত্ত্ব বিজ্ঞান জগতের স্বীকৃতি লাভ করে। আইনস্টাইন বলেন আলোকরশ্মিও কণিকা সমষ্টি ;—তারও তরঙ্গ সংখ্যাকে প্লাঙ্কাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় সে রশ্মির শক্তি-মাত্রা। এতদিন ঈথর তরঙ্গ বা বিদ্যুৎ-চুম্বকী তুরঙ্গ বলেই আলোক বিদিত ছিল, এখন সন্ধান পাওয়া গেল আলোক-অণুর ; তার নাম হল 'ফোটন'।

এরপর কয়েক বছর আর কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বিশেষ অগ্রসর হয় নি। বোর হাইড্রোজেন বর্ণালি ব্যাখ্যায় পরাণুর স্থাপত্যে এই বিধি প্রয়োগ করে তাকে জয়যুক্ত করলেন। এরপর থেকে কোয়াণ্টাম বিধি প্রয়োগ সহজ হল। বোরের মতে পরাণুতে প্রদক্ষিণরত ইলেক্ট্রনদের কথা নির্দিষ্ট মাত্র এক একটি নয় ; অনেকগুলি। বিশেষত্ব এই যে কক্ষগুলির বর্ধিত হারে কোয়াণ্টাম বা শক্তি-মাত্রা আছে। তাপ বা আলোকপাত হলে অথবা সংঘর্ষের ফলে পরাণুর শক্তি লাভ হয়। তখন পরাণুসহ ইলেক্ট্রনরা উচ্চমাত্রিক কক্ষে নীত হয়। আবার যখন পরাণুর শক্তিব্যয় হয় তখন তার ইলেক্ট্রন নিম্ন-মাত্রিক কক্ষে পতিত হয়। শক্তি ব্যয়ের সময় উদ্বৃত্ত শক্তি আলোকরশ্মি রূপে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়। এই মত হিসাবে বোর হাইড্রোজেন বর্ণালির বিশেষত্ব প্রত্যক্ষের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। কেবল হাইড্রোজেনের নয়, হিলিয়ামের বর্ণালি ও এক্সরে বর্ণালিগত বৈশিষ্ট্য তাঁর হিসাব মতে অপ্রত্যাশিত ভাবে মীমাংসিত হল, যা সব অনেককাল অবোধ্য ছিল। এই ভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানে ক্ষুদ্র জগতের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর এক বিধি ধীরে ধীরে নিজের আসন পেতে নিল।

প্লাঙ্ক-আইনস্টাইন-বোরের গবেষণা থেকে এটা বেশ স্পষ্ট হল যে পদার্থ-জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের দুটি রাস্তা বিদ্যমান,—একটি ক্ষুদ্র সত্তাদের জন্য ও অপরটি বড়দের জন্য। জগৎ পরিচয়ের এক রাস্তা নেই। আবার ক্ষুদ্রের ব্যষ্টিক সাক্ষাৎ বা আচরণ প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব ; কিন্তু ক্ষুদ্রের সামষ্টিক আচরণ প্রত্যক্ষ ও আয়ত্ব করা বিজ্ঞানে সহজসাধ্য। এর জন্য প্রয়োজন সমষ্টিগণিতের। বিজ্ঞানে সমষ্টিগণিতের প্রথম পত্তন করেন ম্যাক্সওয়েল। তাপের সমষ্টিগণিতের পত্তন করতে বোল্‌জমান তাঁর সূত্র প্রস্তাবিত করেন ও

তারই সমর্থন সন্ধানে প্লাঙ্ক উপনীত হন কোয়াণ্টাম বিধিতে,—কিন্তু বিধিমত উপায়ে নয়। অতঃপর প্রফেসার সত্যেন বোস ১৯২৪ অব্দে ‘ফোটন’ ও তথা কোয়াণ্টামের সমষ্টিগণিত রচনা করেন ও এই সঙ্গে বোল্‌জমান-সূত্র ও প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বিধিমত ভিত্তি লাভ করে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আলয়ে প্রফেসর বোরকে বিমলাচরণ লাহা স্বর্ণপদক উপহার দেওয়ার জন্য যে সভা আহূত হয়, প্রফেসার বোস তার সভাপতিত্ব করেন। বোর এই সভায় এক মনোজ্ঞ বক্তৃতায় বোস স্ট্যাটিসটিক্সকে সমাদৃত ও কীর্তিত করে বলেন—“আপনাদের প্রেসিডেন্ট যে নূতন পথ রচিত করেছেন আমরা আজ সে পথের যাত্রী।” এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—নিউটন থেকে অদ্যাবধি বিজ্ঞানীরা পদার্থ, পরমাণু শক্তি, ব্যাপ্তি প্রভৃতির আবরণ ভেদ করে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করবার চেষ্টা করে আসছেন। এই প্রয়াসে প্লাঙ্ক যখন কোয়াণ্টাম আবিষ্কার করলেন তখন তাকে সমর্থন করলেন আইনস্টাইন। আইনস্টাইন আলোককণিকা প্রস্তাবিত করে তাকে কোয়াণ্টামের অন্তর্গত করলেন। এর নামকরণ হল ‘ফোটন’। এই ফোটন ও কোয়াণ্টার জন্য প্রফেসর বোস রচনা করলেন বোস স্ট্যাটিসটিক্স ও বোলজমান সূত্র ও প্লাঙ্ক উদ্ভাবিত কোয়াণ্টাম অবলীলাক্রমে বোসের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হল। এ সময়ে পাউলির বিখ্যাত তত্ত্ব—exclusion principle সবে প্রচলিত হয়েছে,—তার মর্মার্থ, দুটি ইলেক্ট্রন এক সঙ্গে একই কোয়াণ্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। তবে কণিকা মাত্রেই ইলেক্ট্রন জাতীয় নয়। সমভাবের ও বিষম ভাবের,—বৈজ্ঞানিক ভাষায় symmetrical ও assymetrical function শাসিত। পাউলির এ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এক বছর পরে ফার্মি অপর এক স্ট্যাটিসটিক্স প্রস্তাবিত করেন। এই দুই সামষ্টিক বিধি দ্বারা কণিকাসমষ্টির আচরণ শাসিত। যে সব কণিকা প্রথমটির দ্বারা শাসিত তাদের নাম ‘বোসন’ : ফোটন, অ্যালফা কণা প্রভৃতি এর অন্তর্গত। আর যে সব কণিকা দ্বিতীয়টির দ্বারা শাসিত তাদের নাম ‘ফার্মিয়ন’ ; ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

বিজ্ঞান-পরিচয়ের যে দুটি পথের কথা ওপরে বলা হয়েছে তাদের ও রেলেটিভিটি প্রভৃতি সঙ্কলন করে এক মার্গের সন্ধানে আইনস্টাইন রত ছিলেন মৃত্যুকাল অবধি ; কিন্তু বোর মনে করেন সে বৃথা প্রয়াস। ক্ষুদ্র জগতের পরিচয় আমাদের বিভিন্ন ভাবেই নিতে হবে।

বাঙলা চিত্রকলার এ্যাবস্ট্রাক্ট ধারা

প্রভাতকুমার দত্ত

মূল আলোচনা স্বরু করার আগে এ্যাবস্ট্রাক্ট কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে এমন একটি আঙ্গিকের রূপায়ণ যেখানে অনুভূতিগত পারম্পর্য বা অনুকরণকারী ইচ্ছা অনুপস্থিত। এক কথায় এই ধরণের শিল্প বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে কেবল ফর্মসৃষ্টির চেষ্টা। এ ব্যাপারে শিল্পী বাস্তব জগত থেকে সাহায্য পেতে পারেন কিংবা তা সম্পূর্ণ স্বকল্পিত হতে পারে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই রঙ ও রেখাকে নয়ন সুখকর ভাবে সাজানোই হচ্ছে শিল্পীর উদ্দেশ্য। সত্যিকারের এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প ন্যাচারালিজমের একেবারে বিপরীত জিনিষ। অবশ্য কথা এই সত্যিকারের এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প বলতে কিছু হতে পারে না। কারণ ছবির নক্সা যতই নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি হোক না কেন স্বাভাবিক ফর্মের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে তার যোগাযোগ থাকবেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার স্বাভাবিক ফর্মকেই মূলভিত্তি করে তাকে এদিক ওদিক ভেঙে সাজিয়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প সৃষ্টি করা হয়।

একথা সকলেরই জানা যে এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ইউরোপ। যে মন এই ধরনের শিল্প সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে তার রূপ কিন্তু বড় বিচিত্র। বিজ্ঞান তথা বস্তুর প্রাচুর্যের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় মানসিকতা যে মৌলিকত্ব অর্জন করেছে ভারতীয় মানস বোধহয় ততটা করেনি। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে হয়ত আমরা ইউরোপকে ছাড়িয়ে গেছি কিন্তু পাশ্চাত্যের মন-রাজ্যের যে মৌলিকতার কথা আমরা বলছি তা ঠিক দর্শনগত নয়। সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগের আশায় বস্তুজগতের মধ্যে পরিপূর্ণ ডুবে যাওয়ার ফলে যে মৌলিকতার সৃষ্টি, ইউরোপের মানসিক মৌলিকতা জিনিষটা অনেকটা তাই। আমরা ভারতীয়রা বস্তু-রাজ্যের প্রাধান্যকে এখনও অতটা গ্রহণ করতে পারিনি। অথচ এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের উৎপত্তি ঐ বস্তুজগত থেকেই। যে মানুষ তার নিজের তৈরি

জিনিষের দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সে ওরই মধ্যে ফর্মের অনুসন্ধান করবে। অবশ্য মানুষের সাজানো বস্তুর মধ্যে ফর্মের সন্ধান অনেকটা সাবজেকটিভ ব্যাপার। এখানে ফর্মের সৃষ্টি অনেকটা তার মনের বিশেষ সংস্কারের উপরই নির্ভর করে। এমনও হতে পারে ফর্ম সন্ধানের কোন সচেতন প্রয়াস নেই, হঠাৎ শিল্পীর মনে তা ধরা দিল। যে মুহূর্তে ও যে পরিপ্রেক্ষিতে কোন ফর্ম শিল্পীর মানসপটে ধরা দিল ঠিক সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি শিল্পীর জীবনে হয়ত আর নাও হতে পারে। ফ্রয়েড-ইয়ুং-অ্যাডলারের গবেষণার পর অবচেতন মন বলে মানুষের মন-রাজ্যের এক অতলস্পর্শী রাজ্যের দ্বার খুলে গেছে। সুতরাং ইউরোপের বস্তুসম্ভোগকারী ও নতুনত্বের সন্ধানী চঞ্চলচিত্ত মন অবচেতনের রাজ্য বেয়ে কতদূর যেতে পারে তার কোন কূলকিনারা নেই। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে পদার্থবিদ্যা, আলোর বিকীরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার হওয়ার ফলে বস্তুর রূপ সম্পর্কে মানুষ অনেক নতুন রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। ইউরোপে আমরা এখন লক্ষ্য করছি যে অনেক শিল্পী এ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম সৃষ্টির ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্য নিচ্ছেন। অধুনা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের অনেক প্রতীক বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জার্মান শিল্পী পল ক্লি'র (Paul Klee) অনেক এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতে আমরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। পিকাসো যে মানুষ বা বস্তুর ফর্মকে নানাভাবে ভেঙে দেখিয়েছেন তার পেছনেও আধুনিক Optical ও Light theory'র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক আবিষ্কারগুলিই যে প্রথমে শিল্পীদের এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয়। চিত্রকলাকে ফোটোগ্রাফসুলভ স্বাভাবিকতা থেকে বাঁচবার জন্যে ইউরোপীয় শিল্পীরা উল্‌টো পথে চলতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয় চিত্রকলার জগতে কিউবিজম আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চিত্ররসিকদের কাছে একথা খুবই সুপরিচিত যে কিউবিজমই এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের সুরু। বিজ্ঞান ও যন্ত্রের উপর সমাজকে সম্পূর্ণভাবে স্থাপন করার জন্য ইউরোপীয় মানস এখন অতিমাত্রায় বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের সন্ধানী হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্ত্যের শিল্পীরা Representational Art এর যে ধারা তাতে সেই নতুনত্বের আস্বাদ পাচ্ছেন না। কারণ বিষয়বস্তুর চেয়ে ফর্মের ক্ষেত্রেই নতুনত্বের চমক তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করা যায়। আর শিল্পীরা ফর্মের ঘোর প্যাঁচের মধ্যেই তাঁদের লাগাম-

ছাড়া মনের প্রকৃত স্ফূর্তি খুঁজে পান। Representational শিল্প সৃষ্টির ধারাকে মেনে নিলে কতকগুলি দায়দায়িত্বও স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পে শিল্পীর যা খুসি করার (শিল্পগত অর্থে) সুযোগ আছে। তাকে কৈফিয়তও কারুর কাছে দিতে হয় না। এখানে ফর্মের যে বিচিত্রগতি তা একান্তভাবে শিল্পীর মর্জির উপর নির্ভরশীল। আর এ্যাবস্ট্রাক্ট সৃষ্টিতে একই ফর্মের পুনরাবৃত্তি কখনও লক্ষ্য করা যায় না। যার অর্থ হচ্ছে এক্ষেত্রে কোন দুই শিল্পী এক নন।

আমরা আগেই বলেছি কিউবিজম আন্দোলনের মাধ্যমেই এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প ধারার সূত্রপাত। আমাদের দেশে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্যের কিউবিক ধাঁচে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। সেদিক থেকে তাঁকেই রাংলাদেশে এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পান্দোলনের উদ্গাতা বলা যেতে পারে। তবে গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। সে যাই হোক গগনেন্দ্রনাথের ঠিক পরে কোন শিল্পীই পাশ্চাত্ত্যের এ্যাবস্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে ছবি আঁকার তেমন কোন চেষ্টা করেন নি। অবশ্য অনেকে একথা বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ নিজে ষাট থেকে সত্তর বছর বয়েসের মধ্যে দুই সহস্রাধিক ছবি এঁকেছেন যার মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে এ্যাবস্ট্রাক্ট। কিন্তু কবির এই চিত্রসৃষ্টিকে বাঙলাদেশে এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প চর্চার ধারার মধ্যে ফেলা ঠিক হবে না। কারণ যে অর্থে অন্যান্য বাঙালী শিল্পীরা আলোচ্য ইউরোপীয় চিত্ররীতিকে সচেতনভাবে চর্চা করে ছবি আঁকছেন রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেভাবে অগ্রসর হন নি। এ্যাবস্ট্রাক্ট হলেও তাঁর ছবির আঙ্গিকের সঙ্গে ইউরোপের এ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রপদ্ধতির নানাশাখার সঙ্গে একেবারেই যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কবির প্রতি সুবিচার করতে গেলে তাঁর ছবির আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা বাঞ্ছনীয়। অতি সাম্প্রতিক কালে বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে খানিকটা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এ্যাবস্ট্রাক্ট সৃষ্টির দিকে একটা সচেতন ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির নবপরিণতিশীল রূপের প্রতি বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। হয়ত এই অভ্যাসটি গড়ে উঠেছে দুশোবছরের ইংরাজ সম্পর্কের দরুণ। অবশ্য বাঙালী শিল্পীদের ইউরোপের প্রতি আকর্ষিত হবার বিশেষ একটি কারণ আছে। আমাদের দেশে চিত্রশিল্পীই বা কজন আর চিত্রকলারই বা কদর কতটুকু। একমাত্র প্যারিস শহরেই শুনেছি অর্দ্ধসহস্র শিল্পী আছেন।

আমাদের শুধু একটা শহর কেন সারা ভারতবর্ষে এত শিল্পীর কথা চিন্তায় আনা যায় না। ওদের দেশে রাস্তাঘাটে সারাবছর ধরে চিত্রের মেলা লেগে থাকে। বড় আর্ট গ্যালারীর কথা এখানে না হয় নাই তুললাম। কিন্তু আমাদের কলকাতার মত শহরে মাসে একটা করে চিত্রপ্রদর্শনী হয় কিনা সন্দেহ। তরুণ বাঙালী শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্রকলার এই বিপুল আয়োজনে যে বিমোহিত হবেন এ আর আশ্চর্য কি? ইউরোপীয় শিল্পীর ক্যানভাসে বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ, তার প্রয়োগের অদ্ভুতত্ব এবং আঙ্গিকের নানা সূক্ষ্ম বক্রগতি আমাদের শিল্পীদের মনকে সহজেই টেনে নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে বাঙলাদেশে ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের বিশেষ চর্চা করেছেন। প্রাণকৃষ্ণ পাল, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন প্রমুখ শিল্পীরা এ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রসৃষ্টিতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর চিত্রে এ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের রূপায়ণে কেবল বাঙলা নয় ভারতের একজন অগ্রণী শিল্পী। বর্তমানে বাঙলাদেশে ইউরোপীয় এ্যাবস্ট্রাক্ট ধারার সবচেয়ে বড় প্রতিভূ বোধহয় শিল্পী আমিনা লোদী। এর আগে সম্ভবত আর কোন বাঙালী শিল্পী এতটা আত্মগতভাবে এবং অবিমিশ্রতার সঙ্গে উল্লিখিত চিত্রপদ্ধতির অনুশীলন করেন নি। এছাড়া সুনীলমাধব সেনগুপ্ত প্রমুখ আরো অনেক বাঙালী শিল্পী এককভাবে বর্তমানে এ্যাবস্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে ছবি আঁকার পরীক্ষা করেছেন, করছেন। সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় বাঙলা চিত্রকলার ক্ষেত্রে ইউরোপের এ্যাবস্ট্রাক্ট রীতি আজ আর মোটেই অপরিচিত কিছু নয়। অবশ্য তাকে আমরা কতটা আত্মস্থ করে নিতে পেরেছি সেটি ভিন্ন প্রশ্ন।

আমাদের চিত্রকলার নতুন পরিণতির জন্য আমরা যে ইউরোপীয় শিল্পরীতির সাহায্য নিচ্ছি তাতে সাধারণভাবে লজ্জিত হবার কিছু নেই। কারণ বাঙালী সংস্কৃতির যে বর্তমান সমৃদ্ধি তাতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দানকে তো একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনি শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও দেওয়া-নেওয়া চলেই। এতে শিল্পের ঔৎকর্ষ বাড়ে বৈ কমে না। কিন্তু বাইরে থেকে কোন জিনিষ একেবারে নির্বিচারে নেওয়াও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বাইরের কোন রীতির সাহায্য নেওয়ার সময় ভেবে দেখতে হবে তা আমাদের চিত্রধারায় কতটা খাপ খাবে, তাকে আমরা কতটা আত্মস্থ করতে পারব এবং তা আমাদের প্রচলিত শিল্পের

ধারাকে ক্ষুণ্ণ করবে কিনা। বাংলা চিত্রকলার ক্ষেত্রে এ্যাবস্ট্রাক্ট পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে কতগুলি প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। আমাদের শিল্পের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই প্রশ্নগুলির উপযুক্ত আলোচনা করা দরকার। আমরা আগেই বলেছি এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের সম্পর্ক প্রধানত বস্তু-জগতের সঙ্গে। আর ইউরোপীয় শিল্পীর ক্ষেত্রে বস্তুর সূক্ষ্মবুদ্ধিগ্রাহ্য ফর্মের চর্চায় সাহায্য করেছে অবচেতন মন সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় গবেষণা এবং পদার্থ-বিদ্যার নব আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি। ফলে ওদেশের শিল্পীর মনের এক বিশেষ গড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই মনকে তার পরিবেশ থেকে একটু সরালেই তার আর কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। কিন্তু বাঙালী শিল্পীর কাছে বর্তমানে বাস্তব পরিবেশটা কি ধরণের? আমাদের দেশে বস্তুর সে প্রাচুর্য কোথায়? বিজ্ঞান কি আমাদের মনজগতে এখনও ওতপ্রোতভাবে বাসা বাঁধতে পেরেছে? আর মনের অবচেতন রাজ্যেরই বা আমরা কতটা খোঁজ রাখি? বিজ্ঞান, বস্তু-জগৎ আর মানুষের বিচিত্র মন এই নিয়ে জীবনের যে তীব্র গতি চাঞ্চল্য, তা এখানে কোথায়? বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে অশান্ত ছুটে চলার দরুণ ইউরোপীয় শিল্পীর চেতনায় যে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিক্ষিপ্ত রূপের দেখা মিলছে তারই ফলে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের সৃষ্টি। বাঙলাদেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বাঙালী শিল্পীর পক্ষে এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তাই ইউরোপের এ্যাবস্ট্রাক্ট পদ্ধতি আমাদের চিত্রকলায় অঙ্গীভূত করার সময় ভেবে দেখা দরকার তাকে আমরা সত্যি সত্যি আত্মস্থ করতে পারব কি? না আমরা নিছক পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করবো?

বর্তমানে যে সমস্ত বাঙালী শিল্পী এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের চর্চা করছেন তাঁরা অবশ্য উপরোক্ত পরিস্থিতির একটা সহজ সমাধান করে থাকেন। এঁরা বলেন শিল্পের ভাষা আন্তর্জাতিক, তা দেশের সীমার মধ্যে গ্রথিত নয়। এ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের সূত্রপাত প্যারিস বা লণ্ডনে হতে পারে কিন্তু শিল্পের এই ভাষা সব দেশের শিল্পীরই সম্পত্তি। আজকাল যখন সব দিক থেকে দেশে দেশে মানুষে মানুষে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে তখন শিল্পের ক্ষেত্রেই বা সেই দূরত্ব বজায় থাকবে কেন? শিল্পে রূপ সৃষ্টি বা প্রকাশই বড় কথা এবং শিল্পী নিজেকে ব্যক্ত করতে গিয়ে ভারতীয় কি ইউরোপীয় রীতির সাহায্য নিচ্ছেন সেটা বড় কথা নয়। শিল্পী তাঁর নিজস্ব রুচি অনুযায়ী যে কোন রীতিতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং এঁদের মতে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের

চর্চায় ইউরোপ ও বাঙলাদেশের পরিবেশগত পার্থক্যের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। যখন আমরা কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা করি তখন ভাষা অধিগত করাটাই থাকে একমাত্র উদ্দেশ্য, ঐ দেশের সামগ্রিক পরিবেশের খবর নেবার কোন প্রয়োজন হয় না। ঠিক তেমনি বাঙালী শিল্পী ইউরোপীয় এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের ভাষা (অর্থাৎ টেকনিক) রপ্ত করে স্বকীয় প্রতিভার পরিপুষ্টি সাধন করতে পারেন। এর বাইরে তাঁর আর চিন্তা করার কিছু নেই। এখন শিল্পের ভাষার আন্তর্জাতিকতার আদর্শ খুবই মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তো আমরা আমাদের স্বজাতীয়ত্ব বিসর্জন দেবো না। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের চর্চা আমাদের শিল্পীরা করছেন ঐ পদ্ধতিকে নকল বা অনুকরণ করার জন্য নয়। সব জিনিষেরই ভালো কিছু না কিছু থাকে। বাঙলার চিত্রকলার নব পরিণতির জন্য আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ভাষা (অর্থাৎ ফর্ম) তো শিল্পের সবটুকু নয়, যদিও বর্তমানে এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতে আমরা অনেকটা তাই লক্ষ্য করছি। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনেই ফর্মের যা কিছু বৈচিত্র্য। বাঙালী আমরা, সুতরাং চিত্রের বিষয়বস্তু আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ করতে হবে। ফর্মসর্বস্ব এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের ধারাকে হুবহু আমরা কি করে গ্রহণ করি? তাছাড়া শিল্পের ভাষাকে না হয় আমরা আন্তর্জাতিক করলাম কিন্তু তাই বলে মানুষের মন, তার রসগ্রহণ ক্ষমতা সর্বত্র কি এক হয়ে যাবে। বিজ্ঞান নানা জিনিষ আবিষ্কার করেছে এবং মানুষ তা সর্বত্রই ব্যবহারও করছে। কিন্তু সেই জন্য আমাদের মানসিক গড়ন সব জায়গায় এক হয়ে গেছে একথা বলতে পারি না। একজন বাঙালী শিল্পী ইউরোপীয় শিল্পীর আঁকা কয়েকখানা এ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ দেখে সম্পূর্ণ ঐ রীতিতে কিছু ছবি তৈরি করলেন। কিন্তু তাতে আমাদের দেশীয় শিল্পধারার লাভ হল কতটুকু? আধুনিক শিল্পের ভাষা আন্তর্জাতিক একথা মেনে নিলে শিল্পীদের তো যা খুসি করার অধিকার দেওয়া হোল। তখন মন্দ জিনিষও আর্ট বলে বাজারে চলার সম্ভাবনা থাকবে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মারফৎ পরস্পরের কাছে আসা, পরস্পরকে জানা এটাই বড় কথা। মানুষের সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রকাশ এক আন্তর্জাতিক ভাষায় হবে এটা মোটেই যুক্তিযুক্ত কথা নয়। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন এক আন্তর্জাতিক ভাষা অলীক কল্পনা তেমনি অলীক শিল্পের আন্তর্জাতিক ভাষা। কলকাতা বা বাঙলার

অন্য কোথাও বসে একটা কাঁচঘর সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্যারিসীয় আবহাওয়া তৈরি করাটা উদ্ভট চিন্তা নয় কি ?

অবশ্য বর্তমানে দু'একজন বাঙালী শিল্পী ইউরোপীয় এ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মকে হুবহু গ্রহণ না করে তাকে প্রয়োজনানুসারে আমাদের স্বকীয় শিল্পধারার অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করছেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত পথ। আমাদের শিল্পীদের আদর্শ নিশ্চয়ই নিছক মডার্ণিজম্ নয়। আমাদের দেশে কিছু হয় না, সবই নেতিয়ে পড়া ভাব—এই সমস্ত কথা বলে হতাশ হয়ে ইউরোপের মুখাপেক্ষী হওয়াটা উচিত মনোভাব নয়। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের কাজ খুঁটিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে সেখানে অপৌরুষেয় কিছু নেই। তাঁদের কোন কোন অক্ষম উত্তরসাধক যদি ছবিতে নেতিয়ে পড়া ভাবের সৃষ্টি করেন তার জন্য শিল্পীগুরুদের দায়ী করা যায় না। শিল্পে আধুনিকতা জিনিষটা খারাপ নয়। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের চর্চা আমরা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ রীতি থেকে আমরা যা নেবো তা যেন আমাদের শিল্পধারায় খাপ খায়। জিনিষটা যেন কাঁচঘরে প্যারিসীয় আবহাওয়া সৃষ্টি না হয়ে দাঁড়ায়।

পুস্তক পরিচয়

বৈষ্ণব কাব্যের তিনদিক ॥ রণেন্দ্রনাথ দেব ॥ গ্রন্থজগৎ : রত্ন সাগর গ্রন্থমালা। আড়াই টাকা ॥

রত্নসাগর গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী ভূমিকায় জানিয়েছেন "বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন।" প্রয়োজনের তাগিদেই লেখক বৈষ্ণব কাব্যের তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ; পদাবলী সাহিত্যের চিত্রকল্প, আখ্যানমূলক বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান এবং কৃষ্ণমঙ্গল ও চৈতন্য চরিতগ্রন্থে প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজ। শেষ দুটি প্রবন্ধ ছাত্রদের কাজে আসবে, বিশেষ করে চৈতন্য চরিতগ্রন্থে সমাজজীবন অধ্যায়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

কিন্তু কোন গ্রন্থের যদি প্রকৃতই সমালোচনা করতে হয় তাহলে এ সমস্যা প্রায় সব সমালোচককেই পীড়া দেয় যে গ্রন্থকার কি নূতন তত্ত্ব বা তথ্য দিলেন যাতে বাঙালী পাঠকের সুপ্ত বুদ্ধি ও মনীষা জাগরণের আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে! এই বিচারে রণেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় কিছুই নূতন দেন নি। তবে ডঃ সুকুমার সেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে মতামতগুলি প্রকাশ করেছেন, তাকেই প্রসঙ্গক্রমে রণেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় কাজে লাগিয়েছেন ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মঙ্গলকাব্য, বাসুলী বা বাশুলী বাগেশ্বরী থেকে আসে নি, এসেছে রাত্রি অর্থে দুর্গার এক নাম বাসুরা থেকে, ডঙ্কা মানে সাপের ওঝা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলি গ্রন্থকারের মত নয়, সেই হেতু এ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

তবে পদাবলী সাহিত্যে চিত্রকল্প প্রসঙ্গে কিছু বলা যেতে পারে। প্রথমেই বলি চিত্রকল্প বা image সাধারণ ইংরাজী অভিধানে metaphor বা simile অর্থে চললেও একজাতীয়ত্বের বিচারে উপমার সঙ্গে তুলিত হতে পারে না। দুটি ভিন্নতর বস্তুর আপাত সাদৃশ্য উপমার লক্ষ্য বস্তু, কিন্তু চিত্রকল্পে এই

সাদৃশ্যধর্ম অনুপস্থিত থেকেও বিভিন্ন দৃশ্য বা বস্তুর উজ্জ্বল বর্ণনা একটি সামগ্রিকভাবের পরিপূর্ণ রূপায়ণে সার্থকতর হয়ে ওঠে। স্বভাবোক্তির মধ্যে কোন অলঙ্কার নেই, কিন্তু তাতে চিত্রকল্প রয়েছে। আসলে বৈষ্ণব কবিরা আলঙ্কারিক কারুকৃতির মধ্য দিয়ে কবি জীবনের যে সার্থকতা দেখিয়েছেন পাণ্ডিত্যকে সঙ্গে করে, চিত্রকল্পনায় তা দেখাতে পারেন নি। যদিও চিত্রকল্পনা একেবারে নেই একথা বলিনে, তবে তা এত অল্প যে উল্লেখ্য নয়। তাই চিত্রকল্পে উপমা থাকলেও উপমা চিত্রকল্প নয়, যদিও উপমায় একটা ক্ষণিক চিত্র ভেসে ওঠে।

রণেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় চিত্রকল্পের বিশ্লেষণ করেছেন মানব জগৎ, প্রকৃতিজগৎ ও মানবসংসার থেকে গৃহীত উপাদানগুলিকে নিয়ে—অর্থাৎ এই উপাদানগুলি বৈষ্ণব কবিতায় কি ভাবে উপমিত হয়েছে তারই আলোচনা করেছেন। কিন্তু কবিতার মধ্যে অলঙ্কার বা উপমা যে সামগ্রিক বোধ চেতনারই প্রকাশী ধারণা—তার আলোচনা নেই। এদিক থেকেও গ্রন্থটির ত্রুটি অনস্বীকার্য। তবে, ছাত্রদের জন্য রচিত অলঙ্কার গ্রন্থে বৈষ্ণব কাব্যের অলঙ্কার বিশ্লেষণ থাকলেও সাধারণ ভাবে রূপ ও রসোপভোগের জন্য স্বতন্ত্র কোন আলোচনা চোখে পড়েনি, এই বিচারে বৈষ্ণব কাব্যের তিন দিকের মধ্যে একটি দিক স্বীকার করতেই হবে।

বার্ণিক রায়

নোনাজল মিঠে মাটি ॥ প্রফুল্ল রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। সাড়ে আট টাকা॥

প্রজাপতির রঙ ॥ প্রবোধবন্ধু অধিকারী। নিউ স্ক্রিপ্ট। আড়াই টাকা॥

ভাবিয়াছিলাম তরুণ যুগলের উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ দুইটি পাঠ করিয়া পুনর্বার উল্লসিত হইয়া উঠিব। বহুদিন ভাল বই পড়ি নাই। তরুণ লেখকদের দিকে তাকাইয়া আছি।

তরুণ লেখকদের নিকট কি আশা করি? দুঃসাহস। দুঃসাহস, কিন্তু হঠকারিতা নহে। হঠাৎ নূতন কিছু করিবার চঞ্চল স্পৃহা নহে। আশা করি,—যুবকেরা দীপ্ত চক্ষে, দৃঢ় মুষ্টিতে সাহিত্যকে বর্তমান ক্ষেত্র হইতে ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল পথে লইয়া যাইবেন। যুবা বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের

'চোখের বালি'র কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কথা। এখন যাঁহারা প্রবীন, প্রতিষ্ঠিত লেখক—তাঁহাদেরও অনেকেরই প্রথম বয়সে এই প্রকার দেখিয়াছি।

যুবক বয়সে সাহিত্য সম্বন্ধে যে এক দৃপ্ত স্পর্ধা থাকে, তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য। রক্তে তেজ থাকে বলিয়া অর্থ কিংবা খ্যাতির বন্ধন তেমন ভাবে লেখার প্রতি অমনোযোগী হইতে দেয় না। নিজের রচনা সম্বন্ধে কখনও তৃপ্তি আসে না, এক লেখা বারবার বদল করিতে হয়। খ্যাতি-প্রতিষ্ঠিত, প্রতিভা-নিঃশেষিত লেখকদের মত আত্মতৃপ্তির ভুল স্বর্গে তাঁহারা বিরাজ করেন না।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের লেখা পড়িয়া গভীর দুঃখ পাইলাম। এই বয়সে একাধিক বিশাল-আয়তনের উপন্যাস লিখিতে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছিলাম। কিন্তু বৃহদাকার আসলে প্রতারণা। পাইকা টাইপে ছাপা, বহু পুনরুক্তিতে গ্রন্থ পূর্ণ। পুনরুক্তি বিষয়ে, ভাষায়। উদ্ধৃতি দিয়া দেখান যায়। কিন্তু তাহা হইলে উদ্ধৃতিতেই আলোচনা পূর্ণ হইবে। গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করিবার দিকে তাঁহার প্রাণপণ প্রয়াস অত্যন্ত প্রকট। ক্রেতাদের প্রতারণা করা চলে কিন্তু পাঠককে প্রতারণা করা যায় না। শেষ বিচারের জন্য লেখককে পাঠকদের সম্মুখেই দাঁড়াইতে হইবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' পড়িয়া প্রথমে যে তীব্র তৃপ্তি পাইয়াছিলাম তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। জটিল-কুটিল হোসেন মিঞা একটি নূতন দ্বীপ গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল—সেখানে মানুষ ফসল ফলাইবে, জীবন গড়িয়া তুলিবে, জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হইবে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়কে অতদূর কল্পনা করিতে হয় নাই। তাঁহার সম্মুখে যাহাকে বলে একটা ভিস্যুয়াল রিয়ালিটি ছিল। আন্দামানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা নূতন বসতি স্থাপন করিতেছে—ইহাই তাঁহার পটভূমি। এই পটভূমিতে এপিক উপন্যাস লেখাও সম্ভব। কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের অসাধুতাই তাঁহাকে ব্যর্থ করিয়াছে। আন্দামান সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান শখের ভ্রমণকারীদের মত। পূর্বতন গুণ্ডা, বদমাস আর ভূমিহীন-ভবিষ্যৎহীন মানুষ সম্বন্ধে লিখিবার মত কল্পনার বিস্তার তাঁহার নাই। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাহাকে বলে, 'বাংলা সাহিত্যের ভূগোল-বিস্তার', তাহাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কৃত্রিম চেষ্টা অনেক আছে,—হাঙর-ঝিনুক আছে, নাম না জানা গাছপালা-পাখি আছে;

পূর্ববঙ্গের ভাষা আছে, গোটা কুড়িক চরিত্রের নাম আছে, কুৎসিত কদর্য গালাগালি আছে, যুবতী নারীর শারীরিক ক্ষুধা এবং ব্যাভিচার আছে। কিন্তু মানুষের জীবনকে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। চক্ষু দিয়া জল পড়িলে তিনি তাহাকে কান্না বলিয়া চিনিতে পারেন। ওষ্ঠ ফাঁক করিয়া উচ্ছলিত শব্দ বাহির হইলে তাহাকে হাস্য বলিয়া মনে করেন। এইটুকুই তাঁহার সীমা।

ভাষায় দীন বলিয়াই তিনি চরিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁহার নিজের যে চিন্তা তাহাও স্পষ্ট করিতে পারেন নাই। যেমন, 'বিচিত্র মানুষ পাল সাহাব,' আবার 'বিচিত্র মানুষ এই খিলাফৎ পাঠান'। উভয় সম্বন্ধেই 'বিচিত্র' এই বিশেষণ। এ যেন গরু সম্পর্কে রচনা লিখিতে গিয়া স্কুলের বালকের, 'গরু একটি চতুষ্পদ জন্তু' এই বলিয়া আরম্ভ করা। বিচিত্র বলিলে মানুষ সম্বন্ধে কি বুঝিব? কে বিচিত্র নয়? যে মানুষ মন্ত্রীত্ব করিতেছে, কারখানায় যে শ্রমিকটি চুপ করিয়া কাজ করিতেছে, লাঙলের মুঠি ধরিয়া যে কৃষকটি ক্লান্ত, সম্পাদকের টেবিলে বসিয়া যে ব্যক্তি সম্পাদকীয় লিখিতেছে, বৈঠকখানা বাজারে যে কেরাণীবাবুটি ফুলকপি দর করিতেছে—ইহারা কে বিচিত্র নয়? কিন্তু শুধু বিচিত্র বলিলে ইহাদের অন্তরের অযুত তরঙ্গ কতটুকু বুঝিব?

প্রৌঢ় লেখকের মন্দ লেখা পড়িলে উপেক্ষা করি। কিন্তু প্রফুল্লবাবু বয়সে নবীন, তাঁহার রচনা পড়িয়া আহত হইয়াছি। আমার নিবেদন, তিনি স্থিতধী হউন। আজকাল পাঠকবর্গের রুচি বদল হইতেছে। সৎসাহিত্যও বাজারে যথেষ্ট আদৃত হয়।

বরং প্রবোধবন্ধু অধিকারী সম্পর্কে ভরসা রাখি। তাঁহার রচনায় দুঃসাহস নাই, কিন্তু অধ্যবসায় আছে। তাঁহাকে প্রতিভাবান বলিতে পারি না কিন্তু তাঁহার মধ্যে 'গৃহিণীপনা' আছে। যেটুকু তাঁহার ক্ষমতার সীমা—সেইটুকু প্রাণপণে ব্যবহার করিবার প্রয়াস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তাঁহার কলমে দুঃসাহস নাই—সাবধানতা আছে। অর্থাৎ যৌবনের যে উদ্দামতা রক্তের মধ্যে হঠকারিতার বীজ বপন করে তাহা প্রবোধবন্ধু অধিকারীর চরিত্রে অল্প আছে, কিন্তু যে সুস্থ বিচারবুদ্ধি নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়, অনুশীলনের প্রতি আস্থা আনয়ন করে, এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা আত্মতৃপ্তির নির্বোধ স্বর্গ হইতে নিজেকে দূরে রাখে—তাঁহার রচনায় এই গুণগুলি অত্যন্ত তৃপ্তিকর ভাবে দেখিতে পাইলাম।

'প্রজাপতির রঙ' এই নামের সঙ্গে অর্থ মিলাইয়া তিনি কয়েকটি বিভিন্ন স্বাদের গল্প লিখিয়াছেন। প্রথম গল্প প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার শান্ত-মধুর প্রেম, দ্বিতীয় গল্প হিংস্র চরিত্রের নিচু-শ্রেণীর মানুষের জান্তব কামনা হইতে বাৎসল্য, তৃতীয় গল্প আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক ট্র্যাজেডি ইত্যাদি। গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত, নিটোল। আরম্ভ আছে, ক্লাইম্যাক্স আছে, পরিণতি আছে। শেষে একটা টুইস্ট দিয়া প্রচলিত ভাবে গল্প শেষ করিবার পদ্ধতিই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি গল্প সাজাইতে জানেন, চরিত্রগুলি উপস্থিত করিতে জানেন। অনেক রকম মানুষ তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। তবে সব মানুষের মধ্যেই একটা গল্প খুঁজিবার চেষ্টা করাকে তেমন সমর্থন করিতে পারি না। মানুষের জীবন যাপনই পৃথিবীর একমাত্র গল্প—তাহারই খণ্ডাংশ দেখিতে চাই। এই গল্পগুলির সব কয়টিকেই সফল গল্প বলিব না—একজন তরুণ লেখকের সাফল্যের পথে আরোহনের সার্থক সোপান বলিতে চাই।

সনাতন পাঠক

প্রাপ্ত পুস্তক।

সমালোচনার্থ প্রেরিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করার সময় সংশ্লিষ্ট লেখক ও প্রকাশকবৃন্দকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও স্থানাভাব প্রভৃতি কারণে এখন পর্যন্ত সমালোচনা প্রকাশ করতে না পারায় পত্রিকার তরফে যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য আমরা পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি।—সম্পাদক, পরিচয়।

ফাল্‌গুনের পরশ—তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
যুগসন্ধি—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
চিরদিনের কাহিনী—সুশীল জানা
বাংলা গল্প বিচিত্রা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বাংলা নাটক—দেবকুমার বসু

সিঁড়ি—নবেন্দু ঘোষ
ঝড় থামবে—শ্রীপারাবত
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি—প্রিয়দারঞ্জন রায়
আয়নোস্ফিয়ারের কথা—এফ. আই. চেস্তনভ্
আলো আঁধার—অমরকুমার নন্দী
কাব্যকাহিনী—তমোনাশ মুখোপাধ্যায়
অতীতের পৃথিবী—ভি. আই. গ্রমভ
সজনে পাতা—উষা দত্ত
রোদনভরা এ বসন্ত—চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায়
হট্টমালার দেশে—প্রভাতকুমার গোস্বামী
রাজা ইডিপাস—সাধনকুমার ভট্টাচার্য
জ্যোতির্বিজ্ঞানের সপ্তরথী—অমিতাভ সেন
নীলপাতা—জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়—প্রবোধরঞ্জন গুহঠাকুরতা
অভিযান—জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ
বৃষ্টি যদি আসে—সমীর চৌধুরী
সাহিত্য রুচি—সরোজ আচার্য
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—মনোরঞ্জন গুপ্ত
মহাবিজ্ঞানী নিউটন—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
Socialist Upsurge in China's Countryside
Son of the Working Class—Wu-yun-To
A Thousand Miles of Lovely Land—Yang Shu
Not Winter But Spring—A collection
The Cry of The Hour—A report
ত্রিনয়ন—সুনীল দত্ত
নীলরাত্রি—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
হে মহানগর—নগেন দত্ত
এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য—বিষ্ণু দে
নারীর উক্তি—ইন্দিরা দেবী

একটি প্রহর—অসীমকৃষ্ণ দত্ত

মোদের বিশ্ব—অমর নন্দী

প্রতীক্ষা—কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

আমার দেখা চীনের গণকমিউন—গীতা মুখোপাধ্যায়

পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ—চিত্তরঞ্জন দেব

এ্যালবাম—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শুভনির্মাল্য—দীপক সেন সম্পাদিত

বাংলা কবিতা—জিতু গুপ্ত সম্পাদিত

সংস্কৃতি সংবাদ

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর পূর্বাহ্নে

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী নিকটস্থ হয়ে আসছে। অন্তত আগামী পঁচিশে বৈশাখের (১৩৬৭) সময় থেকে তা যথোচিতভাবে পালনের পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ না করলেই নয়। ইতিমধ্যে বিশ্বশান্তি পরিষদ এই উৎসব উদ্‌যাপনের যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন বাঙলার জনসাধারণ তা সংবাদপত্র থেকে জেনে থাকবেন, 'পরিচয়ে'র পাঠকবর্গেরও তা জানবার কথা। প্রধানতঃ তাঁদের সঙ্কল্প দুইটি—শান্তি ও বিশ্বমৈত্রী সম্বন্ধে কবির লেখার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ; এবং বিশ্বমনস্বী ও শিল্পী সাহিত্যিকদের নিজ নিজ রচনার একটি সংগ্রহ সম্ভার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করে কবির জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত করা। এই সংগ্রহ গ্রন্থে থাকবার সম্ভাবনা—লুই আরাগঁ, এলিয়া এরেনবুর্গ, বের্নল, এ্যানা সের্গার্স-প্রমুখ সাহিত্যিকদের, বৈজ্ঞানিকদের নানা বিষয়ের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি; পিকাসো প্রমুখ শিল্পীদের শিল্পের প্রতিলিপি, শোষ্টাকোভিচ ও কাচুত্রিয়ান প্রমুখ সঙ্গীত রচয়িতাদের সঙ্গীতের স্বরলিপি; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লেখা নয়, স্বাধীন রচনা। আর এ গ্রন্থ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের নামে নিবেদন করবার জন্যে সে সময়ে (১৯৬১) কলকাতায় আসবার প্রস্তাব আছে বের্নল, এরেনবুর্গ, পল রোব্‌সন প্রমুখ বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের প্রায় বিশজন নেতৃবর্গ ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের। বলা বাহুল্য, বিশ্বশান্তি পরিষদের এই সমগ্র প্রস্তাবটির সাফল্যের জন্য পরিষদ বিশেষ করে নির্ভর করছেন—ভারতের, বিশেষত বাঙলার শান্তি আন্দোলনের ও প্রগতিশীল মানুষের উপর। তাঁদেরই উপর তাই গ্রন্থ মুদ্রণ প্রকাশনের দায়িত্ব ও ১৯৬১ এর সেই মনস্বী-মহা-সঙ্গমের উদ্যোগ-আয়োজনের ভার। আমরা শুনে আশ্বস্ত হলাম—বাঙলার শান্তি আন্দোলনের কর্মীরা এই দায়িত্ব সর্বশক্তি দিয়ে পালনের জন্য দেশের সকল ক্ষেত্রের ও সকল মতবাদের মনস্বীদের নিয়ে একটি বিশেষ পরিষদ গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। সময় তাঁদেরও হাতে বেশি নেই। তাই তাঁদের উদ্যোগী হবার জন্য অনুরোধ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা

দেশের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষকেই তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান করছি। কারণ, দায়িত্ব বিশেষ করে শান্তি কর্মীদের হলেও এই আন্তর্জাতিক উৎসবের গৌরব যখন আমাদের সকলকার, তখন দায়িত্বও এক অর্থে আমাদের সকলকার—সকল বাঙালীর, সকল ভারতবাসীর।

পশ্চিমবঙ্গীয় শতবার্ষিকী রাজ্য সমিতির উৎসব

পশ্চিম বাঙলার রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য যে রাজ্য সমিতি গঠিত হয়েছে সম্প্রতি আমরা তার সদস্য ও কার্যকরী সভার সদস্যাদির তালিকা প্রাপ্ত হয়েছি। এই সমিতির সম্বন্ধে জনশ্রুতিতে আমরা যা জেনেছি এখন মুদ্রিত লিপিতে তাই জ্ঞাত হলাম। সমিতি (কমিটি) মোট ১১৯ জন সাধারণ সভ্য নিয়ে গঠিত (ডাঃ রায় বা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু দ্বারাই গঠিত); ৫টি সাব্-কমিটিতে তা বিভক্ত—যথা প্রচার, (আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত অমল হোম); অর্থ (আঃ শ্রীযুক্ত জি বসু) ; প্রকাশন (আঃ শ্রীযুক্ত পুলিন সেন) ; কার্যসূচী (আঃ শ্রীযুক্ত প্রতুল গুপ্ত) এবং উৎসব (আঃ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী)। কার্যকরী কমিটির গঠন এইরূপ (১) সভাপতি: ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ; (২) উপসভাপতি: জাষ্টিস কে, সি, দাশগুপ্ত ; (৩) সম্পাদক: শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, আই-সি-এস (অবসর প্রাপ্ত) ; (৪)-(৫) যুগ্ম-সম্পাদক: ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় ও শ্রীকুলপ্রসাদ সেন ; (৬) কোষাধ্যক্ষ: স্যর বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ; (৭)-(১২) সদস্যগণ: শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত, জি, ডি, বিড়লা, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, বি, পি, সিংহ রায় ; (১৩)-(১৭) ৫টি সাব্ কমিটির ৫জন আহ্বায়ক (১৮) উপ-কোষাধ্যক্ষ: শ্রীশরদিন্দু গুপ্ত এবং (১৯) সহকারী সম্পাদক: শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চ্যাটার্জি।

বলা বাহুল্য, কি সাধারণ সভ্য, কি কার্যকরী কমিটির সভ্য সকলেই অসাধারণ—এই অর্থে যে কেউ তাঁরা সাধারণ পদ্ধতিতে নির্বাচিত বা মনোনীত নন—অসাধারণ পদ্ধতিতেই এই পদে নিযুক্ত ; এবং এখন পর্যন্ত এই শতবার্ষিকী কমিটির সঙ্গে অন্য কারো সহযোগিতার সুযোগও নেই, সেরূপ আহ্বানও নেই। সেরূপ আহ্বান থাকুক বা না থাকুক, আমাদের অভিমত আমরা পূর্বেই 'পরিচয়ে' ব্যক্ত করেছি—আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিম বাঙলার এইটিই রাজ্যউৎসব বলে পরিগণিত হবে। অতএব, এ উৎসবকে সার্থক না করতে পারলে তার

কলঙ্ক কমিটিরই শুধু হবে না, হবে বাঙালী জাতির প্রত্যেকটি মানুষের। কাজেই আমাদের প্রার্থনা অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

আরম্ভ ও বহ্বারম্ভ

ঋষিশ্রাদ্ধে যা ঘটে তা শোনা আছে, কিন্তু কবি-জন্ম উৎসবেও তা ঘটবার মত শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় বচন এযাবৎ পাই নি। ভাগ্যবশে তা না পেতে হলেই মঙ্গল। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী রাজ্যপরিষদের কথা এ পর্যন্ত যা শুনেছি—তা আশ্বস্ত হবার মত নয়। এই ফাল্গুনের প্রারম্ভ পর্যন্ত জানি (১) সাধারণ সদস্যদের কোন সভাই হয়নি; (২) কার্যকরী কমিটির কোন সভা হয়ে থাকলেও কাজ হয় নি। (৩) ৎসিৎসিন প্রমুখ সোভিয়েৎ প্রতিনিধিরা জন্মশতবার্ষিকী সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসে জেনে গিয়েছেন (১৯৫৯ এর ডিসেম্বরে) যে, উৎসব হবে, তবে তার কার্যক্রম সম্বন্ধে এখনো সভাপতি ডাঃ রায় ভাববার অবকাশ পান নি, এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়েরও (তিনিই নবগঠিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) কিছু করবার সুযোগ হয় নি। (৪) কার্যক্রম কমিটি একটি কার্যসূচীর প্রস্তাব করেছিলেন; তা (কার্যকরী সমিতির দ্বারা ?) নথিভুক্ত ('রেকর্ডেড্') হয়ে আছে। আগামী ৯ই এপ্রিলের পরে ডাঃ রায় বাজেট-চিন্তা চুকিয়ে কার্যকরী সমিতির সভার ব্যবস্থা করলে তা বিবেচিত হবে। (৫) এখন পর্যন্ত এই উৎসব কমিটির নিজের ছাপানো চিঠির কাগজও নেই, দপ্তরও নেই— পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের শিরোনামায় তার চিঠিপত্র চলে, আর সেই শিক্ষা দপ্তরেই তার 'কার্যালয়' এখনো গর্ভস্থ (বা কবরস্থ)। শোনা যায় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুরুদ্ধ হয়ে যে মুদ্রা উৎসব কমিটির জন্য প্রস্তাব করেছেন ডাঃ রায়ের অবকাশ না হওয়াতে তাও এখনো মনোনীত হয় নি, চিঠিপত্রের কাগজও ছাপা হয় নি।

এই যদি 'আরম্ভ' হয় তা হলে ব্যাপারটা 'বহ্বারম্ভ' হবারই আভাস।

রবীন্দ্র উৎসবের রূপ

ইতিমধ্যে পশ্চিম-বঙ্গীয় আইন সভায় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণে জানা গেল—এই উৎসব তাঁর সরকার পালন করছেন রবীন্দ্র ভবন শুদ্ধ কবির পৈত্রিক ভবনে নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত-সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের একটি 'শিক্ষা-

নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করে। আশ্চর্যজনকরূপ সংক্ষিপ্ত এই উৎসব-মন্তব্যটিকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে কয়েকটি কথা হয়তো জানা দরকার—ডাঃ রায় একটি আহূত সভায় প্রস্তাব করেছিলেন ওরূপ নৃত্য-নাট্যের 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করবেন। শোনা যায় তাঁর আহূত সজ্জনেরাও ওরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব পরিপাক করতে পারেন নি। কারণ, তাঁদের মতে 'অনেক হয়েছে। আর কেন এ সব? কবি কি যাত্রার দলের অধিকারী ছিলেন?' এই কারণেই বোধহয় 'ইউনিভার্সিটি'র পরিবর্তে 'ইনষ্টিটিউট', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' স্থলে 'শিক্ষানিকেতন' শব্দটি রাজ্যপালের ভাষণে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু গোলাপ তো গোলাপই আছে। আমরাও আইন সভায় তাই এ প্রস্তাবকে অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানাতে পারি নি। বরং রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিকভবন ও তাঁর 'বিচিত্রা' সাহিত্যিক গোষ্ঠীগৃহ প্রভৃতিকে ভেঙে চুরে নাচঘরে বা গানের মহরা ঘরে পরিণত না করে যথাসম্ভব সুরক্ষিত করে ইয়াসনায়া পলিয়ানার তলস্তয়-সংগ্রহশালা বা ষ্ট্রাট ফোর্ড অন-আভন-এর শেক্স্পীয়ার সংগ্রহশালার মত রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবংশীয় সংগ্রহশালায় পরিণত করার প্রস্তাব করেছিলাম। জানা গেল, এখন কর্তৃপক্ষ তাতে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করবেন। (অবশ্য কর্তৃপক্ষ আমাদের পরামর্শে তা করছেন না, তাঁদের মর্যাদায় সম্ভবত তা বাধে —একথাও জানাতে ছাড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা সম্বন্ধে না হোক, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁরা সত্যই নিরঙ্কুশ।)

যাই হোক, স্বাধীনতা লাভের পরেও এ উৎসব পশ্চিম বঙ্গ সরকার শুধু এরূপ একটি চেষ্টায় শেষ না করে সমুচিত ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, এ আশা আমরা তখনো করেছিলাম, আজও করি। রবীন্দ্র উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত করতে হলে প্রথমত চাই জাতির সর্বস্তরের মানুষকে এই উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত করা; দ্বিতীয়ত চাই উৎসবের জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষা স্মরণে রেখে কবির আকাঙ্ক্ষা ও কবির কামনার সঙ্গে সমন্বিত করে উৎসবের কার্যক্রম নির্ধারণ। আমাদের বিবেচনায় আমরা খুব সংক্ষেপে তা নির্দেশ করেছিলাম—এখানে তা বিস্তারিত করার অবকাশ নেই। আমাদের প্রস্তাব এই:

(১) এই রবীন্দ্র উৎসব থেকে বাঙলা রাজ্যের সরকারি কাজে বাঙলাকে যথার্থ রাজ্যভাষা রূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা।

(২) এই উপলক্ষে একমাস থেকে তিনমাস ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি

মেলা'র ব্যবস্থা করে কলকাতায় একটি বার্ষিক সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা।

(৩) 'এই সময় একটি পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সমবেত 'বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনের' অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করা।

(৪) সস্তা দরে বাঙলায় (তিন চার হাজার পৃষ্ঠায়) একটি রবীন্দ্র রচনা-সঞ্চয়ন প্রকাশিত করা।

(৫) রবীন্দ্রনাথের চিরাকাঙ্ক্ষিত 'জন শিক্ষা'র আয়োজন যথার্থ সুসম্পন্ন করা।

(৬) রবীন্দ্রনাথের পরম বেদনার কারণ দেশবাসীর জলাভাব দূরীকরণের জন্য সমুচিত আয়োজন করা।

বলাবাহুল্য, আরও বহু সৎ প্রস্তাবই উত্থাপন করা যায়। তবে কোন কোন প্রস্তাব সরকারের সহায়তা ছাড়াও দেশবাসী সুসম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু অনেক প্রস্তাব ইদানীংকালে সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া কার্যে পরিণত করা যায় না। তাই তো আজ সরকারের দায়িত্ব এত অধিক। আর তাই আমরা সরকারী-বেসরকারী সকল প্রচেষ্টার জন্যই কামনা করি—সফলতা। সর্বক্ষেত্রেই চাই সকলের সহযোগিতা।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আশার কথা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ নিজের গৃহ-স্থাপনে যত্নপর হয়েছেন, তাঁরা এ জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সাহায্যে জমি সংগ্রহ করতেও সমর্থ হয়েছেন। পরিষদের বার্ষিক সভায় এ সংবাদ জানিয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে ভাষণ দেন আমরা তা কতকাংশে উদ্ধৃত করছি—

পরিষদ-সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসু পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া বলেন, 'আমরা নিজের বাড়ী তৈরি করতে চাই দুটি কারণে—প্রথমত মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার জন্যে বক্তৃতা-গৃহ ও পাঠাগার স্থাপন; দ্বিতীয়ত তরুণ ছাত্রছাত্রীরা নিজের হাতে যে সব কার্যকর মডেল ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে সেগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্যে একটি মিউজিয়ম, যাতে এ-সব দেখে সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ে এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়।

পরিশেষে অধ্যাপক বসু এক শ্রেণীর লোকের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে

সংশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'আমার এক বন্ধু বলেছেন যেদিন তোমরা বাঙলা ভাষায় মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করতে পারবে সেদিন বুঝবো তোমাদের মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সার্থক হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার অন্তত প্রতি সংখ্যায় একটি মৌলিক গবেষণা বাঙলায় প্রকাশ করব। এজন্যে গবেষককর্মী ও গবেষক-ছাত্রদের আমি অনুরোধ করছি তাঁরা যেন নিজ নিজ গবেষণার বিষয় বাঙলায় লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন।'

প্রধান অতিথি অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁহার ভাষণে সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হলেও আজকের দিনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাহিত্যিকেরা উদাসীন থাকতে পারেন না। আজকে সাধারণ মানুষের মনে একটা বৈজ্ঞানিক সত্তা, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন স্পৃহা জেগেছে। কাজেই সাহিত্যিকদের এখন বিজ্ঞানীদের মতো করে চিন্তা করা উচিত।'

চলচ্চিত্রং চলদ্বিত্তং

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের নতুন চিত্র 'দেবী'-কে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা যখন সে সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময়ই এল নয়া দিল্লীর ফিল্মী করের প্রস্তাব। 'দেবী' বারান্তরে আলোচ্য হোক, আপাতত ফিলম শিল্পের নতুন বিপদটাই চিন্তনীয়।

আমরা যখন ডেভলাপমেণ্ট যুগে বাস করছি তখন আর যাই হোক দুর্মূল্যতা ও করবৃদ্ধি থেকে নিস্তার নেই—অবশ্য ধনিক ব্যবসায়ী না হলে। ফিল্মের উপর করবৃদ্ধিও এই সূত্রানুযায়ীই সম্ভবত প্রস্তাবিত হয়েছে। যতদূর জানি, মুষ্টিমেয় তারকারা ও জগতে প্রভূত উপার্জন ও প্রভূত ব্যয় করলেও এই ব্যবসায়ের বহু কর্মীরই কাজ অনিশ্চিত ও উপার্জন সামান্য। যে হারে করবৃদ্ধির প্রস্তাব হয়েছে তাতে আপাত হিসাবে মনে হবে একটি সাধারণ দৈর্ঘ্যের (১৩০০০ ফুট) বাঙলা চলচ্চিত্রের উপর বসবার কথা প্রায় ২ হাজার টাকার নতুন বোঝা ; এবং যেহেতু একখানা ছবির ১৪ কপির জন্য ছাপতে লাগে আনুমানিক ১৪গুণ ফিল্ম্ অতএব কার্যত সেই করভার হবে ২৮ হাজার টাকা। এই করভার দিয়েও হয়তো বোম্বাইর ছবি চলবে ; তাঁরা আরও নানা উপায়ে ব্যাপারটা 'ম্যানেজ'ও করতে জানে। বাঙলা ছবির মধ্যেও

যাঁরা 'বোম্বেটে' পদ্ধতি গ্রহণ করবেন, তাঁরাও হয়তো বাঁচবেন। মরতে বসবেন তাঁরা যাঁরা ভালো ছবি তুলতে চান—পরীক্ষা ও বাছাই করে যাঁরা ছবি নির্মাণ করেন। করভারটা তাই পরিমাণের উপর নয়, আসলে গুণের বিরুদ্ধে।

ভারতীয় ছবির দৈর্ঘ্য যদি সত্যই অসঙ্গত হয় তা হলে ছবির দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণের নীতি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারেন। যুদ্ধকালেও তা হয়েছিল। করভার চাপানোর প্রয়োজন নেই।

ফিল্‌ম্‌-এর উপর এই করাঘাত সদ্য সমুদ্ভুত একটি দেশীয় শিল্পকলার উপর খড়্গাঘাত। জানি না, এ ক্ষেত্রে বাঙালী কৃতিত্বের বিরুদ্ধেও কোন বিরূপতা আছে কিনা ; না, বিশুদ্ধই এটি আমাদের ডেভলাপমেণ্টের দায় !

গোপাল হালদার

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—সত্য গুপ্ত ; ভারতীয় ; ২৯, নর্থ রেঞ্জ কলকাতা-১৭

৪। প্রকাশক— „ „ „ „ „ „

৫। সম্পাদকদ্বয়—(ক) গোপাল হালদার ; ভারতীয়
(খ) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; ভারতীয়
২৬।৩ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্লাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্ডিংস্, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা ১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৩৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলকাতা ৪ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা ১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা ২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা ২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩ ফার্ন রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা ১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ঈস্ট রোড, যাদবপুর কলোনি, কলকাতা ৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩১এ লেক অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৬ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা ১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ৭এফ রিমাউন্ট রোড, কলকাতা ২৭ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা ২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, ৯৭, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা ১৯ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলকাতা ১৯ ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, ১৪এ।৭৯

ওয়েস্টার্ন এক্সটেনশন এরিয়া, নয়াদিল্লী ৫ ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা ১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস কলকাতা ২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৭৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা ৬ ॥

২৯শ বর্ষ ॥ চৈত্র, ১৮৮২ ; ১৩৬৬ ॥ ৯ম সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

২৯ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা
চৈত্র ১৮৮২ ; ১৩৬৬

আধুনিক বিজ্ঞানে দর্শনের ভূমিকা

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

। এক ।

আধুনিক বিজ্ঞান নাকি যুক্তিবিচারের পূর্বতন ঐতিহ্য আর বহন করতে পারছে না—এমন অভিযোগ আজকাল প্রায়শই শোনা যাচ্ছে। এ-জাতীয় ধারণা নিয়েই পপারের ইতিহাস-দর্শন, কোয়েস্‌লারের বিজ্ঞান-বিশ্লেষণ। অথচ সমস্ত ভিত্তিটি তৈরি হয়েছে এমন এক পোড়ামাটিতে যা দিয়ে কোনদিনই বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং স্বরূপকে টেরাকোট্টায় মূর্ত করা সম্ভব নয়। "Newton is dead, long live Newtonism !" এমন কথা বোধ করি রাদারফোর্ডও কোনদিন উচ্চারণ করেন নি, যদিও তিনিই হলেন সর্বপ্রথম এবং প্রধান নায়ক যিনি বিজ্ঞানধারায় নিউটন-বিরোধী ধ্যানধারণার উপযুক্ত জমি তৈরি করেছিলেন। তারপর আইন্‌স্টাইন্‌, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, নীল্‌স্‌ বোর, ম্যাক্স বর্ন, হাইজেনবার্গ, ডি. ব্রগ্‌লী এবং শ্রোয়েডিংগারের হাতে বিজ্ঞান যে রূপ নিল তাতে নিউটনবাদ পুরোপুরি বিলুপ্ত হল সত্য, কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনো কোনো বিজ্ঞানী ক্লাসিক্যাল ভাবধারার পুনঃপ্রবর্তনে বিশ্বাস হারাতে পারলেন না। আধুনিক বিজ্ঞানকে তাই এক হিসাবে "Battle of beliefs" -এর রণক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন একাধিক চিন্তাবিদ। কেউ বলেছেন ডিটারমিনিজম নয়, সম্ভাবনা সূত্রই (probability) আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা, কেউ বা তারই খেই ধরে অনিশ্চয়তাবাদের জয়গান গেয়েছেন ; কেউ বা বলেছেন বস্তুর কোনো অস্তিত্বই নেই ; আর কেউ কেউ এরই মধ্যে "uniformity"এর অন্বেষণে ব্যগ্র। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এরকম তীব্র মতভেদ বোধকরি এর আগে কখনো ঘটে নি। আর এই মতভেদকেও বিজ্ঞান প্রশ্রয়

দিল "Subjectivism"কে বস্তুবিচারের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই সব মিলিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান যেমন জটিল, প্রকৃতি-বিশ্লেষণের নতুন মানদণ্ডে তেমনি অভিনব।

তেজস্ক্রিয়তার স্বরূপ নিয়ে গবেষণাকালে রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেছিলেন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন charged particles-এর অস্তিত্ব যা থেকে তিনি ধারণা করে নেন যে পরমাণুর গঠনও অনেকটা সৌরজগতের মতো—কেন্দ্রে ঘনীভূত পদার্থভর এবং তাকে ঘিরে ইলেক্‌ট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষে ঘূর্ণায়মান, কিন্তু প্রশ্ন উঠল ইলেকট্রনের পক্ষে কী করে এভাবে চলা সম্ভব? নিউটনীয় সূত্রাবলী এবং ক্লাসিক্যাল ইলেক্‌ট্রোডিনামিক্সের নিয়মাবলী মানতে হলে এ ঘটনা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এবার নীল্‌স্ বোর এগিয়ে এলেন তাঁর বিখ্যাত ইলেকট্রনের বিভিন্ন শক্তি কক্ষে লাফিয়ে চলার তত্ত্ব নিয়ে। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সন্ধান দেন, নীল্‌স্ বোর তাকে রূপায়িত করলেন ইলেক্‌ট্রনের "Quantum jumps"এর সূত্রাবলীর মধ্যে। অবশ্য আইন্‌স্টাইন্ এবং আরো অনেকে বোরের এ ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোরের এই মডেলটিই পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে কার্যকরী বলে গণ্য হল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিক্যাল ইলেক্‌ট্রোডিনামিক্সের অস্তিত্বও বিলুপ্ত বলে ঘোষিত হল।

কিন্তু "Anti-Newtonism"-এর সূত্রপাত শুধু এই একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯০০ সালের কোন এক সন্ধ্যায় জার্মানীর এক নিভৃত অঞ্চলে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর ছেলের সঙ্গে বেড়াবার সময় এক যুগান্তকারী সৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। প্ল্যাঙ্ক "Black-body radiation" নিয়ে গবেষণার সময় যে সমস্ত তথ্যের সন্ধান পান তার যথার্থতা ব্যাখ্যা করার সময় সম্পূর্ণ নতুন এক দর্শনে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু ভয় ছিল, এরকম সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তার ফলাফল বিশ্ববাসী কী-ভাবে গ্রহণ করবে, বিজ্ঞানীরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন। পরবর্তীকালে যখন প্লাঙ্কের এই গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হল, বিজ্ঞানীরা বিমুগ্ধ হলেন এক নতুন প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়ে। তেজ (energy) কখনো ক্রমিকভাবে (continuous) কাজ করে না, থেমে থেমে তেজকণাগুলো কাজ করে চলে এ ধারণায় আসার পর প্রকৃতি বিশ্লেষণে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এই প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে বর্ন, হাইজেনবার্গ এবং ডিরাক বস্তু-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

কোয়ান্টাম্ মিকানিক্সের প্রবর্তন করলেন। আর তা থেকে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, তা আর কোনক্রমেই নিউটনীয় ঐতিহ্য বহন করতে পারল না। ডিটারমিনিজমের স্থানে সম্ভাবনা সূত্রাবলী (probability) প্রবর্তিত হল, বস্তু এবং তরঙ্গের এক দ্বৈতরূপ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা হল, এবং সর্বাধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলোই এক-মাত্র কার্যকরী বলে গণ্য হল।

এদিকে ১৯০৫ সালে আইন্স্টাইন্ তাঁর বিশ্বআলোড়নকারী আপেক্ষিকতা-বাদ উপস্থিত করলেন। বার্নের পেটেণ্ট অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একজন সামান্য পেটেণ্ট পরীক্ষকের মনে যে সমস্ত চিন্তাধারা জন্ম নিল, সমস্ত পৃথিবীকে তা আলোড়িত করল এক ব্যাপক ভূমিকম্পের মতো। টাইম এবং স্পেস সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তাসূত্র পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হল এবং তাই হল নিউটনীয় ভাবধারার অন্তর্মূলে সর্বপ্রধান আঘাত। তেজ এবং বস্তুর মধ্যে সমার্থকতা প্রবর্তিত হওয়ার পর "Mass" সম্পর্কিত ধারণায় নতুন মোড় নিল, এবং একের পর এক বিভিন্ন বিস্ময়ের সামনে বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়ে উঠল অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ। আইন্স্টাইন্ তাই শেষ যুগে মাধ্যাকর্ষণ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিজমের মধ্যে ঐক্য খুঁজবার প্রয়াসে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর প্রস্তুতিকার্যে মনোনিবেশ করেন। যদিও আজ পর্যন্ত তা একটা স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণ করে নি, তা সত্ত্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিউটনীয় ব্যাখ্যা যে অচল, সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমত।

অবশ্য ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের পরাজয়ের পটভূমি পরে আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করল। "anti-matter" সম্পর্কে নতুন আলোকপাত এবং ঐ বিষয়ে পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে যে সমস্ত প্রজ্ঞান আহরণ করা হয়েছে তা কোনো অংশেই বস্তু সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারাকে সমর্থন করে না। উপরন্তু "matter"এর বিপরীত কোণেই "anti-matter"এর উদ্ভব, এ যুক্তি আধুনিক বিজ্ঞান পুরোপুরিভাবেই বর্জন করতে চলেছে। অন্যদিকে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ বোধহয় ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তির স্তম্ভ হিসেবেই দাঁড়িয়ে এক ব্যাপক এবং অভিনব দিগন্তের বিস্তৃতি আমাদের সামনে মেলে ধরেছে। একই সময়ে বস্তুর স্থিতি এবং গতি জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় —এ শুধু তত্ত্বমাত্র নয়, বিশ্বদর্শনের এক নতুন ভিত্তি। সব মিলিয়ে বিজ্ঞান আজ এমন এক জটিল পথ অতিক্রম করতে চলেছে যাতে নতুন মূল্যবোধকে

স্বীকার করার প্রয়োজন যেমন জরুরী, পদস্খলনের সম্ভাবনাও তেমনি স্বাভাবিক ; এবং আধুনিক বুদ্ধিজীবীমাত্রই এ দুয়ের টানাপোড়েনে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে নিশ্চিত কিছু বলা তো সম্ভবই নয়, বরং একটা বিশ্বাসের উপর ভর করে কোনো বিশেষ দিকে ঝুঁকে পড়াই হয়ে ওঠে একমাত্র অবলম্বন। আর বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি, সমাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য তা-ই হয়ে ওঠে বিজ্ঞান-ব্যাখ্যার অন্যতম অঙ্গ, হয়তো বা কখনো কখনো ইচ্ছাকৃত বিকৃতিও বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত।

॥ দুই ॥

যে নিউটন-বিরোধী ভাবধারার সূত্রপাত একদিন এভাবে হয়েছিল, আলোচনা করে দেখবার প্রয়োজন আছে সেই ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের দার্শনিক সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং কতটুকু। আধুনিক বিজ্ঞান যে কয়েকটি চমকপ্রদ পরীক্ষা-লব্ধ তথ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যেই নতুন প্রজ্ঞায় আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি, ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের দার্শনিক সীমারেখাকেও অস্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল, বিজ্ঞানের ইতিহাস-বিচারে এ সত্যকে অবহেলা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের মূল বক্তব্য কী ? এক কথায় তা হল এই, কোনো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা (initial condition) জানা থাকলে তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, প্রাথমিক অবস্থা কি সব সময়ে জানা সম্ভব ? তাছাড়া দ্রষ্টাও (observer) কি প্রাথমিক অবস্থার বিচারে "reference factor" নয় ? উপরন্তু পারমাণবিক বস্তুকণার প্রাথমিক অবস্থা পরীক্ষা কিংবা নিরীক্ষার (observation) মাধ্যমে জানা কখনোই সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠবে, ভবিষ্যতে তো এমন মাইক্রোস্কোপও আবিষ্কৃত হতে পারে যার সাহায্যে পরমাণুর গতিবিধি লক্ষ্য করা যাবে এবং তখন কোনো পারমাণবিক বস্তুকণার প্রাথমিক অবস্থাও জানা যেতে পারে ; কিন্তু আদৌ তা হবার নয়। কারণ যখনই কেউ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বস্তুকণাটিকে লক্ষ্য করবে, তখনই ফোটনকণা গিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে প্রাথমিক অবস্থা থেকে সরিয়ে ফেলবে। অতএব এক্ষেত্রে কোনো পারমাণবিক বস্তুকণার প্রাথমিক অবস্থা জানা কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

আর শুধু পরমাণুর ক্ষেত্রেই কেন ? ব্যাপক অর্থে বলা যেতে পারে নিরীক্ষার (observation) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই হল আলোকরশ্মির সঙ্গে বস্তুর প্রক্রিয়ার (interaction) প্রতিফলন ; তাই নিরীক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর সাশ্রয়ী (intrinsic) স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ।

প্রশ্ন উঠবে তাহলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেণ্টের ভূমিকা কী ? এক্সপেরিমেণ্ট লব্ধ জ্ঞান কি তবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য বহন করে না ? প্রশ্নটা ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। এ-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে এক্সপেরিমেণ্টের অনুসঙ্গী আরও কয়েকটি পদ্ধতিকেও বিচার করতে হবে। প্রথমত প্রকৃতি-বিশ্লেষণে "presupposition" বা পূর্ব-কল্পনার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে (অবশ্য "presupposition" বা পূর্বকল্পনা এখানে "hypothesis" বা অনুমানের নামান্তর নয়) ; কলিংউডের ভাষায় তাকে আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে "absolute presupposition ।" এই "absolute presupposition" অবশ্য যুগবিশেষে রূপান্তরিত হয়ে থাকে যেমন গ্রীক যুগে তা ছিল এই বিশ্বাসে যে প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রই আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করে, ক্লাসিক্যাল যুগে তা রূপান্তরিত হয়েছিল বিশ্বপ্রকৃতি এক অঘোর নিয়মের অধীন এই প্রজ্ঞায়। তাই ক্লাসিক্যাল যুগে প্রকৃতি বিশ্লেষণে সব সময়ই সন্ধান করা হত একটা বিশেষ নিয়ম, যা দিয়ে যাবতীয় ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব (এই "generalisation" বা সাধারণীকরণের মোহকে পরবর্তীকালে অনেকে "economy of thought" -এর প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করেছেন)। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হত সমস্ত এক্সপেরিমেণ্টলব্ধ তথ্য। লক্ষ্য করবার বিষয় এই নিয়মের অন্বেষণই ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানে "Law" শব্দটির প্রচলন (যেমন "Boyle's law", "Newton's law") সম্ভব করে তুলেছিল। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান গবেষণার "absolute presupposition" ক্লাসিক্যাল যুগ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। তাই আজকের দিনে এক্সপেরিমেণ্টলব্ধ তথ্যকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিও অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সিদ্ধান্তে পৌছান, পরবর্তীযুগে আইন্স্টাইন্ সেই একই ঘটনাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। এক্সপেরিমেণ্টলব্ধ তথ্যকে তাই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যুগ বিশেষের "absolute presupposition"-এর আলোকে—যাকে আরো সহজ এবং ব্যাপকভাবে বলা যেতে পারে যুগ

বিশেষের দার্শনিক বিচারের মানদণ্ডে। দর্শনকে বিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র করে দেখবার চেষ্টা তাই ভ্রান্ত, অর্থহীন।

উপরন্তু যুগবিশেষে এক্সপেরিমেণ্টের টেকনিকও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কোপার্নিকাস যখন পৃথিবী ঘূর্ণায়মান এ সিদ্ধান্তে আসেন, তখনো টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হয় নি, খালি চোখের সীমিত বিশ্বই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু। সেদিন যদি শুধু পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করা হত, তবে সত্য থেকে সে-যুগ বঞ্চিত হত নিঃসন্দেহে। অবশ্য এক্সপেরিমেণ্টের সঙ্গে নতুন প্রত্যয়ে আসার কোনো সম্পর্ক নেই এমন কথা বলাও অযৌক্তিক। কখনো কখনো পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে প্রচলিত সত্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নাও হতে পারে, এবং তখন নতুন সত্যে আসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বাস্তবতার সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পয়ন্‌কেয়ার বলেছেন, "A reality completely independent of the mind which conceives it, sees or feels it, is an impossibility. What we call objective reality is, in the last analysis, what is common to many thinking beings and could be common to all।" বলা বাহুল্য, নিউটনীয় বিশ্বদর্শন বাস্তবতার এ সংজ্ঞাকে আদৌ গ্রহণ করে নি, বরং একটা "mechanical philosophy"-র প্রবর্তন করে বিশ্ব সম্পর্কে একটা একপেশে সত্যসত্তার পরিবেশন করেছে। শ্রোয়েডিংগার বেশ পরিষ্কারভাবেই বলেছেন ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হল "Exclusion of ourselves from the picture।"

নিউটনীয় বিশ্বদর্শনের এই হল স্থূল সীমারেখা। কিন্তু তার অভ্যন্তরে আপত্তির কারণ ছিল প্রচুর, যেমন "কাজের" (work) সংজ্ঞানুযায়ী ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞান এক ধরনের "principle of least action"কেই সমর্থন করেছে। প্রব্যাবিলিটি মিকানিক্সের প্রবর্তনের মূলে এ সম্পর্কে দর্শনগত আপত্তি ছিল অনেকখানি। এমনকি ক্রিয়া (action) এবং প্রতিক্রিয়ার (reaction) এককালীনতার ধারণা কার্যকারণবাদকে সম্পূর্ণভাবে মানে নি— এমন অভিযোগও নিউটনের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। সম্প্রতি কজিরেভ (Kozeyrev) তাঁর "Causal mechanics" সম্পর্কে জানিয়েছেন প্রতিক্রিয়ার (reaction) কারণ হিসেবে যদি ক্রিয়াকে (action) উপস্থাপিত করা হয়,

তাহলে এ দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের পার্থক্য নিশ্চয়ই বিদ্যমান এবং এ প্রজ্ঞার উপর দাঁড়িয়ে তিনি যে মিকানিক্সের প্রবর্তন করেন তা আজ অজস্র সমালোচনার সম্মুখীন হলেও, ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞান যে তথাকথিত কার্যকারণবাদের একটা সম্পূর্ণ নিখুঁত স্তম্ভ আঁকড়ে ধরে নেই এ তথ্য আজ অনেকখানি স্পষ্ট।

সব মিলিয়ে তাই বোঝা যাচ্ছে, ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের দার্শনিক বিচারে যে সমস্ত বিরোধ মূলগতভাবে দেখা দিয়েছে, তা শুধু সামান্য রূপান্তরের অপেক্ষা রাখে না, এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিশ্বপ্রজ্ঞায় আসার প্রয়োজনীয়তাকে যথার্থ করে তোলে। আর তারই অন্বেষণে শুরু হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা, যদিও কখনো তা অস্পষ্ট, কখনো বা অপরিণত।

॥ তিন ॥

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অঙ্গ কোয়াণ্টাম তত্ত্বের দর্শনগত ভূমিকা কী? এক কথায় তা বলা হয়ে থাকে যে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ একটি ক্রমিক (continuous) পদ্ধতিতে ঘটে না; অণুপরমাণুর গতিবিধি থেকে সমস্ত বৃহৎ কার্যাবলীর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এক জাতীয় অক্রমিকতা (discontinuity) বিরাজমান।

কিন্তু কোয়াণ্টাম তত্ত্ব প্রসঙ্গে এটুকুই যথেষ্ট নয়। কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য বোধ হয় পদার্থের তরঙ্গ এবং বস্তুকণার দ্বৈতরূপ বিশ্লেষণ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডি. ব্রগলী গবেষণার সময়ে লক্ষ্য করেন যে ইলেকট্রনপ্রবাহও তরঙ্গের মতো "diffraction" উৎপন্ন করে এবং তা থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে বস্তুকণা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই, সবকিছুই শুধু তরঙ্গ সমষ্টি। তাঁর এ ব্যাখ্যাকে গণিতে ভাষান্তরিত করলেন শ্রোয়েডিংগার। কিন্তু প্রশ্ন উঠল তাহলে অণুপরমাণু এগুলোর কি কোনো অর্থই নেই? যখন আমরা বলি দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটা অক্সিজেন পরমাণু মিলে এক অণু জল তৈরি করে, তরঙ্গের সাহায্যে এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া কি করে সম্ভব? এবার এগিয়ে এলেন ম্যাক্স বর্ন তাঁর যুগান্তকারী প্রব্যাবিলিটি সূত্র নিয়ে। তিনি বললেন শ্রোয়েডিংগার তাঁর গণিতে যে "wave equation" প্রবর্তন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা বস্তুকণার কোনো এক বিশেষ স্থানে অবস্থিতির সম্ভাবনাকেই (probability) নিরূপিত করে। কিন্তু আপত্তি উঠল অনেক দিক থেকে। এমনকি আইনস্টাইন্ পর্যন্ত বর্নের এ ভাষ্য মানতে

পারেন নি। শুরু হল বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক দর্শনের লড়াই। বর্ন জানালেন ডিটারমিনিজমের যুগ যে শেষ হয়েছে তাতে তিনি খুশি "at least on philosophical ground", কারণ তাঁর মতে নিউটনীয় ডিটারমিনিজম "fatalism"এরই নামান্তর; তাতে মানুষের করার কিছুই থাকে না। অন্যদিকে আইন্‌স্টাইন্ বললেন, "the world cannot be rational at the one end, and irrational at the other।" আর এ অবস্থার সবচেয়ে বেশী সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজকরা বললেন—বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবার দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে; সম্ভাবনা সূত্র প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যনির্ভরতারই নামান্তর। এমনকি কোনো কোনো ধর্মযাজক বর্নকে উপযুক্ত-লোক ভেবে গোত্রান্তরের জন্য প্রস্তাব পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য আইন্‌স্টাইন তাঁদের এই তৎপরতার একটা সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন এই বলে যে, "I would not respect that God, who spent his whole energy in games of chance only।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্ভাবনা সূত্রের অপব্যাখ্যা বিন্দুমাত্র কমে নি। আর শুধু ধর্মযাজক কেন, রাজনীতিবিদ্, দার্শনিক, ঐতিহাসিক সবাই কিছু না কিছু এ সম্পর্কে না বলে পারলেন না। যদিও আইন্‌স্টাইনের মতো যুগন্ধর চিন্তাবিদ বর্নের সঙ্গে একমত হন নি, বরং তিনি "Dice-playing God"এ অবিশ্বাসী বলে বারেবারে ঘোষণা করেছেন, তবুও বর্নের ব্যাখ্যায় পরমাণুর অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে পড়ে নিঃসন্দেহে। অবশ্য তাতেও যে আপত্তির অবকাশ নেই এমন নয়। যেমন বর্নের বিরুদ্ধে প্রথম এবং প্রধান অভিযোগ এই যে তিনি শুধু পারমাণবিক ঘটনাবলীকে সম্ভাবনার (probability) আলোকে বিচার করেছেন; কিন্তু "wave equation"এর সিদ্ধান্তকে কেন সম্ভাবনার পরিমিতি (probability) বলে গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে তিনি কোনো প্রমাণ বা ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন নি। এক কথায় "he gave an interpretation, not an explanation।" সন্দেহ নেই, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিচারে এ জাতীয় আপত্তির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং এখানে বর্নের একমাত্র উত্তর এই যে তরঙ্গের সম্মোহনে তিনি চোখে-দেখা বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে অপ্রস্তুত; উপরন্তু "philosophically" তিনি সম্ভাবনা সূত্রে বিশ্বাসী, কারণ তাঁর ধারণা তা মানুষের সম্ভাবনাকে অনন্তের দিকে নিয়ে যায়; নিউটনীয় ডিটারমিনিজম্ বড় সঙ্কীর্ণ, কেননা প্রাথমিক অবস্থাই যদি ভবিষ্যৎ

নিরূপিত করে তাহলে মানুষের আপন প্রচেষ্টা বলতে কিছু থাকবে না ; এবং এরকম ছকবাঁধা পথে জীবন হয়ে উঠবে দুঃসহ। অবশ্য "Scientific determinism" সম্পর্কে এ জাতীয় যুক্তি কতটুকু সত্য তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এবং এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে যে আপেক্ষিকতাবাদ থেকে ইউনিফাইড্ ফিল্ড্ থিয়োরী পর্যন্ত আইন্স্টাইনের ব্যাপক জীবনসাধনা সম্ভাবনা সূত্রেরই (probability) বিপরীত কোণে এক আশ্চর্য "uniformity"-র অন্বেষণ। বর্নের কাছে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "In our scientific expectations we have progressed towards antipodes. You believe in the dice-playing God, and I in the perfect rule of law in a world of something objectively existing which I try to catch in a wildly speculative way. I hope that somebody will find a more realistic way, or a more tangible foundation for such a conception than that which is given to me. The great initial success of quantum theory cannot convert me to believe in that fundamental game of chance !"

সর্বশেষ বিচারে তাই বর্ন কতটুকু সত্য, কতটুকু ভ্রান্ত এ নিয়ে মতপ্রকাশ করবার অধিকার হবে সেদিনই যেদিন ইউনিফর্মিটিকে ভিত্তি করে প্রকৃতি বিশ্লেষণের এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করা যাবে। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিভিন্ন শ্রেণী নায়কের হাতে তার ব্যাখ্যার চেয়ে অপব্যাখ্যাই হয়েছে বেশী। সম্ভাবনা সূত্রের মাধ্যমে যে তিনি মানুষকে ভগবানের হাতের ক্রীড়নক করে তোলেন নি, বরং যুক্তিধারার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন—এ সত্যকে অনেকেই অস্বীকার করতে প্রয়াসী।

মনে পড়ে হাইজেন্বার্গের অনিশ্চয়তাবাদও অনুরূপ পরিণতি লাভের পথে। কোন এক বিশেষ সময়ে বস্তুর স্থিতি এবং গতি দুই-ই জানা অসম্ভব, হাইজেন্বার্গের এ-সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিশ্বজোড়া এক অনিশ্চয়তার সন্ধানে আগ্রহশীল। এবং তাঁরা এ বিষয়ে তৎপরতা দেখিয়ে থাকেন মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা না করেই। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে বর্ন বলেছেন—"The situation is similar if you wish, for instance, to determine the physico-chemical processes in the brain connected with a mental process ; it cannot be done because the latter would be decidedly disturbed by the physical investigation. Complete knowledge of the

physical situation is only obtainable by a dissection which would mean the death of the living organ or the whole creature, the destruction of the mental situation ।"

কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের এক দুরূহ এবং জটিল পরিস্থিতির মধ্যে একটা ঐক্য খুঁজবার প্রয়াসে নীল্‌স্ বোর তাঁর বিখ্যাত Complementary তত্ত্ব ঘোষণা করেন। বিশ্বপ্রকৃতি শুধুমাত্র বস্তুকণা বা তরঙ্গের সমষ্টি নয়, বরং এ দুয়ের এক দ্বৈত সত্তা প্রত্যেক অণুপরমাণুতে বিদ্যমান, এ বিশ্বাসে তিনি আসেন এক অভূতপূর্ব দার্শনিক তাড়নায়। অবশ্য বস্তুকণা এবং তরঙ্গের এই দ্বৈতরূপের প্রকৃতি কী হবে সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্য তিনি রাখেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এই মডেল গবেষণাক্ষেত্রে কার্যকরী বলে গণ্য হল।

শুধু তাই কেন প্রসিদ্ধ রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভাবিলভ (Vavilov) কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের জয়জয়কার করেছেন অন্তত, এই বিশ্বাসে যে নীল্‌স্ বোরের সম্পূরক তত্ত্ব (complementary theory) ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম-এর নিয়মানুযায়ীই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ তরঙ্গ এবং বস্তুকণার এই দ্বৈতরূপকে বিদ্রূপ করে বলেছেন, মনে হচ্ছে যেন এই বিশ্বচরাচর পালা করে প্রতি সোমবারে তরঙ্গ এবং প্রতি বুধবারে বস্তুকণা সেজে অভিনয় করে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তরঙ্গ এবং বস্তুকণার দ্বৈতসত্তা বিশ্ববিচারে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করল।

কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের দ্বিতীয় তাৎপর্য বোধ হয় দৃষ্টির মাধ্যম (apparatus) এবং দৃষ্টিবস্তুকে (observable object) একাঙ্গীভূত করা। যে সমস্ত মাধ্যমের সাহায্যে কোনো বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা হয়ে থাকে, তাকে যে সেই নির্দিষ্ট বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, বরং আমরা যা জানতে পারি তা এ দুয়ের মধ্যে সম্পাদিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার পরিচয়মাত্র, সে সম্পর্কে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব স্পষ্ট বক্তব্য গ্রহণ করেছে।

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোপেনহেগেন-এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলন হয়। তাতে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য কতকগুলো বিষয়সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা পরে 'কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা' বলে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু এই 'কোপেনহেগেন ব্যাখ্যাকে' যাঁরা মানতে পারলেন না, আইনস্টাইন এবং শ্রোয়েডিংগার তাঁদের অন্যতম। আইনস্টাইন পরিপূর্ণভাবে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তিকেই অস্বীকার করলেন।

শ্রোয়েডিংগার তার বস্তুর তরঙ্গরূপের মোহ ছাড়তে পারলেন না। কিন্তু বিরোধীরা অন্তত একটা বিষয়ে একমত হয়ে এই মনোভাব প্রকাশ করলেন যে "বাস্তবতা" সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল ধারণা থেকে এতটা বিচ্যুতি বিজ্ঞানের স্বরূপকে হয়তো অনেকখানি ব্যহত করবে।

কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের যে তাৎপর্য্য কোনো কোনো বিজ্ঞানীর কাছে সবচেয়ে আপত্তিকর বলে আখ্যায়িত হয়েছে তা হল এই যে, তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "free will"-এর ভূমিকাকে অনেকাংশে মেনে নিয়েছে।

"Whether we believe theoretically in strict determinism or not, we can make no use of this theory since a human being is too complicated, and we have to be content with a working hypothesis like that of spontaneity of decision and responsibility of action. If you feel that this clashes with determinism, you have now at your disposal the modern indeterministic philosophy of nature, you can assume a certain "freedom" i.e. deviation from the deterministic laws, because these are only apparent and refer to averages. Yet if you believe in perfect freedom, you will get into difficulties again, because you cannot neglect the laws of statistics which are laws of nature।"

এ হল কোয়াণ্টাম মিকানিক্স 'free will'-কে পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে বিজ্ঞানের স্বরূপকে বিনষ্ট করেছে—এই অভিযোগের জবাব হিসেবে বর্নের বক্তব্য।

তা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই "free will"-এর দার্শনিক বিচার অনেকাংশে ব্যহত হয়েছে কোনো কোনো বিজ্ঞানীর প্রকৃতি-বিশ্লেষণের "subjective" এবং "objective" ধারাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সম্মোহনে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের বিখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হল; স্থান বস্তু এবং সময়ের বিচারে "absoluteness" লোপ পেল, এমনকি "natural laws"-এর সংজ্ঞা পরিবর্তনেরও প্রশ্ন উঠল। মাধ্যাকর্ষণের ধারণারও এক আমূল পরিবর্তন ঘটল। এদিকে কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলকে ব্যাখ্যা করার সময়ে দ্রষ্টার (observer) ভূমিকাকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আর

এভাবেই একদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "subjectivism"-এর (অবশ্য তার চিরাচরিত অর্থে নয়) অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত করা যেতে পারে। মনে করা যাক একটি কাঠের বোর্ডে পাশাপাশি দুটি সঙ্কীর্ণ ছিদ্র (ক ও খ) আছে এবং তার পেছন দিকে একটি বাল্‌ব এবং সামনে একটা ফটোগ্রাফিক প্লেট আছে। বাল্‌বটিকে জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে প্লেটটি কালো হতে শুরু করবে। এখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী এ পরীক্ষাটির ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হবে ছিদ্র দুটোর মধ্য দিয়ে ফোটনকণা গিয়ে প্লেটের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। কিন্তু প্রথমে যদি ক ছিদ্রটিকে বন্ধ করে খ ছিদ্রটি দিয়ে আলোকপাত করা হয় এবং কিছুক্ষণ পরে ক ছিদ্রটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তার সঙ্গে প্রথমে খ ছিদ্রটি বন্ধ করে ক ছিদ্র দিয়ে আলোকপাত করে এবং আগের মতো একই সময়ের ব্যবধানে খ ছিদ্রটি উন্মুক্ত করে দিলে প্লেটের সঙ্গে যে প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে তার পার্থক্য নির্ণয় করা গণিতের সাহায্যে অসম্ভব। বস্তুত কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে সমগ্র পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা করার সময় ক এবং খ ছিদ্রের পার্থক্য নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। এখানে একমাত্র দ্রষ্টার (observer) সাহায্য ব্যতীত ছিদ্র দুটোর মাধ্যমে সম্পাদিত দুটো পৃথক পরীক্ষাকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত পরীক্ষা থেকেই বোঝা যাচ্ছে "subjectivism"-ও (অবশ্যই তার সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়) প্রকৃতি বিচারের একটি অন্যতম অঙ্গ, যদিও একথা সত্য যে প্রকৃতিতে কী ঘটছে না ঘটছে তা আমাদের নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করে না। হাইজেনবার্গের ভাষায় আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে, "Natural science is not concerned with Nature itself, but with Nature as man describes and understands it......attention is brought to the fact that natural science stands between man and Nature and that we cannot dispense with the aid of perpetual concepts or other concepts inherent in the nature of man।" গবেষণাগারে গবেষকের ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে বর্ন বলেছেন, "এতকাল আমাদের ধারণা ছিল বিশ্বপ্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন বস্তু অভিনয় করে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞানী সেখানে নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র; কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। বিজ্ঞানীর সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে থিয়েটারের দর্শকের সঙ্গে

নয়, বরং ফুটবল খেলার দর্শকের সঙ্গে যাঁর হাততালির উপর খেলাটা অনেকখানি নির্ভর করে।”

মনে পড়ে পাউলি তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, “Styles of thought”-এর কথা—“Styles of thought not only in arts, but also in science।” প্রকৃতি-বিশ্লেষণও বিশ্লেষকের “thought pattern” বা চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল এমন কথা শোনার পর নিশ্চয়ই “exact science”-এর মোহে আচ্ছন্ন অনেকেই বিরূপ হবেন। তার উত্তরে অন্তত এটুকু বলা যেতে পারে যে নিউটনীয় বিজ্ঞানের সম্মোহনে একদিন যে “mechanical philosophy”-র প্রবর্তন হয়েছিল তাতে “subject” এবং “object”-কে পৃথক করে দেখার চেষ্টা হয়ে উঠেছিল সে-যুগের চিন্তা-বিকাশের অন্যতম ধারা; কিন্তু “logical system” হিসেবেও সে-জাতীয় “positivism” কোনক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে দাঁড়ায় না, কারণ, “what the positivists called observing facts is really historical thinking, which is a complex process involving numerous presuppositions।” পয়নকেয়ারের মতে তাই বিজ্ঞানীর দায়িত্ব “true nature of things”-এর অন্বেষণ নয়, “true relation of things”-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ। এবং এ দায়িত্ব পালনে কোয়াণ্টাম মিকানিক্স একটি অন্যতম হাতিয়ার নিঃসন্দেহে।

অবশ্য এমন কথা বলা যেতে পারে না যে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব তার দার্শনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি (যা কোনো কোনো বিজ্ঞানীর কাছে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে) নিয়েই বিশ্ববিচারের অপেক্ষা রাখে। বিজ্ঞান বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই ভবিষ্যতে অন্য কোনো দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে হয়তো বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি দর্শন করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলতে হবে যে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব তার যুগের প্রয়োজনীয়তা মিটাতে আজ একান্তভাবেই বদ্ধপরিকর, ঠিক যেমনভাবে নিউটনীয় বিজ্ঞানও একদিন তার যুগের দাবি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিল।

॥ চার ॥

প্রসঙ্গত এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ অন্যতমভাবে আনা হয়ে থাকে, অর্থাৎ তা আর কার্যকারণবাদের ঐতিহ্য বহন করছে না,

সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রব্যাবিলিটি মিকানিক্সের উদ্‌গতা ম্যাক্স বর্ন বলেছেন :

"There is no doubt that the formalism of Quantum mechanics and its statistical interpretations are extremely successful in ordering and predicting physical experiences. But can our desire of understanding, our wish to explain things, be satisfied by a theory which is frankly and shamelessly statistical and indeterministic? Can we be content with accepting chance and not cause as the supreme law of physical truth?

To this last question I answer that, not causality properly understood, is eliminated, but only a traditional interpretation of it, consisting in its identification with determinism. I have taken pains to show that these two concepts are not identical."

ডিটারমিনিজমের অবসান তাই কার্যকারণবাদের অবসান নয়। এ দুয়ের সংজ্ঞা হিসেবে তিনি বলেছেন, "Determinism postulates that events at different times are connected by laws in such a way that predictions of unknown situations (past or future) can be made. Causality postulates that there are laws by which the occurrence of an entity B of a certain class depends on the occurrence of an entity A of another class, where the word "entity" means any physical object, phenomenon, situation or event. A is called the cause, B the effect."

বলা বাহুল্য, কার্যকারণবাদ এ-সংজ্ঞানুযায়ী সম্ভাবনা সূত্রকে পরিপূর্ণভাবেই সমর্থন করে কারণ, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ স্থানে কোন বস্তুকণাকে পাওয়ার সম্ভাবনারও একটা কারণ আছে। বস্তুত কার্যকারণবাদের ধারণা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। গ্রীক যুগে তা যে অর্থ বহন করত, নিউটনীয় যুগে তা নিশ্চয়ই সে অর্থ বহন করত না। কার্যকারণবাদের সীমারেখা কোনো একটা নির্দিষ্ট বৃত্তে আবদ্ধ নয়। জ্ঞানবিকাশের বিভিন্ন স্তরে তা ক্রমশ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানে কার্যকারণবাদ যে অর্থে ব্যবহৃত হত, আধুনিক বিজ্ঞানে তা আরো সমুন্নত এবং সম্প্রসারিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। আধুনিক বিজ্ঞানে কার্যকারণবাদের ভূমিকা সম্পর্কে কলিংউড বলেছেন :

"Of the two Newtonian classes of events, (a) those that happen according to law, (b) those that happen as the effects of causes, class (a) has expanded to such an extent as to swallow up (b)."

"Casusal sense" এবং "Induction"-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি সে নিয়েও তীব্র মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ "Inductive method"-কে কার্যকারণবাদের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে অসম্মত অন্তত এই কারণে যে "exactness"-র ঐতিহ্য তাতে ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ একজাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কারণ কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে যে কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যেই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা কখনো নির্দিষ্ট সংখ্যক তথ্যের চেয়ে বেশি কিছু দিতে সক্ষম নয়। অতএব পরীক্ষালব্ধ তথ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকালে "Induction"-কে বাদ দেওয়া অনেক সময়ই হয়ে ওঠে অসম্ভব।

॥ পাঁচ ॥

অবশেষে বিশ্বপ্রকৃতির চরিত্র বিশ্লেষণে ডিটারমিনিজমের ভবিষ্যৎ কি সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে কোয়াণ্টাম মিকানিক্সে তথাকথিত ডিটারমিনিজমের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্বেও "statistical interpretation"-এরও একটা নিয়ম আছে, তার মধ্যেও একটা স্বাভাবিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই অনেক বিজ্ঞানীই ডিটারমিনিজমের অন্বেষায় আজও ব্যগ্র।

ডিটারমিনিজমের বিরুদ্ধে বর্নের যে আপত্তি তা "fatalism"এরই নামান্তর, সে-সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সমাজবিজ্ঞানের কোনো "deterministic" পদ্ধতিতেও "human intervention" বা মানুষের কার্যকলাপের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং তাও সমস্ত পদ্ধতিটিরই একটা অন্যতম অঙ্গ বা "variable factor" হিসেবে কাজ করে। অবশ্য একথা মানতেই হবে যে নিউটনীয় ডিটারমিনিজমের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে যা রয়েছে অর্থাৎ বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা (initial condition) জানা তা অনেকাংশেই দুরূহ কিংবা অসম্ভব। কেননা, প্রাথমিক অবস্থা বলতে শুধু "3-dimensional" অক্ষই যথেষ্ট নয়, বাইরের জগতের সঙ্গে এবং সর্বোপরি দ্রষ্টার অবস্থিতির সঙ্গে তার

জটিল সম্পর্ক জানারও প্রয়োজন রয়েছে। তাই ডিটারমিনিজমের ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞাকে পরিবর্তন বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন হিসেবে দাঁড়িয়েছে, তবুও ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের কার্যকারণবাদের ধারণার সঙ্গে নতুন "dimension" সংযোজন করে যেভাবে কোয়াণ্টাম মিকানিক্স তা গ্রহণ করেছে, তেমনি ডিটারমিনিজমের পুরানো ধারণার সঙ্গে নতুন "dimension" সংযোজনের আশাও অবান্তর নয়।

বলা প্রয়োজন, কোয়াণ্টাম মিকানিক্স জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকেই শাশ্বত সত্য বলে গ্রহণ করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রসঙ্গত আইন্স্টাইনের একটি বিখ্যাত উপমার কথা মনে পড়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের জটিলতা সম্পর্কে আইন্স্টাইনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "মনে করা যাক একটা বাল্ব আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আলোর পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে আলোর পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সঙ্গে সংস্পর্শের পরিধিও সম পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে।" অজ্ঞানতার সীমা নেই বলে জ্ঞানবিকাশও কোনোদিন ব্যাহত হবে না। আর এই জ্ঞানবিকাশ এবং সত্য অন্বেষণের তীব্র তাড়নায় ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের যে দার্শনিক ভিত্তি গঠিত হবে তা ডিটারমিনিজমের নিউটনীয় সংজ্ঞাকে রূপান্তরিত করে গ্রহণ করবে না এমন কথা বোধ করি কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের সুদৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়িয়েও আজ কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব।

এই প্রবন্ধ লিখতে নিম্নলিখিত বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. Natural Philosophy of Cause and Chance—Max Born.
2. Physics in my Generation—Max Born.
3. Physics and Philosophy—Heisenberg.
4. Physical Principles of the Quantum Theory—Heisenberg.
5. Atomic Physics and Human Culture—Niels Bohr.
6. An Essay on Metaphysics—Collingwood.
7. The Value of Science—Poincare.

দেখেও লাগে ভালো

বিষ্ণু দে

দেশবিদেশে শাস্ত্রে ঠিক কথাই বলে বটে :
রূপবতীর ভিতরে রোগবীজাণু বাঁধে বাসা,
আবিল দেহে বহু ময়লা নানারকম কীটে,
তাছাড়া আছে সতী-অসতী প্রশ্ন সঙ্কটে
মেজাজফেরও প্রায়ই ঘটে যখন যায় মিটে
মোহিনীমায়া, রুদ্ধ হয় পদাবলীর ভাষা।
তবুও দেখি সিনেমাঘরে পার্কে ময়দানে
ট্রামে-বাসে বা ট্যাক্সিতেই চলে প্রেমের আশা
ঘেঁষে বসার তীব্র সুখে আলাপ মুখে-কানে।
যৌবনের যুগলরূপ যযাতিকেও টানে।
কারণ প্রেমই যৌবনের বিধুর—সত্তায়
ব্যক্তি হয়ে সমষ্টিও, হৃদয়বত্তায়।

শাস্ত্রে ঠিক কথাই বলে, কালের চালু নীতি
এই কথারি সমর্থক, উল্টা দিক ঘেঁষে,
কারণ আজ উন্নতির ফোঁপরা বুলি শিখে
এই কথারই ছদ্মবেশ দুর্গতের দেশে,
কারণ নাকি : সমস্যাটা প্রজাপতির স্ফীতি,
জমির আর মেহনতের অপচয় বা ক্ষতি
তুচ্ছ অতি, সহায় শুধু উদার তেজারতি।
তাই মনের ইন্দ্রধনু সে নাকি জৈবিকে
এবং যাকে ফুর্তি বলে তাতে ফুরায় শেষে।

যৌবন কি ওষ্ঠাধরে ম্যাজেন্টার শোভায়
অভিসার কি ক্ষান্ত আজ নব্য কাসানোভায় ?
তবুও এরা যৌবনের রংবাহার আলো
দুঃখে সুখে খাঁচায় জ্বালে, দেখেও লাগে ভালো।

যদিও নেই হেলেন, নেই মেহের উন্নিসা,
মহাশ্বেতা খোঁজে কালের অন্ধকারে দিশা,
এটাও ঠিক, নেই ট্রয়ের কাসান্দ্রার প্রাণ,
শাহীবাগের চেরাগও নেই বুলবুলের গান।
তাইতো কাঁচা বিশবাইশে শ্রাবণ-মেঘে বাহার
এরা ছড়ায়, বৃদ্ধ মন রঙিন তারই আভায়।
এরা মাতে না জীবন ফেলে মান-উন্নয়নে,
তাই এদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি দিবানিশা।
আশা রাখে না জীবিকা চেলে দিল্লী সরকারে,
কষ্ট ক'রে কলকাতায় আহত নন্দনে
একাত্মের মদির টানে কাটায় গুঞ্জনে
একান্তের মুক্তি চায় তীব্র দেহমনে,
মানে না দেশ অগ্নিগিরি হতাশ্বাস লাভায়
সর্বনাশ পায়ের নিচে, তাইতো সংসারে
অকুতোভয় স্বপ্ন পাতে, কটা মুখের আহার
জোগাতে হবে, ডরে না তাতে, চার চোখের আলো,
শ্রাবণাকাশে সন্ধ্যা জ্বলে, দেখেও লাগে ভালো,
এরা আমার শরীরী স্মৃতি, হৃদয় সন্ধানে
এরাই বুঝি বহু জরায় নবজীবন আনে ॥

সাদার রঙ

(মস্কোয় জানুয়ারি)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যেদিকে চাও সাদা আর সাদা
বাড়ির ছাত, গাছ-পাথর, রাস্তাঘাট।
ভাবছ বুঝি : এ বুঝি অক্ষমতা
সাদার উপর রঙ ফোটাবার ভার!
মোটেই নয়, যদি
যে-যার কাজ করে ;
বাউল গায় গান, জেলে মাছ ধরে,
ইঞ্জিনিয়ার বানায় পথ
কবি লেখে কবিতা—
রঙ ফোটাবার এ-সবই তো কাজ তা।

অনেক দূরে দেশ-ছাড়া এই আমি
সাদার মধ্যে আছি।
তবুও দেখি রঙের ছড়াছড়ি
পথে-ঘাটে আপিস কারখানায়
প্রাণের ব্যঞ্জনায়
জীবন্ত ফুলঝুরি।

এ-রঙ অদ্ভুত
এ-রঙ হল আসল স্বর্গ-দূত।
সবুজ আর নীল আর গোলাপী আর লাল
রঙ-সমুদ্রে নৌকো—হাজার পাল।

পারাঘষা আয়না

হেমেন্দ্রমোহন রায়

এই, চা। চায়ের বাটিটা ভবতোষের সামনে রাখল আরতি।

—ব্যথাটা কেমন আছে আজ? চোখ তুলে ভবতোষ জিজ্ঞেস করল।

—খুব। খুব বেশি।

ভবতোষ শুনল। কপালটা কোঁচকাতে হয়, কোঁচকাল। আরতির মুখ থেকে চোখ সরাল। সামনে দেয়ালটা নিরেট। হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোতে পাণ্ডুর। ভবতোষ চোখ রাখল।

—চা খেয়ে যাও না, চালটা নিয়ে এসো, বসে না থেকে।

ছেঁড়া সতরঞ্চিটা পাতল আরতি। তোশকটায় হাত দিল।

দেয়াল থেকে চোখ সরাল ভবতোষ। চায়ের বাটিটা সামনে টেনে নিল। বাটিটা গরম। একটু থাক, জুড়োক। কি রোগাই হয়েছে। এক বছর আগেও মোটাসোটা ছিল। গাল দুটো পুষ্ট। এখন মাড়িতে মিশে গেছে। নরেন ডাক্তার বলত, দু-দিন বলেছিল, ভালো চিকিৎসা করান ভবতোষবাবু, দেরি করলে আর বাঁচাতে পারবেন না। তিন টাকা ছ আনা পয়সা পাবে। এক বছর টাকাটা দেয়া হয় নি নরেন ডাক্তারকে।

ছোট্ট একটা চুমুক দিল চায়ের বাটিতে।

—ব্যথাটা কি থেকে থেকে ওঠে, না, সব সময়ই থাকে?

—আজ সকাল থেকে এক নাগাড়েই হচ্ছে, অসহ্য।

আরতি জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই দিল। কারণ এ রকম প্রশ্নের জবাব রোজ দিতে হয়।

—রোগটা তোমার ভালো নয়, বুঝলে, ভালো চিকিৎসা দরকার।

বালিশগুলি বিছানায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাখছে আরতি। কথা বলল না।

—আমি নরেন ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি, কাল এসে দেখে যাক।

নরেন ডাক্তার টাকা পাবে না তোমার কাছে, কত, তিন টাকা না চার টাকা?

—টাকা! এক পয়সাও না, সে দিয়ে দিয়েছি কবে, আমি তা ভাবছি না, ওর কাছে পঞ্চাশ টাকাও ধার রাখতে পারি, ভাবছি, একটা এক্স-রে করিয়ে আর সমীরবাবুর চিঠি নিয়ে কলকাতায় বোস সাহেবকে দেখিয়ে আসব কিনা?

—তুমি আগে নরেন ডাক্তারকেই ডাক না—

—নরেন ডাক্তারকে, তা মন্দ নয়, ওকেই বলে আসি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের পথ স্টেশন। স্টেশনের পাশে মন্মথর চায়ের দোকান।

দোকানে ঢুকে খবরের কাগজটা তুলে নিল ভবতোষ। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। শেষ বেঞ্চিটারও একেবারে কোণে গিয়ে বসল।

চালটা যে করেই হোক নিতে হবে। মাত্র তিন-চারটে টাকার জন্য নরেন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। ও কি এতদিন মনে রেখেছে? খাতায় লেখা আছে হয়তো। হয়তো আবার কি? নিশ্চয় আছে। খাতা খুলেই নামটা চোখে পড়ে। কিন্তু চালের কি হবে? প্রদীপটা আর এলই না। ও কি কিছু বুঝে ফেলেছে? কে জানে বাবা!

খবরের কাগজটা খুলল। কর্মখালি আর বিজ্ঞাপনের পাতাটা রোজই দেখতে হচ্ছে। এক বছর এমনি রোজ। ফ্যালা এক কাপ চা রেখে গেল। মন্মথর বয়। মুখ না তুলেও ভবতোষ বুঝল।

—একটু আগুন দিস তো। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ঠোঁটে চাপল। চারদিকে তাকাল। লোকজন বিশেষ নেই দোকানে। পকেট থেকে নোটবই বার করল, কর্মখালির বিজ্ঞাপন থেকে কি টুকল। তারপর বইটা পকেটে রেখে চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বুঝল চাটি কত গরম।

ফ্যালা আগুন দিয়ে গেল। প্রথম ধোঁয়াটা মুখ উপর দিকে করে ছাড়ল। টালির চালটা দেখা যাচ্ছে। পুরনো রংচটা টালি। লেবুর জল খেয়ে আগে ওর ব্যথাটা কমত। আজকাল আর তাও কমছে না। কমবে কেন? চিকিৎসা না হলে রোগ কমে? সন্তোষটা তেমনি আছে। তেমনি সাদাসিধে সরল। এত বড় অফিসার হয়েও একটু পালটায় নি। ওর অফিসের কাজটি প্রায় হবার মধ্যে। হবার মধ্যে কেন, হবেই। ওটি হয়েই যাবে। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি। তাছাড়া সিলেকশনও ওই করবে।

কিন্তু কতদিনে কে জানে? ওর চিকিৎসাটা এক্ষুনি দরকার, একেবারে এই এক্ষুনি।

—ভবতোষদা, আপনাকেই খুঁজছি, বাড়িতে শুনলাম ডাক্তারের কাছে গেছেন। প্রদীপ এসেছে। হাসছে। হাসিটা বিনয়ে ভরা! বুকের মধ্যেটা টিপ করে উঠল। কতক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, মনে মনে সময়টা হিসেব করল।

—তোমার বৌদির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাই একবার এলাম নরেন ডাক্তারের কাছ থেকে, কাল একবার আসতে বললেন। বল কেন, জ্বালাতন!

বিড়িটায় শেষ টান দিল। শেষটা ছুঁড়ে ফেললে টেবিলের নিচে। আর একটা বিড়ি বার করে ফ্যালাকে ডাকল।

—দে তো আর একটু আগুন দে দিকি, না, একটা দেশলাই-ই দে।

দিয়াশলাই দিয়ে গেল ফ্যালা।

—তারপর তোমার কি খবর বল তো, বোস। ভবতোষ বললে।

প্রদীপ বসল।

—মানে, সেই পোর্ট কমিশনারের ক্যানটিনের অর্ডারটা—চিন্তিত মুখে টেবিলে মুখ নামাল ভবতোষ! ভ্রূর মাঝখানটা আস্তে আস্তে কোঁচকাল! প্রায় একটা মিনিট অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ তুলল।

—একটা দরখাস্ত লিখে দাও, দেখি কি করা যায়, বড্ড দেরি করে ফেললে, নিজের কাজে আমিও ভুলে গেলাম।

—কাল সকালে পৌঁছে দেব ভবতোষদা।

—কাল কেন, আজই দিয়ে যাও, খুব সকালে বেরোব কাল, টন ত্রিশেক লোহা ডেলিভারী দিতে হবে ব্যারাকপুরে।

দমে গেল প্রদীপ।

—কাল নটার আগে টাকাটা পাব না ভবতোষদা।

—নটা! অনেক বেলা,—দিও, তাই দিয়ে যেও, টাকাটা না নিয়ে গেলে কাজ হবে না, তবে সুবিধে বুঝলেই ঠুকব, নয়তো ফেরত পাবে।

—দেখবেন যাতে হয়, বড্ড অসুবিধায় আছি ভবতোষদা। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল প্রদীপ।

—ভেবো না, দেখছি আমি।

প্রদীপ বেরিয়ে গেল। ভবতোষও উঠল। মন্মথর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, কত হয়েছে বলুন তো মন্মথবাবু?

মন্মথ তৈরিই ছিল। বললে, চার টাকা ছ আনা আজকেরটাও নিয়ে।

—ও হরি! আমি আবার ভাবলাম, কত হয়ে গেছে, কাল বেরোবার পথে না হয়—

—তা দেবেন, তবে সেই নগদ টাকা দুটো পেলাম না কিন্তু, আপনি ভুলেই যান।

—দু টাকা! হা-হা, সত্যি কি ভুল দেখুন, চান নি কেন? আপনিও যেমন!

কথা বলে না মন্মথ। মুখ ঘুরিয়ে একটা কাঁচের গ্লাস টেনে নেয়। রিক্সাওয়ালা রামকিশন চা চাইছে।

কেমন একটা লজ্জা! মন্মথর কাছ থেকে রাস্তায় পা বাড়াতে লজ্জা। কালই দিতে হবে। প্রদীপের টাকাটা পেলেই ওর সব হিসেব মিটাতে হবে। ওর এমন সুন্দর ধারণাটিও নষ্ট করা চলে না।

রাস্তার উপর দু পা এগিয়ে বুড়ো ভজহরির পান-বিড়ির দোকান। চোখ পিট্‌পিট্‌ করে ভবতোষ তাকায়। ভজহরি দোকানে নেই। এ সময় কবেই বা থাকে? এতক্ষণ শরণ কাহারের দোকানে বসে নির্ঘাত তাড়ি গিলছে। ছোটছেলে কানাই দোকানে বসে। পিঠ কুঁজিয়ে দেখছে আপন মনে। কি দেখছে? বাবা আসে কিনা, অথবা রাস্তার লোক? বাচ্চা ছেলের খেয়াল, কে জানে?

মনে মনে খুশি হল ভবতোষ। দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই পান-বিড়ি চায় না। ঠোঁটের ফাঁকে একটু একটু হাসে।

—আজ দেখি কানাই দোকানী, খুব শাস্তি দিয়েছে আজ বাবা।

কানাই হাসে না। বাপের মতো গম্ভীর হয়ে থাকে।

—শেখো ভাই, শেখো, বাবা আর কদিন, দাও বিড়ি দাও এক বাণ্ডিল, কালো সুতোরটাই দাও, কড়া না হলে হয় না আমার।

এক বাণ্ডিল বিড়ি দেয় কানাই।

—কত হয়েছে আমার?

—পাঁচ টাকা দু আনা। খাতা খুলে ঠিক ঠিক বলে দেয় কানাই।

—কাল সকালে দিয়ে যাব; বুঝলে।

খাতা রেখে রাস্তার দিকে চোখ ফেরায় কানাই।

কিন্তু পেছনে দাঁড়িয়ে ভজহরি অন্য কথা বলে।

—এত ধার রেখে মাল বেচতে পারব না আমি ভবতোষবাবু, লিবেন শুধু আর দেবার নাম করবেন না, আমি কি দোকান তুলে উপোস করব?

ভীষণ লজ্জা লাগে ভবতোষের। কানের মধ্যে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিচ্ছে ভজহরি। চারদিকে তাকায়। কাছাকাছি কেউ নেই।

পকেট থেকে বিড়িগুলি বার করে হাতে নিল।

—এত কথা শুনতে পারব না ভজহরি; রেখে দাও তোমার বিড়ি, চার বছর তোমার দোকান থেকে নিচ্ছি, না হয় পাঁচটা টাকা ধার পড়েছে।

ভজহরি দমে গেল।

—ও আমি ঘুরে লোবো কেনে, লিয়েছেন, পকেটে পুরেছেন, ও আপনি লিয়ে যান, গরীব মানুষ খেয়াল করে দিয়ে দেবেন পয়সাটা।

বিড়িগুলি আবার পকেটে ভরল ভবতোষ। স্টেশনের উল্টো দিকের রাস্তায় পা বাড়াল।

বুকের মধ্যে জ্বলছে। ভজহরির কথাগুলি খোঁচার মতো বিঁধছে। শালা—শয়তান! সময় দেখেছ শালা। খুব ডাঁট হয়েছে। যা মুখে আসবে তাই বলবে! কি হয় ওর দোকানে বিড়ি না খেলে? সন্তোষের চাকরিটি হবে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে নগদ পয়সায় কয়ালের দোকানে নেব। শালা তখন পায়ে ধরে সাধবে।

ভাবতে ভাবতে জ্বলুনিটা কমছে। আর ভাবতে ভাবতেই বুড়ো রামকনাইয়ের দোকানে এসে দাঁড়িয়েছে। বাপ-বেটায় দোকান চালায়। বাপ সওদা মাপছে বেটা পয়সা বুঝে নিচ্ছে। অন্ততঃ সের দশেক চাল নিতেই হবে। কিন্তু কি করে? কমসে কম কুড়িটা টাকা পাবে রামকানাই। উনোনে আগুন দিয়ে আরতি বসে আছে। পেট চেপে দুই হাটুতে মুখ গুঁজে আছে। উনোনটা সামনে জ্বলছে। মানব ঘুমিয়েছে। রুমাট্টা নির্ঘাত পুতুল খেলছে। কি অসম্ভব এক মনে পুতুল খেলে মেয়েটা! কানাইটা একমনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে। বাপের মতো শয়তান হয় নি এখনো। তবে আস্তে আস্তে হবে। রামকানাই আর কান্ত! সত্যি কি ওরা দেখতে পায় নি? পাচ্ছে না? সবাইকে দেখছে। কে কি নেবে জিজ্ঞেস করছে। আর শুধু আমাকে দেখতে পাচ্ছে না! রামকানাই তাকাচ্ছে না, একবারও

তাকায় নি। কান্তর চোখ দুটো ঘুরছে। ঘুরছে আর সযত্নে শুধু আমার মুখটা এড়িয়ে যাচ্ছে। সব দেখছে। আসলে ডাঁট হয়েছে শালাদের। চোখ তুলে আজ দেখতে চায় না। তার আগে? যখন চাকরি ছিল, এক বছর আগে? ঘাড়ে বয়ে চাল দিয়ে আসত ঘরে। আজ যদি চালটা না নিই? চলবে না? উনোনে আগুন দিয়ে আরতি বসে আছে। ভাত হলে রুমা খাবে। মানবকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াবে।

রামকানাইকে বলে না। কান্তকে ডাকে।

—অঃ কান্ত, দাও, আমাকে দাও দিকি এবার।

কান্ত মুখ তোলে।

—চালটা দিয়ে দাও আমাকে, সের দশেক দাও, রোজদিন আর বইতে পারি না। থলেটা এগিয়ে ধরে ভবতোষ।

কান্ত নিলে না। রামকানাই হাতে নিলে।

আর চাল মেপে থলেটা ভবতোষের হাতে ফিরিয়ে দিলে।

—ভবতোষবাবু, চাল দশ সের ছটাকা বারো আনা।

কান্ত তৈরি ছিল। বললে, আগেরটাও দিয়ে ফেলুন না ভবতোষদা, অনেক জমে গেছে।

—ধার নিয়েছি দেব বই কি, সবই দেব, কত হয়েছে বল?

হিসেবের খাতাটা হাতে তুলে নিল কান্ত। আর ঠিক তখনি হিন্দুস্থানী রিক্সাওয়ালা রামকিশনের মেয়েমানুষটা এসে দাঁড়াল। রামকানাইকে নয়, সোজা কান্তকে তাড়া লাগাল।

—দাওনা দোকানী, বসে থাকলে কেন?

—কি নিবি বল, এই তো এলি, একটু থাক।

—রোজ রোজ আমি কত বলবে, তুমি জানে না বুঝি, আটা দাও, ডাল দাও, তেল দাও—

ভবতোষ দেখছে। কান্তর চোখ দুটো দেখছে। আর মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল রামকানাই!—ওখানে কি রে ছুঁড়ি, এখানে এসে বল কি নিবি।

মেয়েটা তাকাল। শুধু চোখ তুলল। একটু নড়ল না।

বেড়ে আছে তো ছোঁড়া! বেড়ে জমিয়েছে! তাহলে এক্ষুনি। এই সুযোগে! উনোনে আগুন দিয়ে আরতি বসে আছে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে ধুঁকছে।

কান্তর কোলের উপর খোলা পড়ে আছে হিসাবের খাতাটা। মুখ ঘুরিয়ে ভবতোষ তাকাল। ঠিক উল্টো দিকে পরেশ কুণ্ডুর গাঁজা আফিংয়ের দোকান। ঐ তো রয়েছে রঞ্জিত। একশো পাওয়ারের বাতিটা নেভানো। নির্ঘাত কারবার চলছে।—আরে এই, এই রঞ্জিত শোন, শোন—

ভবতোষ পা বাড়াল। প্রায় দৌড়াল।

আর রামকিশনের মেয়েমানুষটা কান্তকে তাড়া দিল।—জল্‌দি দাও না গো দোকানী, আমি কি অখন এয়েছি ?

ভবতোষ শুনল আর রাস্তাটা পেরিয়ে গেল।

কিন্তু এখানেও মুস্কিল! আবছায়া আলোতেও ভবতোষ চিনল। দিনের বেলায় অন্ধ সেজে ভিক্ষে করে যে ছুঁড়িটা হঠাৎ সে এক পলক দেখে ফেলল ভবতোষকে! আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ উলটাল! বাঁ হাতটা কাপড়ের নিচে টানল।

মনে মনে ও কি এখন গালমন্দ দিচ্ছে? নির্ঘাত দিচ্ছে। মুণ্ডুপাত করছে। ভীষণ হাসি পাচ্ছে। করবে নাই বা কেন? রাতের অন্ধকারেও একটু চোখ মেলে চাইতে পারবে না মানুষের যন্ত্রণায়! ঢেলাটা নির্ঘাত পাচার করতে পারে নি ছুঁড়িটা। নয়তো বাঁ হাতটা কাপড়ের নিচে লুকোবে কেন? বেড়ে আছে রঞ্জিত ছোঁড়া! বেড়ে কামাচ্ছে!

পরেশ কুণ্ডু বললে, ভবতোষবাবু যে, থলেতে কি আনলেন? ভবতোষ হাসল।

—আমরা আর কি আনব, হয় চাল, নয়তো বাজার, এতে চাল আছে। ভাল লাগছে। সারা সন্ধ্যে মনটা খিঁচিয়ে ছিল। কিন্তু এখন ভাল লাগছে। এই মানুষগুলিকে দেখে লাগছে। জলুনিটা কমছে।

—চলুন আপনাকে দিয়ে আসি ভবতোষদা, রঞ্জিত বললে।

—তা চল। বাঁ হাতে গলিটা সর্টকাট। দুজনে পা বাড়াল।

আর বাড়ি এসে দেখল ধার করে চাল এনে আরতি ভাত রেঁধেছে। খেয়ে ঘরে এসে চালটা তুলে রাখল আরতি। একটা ওষুধ কোম্পানির ক্যাটলগ খুলে বসেছে ভবতোষ।

—বাজার আনলে না যে, কাল খেয়ে যাবে কি, ডাল ছাড়া কিছু নেই ঘরে।

—কি করে আনব, ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরতেই তো আটটা বাজল, রাত আটটায় কে বাজার সাজিয়ে বসে থাকবে?

চাল রেখে আরতি বিছানায় ঢোকে। আর ঠিক পেছনে ভবতোষ ঢোকে। গেঞ্জিটা খুলে রাখে শিয়রে। বিড়ি দিয়াশলাই রাখে।

মানবের গায়ে পা তুলে দিব্যি ঘুমুচ্ছে রুমা।

ওদের ঠিক করে শুইয়ে দিল।

—লেবুর জল খেয়েছিলে ?

—হুঁ-উ। কমে নি।

—না কমুক, শোন, নরেন ডাক্তার কি বললে জান ? ভবতোষ হাসে।

—তুমি না ডালভাত খাব কি করে বলছিলে, সে সেই ব্যবস্থাই দিলে।

—মানে ?

—মানে, মানে মাসে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা তোমার চিকিৎসায় লাগবে, ডালভাত খাব না তো খাব কি ?

—কাল দেখবে এসে বললে ?

—সে এক কাণ্ড, বললাম কাল এসে দেখুন, তা সে আসবে না কিছুতে, বললে রোগ আমার জানা, কাল এসে ওষুধ নিয়ে যাবেন। আরতি কথা বলে না। চুপচাপ চোখ বুজে থাকে। কিন্তু ভবতোষ শুনতে চায়। কিছু একটা শুনতে চায় আরতির মুখ থেকে। কিছু না শুনলে সে শান্তি পাচ্ছে না!

—চুপ করে রইলে যে ?

—কি বলব ?

—বলবে, মানে, খাবে তো, না শিশিতে পচবে ওষুধ ?

—না, আর পচলে চলবে না, ব্যথাটার নমুনা ভাল নয়।

আরতিকে আরো একটু কাছে টেনে নেয় ভবতোষ।

রাত বাড়ে। বাইরেটা নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে আসে। আর কান পেতে ভবতোষ শোনে। কি বিশ্রী শব্দ হচ্ছে আরতির গলায়! নিশ্বাসে কি কষ্ট হচ্ছে ওর ? একটু হয়তো ঘুমিয়েছে। বালিশের নিচে থেকে একটা বিড়ি বার করে। দিয়াশলাই জ্বেলে বিড়টা ধরায়। আর সেই আলোতে আরতির মুখটা দেখা যাচ্ছে। ঠিক এমনি একটা মুখ! এমনি মাড়িতে মিশে যাওয়া গাল! কালো গর্তের মধ্যে বোজা চোখ। কিন্তু কার, মনে পড়ছে না।

চোখ সরায় ভবতোষ। কাঠিটা জ্বলছে। নিভিয়ে দেয়। হ্যারিকেনটায় কালি পড়েছে। টিকটিকিটা আজো এসেছে। এই এত রাতে আঁধার

খুঁজছে। আরতির গলায় শব্দ নিশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে ওর। নড়ছে। ঘুমটাই ভেঙে যাচ্ছে।

ভেঙেই গেল! হাত বাড়িয়ে ভাবতোষের হাতটা টেনে নিল। বুকের মধ্যে চেপে ধরল।

মাত্র একটা বছর! শুকিয়ে গেছে। আমি কি পারি না? এই মেয়েটাকে বাঁচাতে পারি না? কি ভাবছে ও? এই এখন কি ভাবছে? আমার বুকের কাছে মুখ রেখে হয়তো আমাকেই বিশ্বাস করছে না! বড় মাসির মেয়ে, মনে পড়েছে! আরতির মুখের মতো মুখ মনে পড়েছে। বাচ্চা হয়ে সূতিকা হয়েছিল। অনেকদিন ভুগে মরেছিল।

রঞ্জিত কি সত্যি চাকরি চায়? চাকরি পেলে এ সব ধান্ধা ছেড়ে দেবে, কথাটা কি সত্যি? শিষ্য দুটো ভালই পেয়েছে, বিশেটা গোঁয়ার। গোঁয়ার আর রঙবাজ। কিন্তু কেতুটা ভাল ছিল। আর ও নিজে? কিছু খারাপ ছিল না। পুলসাপুরের মিত্তির বাড়ির ছেলে। একদিন নামডাক ছিল পরিবারটার। আর আজ গাঁজা-আফিং করে বেড়াচ্ছে। হাসি পাচ্ছে। ওর কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। পাচ্ছিল। কেন পাচ্ছিল? কেন পাবে! আমি কেন হাসব! একটা বছর যা করেছি, করছি, যা করে সংসার চালাচ্ছি, তা কি এ থেকে ভাল? এ থেকে? রাতটা কী নিস্তব্ধ! এখন রাত কত? নিশ্চয় অনেক। ঘুম আসছে না কেন তবে? মাথাটা ধুয়ে আসব কি?

ছাদের কার্নিশে পাখি ডাকছে। নিস্তব্ধতাটা ভেঙে টুকরো হয়ে গেল।

ঠিক নটায় পঁচিশটা টাকা আর একটা দরখাস্ত দিয়ে গেল প্রদীপ।

আর স্নান-খাওয়া সেরে তৈরি হতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। চারটে করে পয়সা দিল রুমা আর মানবকে। ভাঙা আয়নায় মুখ দেখল। আয়নার মধ্যে মুখটা ভাঙা দু টুকরো, মাঝখানটা জোড়া দেয়া। বিশ্রী! বিশ্রী! সরে এল ভবতোষ।

ঠিক পেছনে আরতি দাঁড়িয়ে।

—ব্যথাটা কেমন? ভবতোষ জিজ্ঞেস করলে।

—ভাল না, নমুনাটা ভাল লাগছে না আজ, কেমন খিঁচ ধরে উঠছে, শীগ্‌গির এস।

—আসব, খুব বেশি কাজ নেই, টন্ ত্রিশেক লোহা ডেলিভারী দেব, চলে আসব, লেবুর জল খেও একবার, বুঝলে?

কথা বলে না আরতি।

রাস্তায় পা বাড়ায় ভবতোষ। স্টেশনের পথে মন্মথর হিসেবটা মেটায়। ভজহরিরটা মেটায়। নূতন ধারের হিসেবে এক প্যাকেট ভালো সিগারেট নেয়। কালো সুতোর এক বাণ্ডিল বিড়ি নেয়। একটুমাত্র দূরে রামকানাইয়ের দোকান। বিড়ি-সিগারেট পকেটে ভরতে ভরতে রামকানাইয়ের দোকানটা তাকিয়ে দেখে!

বারোটা পঁচিশের আগে আর গাড়ি নেই। একখানা খবরের কাগজ নিল। টিকিট নিল।

প্ল্যাটফর্মের একেবারে সামনেটা ফাঁকা। একটা সিগারেট বার করল। দিয়াশলাই হাতে নিতে প্যাণ্টের দিকে চোখ পড়ল। হোক পুরনো, প্যাণ্টটা ভালো। কাপড়টা ভালো আর দামী। ছিঁড়লে এখন আর করাই যাবে না। তখন কি সহজে পারতাম। ইচ্ছে হলেই করতে পারতাম জামাকাপড়। সত্যি কি সহজ। কি সহজ আর কি স্বাভাবিক একটা জীবনধারা! সত্যি কি নিজের দোষে হারিয়েছি? যা করেছি তা কি সত্যি বাড়াবাড়ি? আরতি বলে। ওর বাবা-মা আড়ালে বলে। বোকা আর গোঁয়ার বলে। হয়তো তাই। অতটা 'এগুনো সত্যি ভুল হয়েছে। আজ যদি সাহেবকে বুঝিয়ে বলি? যদি কথা দিই। খুব কি অন্যায় হবে? বেইমানী হবে?

—ভবতোষদা, আপনাকেই খুঁজছিলাম।

ভবতোষ চমকাল। ঠিক পেছনে বিশে দাঁড়িয়ে। বুকটা উঠা-নামা করছে, কাঁপছে। চমকাল! বিশে কিছু ভাবলে কি! কি আর ভাববে? খেয়ালই করে নি।

—কি ব্যাপার, খুঁজছ কেন?

—খুঁজছি, মানে, রঞ্জিতদা আজই চলে যাচ্ছে, চাকরি পেয়ে—

—চাকরি! কোথায়?

—ধানবাদ, রেলের ওয়ার্কসপে।

কে দিলে করে?

—কে, ওর মেসো না কে আছে ওখানে, বড় কাজ করে।

আমার নেই। কেউ নেই কোথাও। শুধাংশুদা, বড়মামা! কখনো দেবে না। পুলিশের অফিসার, আমাকে চাকরি দেবে না, কিছুতে না। সব ভেঙে বললে, বুঝিয়ে বললে? বিশ্বাস করবে না।

—আমি কি বলছিলাম ভবতোষদা, মানে রঞ্জিতদা চলে গেল, আমাদের একটু মুস্কিলে পড়তে হবে, সাহস আমাদের আছে, কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধি কি আছে জানেনই, তাই বলছিলাম, বিদ্যেবুদ্ধিওয়ালা একজন মাথার ওপর না থাকলে এ সব কাজ চলে না কিনা—বিশে চুপ করল।

—তাই কি ? সোজা বিশের মুখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল ভবতোষ।

—তাই বলছিলাম, মানে লোহার দালালি করে কিছু পান না ভাবছি না, তবে দিনকাল ভালো নয়, তাই, বসে বসে মাসে তিনশো টাকা কামাতে পারতেন—

ভবতোষ দাঁড়িয়ে গেছে একটা জায়গায় এসে! সেখানে তিনশো টাকাও পৌছাতে পারে না!

—ও থেকেও বেশি পাই, বুঝলে বিশু। খুব ভুল জায়গায় হাত বাড়িয়েছ। ভবতোষ দাঁড়ায় না আর।

ডিসটেণ্ট সিগন্যালে গাড়ি দেখা যাচ্ছে। ভবতোষ পা বাড়ায়। পা বাড়ায় আর শোনে।

—কত যে পান সে তো দেনা আর চালবাজির বহর দেখেই বুঝতে পারছি।

কি অনায়াসে বললে! মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত না। মাথার মধ্যে জ্বালা হচ্ছে। বুকের মধ্যে জ্বলছে। শুয়োরটার মুখ ভেঙে দিলে ভালো লাগত। জ্বলুনিটা কমত।

গাড়ি দাঁড়িয়েছে এসে। উঠল। ভেতরের বেঞ্চিতে জায়গা আছে। বসল। সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতগুলি টেনে তুললে ভালো লগেত। ভবতোষ চাটুজ্যে চালবাজ! সিগারেটটা হাতে রয়েছে। ঠোঁটে চেপে দিয়াশলাই জ্বালল। বুকপকেট থেকে টাকাটা প্যান্টের পকেটে ভরল। মাত্র দশটা টাকা আর আছে! বড় জোর একটা মাস সময় পাওয়া যাবে। আজ-কাল বলে একটা মাস ভুলিয়ে রাখা যাবে প্রদীপকে। তারপর দিতেই হবে। যে করেই হোক ওর পুরো পঁচিশটা টাকাই ফেরত দিতে হবে। দেনা আর চালবাজির বহর! বিশে বলে। ওদের দলে ভর্তি করতে চায়! কেন চাইবে না? আমি কি করব! আমি তাহলে কি করব? আরতি রুমা মানব আর আমি। আর চারদিকে এই মানুষ আর দুনিয়া, এর মধ্যে আমি কি করব?

দুই আঙুলে মাথাটা টিপে ধরল। ঝিমঝিম করছে। জামার নিচে শরীরটা কি অসম্ভব ঘামছে। একটু আগেও ঘাম ছিল না। সন্তোষের চাকরিটা হতে পারে, হবেই। দু আঙুলের মধ্যে সিগারেট জ্বলছে। আস্তে আস্তে মুখ তুলল।

নিশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। আঙুলে সিগারেটটা জ্বলছে। কেন জ্বলবে! কেন জ্বলবে? সিগারেট কেন জ্বলবে? একটা মুহূর্ত না, আর একটা মুহূর্তও না। সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ল! পকেটে হাত দিয়ে প্যাকেট চেপে ধরল! মাথার মধ্যে জ্বলুনিটা কমছে। ঝিমঝিম ভাবটা কমছে। আরো জোরে চাপল। মুঠির চাপে হাত কাঁপছে। জ্বলুনিটা আরো কমছে। জামার নিচে ঘামটা মরে আসছে। একেবারে মিলিয়ে দেয়া যায় না এই প্যাকেটটাকে। একটা চাকরি! আরতি রুমা মানব, একটা জীবনযাত্রা, কি সুন্দর আর সহজ! বিশে থামবে। মাটির দিকে চেয়ে কথা বলবে। ঘাড়ে বয়ে চাল দিয়ে আসবে কান্ত।

গাড়িটা আবার থামছে। জানালায় চোখ তুলল ভবতোষ। হাওড়া।

বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবল। দুটো জায়গা মাথার মধ্যে ঘুরছে। সন্তোষ আর এমপ্লয়মেণ্ট অফিস। এমপ্লয়মেণ্ট অফিস! জব্বর নামটা বার করেছে! যে শালা করেছে শালার মাথা আছে! চাকরি যাবার সময় আটকাতে পার নি, এখন দেবে চাকরি করে! শালা বুজরুকের আখড়া!

কিন্তু কোথায় আগে? ভাবতে ভাবতেই বাসে উঠল। আর ডালহাউসী এসে ঠিক করল, আগে সন্তোষ।

পোস্ট অফিসের ঘড়িতে দুটো বাজে। ভবতোষ পা বাড়াল। ডালহাউসীর একটা দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে বাংলা দেশের ভাগ্যবিধাতা! ভবতোষ এগুল। আর অসংখ্য সিঁড়ি, অগুন্তি দপ্তর আর বারান্দার অরণ্য ঠেলে এসে দাঁড়াল।

সন্তোষের আর্দালিটা ওকে চেনে। সাহেব বাইরে গেছে, বললে।

—কখন আসবে?

—আপনি বসুন, নয়তো একটু ঘুরে আসুন, খুব দেরি হবে না।

তাহলে ঘুরেই আসা যাক্। একটু চা খেয়ে আসা যাক। নিচে নেমে বাঁ হাতে স্টাফ ক্যানটিন। সিঙ্গাড়াগুলি সস্তা, চার পয়সায় খুব বড় বড়।

কিন্তু সন্তোষের ফিরতে দেরি হল। চা খেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে

প্রায় সাড়ে তিনটেয় সন্তোষের দেখা পেল। সন্তোষ বললে, ওখানে একটা লোক নিয়ে নিলে সেক্রেটারি নিজে, যাক ভেবো না তুমি, আমি দেখব, আবার এস :

সন্তোষ বলছে! মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। ঠিক সামনে সন্তোষের মুখটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সামনে উজ্জ্বল সাদা দেয়ালে অসংখ্য কালো ছোপ। নড়ছে, ঘুরছে, নাচছে

দুই হাতে মাথা রেখে টেবিলে মুখ নামাল ভবতোষ।

—একটু চা খাবে? সন্তোষ জিজ্ঞেস করলে।

—না, একটু জল দাও তো।

কলিং বেল বাজল। আর একটু পরে জল এল। বেলজিয়াম কাঁচের নক্সা-কাটা গ্লাস। ভবতোষ খেল। নোনতা নোনতা জল, প্রায় সবটা খেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়াল।

—আবার এসো, সন্তোষ বললে।

—আসব।

বাইরে বারান্দার সিঁড়ির মুখে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে। কিছু বলবে এমনিভাবে তাকালে। বললে, আপনার নাম ভবতোষ চ্যাটার্জী না?

—হাঁ, কেন বলুন তো?

—কি বলব! পরীক্ষায় আপনি প্রথম হয়েছিলেন, ইণ্টারভিউতেও তাই, কিন্তু দাস সাহেবের শালা ছিল ক্যানডিডেট, তাই আপনার হল না।

—কার শালা! সন্তোষের?

—হ্যাঁ মশাই, বলছি কি তবে, আপনি ছাড়বেন না, সেক্রেটারিকে লিখুন, পরীক্ষার খাতাগুলি আবার দেখতে লিখুন, ও ছোঁড়া তো মশাই ফেল করেছিল।

ঠিক পায়ের সামনে সিঁড়িটা নেমে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে ভবতোষ পা বাড়াল। আর মনে মনে সময়টা হিসেব করল। সোজা হাওড়া যেয়ে গাড়ি ধরলে সন্ধ্যায় পৌছান যায়।

প্রায় ঠিক ঠিকই পৌছাল। মন্মথর চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চা চাইল। কোনের বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন থেকে কি টুকল। নোট বই পকেটে ভরে একটা বিড়ি ধরাল।

প্রদীপের টাকার মাত্র এটা অবশিষ্ট আছে। বড়জোর দুটো দিন চলবে। কিন্তু তারপর? তারপর আবার খুঁজতে হবে ধার চাইবার মানুষ। কিন্তু কার কাছে চাইব? একটা মুখ মনে পড়ছে না। একটা নতুন মুখও না। এভাবে চলবে কেন? সন্তোষটা কি সাংঘাতিক ব্লাফ! আস্ত শয়তান! কিন্তু, কি করব? কটা মুরগি পাললে হয় না? নয়তো, নয়তো কিছু চা এনে যদি বাজারে বেরনো যায়?

ভাবতে ভাবতে উঠল। আরতি তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে। ব্যথাটার ধরন ভালো নয়, খিঁচ ধরে উঠছে, বলছিল। প্রদীপ এসে পড়তে পারে। পঞ্চাশটা কথা বানিয়ে বলতে হবে। দায় পড়েছে বলতে! এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি।

সোজাই বাড়ি এল। আরতি নয়, দরজা খুলল রুমা। ভবতোষকে দেখে কেঁদে ফেলল।

—কি হয়েছে রে, কাঁদছিস কেন? ভবতোষ কোলে তুলে নিল। বাঁ হাতে পকেট থেকে বিস্কুটের প্যাকেটটা বার করে দিল। রুমা দেখল, কিন্তু হাতে নিল না। বরং কান্নাটা আরো বেড়ে গেল। আর পাশের ঘর থেকে গোঙানির শব্দটা কানে এল।

সারা দিনে তিনবার লেবুর জল খেয়েও কিছু হয় নি। দুপুরের দিকে বিছানা নিয়েছে আরতি। রাতের রান্নাও হয় নি। পারে নি।

প্যাণ্টের পকেট থেকে লিভার কিওরের শিশিটা বার করে তাকের ওপর রাখল। প্যাণ্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরল। জামা ছাড়ল। গেঞ্জিটা গায়েই রইল।

আরতির পাশে বসে মুখ নামিয়ে ডাকল। আরতি তাকাল, দেখল। কিন্তু কথা বলল না। আবার চোখ বুজে চুপ করে রইল। চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা, অস্পষ্ট আলোতেও ভবতোষ দেখল। হাড়-উঁচনো গালটা দেখা যাচ্ছে। ভবতোষ গাল ঠেকাল। আর প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করল গাড়ির হকার ছোকরার কথাগুলি!—পেটের যে কোনো ব্যথায় লিভার কিওর মন্ত্রের মতো কাজ করে। অম্ল-অজীর্ণ, পিত্তশূল বা অম্লশূলে লিভার কিওর অব্যর্থ। অনেক পয়সা খরচ করেও যারা পেটের ব্যথায় আজো কষ্ট পাচ্ছেন তাদের একটা মাত্র ফাইল ব্যবহার করতে অনুরোধ করছি।

তাহলে বৃথা চিন্তা করে লাভ নেই কিছু। শুধু সময় নষ্ট।

—রতি শোন, তোমার ওষুধ নিয়ে এসেছি নরেন ডাক্তারের কাছ থেকে, দেব ? দেব এখন ?

প্রাণপণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপল আরতি। কিছু বলল না।

এক দাগ লিভার কিওর খাইয়ে পাশের ঘরের দিলীপকে ডাকল ভবতোষ। সম্পর্কে দিলীপ ওর ভাই। ওদের ঠাকুরদার বাবারা সহোদর ছিল।

দিলীপ এলে একটা বাটি আর দুটো টাকা দিয়ে একসের গরম দুধ, আধসের চিনি আনতে বললে।

বিছানায় শুয়ে আরতি ডাকল।

—রুমাকে নিয়ে তুমি খাওগে, ওবেলার ভাত আছে হাঁড়িতে, ডাল আছে, আলুভাতের খোসাটা ছাড়িয়ে নিও, আমি উঠতে পারছি না।

—না, না, তুমি উঠবে কি! দুধ আনতে দিয়েছি, খেয়ে একটু ঘুমোও।

একরাশ পুতুল নিয়ে বসেছে রুমা। হ্যারিকেনের অপ্রচুর আলোতে কি মনোযোগ দিয়েই খেলছে।

দুধ আর চিনি রেখে গেল দিলীপ। বাড়ির মধ্যে এই ছোঁড়াটা তবু একটু কথা শোনে। এই বিরাট বাড়িটায় কত মানুষ বাস করে! লোকজনরা বলে, পুলনাপুরের চাটুজ্যে বাড়ি, পুরনো বনেদী ঘর! আশ্চর্য, কেউ কাউকে চিনতে চায় না আজ! যারা ভালো আছে, মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

ভাবতে ভাবতে খেতে বসল ভবতোষ। বুকটা দুমড়েমুচড়ে একশেষ হচ্ছে। ভালো চিকিৎসা করান ভবতোষবাবু, দেরি করলে আর বাঁচাতে পারবেন না—ভীমরুলের মতো কথাগুলো ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! মাথাটা ঝিম-ঝিম, বুকটা খালি, কি অসম্ভব ফাঁকা! আমি পারছি না, আমি আর পারছি না। কি চাইছে? নরেন ডাক্তারের এই কথাটা কি চাচ্ছে? উদ্ধত আক্রোশে ও কি হিসাবনিকাশ করতে চাচ্ছে! তাহলে আমি কি করব? ভোরেই ডাক্তার ডাকতে হবে। অন্তত একশোটি টাকা চাই। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চাই। আর না। আর পারব না। এই মেয়েটার ভালবাসার কাছে, ওর বিশ্বাস আর নির্ভরতার কাছে আমি আর ঋণ গ্রহণ করতে পারব না। ভাত খাওয়া এগুচ্ছে না, খেয়াল হল। সুতরাং খেতে মন দিল।

আজই সকালে স্টেশনে বিশে বলছিল। বসে বসে তিনশো টাকা! আবার হাত থেমে গেছে ভাতের থালায়। থেমে আছে। থেমে রইল,

একটা মুহূর্ত রইল! তারপর চলল, বেশ জোরে চলল। একটা পথের সন্ধান তো বটে!

খেয়ে ঘরে এসে আর একবার আরতিকে লিভার কিওর খাওয়াল। দুধ খাওয়াল। এক গ্লাস জল রাখল শিয়রে। তারপর বিড়ির কৌটো আর দিয়াশলাই নিয়ে ঢুকে পড়ল মশারির মধ্যে। রুমাটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। জামাটা খুলল। নিজের গেঞ্জি খুলল। আর অর্ধশায়িত হয়ে একটা বিড়ি ধরাল। হয়তো লিভার কিওরের অব্যর্থ ক্রিয়ায় আরতির ব্যথাটা কম আছে! চুপচাপ শুয়ে আছে আরতি।

হয়তো একটু ঘুমিয়েছিল ভবতোষও। আরতি ডেকে তুলল।

—ওঠ না, আমি আর সইতে পারছি না।

ভবতোষ উঠে বসে। ব্যথার জায়গাটা হাতে চেপে ধরে। ঠেলে ঠেলে কি একটা উঠছে! একটা দলা মতন কি!

—আর একবার ওসুধটা খাও রতি।

আরো একবার লিভার কিওর দেয় ভবতোষ। আরতি শান্ত হয় একটু। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ভবতোষ। আঙুলগুলি টেনে দেয়। হাতটা টিপে দেয়। কুঁচকে-যাওয়া বুকে হাত বুলোয়।

—আমি কি আর বাঁচব না?

চমকে ওঠে ভবতোষ। কুঁচকে-যাওয়া বুকের মধ্যে আঙুলগুলি কেঁপে ওঠে।

—কেন, কেন বাঁচবে না তুমি, ওসুধ খাও, ভোরে বড় ডাক্তার আনব, জগদানন্দবাবুকেই আনব আমি।

—তাই কর, খুব বড় ডাক্তার আন, খুব দামী ওসুধ দাও।

বাইরে মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার গাড়ি যাচ্ছে। দূরে-অদূরে মিলের সাইরেন বাজছে। আর ঐ শব্দের সঙ্গে অভ্যস্ত নিয়মে পাখিগুলি ডেকে উঠল।

আরতির পিঠে হাত বুলচ্ছিল ভবতোষ।

—রুমার জামা প্যাণ্ট সব ছিঁড়েছে, কাল এন তো, যখন ডাক্তার ডাকতে যাবে, আর পারলে একখানা কাপড় এন, কাপড়ের হাল দেখেছ আমার?

—আনব। জানলায় চোখ রেখে ভবতোষ বললে।

পুব আকাশটা জবাফুল। নীল আকাশ আর সাদা পাতলা মেঘের ওপর

রক্তের ছিটে! ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের আলোটা চাপা পড়ে যাচ্ছে দিবালোকের সূচনাতেই।

থাক না যা জেনেছে তাই নিয়ে। ও জানুক ওর ভালবাসা, ভালবাসা আর বিশ্বাসের পুরো দাম মিটিয়েছি আমি। এই বিশ্বাস নিয়ে ও বাঁচুক অথবা মরুক। বিশ্বাসই তো জীবনের একমাত্র অবলম্বন। একমাত্র সান্ত্বনা। সেখান থেকে আরতিকে সরিয়ে এনে লাভ নেই। তাতে দুঃখই বাড়বে। ও বাঁচবে না। মন বলছে ও বাঁচবে না। ওকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি?

ব্যথাটা আবার বাড়ছে। মাথাটা এপাশওপাশ করছে আরতি। ছটফট করছে। আর দেরি নয়। সবটাই এখনো অনিশ্চিত!

দিলীপকে ডেকে বসিয়ে ভবতোষ বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এল নরেন ডাক্তারকে নিয়ে। জগদানন্দবাবুকে পাওয়া যায় নি।

নরেন ডাক্তার রোগী দেখল। ইনজেকশন করল। প্রেসক্রিপসন লিখে ভবতোষের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আর বাইরে এসে ফিসের টাকাটা পকেটে রেখে বলল, পেটের মধ্যে এবসেসটা ফেটে গেছে, বেশিক্ষণ আর নেই। তবু চেষ্টা করুন, ওষুধটা নিয়ে আসুন।

আরতির বিছানায় ফিরে এল ভবতোষ। আরতি এতক্ষণ চেপে ধরতে দিচ্ছিল। এখন আর ব্যথার জায়গায় হাত ছোঁয়াতে দিচ্ছে না। দম খিঁচছে। শরীরটা ধনুকের মত বাঁকাচ্ছে। ও কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? চোখ মেলছে না। একবারও দেখছে না। আমাকে না। রুমা আর মানবকে না। ওর রুমা, ওর মানবকেও না। চোখের কোণে জল গড়াচ্ছে। ঐ জলের সঙ্গে কি ওর ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাগুলি গলে গলে পড়ছে! কিন্তু কি হল!

ভবতোষ দেখছে। দেখছিল। ভবতোষ দেখল।

শরীরটা আর বাঁকাচ্ছে না আরতি। দম খিঁচছে না। আরতি শান্ত হয়ে আসছে। শান্ত আর স্থির!

······আরো একবার ভাবল ভবতোষ। গন্ধটা পেতে পেতে, শব্দটা শুনতে শুনতে আর ধোঁয়াটা দেখতে দেখতে ভাবল। মনে পড়ছে। দশ

বছরের একটা অতি চেনা গন্ধ! আরতির গায়ের গন্ধ। আর এমনি শব্দ হত, এমনি পটপট। উনোনে আগুন দিলে হত। সকাল সন্ধ্যায় আরতি আগুন দিত। রুমাকে ডাকত, ঘরের জানালাগুলি সব খুলে দে তো রুমা। তারপর মুখ ঘোরাত, চোখ তুলত, তোমায় রোজ বলছি একটা আলগা উনোন আনতে, কোনো খেয়াল নেই।

ভবতোষ ভাবছে, দেখছে, শব্দ গন্ধ ধোঁয়া। এমনি পট পট শব্দ আর এমনি ধোঁয়া, কেমন একটা গন্ধও, উনোনে আগুন দিলে। ঐ কাঠ আর ঐ অঙ্গার দেহটা ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে, শব্দ হচ্ছে।

পকেটে হাত দিয়ে নাড়ল। বিশের দেয়া নোটগুলি নাড়ল। এমনি ধোঁয়া উঠবে! উঠবে! কাগজ পুড়লে ওঠে! এগুলি কাগজ! খস খস শব্দ হচ্ছে। কি নতুন, নতুন আর মসৃণ, এই নোটগুলি! নাড়তে কি ভাল লাগছে! কে জানে, সবেমাত্র কারেন্সি থেকে বেরিয়ে এসেছে হয়তো! পকেট থেকে হাত টানল ভবতোষ।

আগুনের পরশমণি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মানুষের জীবন এগিয়ে চলে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। যারা সচেতন-ভাবে বৃহত্তর জীবনের পথ বেছে নিতে চায় তাদের বেলায় সংঘাত হল অনুক্ষণের সাথী। তাই বুঝি কিছুদিন পরেই প্রিয় সঙ্গীর সঙ্গে তীব্র মতান্তর শুরু হয়। আমার ওপর তখন অধ্যাত্মবাদের প্রভাব খুব বেশি। বাড়িতে দাদার আমন্ত্রণে নানা আশ্রমের সন্ন্যাসীরা এসে সময়ে সময়ে অতিথি হন। দাদার সঙ্গে তাঁদের শাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। কখনও বা হয় তুমুল তর্কবিতর্ক। তার অনেক কিছুই বুঝতে পারি না, তবু মনে কিছু কিছু রেশ থেকে যায়। সেগুলিকে নিজের ধারণার রঙে রাঙিয়ে নিতে চাই। সেই সময়টা হিন্দু মিশন থেকে পার্থসারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণের একখানা ছবিকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সেটি ছিল বংশীবাদন ননীগোপালের বদলে শঙ্খচক্রধারী বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি। নিচে লেখা ছিল "অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারী।" সেদিন অনেকের কাছেই তা সংগ্রামী চেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমিও ছিলাম তার একজন। সন্ধ্যায় নির্জন রুদ্ধদ্বার ঘরে বসে সে মূর্তিকে ধ্যাননেত্রের সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম। শশাঙ্ক এই সব কিছুকে হানত বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত। সে মোটেই অধ্যাত্মবাদী নয় এবং অন্তর্মুখীনতাকে উপহাস করে। ফলে আর আগের মত বন্ধুর সামনে মনের কপাট উন্মুক্ত করে ধরতে ইচ্ছা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে না বটে কিন্তু বিরোধ বেড়ে চলে আরো এক কারণে। শশাঙ্ক সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে অনিচ্ছুক। তার দেশসেবার কাজ সমাজ-সংস্কারের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়। ফলে ধীরে ধীরে পরস্পরের সাহচর্যে ভাঁটা পড়ে। আবার নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করি।

দাদা ততদিনে 'থিওজফি'র আশ্রয় নিয়েছেন বোধ হয় সংস্কারের প্রতি আনুগত্য এবং স্বাধীন চিন্তার মধ্যে আপসের উপায় হিসাবে। একযুগে থিওজফিক্যাল সোসাইটি সারা ভারতের উচ্চশিক্ষিত উদার মতাবলম্বী লোকদের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোসাইটির সভাপতি-

ডাঃ অ্যানি বেসান্তের ব্যক্তিত্বও ছিল বোধহয় তার অন্যতম কারণ। আমি যখন জানার সুযোগ পেয়েছি তখন তা পেন্সনপ্রাপ্ত উচ্চ সরকারী কর্মচারী, উদার মতাবলম্বী জমিদার রায়বাহাদুর, আইনজীবী ইত্যাদির অবসর বিনোদনের সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চশিক্ষা এবং খানিকটা দার্শনিক মনোভাবের ফলে বোধ হয় তাঁরা সুরুচি সম্মতভাবে অবসর বিনোদনের জন্য এই পন্থা বেছে নিয়েছিলেন। বড়দা যখনই থিওজফিক্যাল সোসাইটির কোনো সম্মেলনে যেতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। প্রথম প্রথম ভালই লাগত। গণ্ডীঘেরা জীবনের বাইরে একটা নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যেত। অনেক ভাল ভাল কথা, যেমন বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সর্বধর্ম সমন্বয়, সমস্ত ধর্মের সার গ্রহণ ইত্যাদি শুনতাম। সম্মেলনের সভা শুরু হওয়ার আগে প্রতিদিনই সমস্ত ধর্মের প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত। প্রথমে উপনিষদের 'পুরুষসূক্ত' দিয়ে শুরু এবং ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা পর পর চলতে থাকত। এই পরিবেশটি বিশেষ করে কোনো ধর্মের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হতে খানিকটা সাহায্য করেছে বই কি! তবে থিওজফির সঙ্গে বেশিদিন সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় নি। ক্রমে বুঝতে লাগলাম যে ভাল ভাল কথাগুলিকে কাজে পরিণত করার দিকে এঁদের কোনো তাগিদ নেই। কাজেই সেগুলি নিছক সৌখীন বিলাসে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু এঁরা রাজনীতি, বিশেষতঃ সংগ্রামী রাজনীতির ছোঁয়াচটুকুও এড়িয়ে চলেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখবেদনা সম্বন্ধে উদাসীন থেকে মানবপ্রেমের কথা আবৃত্তিকে বেশিদিন বরদাস্ত করা সম্ভব হল না। তাই থিওজফির সঙ্গে সম্পর্ক ভালভাবে গড়ে ওঠার আগেই শেষ হয়ে গেল। তবু স্বীকার করতে হবে যে প্রথমদিনগুলিতে তা মনের দিগন্ত প্রসারে সাহায্য করেছে। আমাদের ছোট্ট শহরটির বাইরে ছড়িয়ে আছে যে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী তার সঙ্গে সংযোগের যোগসূত্ররূপে কাজ করেছে। দাদার কাছে নানা জায়গা থেকে চিঠি এবং পত্রিকা আসত। সোসাইটির মাতব্বরদের অনেকে দার্জিলিং বা কালিম্পং যাওয়ার পথে আমাদের বাসায় অতিথি হতেন। তাঁদের মধ্যে দু-একজন অ-ভারতীয়ও ছিলেন। কারো কারো ব্যবহার সত্যি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাছাড়া দুনিয়ার দিকে নতুন চোখে তাকাতে শিখি। জাতিবিদ্বেষ বা জাতিশ্রেষ্ঠত্ব নয়, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ; ধর্মে ধর্মে হানাহানির বদলে সর্বধর্মের মিলন এবং সকলের মধ্যে যে সত্য আছে তাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণের শিক্ষা।

ততদিনে শশাঙ্কর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু মারা যাওয়ায় তাকে চলে যেতে হয়েছে অন্যখানে। তবে আর একদিক থেকে মনের খোরাক পেতে শুরু করেছি। দুজন শিক্ষকের সস্নেহ সহায়তায় দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় ঘটতে শুরু করেছে। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা চিরদিন মনে থাকবে। সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঘটনাচক্রে জীবিকার তাগিদে এমন এক পরিবেশে এসে পড়েছেন যেখানে সাহিত্যপ্রেম বা শিক্ষার স্থান অতি নগণ্য। অর্থই যেখানে একচ্ছত্র অধিপতি সেখানে বাণীর সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার সুযোগই বা কোথায় আর আবহাওয়াই বা কই? তবু তিনি হার মানতে রাজী নন। স্কুলের ওপরের শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ছাত্রদের উৎসাহ দিয়ে হাতে লেখা পত্রিকা বার করেন। নিজেও লেখেন এবং আমাদেরও প্রেরণা দেন। অতি সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর লেখনীর মুখে মাঝে মাঝে দেশপ্রেমের জ্বালা আত্মপ্রকাশ করে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার বাইরে যে জ্ঞানভাণ্ডার আছে সেদিকে তিনিই প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিজে বেছে বই দেন। বলেন যে সবটা যদি বুঝতে নাও পার তবু পড়ে যাও, তাহলে চোখের সামনে এক নতুন জগতের দরজা খুলে যাবে। বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে দুটি বই তিনি বিশেষভাবে পড়িয়েছিলেন, ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারেবল' (Les Miserable) এবং 'নাইনটি থ্রী' (Ninety three)। বই দুটি পড়ে সত্যি পৃথিবীর দিকে নতুন চোখে তাকাতে শিখি। লা মিজারেবলের অপূর্ব চরিত্র জঁা ভালজঁা, শোষকের সমাজ তাকে নীচের তলার পঙ্ককুণ্ডে দাবিয়ে রাখতে চায় আর সেই পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে উঠে দাঁড়ায় মানুষের অপূর্ব মহিমায়। তার চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দেখতে পাই অতি সাধারণ একটি মানুষ কিভাবে সংগ্রামের আগুনে পুড়ে বিরাট ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। 'নাইনটি থ্রী'তে পাই ফরাসী বিপ্লবের জীবন্ত আলেখ্য, মহাকাব্যের মতই তা মহীয়ান। সেখানেও দুই মহাশক্তিধর চরিত্রের দেখা পাই। একদিকে সিমুরদ্যাঁ (Cimourdain) এবং অন্যদিকে কাউণ্ট লাঁতেলা (Lantelac)। একজনের মধ্যে বিপ্লব আর অপরজনের মধ্যে প্রতিবিপ্লবের শক্তি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

কি একটা অপবাদে মাস্টারমশায়কে স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হল। আমরা ওপরের শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসি। মাস্টারমশায়কে তাড়ানো চলবে না বলার মত সাহস বা শক্তি আমাদের ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অমত সত্ত্বেও তাঁকে আমরা স্কুলগৃহে সভা করে বিদায়-অভিনন্দন দিয়েছিলাম। আর আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের চিহ্ন হিসেবে উপহার দিয়েছিলাম মেরী করেলী (Marie Coreli)-র লেখা 'ইনোসেন্ট' (Innocent) নামে বইটি। বইতে কি আছে পড়ে দেখি নি। কিন্তু নাম দেখেই নির্বাচন করেছিলাম। আমরা যে মাস্টার-মশায়ের বিরুদ্ধে অপবাদে বিশ্বাস করি নি তাই বোঝাতে চেয়েছিলাম ঐ উপহারের মধ্য দিয়ে। তিনি চলে গেলেন। কিছুদিন মনের অনেকখানি যেন ফাঁকা হয়ে রইল। আর বিশেষ করে মনে হত, যে নতুন জগতে পা দিয়েছি সেখানে কে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে? সৌভাগ্যক্রমে তাঁর স্থানে নতুন যে শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এলেন তিনিও ছেলেদের কর্মস্পৃহাকে সস্নেহে বিভিন্ন দিকে পথনির্দেশের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী। সদ্য আইন কলেজের পড়া শেষ করে এসেছেন। নিজের ছাত্রজীবনের জের তখনও কাটে নি। এঁর তত্ত্বাবধানে হস্তলিখিত পত্রিকার সঙ্গে আরও কয়েকটি কাজ যুক্ত হল। গরীব ছাত্রদের সাহায্যের জন্য পুওর ফাণ্ড গড়ে তোলা, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে আবৃত্তি এবং অভিনয় ইত্যাদি। নতুন মাস্টারমশায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বসে শুরু হল কবিগুরুর রচনার সঙ্গে পরিচয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি কিশোর হৃদয়ের ওপর যে দুর্বার আকর্ষণ বিস্তার করে তা যেন মাস্টারমশায়ের ব্যাখ্যায় আরো প্রবল হয়ে ওঠে। পাহাড়ে বেড়াতে যেয়ে নববর্ষার জলে ফুলে-ওঠা পাগলা ঝোরার দুর্দান্ত জলপ্রপাত দেখে এসেছি। কবিতাটির মধ্যে বুঝি শুনতে পাই তারই অশান্ত গর্জন। পড়ি 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন'। অচলায়তনের রূপকটি স্পষ্ট উপলব্ধি করি। মনের সমস্ত জানালাগুলি যেন এক সঙ্গে খুলে যায়। হৃৎপিণ্ডে জাগে বিদ্রোহের ডমরুধ্বনি। তা বে-পরোয়া অভিযানের ডাক দিয়ে বলে "দিক হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে। কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন সীমা লঙ্ঘনে।"

অগ্নিযুগের কাহিনী শুনেছি। বিপ্লববাদ সম্বন্ধে কয়েকটি বই পড়েছি। কিন্তু কোথায় পাই সেই রহস্যময় মহাশক্তিমান মানুষগুলির সন্ধান? বড়দের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে শুনি সে গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলির নাকি আর কোনো অস্তিত্ব নেই। যারা একদিন বহ্ন্যুৎসবে মেতেছিলেন তাঁদের কেউ

এখন অধ্যাত্মের সাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন আর কেউ বেছে নিয়েছেন অহিংস অসহযোগের পথ। কেউ বা হয়তো শান্ত সংসারযাত্রার মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছেন। আকুল হয়ে এক এক সময় ভাবি তবে কি আবার কখনও সেই সব ঘরছাড়া অযাত্রাপথের পথিকদের দেখা মিলবে না? আর কোনোদিন কি তারা গোপন অন্তরাল থেকে বার হয়ে এসে বুকের রক্তে হোলিখেলার অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে সচকিত করে দেবে না? এমনি-ভাবে মন যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তখন আকস্মিকভাবে কলকাতার বুকে বিপ্লবীদের কয়েকটি কার্যকলাপ যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো আসন্ন ঝড়ের আভাষ দিয়ে গেল। বাংলার তরুণসমাজের ওপর আবার নেমে এল ব্রিটিশ দমননীতির খড়্গ। রেগুলেশান থ্রী এবং বেঙ্গল অর্ডিনান্সের জালে অনেকে বন্দী হলেন। তার প্রতিবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সিংহনাদের প্রতিধ্বনি আমাদের অঞ্চলেও গিয়ে পৌছল। আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠি। তবে সেই অগ্নিউৎস নিভে যায় নি। একদিন তার সন্ধান নিশ্চয়ই পাব। এমনিভাবে যখন বিঘ্নবিপদে ভরা দুঃসাহসী যাত্রার জন্য মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে তখন এক যোগাযোগের ফলে সরাসরি বিপ্লববাদে দীক্ষা হল।

আমারই সমবয়সী একটি নতুন ছেলে শহরে এসে বসবাস শুরু করে। জ্যেঠামহাশয় ওখানে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছোটহাকিমের ভাইপোর সঙ্গে মেলামেশায় কোনো অভিভাবকই আপত্তি করেন নি বরং উৎসাহ দিয়েছেন। তাই সমবয়সী যে কয়েকটি ছেলে ছিলাম তাদের প্রায় সবার সঙ্গে মধুর পরিচয় সহজে গড়ে উঠল। মধু ছিল অত্যন্ত শান্ত, স্বল্পভাষী এবং বেশভূষা ও চালচলনে একেবারে নিরাড়ম্বর। আদর্শ ব্রহ্মচারী ছেলে। কাজেই বড়দের কাছে প্রশংসাপত্র পেতে তার একটুও দেরি হয় নি। এহেন লোকটির মধ্যে যে কি আগুন লুকিয়ে আছে তা বাইরে থেকে কে বুঝবে? দুদিনেই তার সঙ্গে আমার গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তারপর কথায় কথায় সে নিজের সত্য পরিচয় দেয়। একটি গুপ্ত বিপ্লবী দলের কর্মী হিসেবে সে এখানে এসেছে। তার সঙ্গে যোগ দিতে আমাকেই প্রথম আহ্বান জানায়। কয়েকটি বাজেয়াপ্ত বই পড়তে দেয় 'কানাইলাল', 'ফাঁসির সত্যেন' ইত্যাদি। কানাইলাল বইটির প্রচ্ছদপটে আঁকা রয়েছে একটি বলিষ্ঠ হাতে ধরা রিভলভার। তা থেকে

বার হচ্ছে আগুনের শিখা। ভিতরে ফাঁসির দড়ি গলায় শহীদ কানাইলাল দত্তের ছবি।

মধুর জীবনে কর্মটাই প্রায় ষোলআনা স্থান দখল করেছিল। আমার সন্ধানী মনের সব প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারে না। সে শুধু জানে দেশের জন্য আত্মাহুতির প্রয়োজন। কবে প্রাণ দেওয়ার ডাক আসবে তারই নীরব একাগ্র সাধনায় ওর দিন কাটে। এক-একদিন মুক্তির পন্থা নিয়ে আলোচনা থেকে তুমুল তর্ক হয়। বিপ্লবের পথ বা রূপ সম্বন্ধে কারোই স্পষ্ট ধারণা নেই। ও বয়েসে এবং সেই যুগে তা থাকার কথা নয়। তবু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্যের সুর স্পষ্ট হয়ে বাজে। মধুর সমস্ত চিন্তা গড়ে উঠেছে ভদ্র তরুণদের গোপন সংগঠন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে। আমাদের শহরে সে রকম সংগঠন গড়ে তোলার সম্ভাবনা কতটুকু! মধুর পরিকল্পনায় আমি তরাই এবং পাহাড় অঞ্চলের উপেক্ষিত মানুষদের কোনো স্থান খুঁজে পাই না। বিপ্লবে সেই মানুষগুলির ভূমিকা কি হবে তা আমিও জানি না। কিন্তু ওদের বাদ দিয়ে যে চলতে পারে না সে বিশ্বাস একরকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব আমাদের অঞ্চলে ক্ষণস্থায়ী হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আলোড়ন তুলেছিল তার কথা ভুলতে পারি নি। দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু মারা যাওয়ার পর তাঁর শবযাত্রায় অগণিত মানুষকে কেঁদে আকুল হতে দেখেছি। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতিকে মেনে নিতে পারি নি বটে। কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দার্জিলিং থেকে নামার পথে তিনি যখন আমাদের শহরে আসেন তখন দেখতে পেয়েছি যে জনগণ-মনে তাঁর প্রভাব কত গভীর। পায়ের তলায়-পড়া বোবা মানুষগুলির মনে স্বাধীনতার চেতনা যে মহাত্মাজীর আন্দোলনের সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠেছে তা স্বচক্ষে দেখেছি। ওদের কিভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের অভিযানে টেনে আনা যাবে? মধুর কাছে তার সন্ধান মেলে না বরং তীব্র মতান্তর হয়। তবু দুজনের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। সে-ই তো গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। যা এতদিন ছিল শুধু বইয়ের পাতায় এবং কল্পলোকের কাহিনীতে, তার সঙ্গে এবার সামনাসামনি পরিচয় ঘটতে চলেছে। অনেকটা রূপকথার রাজ্যের গুপ্তদ্বার খোলার মতো মনে হয়। বন্ধুর হাত ধরে সে দরজার চৌকাঠ পার হতে হবে। যেদিন শালুগড়ার জঙ্গলে নিয়ে

গিয়ে মধু কোমরের কাপড়ের নিচে থেকে রিভলভার বার করে দিয়েছিল সেদিন নিজেকে রূপকথার রাজকুমার বলেই মনে হয়েছিল।

কিছুদিনের মধ্যে বিপ্লব-স্বপ্নের আর দুজন অংশীদার জুটে যায়। একজন হল মোহন, প্রাণের আনন্দে উজ্জ্বল, কৌতুকপ্রিয় ছেলেটি। চলার পথে এরকম একজন সঙ্গী না থাকলে শুধু যে মুহূর্তগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তাই নয়, সরল প্রাণের উচ্ছ্বসিত হাস্যকৌতুকের ছোঁয়া না পেলে মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। ঘরের পরিবেশে আমার স্বভাবটা বড় চাপা হয়ে গিয়েছিল। মোহনের সাহচর্যে পাথর সরে গিয়ে চপল আনন্দের বন্যামুখ খুলে যায়। আর একজন নতুন সঙ্গী হয় সীতাপতি। সে আমাদের চাইতে কয়েক বছরের বড়। ডিকউ অফ কনটের সম্মানের নিদর্শন মেডেল নিতে অস্বীকার করে যে কয়েকটি ছাত্র হেডমাস্টারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল সীতাপতি তাদেরই একজন। বয়েসে বড় বলে আমরা তার থেকে দূরেই থাকতাম। কিন্তু ঐ ঘটনার কথা শুনে মধু গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলে। আমাদের মধ্যে কাজের থেকে রোমান্স এবং জল্পনাই বেশি হয়। সংগঠন সম্বন্ধে মধুর কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সমবয়সী কয়েকটি তরুণ সব সময় একত্রে চলাফেরা করে এ ব্যাপারটি দুদিন পরে নিশ্চয়ই পুলিশের বিষনজরে পড়বে। আর যদি অভিভাবকদের কানে যায় তাহলে তো রক্ষা নেই। যেখানে কোনোরকম রাজনীতি করতেই সবাই শঙ্কিত সেখানে আমরা শুরু করেছি আগুন নিয়ে খেলা। এমনিতেই আমার অভিভাবক ছিলেন অত্যন্ত কড়া। সন্ধ্যার আঁধার নামার আগে ঘরে ফিরতে হবে এই ছিল তাঁর হুকুম। সৌভাগ্যক্রমে মাতৃসমা বৌদি ছিলেন স্নেহশীলা। বাসায় ফিরতে দেরি হলে তিনি নানারকম কৈফিয়ত দিয়ে দাদাকে সন্তুষ্ট রাখতেন। মধুর পরামর্শে থিওজফির সঙ্গে সম্পর্কটাকে কাজে লাগাই। যুব থিওজফিস্ট লীগের আবরণে আমাদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন আর পার্থসারথির মূর্তি ধ্যানে শিহরণ জাগে না। শিহরণ জাগে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কল্পনায়। ধ্যানধারণা অনেক পেছনে পড়ে গেছে। যে পথ বেছে নিয়েছি তাই তো সত্যকার কর্মযোগের পথ। ফলের তথা পুরস্কারের কথা না ভেবে দেশের জন্য আত্মাহুতি দিতে হবে। মায়ের পূজায় দিতে হবে 'জবার বদলে ছিন্নশির'। দেশবাসীকে বিপ্লবের অভিযানে টেনে আনতে হলে চাই দুঃসাহসিক আত্মদানের অনুষ্ঠান। বালক নচিকেতা

যেমন জ্ঞানের আগ্রহে মৃত্যুর ভয়াল রূপকে তুচ্ছ করেছিল তেমনি প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এমনি মুহূর্তে হাতে এসে পড়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরম রাজদ্রোহাত্মক বলে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। ফলে তরুণ মহলে সেখানা পড়ার আগ্রহ দুর্বার হয়ে ওঠে। বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর বইটির চাহিদা বেড়ে যায়। উপন্যাসটি বঙ্গবাণী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকে পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি কেটে বাঁধিয়ে বই করে নেয়। এমনি একখানা বই মধু কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে আনে। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলি। সেদিনের চেতনায় আমরা অনেকেই পথের দাবীতে পথের নতুন ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। ভদ্র তরুণদের মধ্যে বিপ্লবের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ না রেখে এগিয়ে যেতে হবে অগণিত খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে। দুঃখের সাথী হয়ে থেকে ওদের বুকে সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে হবে। সেই আগুনের প্রেরণায় পাগল হয়ে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসবে স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মবলিদান করতে। 'মহামানবের মুক্তি সাগরে মানুষের রক্তধারা ঢেউ তুলে ছুটে যাবে' আর সেই রক্তসাগরে স্নান করে হবে স্বাধীনতার সূর্যোদয়। পথের দাবীর মহানায়ক সব্যসাচীকে মনে হয় যুগের প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যে দেখা পাই এমন এক মানুষের যিনি, আমাদেরই মতো মানুষ এবং অতি সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে অথচ বিপ্লবের সাধনায় হিমালয়ের মতো এক মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। পার্থ-সারথির কল্পনা অনেক পেছনে পড়ে যায়। সব্যসাচীকে সংবর্ধনা জানায় কালবৈশাখীর আশীর্বাদ। সাগরের অশান্ত তরঙ্গ তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ব্রিটিশের গোয়েন্দা পুলিশের বেড়াজালকে তুচ্ছ করে সে এগিয়ে চলে। তার যাত্রা কোথাও বাধা মানে না। মনে মনে বলি "সব্যসাচী! তোমারই ছবিকে ধ্রুবতারার মতো সামনে রেখে এগিয়ে চলব। কথাশিল্পীর ভাষায় আমিও তোমাকে নমস্কার জানাই। তুমি যে মুক্তিপথের অগ্রদূত, পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী।"

রেডিও-ইলেকট্রনিক্স

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

এযুগে রেডিও-ইলেকট্রনিক্স আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। গত বিশ বছরে রেডিও-ইলেকট্রনিক্সে গবেষণার কাজ অতি দ্রুত এগিয়ে এসেছে। অভিনব সব যন্ত্রপাতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, ব্যবহার করেছেন মানুষেরই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের নানাবিধ সুখ, সুবিধা ও সমৃদ্ধির কাজে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, নৌ ও বিমান চালনায়, যুদ্ধান্ধ মানবের আক্রমণ ও প্রতিরক্ষায় আমরা এ যুগে দেখতে পাই রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের বহুবিধ ব্যবহার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যে বীজ একদিন বপন করেছিলেন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, হেন্‌রীক্ হার্ৎজ, আল্‌ভা এডিসন প্রমুখ বিজ্ঞানী, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় আজ তাই পরিণত হয়েছে মহা মহীরূহে। ছড়িয়ে পড়েছে এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ও বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আমরা বলতে পারি যে রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের ভিত্তি গড়ে উঠেছে দুটি প্রধান আবিষ্কার ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগকে কেন্দ্র করে। প্রথমেই বলতে হয় রেডিও বা বেতার-তরঙ্গের কথা যার আবিষ্কারের মূলে ছিলেন ম্যাক্সওয়েল ও হার্ৎজ। সংবাদ আদানপ্রদানের কাজে বেতার-তরঙ্গের প্রয়োগ প্রথম করেন মার্কনি ও পোপফ্। আর ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান গড়ে ওঠে ইলেকট্রনের আবিষ্কার ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগকে কেন্দ্র করে। আমরা জানি, যে-কোনো পদার্থের পরমাণু 'ইলেকট্রন', 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' দিয়ে গড়া। ইলেকট্রনগুলো 'নেগেটিভ চার্জ' বা ঋণ-বিদ্যুৎ, প্রোটনগুলো পজেটিভ চার্জ বা ধন-বিদ্যুৎ বিশিষ্ট এবং নিউট্রনগুলো বিদ্যুৎবিহীন কণিকা। পরমাণুর কেন্দ্র—নিউক্লিয়স, প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে গড়া। ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়সের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। ইলেকট্রনের আবিষ্কার কোনো একজন বিশেষ বিজ্ঞানী করেছেন বলাটা ঠিক

হবে না। বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রনের কথা স্টোনি প্রথম তুলেছিলেন এবং টমসন্ ও তার সহকর্মীরা বায়ুশূন্য বা হালকা গ্যাস ভর্তি টিউবের ভেতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় মুক্ত ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন। ইলেকট্রনিক্স বলতে আজ আমরা বুঝি পরমাণুর অওতা থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করে এনে তাদের গতিবিধি বিভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা ও তাকে কাজে লাগানো। বেতার-তরঙ্গ ও ইলেকট্রনের আবিষ্কারের মূলে যে সব বিজ্ঞানীরা ছিলেন তারা নিশ্চয়ই এযুগের রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের ক্রমোন্নতি ও ব্যাপক প্রয়োগের কথা কল্পনাও করতে পারেন নি। আমাদের এই আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে কি করে এ দুটি বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একে অন্যের সাহচর্যে এসে উন্নততর যন্ত্র, যান্ত্রিক কৌশল ও উচ্চতর গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেছে। রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করব। প্রথম পর্যায় হল, রেডিও বা বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কার ও বেতার-টেলিগ্রাফির প্রবর্তন। দ্বিতীয় পর্যায় হল, ইলেকট্রন টিউব বা ভালবের আবিষ্কার ও বেতার টেলিফোনির প্রচলন। তৃতীয় বা শেষ পর্যায় হল, গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

১৮৬৫ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এক নতুন তথ্য প্রচার করলেন। ফ্যারাডের বিদ্যুৎ ও চুম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ সূত্রকে ভিত্তি করে তিনি কতকগুলো জটিল সমীকরণের উদ্ভাবন করেন। সংক্ষেপে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, যেখানেই কোনো বিদ্যুৎ স্পন্দন হয় সেখান থেকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ একই পরিবারভুক্ত, এদের গতিবেগ সমান, প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, সবাই এক এক প্রকার ঢেউ। এ ঢেউয়ের মাধ্যম সর্বব্যাপী ইথার। এদের পার্থক্য হল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলতে আমরা বুঝি পর পর দুটি তরঙ্গের মাথার দূরত্ব। আমরা এখন জানি যে লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ, বেগুনী আলোর দৈর্ঘ্য এর অর্ধেক আর যে সব বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত তাদের বলি বেতার-তরঙ্গ।

ম্যাক্সওয়েলের তথ্যকে রূপ দিলেন জার্মান বিজ্ঞানী হেনরীক হার্ৎজ। একটি বিশেষ যন্ত্রে তিনি ইলেকট্রিক স্পার্ক বা বিদ্যুৎ-স্পন্দন সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন এবং তা থেকে যে বেতার-তরঙ্গ বেরিয়ে এল, সেটাকে বিনা তারেই দূরে আর একটি বিশেষ যন্ত্রে ধরতে পারলেন। আমরা বলতে পারি যে হার্ৎজের পরীক্ষা থেকেই শুরু হল রেডিও বা বেতারের যুগ। রেডিওর আবিষ্কারক কে এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব বহুদিন ছিল। হেনরীক হার্ৎজের পরে দেশবিদেশে বিজ্ঞানীরাও লেগে গেলেন গবেষণায়। আমাদের দেশে আচার্য জগদীশচন্দ্র, ইতালীতে মার্কনি, রাশিয়ায় পোপফ্ প্রমুখ সবাই নিজ নিজ গবেষণায়, বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি ও তার গুণাগুণ পরীক্ষার কাজে সফলতা অর্জন করলেন। বলা যেতে পারে যে এদের প্রচেষ্টায় বিশেষ করে মার্কনির উদ্যমেই সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যাপারে বেতার-তরঙ্গকে প্রথম কাজে লাগানো হল। জন্ম নিল বেতার টেলিগ্রাফি—অর্থাৎ বেতার-তরঙ্গকে বাহন করে সঙ্কেতের সাহায্যে সংবাদ আদানপ্রদান। প্রসঙ্গক্রমে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিজের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

"তারহীন সংবাদ—অদৃশ্য আলোক ইটপাটকেল, ঘরবাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম।···বিদ্যুতোর্ম্মি···দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ স্তূপ উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে মার্কনি তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অদ্ভুত অধ্যাবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতি সাধনের কৃতিত্বের দ্বারা পৃথিবীতে এক নতুন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্বে দূরদেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনাতারে সর্বত্র সংবাদ পৌছিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশ-তরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে।···"

(অব্যক্ত)

বেতার টেলিগ্রাফি ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে চালু হতে লাগল। গড়ে উঠল শক্তিশালী সব প্রেরক-কেন্দ্র। হার্ৎজ, মার্কনি প্রমুখ বিজ্ঞানীর যন্ত্রের অনুকরণে তৈরি হল উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বড় বড় সব প্রেরক যন্ত্র, স্পার্ক-

ট্রান্স্মিটার। দেশ-বিদেশে সংবাদ আদানপ্রদান, বিশেষ করে চলমান জাহাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কাজে বেতার টেলিগ্রাফি পরীক্ষার স্তর পেরিয়ে গিয়ে স্থায়ীভাবে চালু হল। খুব বেশি দূর পাল্লার কাজে বিশেষ কার্যকরী না হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে বেতার-টেলিগ্রাফি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ইলেকট্রন টিউব বা ভাল্‌বের আবিষ্কার রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজকের রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের অত্যাশ্চর্য সব আবিষ্কারের মূলে রয়েছে বিভিন্ন রকমের ভাল্‌বের ব্যবহার। ১৮৮৩ সালে এডিসন বিজলী বাতি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করছিলেন। কি খেয়ালে তিনি বাতিটির ভেতরে একখানা ধাতু পাত জুড়ে দিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। ধাতু পাতটিতে যদি কোনো 'পজেটিভ ভোল্টেজ' বা বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ করা হয় তবে জ্বলন্ত তার থেকে ওই পাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ শুরু হয়। কিন্তু 'নেগেটিভ ভোল্টেজ' দিলে কোনো বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয় না। বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে এটা 'এডিসন এফেক্ট' নামে পরিচিত। বিদ্যুৎ-প্রবাহ আমরা জানি ইলেকট্রন স্রোত মাত্র। এক্ষেত্রে তাপের ফলে জ্বলন্ত তার থেকে যে সমস্ত ইলেকট্রন বেরিয়ে আসছে পজেটিভ ভোল্টেজের আকর্ষণে তারা বায়ুশূন্য ভাল্‌বের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়ছে ধাতু পাতটিতে। ধাতু পাতটিতে 'নেগেটিভ ভোল্টেজ' থাকলে মুক্ত ইলেকট্রনরা পাতটি থেকে কোনো আকর্ষণ পাচ্ছে না বলেই এক্ষেত্রে আর বিদ্যুৎ-প্রবাহ হচ্ছে না। এডিসনের এই আবিষ্কারই ইলেকট্রন টিউব বা ভাল্‌বের গোড়াপত্তন করল। এডিসনের আবিষ্কারকে প্রথম কাজে লাগালেন ফ্লেমিং। সৃষ্টি হল ডায়োড্ ভাল্‌ব। তিনি এর ব্যবহার করলেন বেতার-গ্রাহকযন্ত্রের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে। এর এই বিশেষ কাজটি হল বিদ্যুতের পরিবর্তী প্রবাহকে (alternating current) সমপ্রবাহ বিদ্যুতে (direct current) পরিণত করানো। ১৯০৮ সালে লী ডী ফরেস্ট ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের আরো উন্নতিবিধান করেন। তিনি ডায়োড্ ভাল্‌বের সরু তার বা ক্যাথোড ও ধাতব পাতটি বা অ্যানোডের মাঝে বসিয়ে দিলেন ঝাঁঝরির মত ধাতব জাল বা গ্রীড। দেখা গেল যে বাইরে থেকে গ্রীডে সামান্য ভোল্টেজের তারতম্য করালে ভেতরকার ইলেকট্রন প্রবাহকে ইচ্ছামত কমানো বাড়ানো যেতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সম্ভব হল ক্ষীণ বেতার

তরঙ্গকে জোরালো করে তোলা। অর্থাৎ আমরা যাকে অ্যাম্‌প্লিফায়ার বা বিবর্ধক বলে জানি তাই সম্ভব হল এই ত্রিপদী বা ট্রায়োড্ ভাল্‌বের দৌলতে। লী ডী ফরেস্ট তাঁর আবিষ্কৃত এই ভাল্‌বের নামকরণ করলেন Audion। বিভিন্ন উপায়ে এর দ্রুত উন্নতিবিধান করলেন। এর ব্যবহার ও চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলল। ব্যবসায়ী বুদ্ধিও তাঁর খুবই প্রখর ছিল, তিনি এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বুঝতে পেরে রীতিমত কারখানা খুলে বসলেন। আর্মস্ট্রং প্রমুখ বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় বিশেষ পদ্ধতিতে ট্রায়োড্ ভাল্‌বকে আন্দোলক (oscillator) হিসেবেও ব্যবহার করা হল। ভাল্‌ব আন্দোলকের কাজ হল সমপ্রবাহের বিদ্যুৎশক্তিকে পরবর্তী প্রবাহে পরিণত করা। বিবর্ধক ও আন্দোলকের যুক্ত ব্যবহারে বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হল। মস্ত বড়ো বড়ো সব স্পার্ক-ট্রান্সমিটারের দিন ফুরিয়ে এল। ছোট-বড়ো বিভিন্ন উন্নত ধরনের ভাল্‌বের সাহায্যে গড়ে উঠল বেতার টেলিফোনি। ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম বেতারে অনুষ্ঠান প্রচার চালু হল—B. B. C. (British Broadcasting Corporation) প্রতিষ্ঠিত হল লণ্ডনে এবং একই বছরে মস্কোতেও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বেতার ব্যবস্থা চালু হল। আমাদের দেশে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারব্যবস্থা চালু হল ১৯২৭ সালে। খুব সাধারণভাবে বেতারে অনুষ্ঠান প্রচার ও গ্রহণ সম্বন্ধে বলছি। মাইক্রোফোনের সামনে কথাবার্তা বা কোনো শব্দ করলে, শব্দের জোর অনুযায়ী মাইক্রোফোন যন্ত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহে অনুরূপ তারতম্যের সৃষ্টি হয়। বিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে এই বিদ্যুৎ-প্রবাহকে বেশ জোরালো করে নিয়ে টেলিফোনের তার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শহর থেকে দূরে নির্জন পল্লীতে অবস্থিত বেতার প্রেরক-কেন্দ্রে। এখানে শক্তিশালী ভাল্‌ব আন্দোলকের সাহায্যে নির্দিষ্ট উচ্চ কম্পন সংখ্যার পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয় এবং স্টুডিও থেকে আনীত বিদ্যুৎ-প্রবাহকে বিশেষ প্রতিক্রিয়ায় তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এরিয়েলে পাঠানো হয়। এরিয়েলের এই মিশ্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে বেতার-তরঙ্গের যা প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিবেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন রেডিও স্টেশন থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এমনি মিশ্র বেতার তরঙ্গ সব সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে এদের প্রভাবে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। গ্রাহক-যন্ত্রের বিশেষ ব্যবস্থায় আমরা খুশিমত যে কোনো স্টেশনের বেতার তরঙ্গকে

বেছে নিতে পারি অর্থাৎ যাকে বলি tune করি। সেটের প্রধান কাজ হল ওই ক্ষীণ মিশ্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ থেকে বাহনকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ পরিশোধিত করে অ্যাম্‌প্লিফায়ারের সাহায্যে জোরালো করে নিয়ে লাউডস্পীকারে পাঠানো। লাউডস্পীকারের কাজ হল বিদ্যুৎ-প্রবাহের তারতম্যকে অনুরূপ শব্দে রূপান্তরিত করা অর্থাৎ ঠিক যেন মাইক্রোফোনের বিপরীত ধর্ম এর। তখনকার দিনে বেতার ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ (কয়েক শত মিটার) ব্যবহৃত হত। কারণ বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে দূর পাল্লার বেতারের জন্য এরাই বেশি কার্যকরী, অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব তরঙ্গ থেকে সহজেই ভূপৃষ্ঠের মাটি বা জল শক্তি শুষে নিয়ে যায় এবং তাই দূরপাল্লার কাজে একেবারে অচল। অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু হ্রস্ব তরঙ্গের কদর বেড়ে গেল এক অভিনব আবিষ্কারের ফলে।

ভাল্‌ব ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি যখন বেশ সুলভ হয়ে উঠল, তখন অপেশাদারী অনেকেই নেহাত শখের বশবর্তী হয়ে নিজেদের মধ্যে বেতারে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। অবহেলিত হ্রস্ব তরঙ্গ ব্যবহারের অনুমতি এরা সরকার থেকে পেলেন। এরা লক্ষ্য করলেন যে দূরপাল্লার কাজে হ্রস্ব তরঙ্গ বেশ ভালো কাজ দিচ্ছে। বিজ্ঞেরা মাথা ঘামাতে শুরু করলেন যে কি করে তা সম্ভব, হ্রস্ব তরঙ্গ পৃথিবীর গা বেয়ে যেতে যেতে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হবেই। কেনেলী ও হেভিসাইড প্রচার করলেন যে ভূপৃষ্ঠের উপরে অদৃশ্য আয়নার মতো একটা কিছু আছে যা থেকে হ্রস্ব তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আবার ভূপৃষ্ঠেই ফিরে আসে। ইংলণ্ডে অ্যাপেলটন ও বার্নে এবং আমেরিকায় ব্রাইট ও টুভে বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা কেনেলী ও হেভিসাইডের মতবাদ সুপ্রমাণ করলেন। এ সব বিজ্ঞানীদের দৌলতে আজ আমরা জানি সেই অদৃশ্য আয়নার কথা। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে পঞ্চাশ থেকে প্রায় তিনশো মাইল উঁচুতে হালকা বায়ুস্তরগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সূর্যকিরণের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে বায়ুকণিকাগুলো তড়িতাবিষ্ট বা আয়নিত হয় এবং বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি করে। এই আয়নিত স্তরগুলোকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল। বেতার তরঙ্গ আয়নোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার ভূপৃষ্ঠের দিকেই ফিরে আসে বলেই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে দেশবিদেশের মধ্যে বেতার সংযোগ-ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। আয়নোস্ফিয়ারের গবেষণা তাই আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দিনে ও রাতে বা বছরের বিভিন্ন ঋতুতে অবিচ্ছিন্ন ও উন্নত ধরনের বেতার সংযোগ-ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে আয়নোস্ফিয়ারের প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা সব সময়ে প্রয়োজন। আয়নোস্ফিয়ার বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা তাই আজ পৃথিবীব্যাপী চালু আছে। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তথ্যাদি আদানপ্রদান ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে আমাদের গর্বের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে তাঁরই তত্ত্বাবধানে কলিকাতার অদূরে হরিণঘাটায় একটি বিশেষ গবেষণাগারে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত মাপজোখের কাজ দিবারাত্র করা হয়। 'আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিদ্যা বছরে' আয়নমণ্ডল বিষয়ক গবেষণায় হরিণঘাটার এই গবেষণাগার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের গবেষণা, উন্নততর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ খুবই দ্রুততালে বেড়ে যেতে থাকে। ফলে নতুন নতুন তথ্য ও প্রক্রিয়া, উন্নত ধরনের বহুবিধ ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব এবং সূক্ষ্ম ও নিখুঁত সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হতে লাগল। মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কাজে রেডিও-ইলেকট্রনিক্স অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। প্রথমেই বলতে হয় টেলিভিশানের কথা। বেয়ার্ড ও জোরিকিনের নিজ নিজ গবেষণার সাফল্যেই আজ সম্ভব হয়েছে টেলিভিশান। রেডিওর আলোচনায় আমরা দেখেছি শব্দকে প্রথমে বিদ্যুৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করতে হয়। টেলিভিশান ব্যবস্থার মূলে রয়েছে যে কোনো ছবি বা প্রতিকৃতির আলো-ছায়ার তারতম্যকে বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে অনুরূপ বিদ্যুৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করা। বিদ্যুৎপ্রবাহের এই তারতম্যকে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতারতরঙ্গের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রেরক-কেন্দ্রের এরিয়েলের সাহায্যে পাঠানো হয়। গ্রাহকযন্ত্রের বিশেষ ব্যবস্থায় মিশ্র বেতার তরঙ্গকে পরিশোধন করে বিদ্যুৎপ্রবাহের তারতম্যকে অনুরূপ আলোর তারতম্যে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে টেলিভিশানের পর্দায় ভেসে ওঠে ছবি, ঠিক যেমনটি ঘটছে তেমনটি দেখতে পাই টেলিভিশানের পর্দায়। রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে টেলিভিশানের বহুল প্রচলন উল্লেখযোগ্য। টেলিভিশানের দৌলতে বহুবিধ খেলাধুলার দর্শকের সংখ্যাও

আজ বহুগুণে বেড়ে গেছে কারণ মাঠে না গিয়েও লোকে আজ তা দেখতে পাচ্ছে টেলিভিশানের পর্দায়। টেলিভিশান মারফত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদি, ভ্রমণকাহিনী, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি দর্শক-শ্রোতাদের কাছে খুবই উপভোগ্য। বড়ো বড়ো হাসপাতালে জটিল সব অস্ত্রোপচার নিখুঁতভাবে শত শত ছাত্রকে টেলিভিশানের সাহায্যে দেখানো ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। রঙ্গিন টেলিভিশান এতদিন গবেষণার স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গত কয়েক বছর ধরে তাও সম্ভব হয়েছে, ছবিকে আরও বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের দেশ বিংশশতাব্দীর রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের এই গৌরবময় যুগেও টেলিভিশান ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। দু-একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছাড়া সরকারীভাবে সর্বসাধারণের উপযোগী ব্যবস্থা এখনও চালু হয় নি।

যুদ্ধেরই তাগিদে উন্নততর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের অভিনব নিদর্শন রেডার। ইংরাজী Radar শব্দটি **Ra**dio **D**etection **A**nd **R**anging কথাগুলো থেকে আমদানি করা। গতযুদ্ধে শত্রুবাহিনীর বিমান আক্রমণ যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন ইংরেজ বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাতে শুরু করলেন যে কি উপায়ে আগে থেকেই আসন্ন বিপদের একটা আভাস পেয়ে সতর্ক হওয়া যায় এবং পাল্টা আক্রমণ চালানো যায়। ওয়াটসন ওয়াটের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী গবেষণায় মেতে উঠলেন। আয়নমণ্ডলের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আয়নমণ্ডলের উচ্চতা মাপার এক পদ্ধতিকে ভিত্তি করে এঁরা সফলতা অর্জন করলেন রেডার আবিষ্কারে। এর মূলে রয়েছে বেতার প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগানো। আমরা জানি যে পাহাড়ের দেশে বা উঁচু কোনো বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো শব্দ করলে ক্ষণকাল পরে প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। শব্দতরঙ্গ গতিপথে কোনো বাধা পেলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। শব্দের গতিবেগ এবং শব্দ ও তার প্রতিধ্বনির মধ্যকার সময়ের ব্যবধান জানা থাকলে আমরা সহজেই বাধাটির দূরত্ব বের করতে পারি। রেডারের কার্যকলাপ ঠিক অনুরূপ বলা যেতে পারে। শব্দের বদলে এখানে ব্যবহার করা হয় অতিহ্রস্ব বেতারতরঙ্গের। প্রেরকযন্ত্র থেকে ঝলকে ঝলকে বেতারতরঙ্গ (Pulses of radio waves) পাঠানো হয়। উড়ন্ত বিমানের গায়ে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে এর কিছুটা অংশ ফিরে আসে ঠিক যেখানটা থেকে পাঠানো হয়েছিল, ধরা

দেয় গ্রাহকযন্ত্রে, এবং ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপ নামক বিশেষ যন্ত্রে দৃশ্য হয়ে ওঠে উজ্জ্বল আলোকবিন্দুতে। অসিলোস্কোপ যন্ত্রের বিশেষ ব্যবস্থায় অতি নিখুঁতভাবে সূক্ষ্ম সময়ের পরিমাপ করা যায়। বেতারতরঙ্গের গতিবেগ আমাদের জানা, তাই অসিলোস্কোপের সাহায্যে বেতারতরঙ্গ যেতে এবং প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে কতটা সময় নিল সেটা পেয়ে গেলে দূরত্বটা বের করা খুবই সহজ। অতি হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ ব্যবহারের একটা মস্ত বড়ো সুবিধা হল এই যে এরিয়েল ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ছোট করে এমনভাবে তৈরি করা যায় যাতে বেতারতরঙ্গ কোনো এক বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ রাখা বা নির্দিষ্ট কোনো দিক থেকে বেতার তরঙ্গগ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় একে চারদিকে ঘুরিয়েফিরিয়ে সার্চলাইটের মতো বেতার অনুসন্ধানের কাজও সুন্দরভাবে করা যায়। সাধারণত সেন্টিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতারতরঙ্গ রেডারে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের তাগিদে, রেডার অতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলল। অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন হ্রস্ব বেতারতরঙ্গ সৃষ্টির কাজে আবিষ্কৃত হল বিশেষ ভাল্‌ব ক্লাইস্‌ট্রন, ম্যাগনেট্রন প্রভৃতি। গত যুদ্ধের শেষের দিকটায় রেডার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে সন্দেহ নেই। শত্রুপক্ষের বিমানবহর বা নৌবহর কখন, কোন দিক থেকে কত উচ্চতায় ও কি বেগে হানা দিতে আসছে তা বেশ কিছুটা আগে থেকেই জেনে নিয়ে পাণ্টা আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার কাজে তৈরি হয়ে নেওয়া সহজ হল। যুদ্ধের শেষে এর বহুবিধ ব্যবহার আজ হচ্ছে। নৌ ও বিমান চালনায় বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে অথবা মেঘ ও ঘন কুজ্‌ঝটিকার অন্তরালে নিরাপদে চলাচল আজ রেডারের সাহায্যে সম্ভব হচ্ছে। চোখে কিছু না দেখতে পেলেও আজকের বৈমানিক রেডারের সাহায্যে অনায়াসে তার বিমান ঠিক পথে চালিয়ে অবতরণ করাতে পারেন। বিশেষ রেডার যন্ত্রের সাহায্যে আবহাওয়াবিদ্‌গণ আবহাওয়ার পূর্বাভাষ আজকের দিনে আরো নিখুঁতভাবে দিতে পারেন। রেডার যন্ত্রের অতি উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিকে কেন্দ্র করে এযুগে অনেক নতুন বিজ্ঞান ও গবেষণার উদ্ভব হয়েছে (যার আলোচনা আমরা পরে করব)।

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের তাগিদে যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে যুদ্ধোত্তর কালে দেশবিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাগারের উন্নততর গবেষণা পদ্ধতিতে নিত্য নতুন আবিষ্কার বর্তমান যুগে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এর বহুবিধ

ব্যবহার আজ আমরা দেখতে পাই নানাক্ষেত্রে—শিল্পে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও গবেষণায়। সামান্য কয়েকটি চমকপ্রদ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

যে কোনো কলকারখানা চালাতে শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি প্রধানত জোগায় বিদ্যুৎ। আমাদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ কতকগুলো সুবিধা থাকায় পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অথচ কতকগুলো শিল্পের প্রয়োজন সমপ্রবাহী বিদ্যুতের। তাই এই সব শিল্পের তাগিদে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে সমপ্রবাহে রূপান্তরিত করণের জন্য গড়ে উঠেছে বিশেষ ইলেকট্রনিক যন্ত্র—Rectifier। এই সমপ্রবাহ বিদ্যুৎকে সব সময়ের জন্য স্থির রাখা বা ইচ্ছামত যাতে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সব ব্যবস্থাও এসব যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। আমাদের কলকাতায় যে ট্রাম ও বৈদ্যুতিক রেল চালানো হয় তাদের শক্তি জোগায় এ ধরনের মস্ত বড়ো বড়ো সব যন্ত্র।

বিশেষ কতকগুলা শিল্পের কাজে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার অপরিহার্য বললেই চলে। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে 'ওয়েল্‌ডিং' এর কথা। দুটো ধাতু পাত বা রড্ হয়তো জুড়তে হবে। প্রক্রিয়াটা হল—যেখানটায় জুড়তে হবে সেখানটায় তাপ প্রয়োগ করা হয়। যখন তাপের ফলে দুটোতেই গলনক্রিয়া প্রায় শুরু হয় তখন জোর চাপ প্রয়োগ করে আস্তে আস্তে তাপ সরিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করতে দিতে হয়। শেষ স্তরে চাপও সরিয়ে নিলে দেখা যায় দুটো মুখ জোড়া লেগে এক হয়ে গেছে। প্রক্রিয়াটা শুনে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে একাজে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার কোথায়! সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমত তাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে। নিখুঁত ওয়েলডিং নির্ভর করে নির্দিষ্ট মাপের বিদ্যুৎ-প্রবাহ, উপযুক্ত চাপ প্রয়োগ এবং ঠিক সময়ের মধ্যে ঠাণ্ডা করে নেবার উপর। এসব করতে হয় নিখুঁতভাবে বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের নিয়ন্ত্রণ করা হয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। শুধু তাই নয় সবটা প্রক্রিয়াই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রই করে, যন্ত্রচালকের কাজ শুধুমাত্র সুইচ টেপা এবং কাজটি হয়ে গেলে তাকে সরিয়ে ফেলে নতুন কাজ বসিয়ে দেওয়া।

কতকগুলো শিল্পে উচ্চমাত্রায় তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধাতুকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র এর উপরিভাগ অথবা

অভ্যন্তর উত্তপ্ত করে তোলার বিশেষ চাহিদা থাকে। এ ধরনের কাজ পূর্বে যা প্রায় অসম্ভব ছিল এযুগে তাই অনায়াসে করা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের দৌলতে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে। দেশজোড়া যে রেললাইন পাতানো আছে বা আমাদের কলকাতার বুকে যে ট্রামলাইন রয়েছে, এদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হল এই যে এর উপরিভাগ ভেতরের চাইতে বহুল পরিমাণে শক্ত ও মজবুত। তাছাড়াও খুব ধারালো ছুরি, কাঁচি বা কলকারখানায় বিবিধ যন্ত্রপাতিও এমনি শক্ত আবরণের ধাতুতে তৈরি। উঁচু মাত্রার তাপ প্রয়োগ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এমনি শক্ত আবরণের সৃষ্টি করা হয় ধাতু ফলকে। যে কোনো চুল্লী কিন্তু এ কাজে একদম অচল বললেই চলে। কারণ চুল্লীতে দিলে ভেতর বার সমপরিমাণেই উত্তপ্ত হয়। ইলেট্রনিক যন্ত্রে উচ্চ কম্পাঙ্কের পরবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় (Induction Heating) একাজ করা হয়। প্রক্রিয়াটা সংক্ষেপে এরকম। উচ্চ কম্পাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ একটা তারের কুণ্ডলী দিয়ে চালনা করা হয়। কুণ্ডলীর ভেতরে যদি কোনো ধাতব পদার্থ রাখা যায় তবে কুণ্ডলীর আবেগে পদার্থটির মধ্যে অনুরূপ উচ্চ কম্পাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হয়। এ ধরনের বিদ্যুৎ-প্রবাহের ধর্ম ধাতুর উপরিভাগ দিয়ে চলা, ভেতরে একদম যায় না বললেই চলে। উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন হলে কয়েক সেকেণ্ডেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ ছাড়া আর এক ধরণের কাজের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কাঠের কারখানায় বিভিন্ন আসবাবপত্তর তৈরির পূর্বে কাঠের ভেতর থেকে জলীয় অংশ বের করে নিতে হলে, বিশেষ আঠা লাগিয়ে দুটো কাঠ পরস্পর জুড়তে হলে, প্লাষ্টিক জাতীয় বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হলে ভেতর বাহির আগাগোড়া তাপ প্রয়োগ করতে হয়। এ ধরনের নানারকমের কাজেও উচ্চ কম্পাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে Dielectric Heating নামক বিশেষ প্রক্রিয়ায়। এ প্রক্রিয়ায় দুখানা সমান্তরাল ধাতু পাতে উচ্চ কম্পাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুতের চাপ প্রয়োগ করা হয়। ধাতুপাত দুখানার মাঝে বিদ্যুতের অপরিবাহী কোনো পদার্থ রাখলে উচ্চ কম্পাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎ চাপের প্রভাবে পদার্থটির আভ্যন্তরীণ অণুগুলো বিদ্যুতাবিষ্ট ও কম্পনশীল হয়ে ওঠে বলে, অল্প সময়ে পদার্থটির পুরোপুরি সবটা আয়তনই বেশ গরম হয়ে পড়ে। প্লাষ্টিকের ছোট

বড় ব্যাগ আজ আমরা ব্যবহার করি। ইলেকট্রনিক সেলাই কল ব্যবহৃত হয় এদের তৈরি করতে, ঠিক একই প্রক্রিয়ায়।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায়, আসন্ন বিপদ অথবা দুর্ঘটনার সঙ্কেতের কাজে এবং আরও বহুবিধ ব্যবহারে ফটো ইলেকট্রিক সেল যুক্ত নানারকম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ফটো ইলেকট্রিক সেল থেকে আমরা আলোক রশ্মির প্রভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাই। আলোর তারতম্যের উপর বিদ্যুৎ-প্রবাহেরও অনুরূপ তারতম্য ঘটে। নানাপ্রকার কৌশলে ফটো সেলের এই ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। সিজিয়াম, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি আলোক-স্পর্শকাতর পদার্থ দিয়ে ফটো সেলের ক্যাথোড তৈরি করা হয়। ক্যাথোডে আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। ফলে ইলেকট্রন-প্রবাহ শুরু হয় অ্যানোডের দিকে। আলো সরিয়ে ফেললে ইলেকট্রন-প্রবাহও বন্ধ হয়ে যায়। ফটো টিউব থেকে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় তা খুবই ক্ষীণ তাই অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে একে বেশ জোরালো করে নিতে হয়। এর চমকপ্রদ সব ব্যবহারের কথা আমরা জানি। যন্ত্রবহুল কারখানায় যন্ত্রচালকের হাত যদি অসতর্ক মুহূর্তে কোনো বিপদসঙ্কুল স্থানে গিয়ে পড়ে তবে এর দৌলতে যন্ত্র আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়ে তাকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রেহাই দেবে। হঠাৎ আগুন লেগে গেলে বা বাড়িতে চোর ডাকাত ঢুকলে আপনা থেকে সঙ্কেত-ঘণ্টা বেজে ওঠা, বিরাট সভামণ্ডপে কত জন শ্রোতার আগমন হল অথবা কারখানা থেকে শেষ পর্যন্ত কতগুলো প্যাকেট-বোঝাই মাল তৈরি হয়ে চলমান বেল্টের সাহায্যে বেরিয়ে আসছে তা গননা করা, কাগজ তৈরির কারখানায় বড়ো বড়ো রীলের গায়ে ঠিকমত কাগজ জড়ানো ও নির্দিষ্ট মাপে কাগজ কাটা, রঙবেরঙের ছাপার কাজে ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক রঙের ছাপ ফেলা, আগন্তুকের জন্যে আপনা থেকে দরজা খুলে বা বন্ধ হয়ে যাওয়া ; বিভিন্ন তরল পদার্থের বিশ্লেষণে, চুল্লীতে দাহ্য পদার্থের দহন ক্রিয়া ঠিকমত চলছে কি না পরীক্ষা করে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি নানান ধরনের ব্যবহার আমরা আজ দেখতে পাই ফটোটিউব দিয়ে গড়া অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের। একথা অনেকেই জানেন আমরা সিনেমায় যে সবাক ছবি দেখি বা টেলিভিশান দেখি সে সবের মূলেও রয়েছে এই ফটোসেলের ক্রিয়াকলাপ। Tele-photo, Radio photo বা Facsimileর কথা অনেকেই শুনেছেন। এদের মূলেও আছে ফটো-

ইলেকট্রিক সেল। এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ছবি সমেত খবর ছাপা হয়ে যায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। সত্যি, আশ্চর্য দীপের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ এই ফটো-ইলেকট্রিক সেলের।

ইলেকট্রনিক কমপিউটার যন্ত্র এ যুগের আর এক বিস্ময়। বড়ো বড়ো শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গবেষণাগারে এর আজ বহুবিধ ব্যবহার হচ্ছে। এদের ক্রিয়াকলাপ বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। মানুষেরই মত যেন এরা বুদ্ধি, বিবেচনা ও স্মরণশক্তির অধিকারী। এসব কমপিউটার দুরূহ গাণিতিক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং জটিল সব সমীকরণ অতি দ্রুত নিষ্পন্ন করে দিতে পারে। কতকগুলো বিশেষ যন্ত্রসমষ্টি নিয়ে এরা গড়া। প্রথমত এসব যন্ত্রের কাছে বিশেষ সঙ্কেত সাহায্যে প্রশ্ন বা সমস্যাটাকে তুলে ধরতে হবে। এর ভেতরকার control unit যন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যথাযথ নির্দেশ দেবে computation unitকে বিভিন্ন গণনার কাজ করতে। শুধু তাই নয়। গণনার শেষে ফলাফলটি লিপিবদ্ধ করে নেবে এবং বোধগম্য ভাষায় সেটি জানিয়ে দেবে যন্ত্রের সর্বশেষ স্তরে। ইলেকট্রনিক কমপিউটারকে বিভিন্ন শিল্পের নিখুঁত সব কাজে, গবেষণার ক্ষেত্রে অতি জটিল ও দুরূহ সব সমস্যা সমাধানের কাজে, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে অতি দ্রুত ও নিখুঁতভাবে হিসেবনিকেশের কাজে ব্যবহৃত করা হয়। হাজার হাজার ভাল্‌ব ও আনুসঙ্গিক সব যন্ত্রপাতি দিয়ে এরা গড়া, আকৃতিতেও বেশ, হয়তো পরপর কয়েকখানা কামরা জুড়েই বসবে। মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় এরা যোগ ও গুণ করার কাজে মানুষের চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশি দ্রুত। আসল সমস্যাটা হল সঙ্কেতের ছাঁচে প্রশ্নটাকে যন্ত্রের কাছে তুলে ধরা, ব্যস। তারপরে যন্ত্রের যা কাজ তা সে খুব কম সময়ের মধ্যেই করে দেবে।

তাহলে আমরা দেখতে পারছি যে ইলেকট্রনিক্সের বিবিধ যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্বয়ংক্রিয় ও আত্মনিয়ন্ত্রিত সব যন্ত্র ও কল তৈরি করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করাই এ যুগের বৈশিষ্ট্য। স্বয়ংক্রিয়তা বা automation এর কথা ইদানীং বেশ শোনা যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে রাশিয়ায় স্বয়ংক্রিয়তা শিল্পে এক নব যুগের সূচনা করছে। প্রশ্ন উঠতে পারে আগামী দিনে যদি সত্যি সত্যিই দেশ ছেয়ে যায়

এমনি স্বয়ংক্রিয় কলকারখানায়, শ্রমিকের চাহিদা কমে যায়, মানুষের পরিশ্রম করতে হয় কম, তার অবসরও আসে প্রচুর, তাহলে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে? প্রশ্নটা ভেবে দেখবার সন্দেহ নেই।

অতি আধুনিক বিজ্ঞান cybernatics সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা বোধ করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। cybernatics এখন আর শুধুমাত্র বিজ্ঞানীর কল্পনা বিলাস নয়। বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে রাশিয়া ও আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা লেগে গেছেন গবেষণায়। ইলেকট্রনিক কমপিউটার ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ও কার্যক্ষমতাকে বিজ্ঞানীরা দেখতে পাচ্ছেন মানুষেরি বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে। মানুষ ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এই দুই-ই কম বেশি শক্তির অধিকারী, শক্তির প্রয়োগে এরা কাজ করে, তাছাড়া দুয়ের ভিতরে বুদ্ধি, বিবেচনা ও স্মরণশক্তির একটা আপাতঃ সাদৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। আজ যে cybernatics বিজ্ঞান গড়ে উঠছে তার মূলে রয়েছে এই সাদৃশ্যকে নিয়ে উচ্চতর গবেষণা। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণায় জড় ও জীবের অনুভূতি ও বিভিন্ন উত্তেজনায় এদের প্রতিক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন এবং নিখুঁত সব যন্ত্রপাতি তৈরি করে তা প্রমাণ করে গেছেন। তাই অতি আধুনিক এ cybernatics বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন তিনিই অর্ধ-শতাব্দী আগে প্রথম করেছিলেন বললে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না।

এ যুগে ব্যবহৃত বহুবিধ জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিরাট আকার একটা সমস্যার কথা সন্দেহ নেই। আকারের কথা বাদ দিলেও এদের চালানোর ব্যাপারে বেশি মাত্রার বিদ্যুৎ-শক্তিরও প্রয়োজন। তাছাড়া যন্ত্রের ভেতরে অধিক তাপের সৃষ্টি হওয়া বা হঠাৎ কোন ভালব অকেজো হয়ে পড়াটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। উপরন্তু ব্যবহারের বিশেষ সুবিধের জন্য অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদে যন্ত্রের কদর বেশি। এসব সমস্যার কিছু কিছু সমাধান বর্তমানে করে দিয়েছে 'ট্রান্‌জিস্টর'। সামান্য একটি শস্যকণার মতো ক্ষুদ্রাকৃতি এর কিন্তু অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ। বিজ্ঞানীর ভাষায় ট্রানজিস্টর হল 'The Wonder Child of Electronics'। এতে কোনো তাপ প্রয়োগ করতে হয় না, সামান্য কয়েক ভোল্টের বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ করেই একে ট্রায়োড্ ভালবের অনুরূপ যে কোনো কাজে লাগানো যায়। এর দৌলতে নিত্য

নতুন ক্ষুদে ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। ট্রানজিস্টর, জার্মানিয়াম নামক ধাতুর স্ফটিক বা ক্রস্ট্যাল দিয়ে তৈরি। সাধারণ অবস্থায় জার্মানিয়ামে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা খুবই কম। কিন্তু দেখা গেছে যে অন্যান্য কয়েকটি ধাতুর সংমিশ্রণে এর পরিবাহিতা বেশ বাড়ানো যায়। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে জার্মানিয়ামের সঙ্গে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আর্সেনিকের সংমিশ্রন করালে এদের পরমাণু সংযোগ ব্যবস্থায় একটি বাড়তি ইলেকট্রন থেকে যায় আবার ঠিক বিপরীতটি ঘটে ইণ্ডিয়াম নামক ধাতুর সংমিশ্রনে; এক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি পড়ে যায়। এই ঘাটতিকে বলা হয় 'হোল' বা শূন্যস্থান পর ধর্ম ধন-বিদ্যুৎকণার মত। ট্রানজিস্টরে বিশেষ ব্যবস্থায় ওই মুক্ত ইলেকট্রন বা 'হোল'গুলির গতি নিয়ন্ত্রণ করার সাফল্যেই, ট্রায়োড্ ভালবের অনুরূপ কাজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ট্রানজিস্টারের আবিষ্কার ইলেকট্রনিক যন্ত্র বিজ্ঞানে এক যুগান্তর আনয়ন করেছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইলেকট্রনিক্স-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় এক্স-রের কথা। এক্স-রে ইলেকট্রনিক্সের প্রাচীনতম আবিষ্কার। জার্মাণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম রণ্টগেন ১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কার করেন। এক্স-রে টিউবের গড়ন ও ক্রিয়াকলাপ সংক্ষেপে বলছি। বড়ো আকারের বায়ুশূন্য কাঁচ-গোলকের একপ্রান্তে থাকে ক্যাথোড, গোলকের মাঝামাঝি বসানো থাকে বিশেষ ধাতু নির্মিত এ্যানোড। ক্যাথোড ও এ্যানোডের মধ্যে হাজার হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। উত্তপ্ত ক্যাথোড থেকে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনগুলো তারই প্রভাবে প্রচণ্ড গতিবেগে এ্যানোডে গিয়ে পড়ে। উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এই ইলেকট্রন বর্ষণে এ্যানোড ধাতুপাতের পরমাণু ব্যবস্থায় চাঞ্চল্য সৃষ্টিই এক্স-রের উৎপত্তির কারণ। আলো, তাপ ও বেতার তরঙ্গের অনুরূপ এক্স-রে ও বিশেষ এক ধরণের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতি হ্রস্ব, এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষাধিকভাগের এক ভাগের চেয়েও ছোট। সাধারণ আলো যে সব পদার্থ ভেদ করতে পারে না তার অনেক কিছুই এক্স-রের অদৃশ্য আলোর কাছে স্বচ্ছ, অর্থাৎ এক্স-রে এসব পদার্থ অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে। এক্স-রের এই বিশেষ ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এর বহুবিধ ব্যবহার। আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ অস্থি মজ্জার গঠন এক্স-রে ফটোর সাহায্যে ধরা পড়ে, তাই দেহের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শল্য চিকিৎসায় এক্স-রে চিকিৎসকের

পরম সহায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয় ছাড়াও এযুগে এক্স-রের বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা আমরা জানি। যে কোনো স্ফটিকের ভেতরকার অনুপরমাণুর বিন্যাস; ধাতু নির্মিত অংশ ঢালাই বা পেটাই হলে তার আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটি; বয়নশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্বাভাবিক ও কৃত্রিম তন্তুর গঠন প্রভৃতি বহুবিধ পরীক্ষা ও গবেষণার কাজে উপযুক্ত শক্তির এক্স-রের ব্যবহার চমকপ্রদ সন্দেহ নেই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহুবিধ গবেষণার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার বিজ্ঞানীর এক অভিনব আবিষ্কার। অতি সূক্ষ্ম রোগ-বীজাণু, জীব-কোষ প্রভৃতি যা সব এতদিন বিজ্ঞানীর চোখকে ফাঁকি দিয়েই এসেছিল, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তারা ধরা পড়ছে বিজ্ঞানীর চোখে। সাধারণ মাইক্রোস্কোপের কথা আমরা জানি—আলো ও কতগুলো লেন্সের কৌশলকে কাজে লাগিয়ে কেমন সূক্ষ্ম জিনিসকে আপাতঃ বড়ো আকারে প্রতিভাত করায়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে, ইলেকট্রন স্রোতকে কাজে লাগানো হয়। ইলেকট্রনের দুটো ধর্ম। একাধারে বিদ্যুৎ কণিকা অপর পক্ষে এরা তরঙ্গধর্মী। ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বিজ্ঞানীরা নিখুঁতভাবে মেপেছেন, জানা গেছে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ইলেকট্রনের গতি অর্থাৎ শক্তির ওপর নির্ভরশীল, গতিবেগ যত বেশি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও তত ছোট। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ইলেকট্রন তরঙ্গকে, বিশেষ কৌশলে তৈরি ইলেকট্রন লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত বা ফোকাস করার ব্যবস্থা থাকে। এর ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মাইক্রোস্কোপেরই অনুরূপ। আমরা জানি যে মাইক্রোস্কোপের বিশেষত্ব হল এই যে যত ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহার করা যাবে অদৃশ্যকে দৃশ্য করবার এবং খুব কাছাকাছি দুটো বস্তুকে পৃথকভাবে দেখানোর ক্ষমতাও তত বেড়ে যাবে। ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চাইতে বহুগুণ ছোট। তাই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের বিবর্ধন শক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা অনেকগুণ বেশি। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও, রসায়ন ও ধাতুবিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যার সমাধান আজ করছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ।

বিশেষ ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে তাপ উৎপাদন ও শিল্পে তার বিভিন্ন ব্যবহারের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এ ধরণের যন্ত্রের ব্যবহারের কথা জানা যায়। মানব শরীরের ব্যাধিগ্রস্থ

আভ্যন্তরীণ অংশকে অনেক সময় উপশমিত করা হয় তাপ প্রয়োগ করে। এই তাপপ্রয়োগের কাজে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের মস্তিষ্কের স্নায়ু, বাতব্যাধিতে পঙ্গু লোকের মাংসপেশী ও শিরা উপশিরা প্রভৃতি সঞ্জীবিত করার কাজেও বিবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ্যামপ্লিফায়ারের কথা আমরা আজ জানি যে, ক্ষীণ বিদ্যুৎ প্রবাহ ও চাপকে জোরালো করে তোলে এবং মাইক্রোফোন, এ্যামপ্লিফায়ার ও লাউডস্পীকারের সমন্বয়ে ক্ষীণ শব্দ জোরাল হয়ে ওঠে। আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অথবা হৃদপিণ্ডের ওঠা নামার সঙ্গে অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। বিশেষ উপায়ে এদের নিখুঁত সব এ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে জোরাল করে নেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই হৃদ্‌রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ চিকিৎসকেরা নিখুঁতভাবে দেখে নেন ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রে; জাগ্রত, সুপ্ত, উত্তেজিত অথবা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের মস্তিষ্কের খুঁটিনাটি ক্রিয়াকলাপ ধরা পড়ে ইলেকট্রো-এনসেফেলোগ্রাফ যন্ত্রে। বধিরের পরম বন্ধু শ্রুতি সহায়ক যন্ত্রও অতি নিখুঁত ও ক্ষুদে এ্যামপ্লিফায়ারের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে। গবেষণার স্তর পেরিয়ে সাফল্যের পথে আজ এগিয়ে আসছে দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র। বিধাতার অভিশাপে দৃষ্টি শক্তি থেকে যারা বঞ্চিত, অতি আধুনিক ইলেট্রনিক যন্ত্রপাতির উন্নততর যান্ত্রিক কৌশলের দৌলতে, অদূর ভবিষ্যতে তারাও ধন্য হবে আলোকের সন্ধান পেয়ে।

যে কোনো বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে নানাবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্র এযুগে অপরিহার্য বললেই চলে। তাছাড়া বর্তমান যুগে নতুন নতুন বিজ্ঞান উঠেছে গড়ে ইলেকট্রনিক্সের দৌলতে। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অজানা রহস্য আজ আমরা জানতে পারছি। খুব বেশিদিনের কথা নয়, ১৯৩২ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী কার্ল ইয়ান্‌স্কি বজ্র বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। নির্মল, মেঘমুক্ত আকাশ, বজ্রবিদ্যুতের কোন আশঙ্কাই নেই অথচ তাঁর গ্রাহক যন্ত্র সাড়া দিল। জোড়াল হিস্ হিস্ শব্দ তিনি শুনতে পেলেন ঠিক যেমনটি আমাদের বেতার গ্রাহক যন্ত্রে হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ টিউন করতে গিয়ে শোনা যায়। আকাশে উল্লেখযোগ্য কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না, শুধু দেখতে পেলেন মাথার উপর ছায়াপথের আবছা আলো। 'ওখান থেকে আসছে না ত'? বিজ্ঞানীর মনে

প্রশ্ন জাগল। একদিন, দুদিন নয় রোজই ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, আর ঠিক যেন তেইশ ঘণ্টা ছাপান্ন মিনিটের ব্যবধানে। রাতের পর রাত চলল তাঁর গবেষণা, তিনি নিঃসন্দেহে প্রচার করলেন যে আকাশ জোড়া ওই ছায়াপথ থেকেই কোনো না কোনো উপায়ে বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন মিশ্র বেতার-তরঙ্গ। তাঁর গ্রাহক যন্ত্রে এরাই ধরা দিচ্ছে হিস্ হিস্ শব্দ সমষ্টিতে, কখনও জোরালো কখনও ক্ষীণ যাকে বলা হয় Radio noise বা বেতার-শব্দ। ইয়ানস্কির আবিষ্কারের কথা শুনে অপেশাদারী বেতার বিজ্ঞানী গ্রোটে রেবার নেহাৎ শখের বশবর্তী হয়ে নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় যন্ত্রপাতি বসিয়ে ঠিক একই ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তিনি ইয়ানস্কির মতবাদ সমর্থন করে বললেন যে এই বেতার-শব্দ ছায়াপথ থেকেই আসছে। আমরা জানি ছায়াপথ অসংখ্য তারার সমষ্টি, ছায়াপথেই যদি বেতার শব্দের উৎপত্তি তবে আমাদের আশে-পাশের সব তারা অথবা আমাদের সূর্য থেকেও ত অনুরূপ বেতার-শব্দ আসা উচিত। আশ্চর্যের বিষয় পরীক্ষা করে এরা কেউ আশানুরূপ ফল পেলেন না। ইয়ানস্কি বা রেবারের পরে বিশেষ আর কেউই একাজে অগ্রণী হননি, দুটো কারণে। প্রথমতঃ মহাশূন্য থেকে আগত বেতার-শব্দের ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার কথা কারোর মনে হয়নি, দ্বিতীয়তঃ মহাযুদ্ধের তাগিদে বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ হল যুদ্ধেরই কাজে। যুদ্ধের শেষের দিকটায় ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা একটা আশ্চর্য ব্যাপার আবিষ্কার করলেন। শত্রু পক্ষের বিমানবাহিনীর কোন চিহ্নও নেই অথচ প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় তাদের সবগুলো রেডার গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ছে খুব জোরাল বেতার শব্দ। তবে কি শত্রুপক্ষের বিজ্ঞানীরা বৃটিশ রেডার যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ পঙ্গু করে দেবার উদ্দেশ্যে কোন কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করছেন? বিভিন্ন রেডার স্টেশনের রিপোর্ট এনে বিশ্লেষণ করে বৃটিশ বিজ্ঞানী স্ট্যানলি হে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এক্ষেত্রে সূর্য থেকেই বেতার-শব্দের উৎপত্তি। যুদ্ধোত্তর কাল থেকে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহুবিধ গবেষণা বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে।

রেডিও-ইলেকট্রনিক্স ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক বিচিত্র সমন্বয় আমরা দেখতে পাই বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞানে। বর্তমান বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আমরা দুটো পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ মহাশূন্যের বিভিন্ন উৎস থেকে আগত বেতার শব্দ নিয়ে গবেষণা, বিভিন্ন এরিয়েল সারি বা রেডিও-

টেলিস্কোপ ও উন্নত ধরণের বেতার গ্রাহক যন্ত্রের ব্যবহারেই যা একমাত্র সম্ভব হয়েছে ; দ্বিতীয়তঃ শক্তিশালী রেডার প্রেরক যন্ত্র থেকে হ্রস্ব রেডার তরঙ্গ পাঠিয়ে, ঊর্ধ্বাকাশে উল্কার আয়নিত পথচিহ্ন, মেরুপ্রভা বা অরোরা, চাঁদ ও গ্রহাদি প্রভৃতি থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৌলতে হাজার হাজার উল্কার গতি, প্রকৃতি ও পথের ঠিকানা, সূর্যের বহিরাবরণ, সৌর কলঙ্ক ও বিস্ফোরণ, ছায়াপথের প্রকৃতি ও গতি ; লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্তী বহু নীহারিকার স্বরূপ ও বিশেষত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা গেছে। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহুবিধ গবেষণা বিশ্বরহস্যের বিভিন্ন সমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করবে সন্দেহ নেই।

বিরাট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান যেমন পাওয়া যাচ্ছে বেতার-বিজ্ঞানের দৌলতে তেমনি অপরপক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু পরমাণু রাজ্যের অনেক গূঢ় রহস্যও এ যুগের বেতার-বিজ্ঞানীর কাছে ধরা পড়েছে। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে Microwave Spectroscropy বা মাইক্রোতরঙ্গ বর্ণালী-বিজ্ঞান রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের অন্যতম অবদান। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ প্রোটন ইলেকট্রনের কাঠামো অথবা অণুর আভ্যন্তরীণ তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বিন্যাস সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কোন মাইক্রোতরঙ্গ এরা শুষে নেবে আবার কতগুলো ক্ষেত্রে বিশেষ উত্তেজনার প্রয়োগে এরা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণ করবে। অণু পরমাণু রাজ্যে মাইক্রোতরঙ্গের এই শোষণ ও বিকিরণ সম্বন্ধে বহুবিধ গবেষণা এ যুগের রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে। এ সব গবেষণায় অণুপরমাণুর আভ্যন্তরীণ অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন।

মহাশূন্যে অভিযান বিজ্ঞানের অতি আধুনিক বিস্ময়। রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের সাফল্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে। স্পুৎনিক ও লুনিকের কথা সকলেই জানেন। এদের দৌলতে বিজ্ঞানীরা এ যুগে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে চাঁদে বা গ্রহান্তরে যাওয়াও যে একদিন সফল হবে সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। এদের চালানোর ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়েছে রকেট শক্তি। গত দু বছরে এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি। প্রথমটি

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে কৃত্রিম গ্রহরূপে ; দ্বিতীয়টি গিয়ে অবতরণ করেছে চাঁদে আর তৃতীয়টির মারফত আমরা দেখতে পেয়েছি চাঁদের অপর পিঠের ছবি। এরা সবাই যেন এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার। এদের আভ্যন্তরীণ নিখুঁত সব স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও বেতার ব্যবস্থার সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশের অনেক নতুন তথ্য আজ আমরা জানতে পেরেছি। বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুস্তরের চাপ ও তাপ, আয়নমণ্ডলের প্রকৃতি, সৌর আলোর বর্ণালী, মহাজাগতিক রশ্মির প্রকোপ প্রভৃতি অনেক কিছুই আজ বিশদভাবে জানতে পারা যাচ্ছে। তাছাড়াও এদের নির্ধারিত গতিপথে, কোনো অবস্থাতেই পথভ্রষ্ট হতে না দিয়ে ঠিকমত চালিয়ে নেবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বহুবিধ স্বয়ংক্রিয় ও আত্মনিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক কৌশল। একথা বলা যেতে পারে যে রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে এ যুগের বিরাট বিস্ময় স্পুৎনিক ও লুনিক।

লেনিনের কাছে ভারতীয় বিপ্লবীদের চিঠি

(লেনিনের নব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে)

মস্কো শহরের মাঝখানে ক্রেমলিনের কাছাকাছি তিনতলা একটা বাড়ি। বাড়িটা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন কেন্দ্রীয় স্মৃতি-সৌধ। এখানে দেখতে পাওয়া যাবে মহান নেতা লেনিনের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, তাঁর নিজের লেখা বইয়ের প্রথম সংস্করণ, যে-সব বই তিনি পড়তেন, কাজে লাগাতেন সেই বইগুলি। আর তারই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র—ফটো, ছবি, মূর্তি, দলিলপত্র। এর প্রত্যেকটি জিনিস দেখলেই মনে হবে কি এক অদ্ভুত অপূর্ব মানুষই না ছিলেন দুনিয়ার প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন।

হাজার হাজার জিনিসের প্রদর্শনী। প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনেই রয়েছে তার নিজস্ব কাহিনী। ঐতিহাসিক দলিলপত্রের ভিতরে রয়েছে ভারতবাসীদের পাঠানো একখানা অভিনন্দন-পত্র। আবছা হয়ে এসেছে লেখা। কালি মুছে-আসা বিবর্ণ সেই কাগজখানার দিকে তাকালেই পর্দার বুকে ছবির মতো অতীতের ঘটনাবলী একটির পর একটি ফুটে উঠবে চোখের সামনে।

উনিশশো সতেরো সালের নভেম্বর মাস। ৭ই নভেম্বরের রাত। লেনিনের নেতৃত্বে মজুর, কৃষক ও সৈনিকেরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করল। সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ। এমনকি সুদূর ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছল সে-খবর। ভারতের কৃষকরা যখন শুনল জমি সম্পর্কে লেনিন একটা আইন জারী করেছেন আর এখন থেকে রুশিয়ার জমির মালিক তারাই যারা জমি চাষ করে, তারা জানতে চাইল: কে লেনিন? কে সেই মানুষটি যিনি মানুষের জীবনে নিয়ে এলেন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি?

তারপর গর্কি যেমন লিখেছিলেন:

ভারতের সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে দীর্ঘ দিন ধরে ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারে জর্জরিত ভারতবাসীরা গোপনে শত শত কিলোমিটার বন ও পাহাড়ী পথ ভেঙে জীবন বিপন্ন করেও রুশিয়ায় যাবার উদ্দেশ্যে কাবুলে

পৌঁছতে চেষ্টা করল। আর যখন এসে পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল : কে এই লেনিন ?

সোভিয়েত রিপাবলিক ও লেনিন সম্পর্কে যখন তারা সঠিক খবর জানতে পারল, তাদের ভিতর থেকে বিশেষ করে কয়েকজন সাহসী লোক চেষ্টা করল রুশিয়ায় গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লেনিনকে তাদের সাদর অভিনন্দন জানাবে। প্রাভদা পত্রিকার উনিশশো আঠারো সালের এক সংস্করণে এই মর্মে একটি ছোট্ট খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, বিশেষ করে একজন বিশ্বস্ত লোক বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মস্কো এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক মাস লেগেছে তাঁর এখানে এসে পৌঁছতে। আর এই বাণী তিনি বহন করে এনেছেন লেনিনের কাছে :

"গণতন্ত্রের অনুকূলে যে মহান বিজয় লাভ আপনি করেছেন তার জন্যে ভারত আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে আপনি যে মহান মানবিকতার নীতি ঘোষণা করেছেন ভারত গভীরভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধাবান।

ঈশ্বরের কাছে ভারত এই প্রার্থনা করে যে তিনি যেন আপনাকে আপনার ঐ মহান আদর্শে অবিচলিত থাকার শক্তি দেন..."

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের ভূমিকায় লেনিন বিরাট গুরুত্ব আরোপ করতেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি, আর যে-সব সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাচ্যের দেশগুলোর জনগণকে শোষণ করে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে তাদের প্রতি লেনিন তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করতেন। এই সব প্রাচ্য দেশগুলি, বিশেষ করে চীন ও ভারতের মতো মহান জাতিগুল সম্পর্কে তিনি গভীর দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গেই বলতেন ; ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলনের বিকাশের পথ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন লেনিন। তিনি মনে করতেন যে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব এবং তুর্কী ও পারস্যের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী, যা নাকি রুশ বিপ্লবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত, এশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামকে তীব্রতর করার দিক থেকে এক নতুন প্রেরণা যোগায়।

উনিশশো উনিশ সালে রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট-এর ভারতীয় প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছলেন রুশিয়ায়। সোভিয়েত জনগণ তখন আক্রমণকারী

চোদ্দটি দেশের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত। প্রতিনিধিদল তাদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যুদ্ধের ফ্রণ্ট ও হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন আর আলাপ করবেন আহতদের সঙ্গে। ভলগার তীরের শহর সামারা (বর্তমান কুইবিশেভ) থেকে 'কম্যুনা' নামে যে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হত তার ১৯১৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল :

"ভারতীয় মিশনের প্রতিনিধিদল যাঁরা সামারায় এসে পৌঁছেছেন, দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা ভারতীয় জনগণের তরফ থেকে তাঁরা ১৭ই সেপ্টেম্বরের লাল ফৌজের সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিরা তাঁদের অভিনন্দনে দারুণ উৎসাহের সঙ্গেই সোভিয়েত রুশিয়ায় মেহনতী মানুষের স্বার্থে স্বাধীনতাকে যে প্রকৃত বাস্তবভাবে কার্যকরী করে তোলা হচ্ছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আর বলেন যে ভারতীয় জনগণ যারা ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের জোয়ালে নিষ্পিষ্ট, ইতিমধ্যেই তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে এভাবে তারা আর বেঁচে থাকতে পারে না। শুধু একটি মাত্র সুযোগের অপেক্ষায় তারা দিন গুনছে যেদিন ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের এই জোয়ালকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

এই সংক্ষিপ্ত অথচ মুখর দলিলটি থেকেই দেখা যায় যে ভারত ও সোভিয়েত জনগণের ভিতরে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই স্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লব ও বিশেষ করে ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তাকে এগিয়ে নিয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দমন ও নির্যাতনমূলক বিধিব্যবস্থা সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা করে সভা-সমিতির এক নতুন জোয়ার নেমে এল ভারতের বুকে। আবারও ভারতের মানুষ ফিরে তাকাল সোভিয়েত রুশিয়ার দিকে, লেনিনের দিকে, যাঁকে তারা তাদের বন্ধু বলেন মনে করত।

উনিশশো কুড়ি সালের চৌঠা মার্চ ভারতেই ভারতীয় বিপ্লবীদের একটা সভা হয়। সেই সভা থেকে এই প্রস্তাবটি তাঁরা পাঠান লেনিনের কাছে :

"সমগ্র নির্যাতীত শ্রেণী ও জনগণের মুক্তির জন্যে সোভিয়েত রুশিয়া যে বিরাট সংগ্রামে অবতীর্ণ, তার জন্যে ভারতের বিপ্লবীরা তাদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানাচ্ছে।

এই দলিলটি ভারত থেকে মস্কোয় এসে পৌঁছতে সময় লাগে আড়াই

মাস। প্রস্তাবটির প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান নায়ক ভারতীয় বিপ্লবী সঙ্ঘের কাছে এক অভিনন্দন বাণী পাঠান। ইংরেজীতে তর্জমা করে লেনিনের বাণী রেডিও মারফত দেয়া হল ভারতে। লেনিন লিখেছিলেন :

"আত্মনিয়ন্ত্রণের ও দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদীদের দ্বারা শোষিত জনগণের মুক্তির যে নীতি শ্রমিক ও কৃষকের প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে তার প্রতি আত্মসচেতন ভারতবাসী—যাঁরা অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তাদের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে তাঁদের এমন প্রাণবন্ত সহানুভূতি লক্ষ্য করে আমি আনন্দিত। একান্ত মনোযোগের সঙ্গে রুশিয়ার মেহনতী জনগণ ভারতের শ্রমিক-কৃষক জাগরণের দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছে। শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠন, তাদের নিয়মানুবর্তিতা, সহনশীলতা আর সমগ্র দুনিয়ার মেহনতী জনগণের সঙ্গে ঐক্যই হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত জয়লাভের একমাত্র পথ। মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে সমগ্র প্রাচ্যের জনগণের ভিতরে এই ঐক্য প্রসার লাভ করুক। যখন ভারতবাসী, চীনা, কোরিয়াবাসী, জাপানী, পার্শী ও তুর্কী শ্রমিক-কৃষক মুক্তির উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে, শোষকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ তখনই সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে। মুক্ত এশিয়া দীর্ঘজীবী হোক!"

মহান লেনিনের ভবিষ্যৎবাণী আজ সফল হতে চলেছে। এশিয়ার বহু দেশের মানুষ আজ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে অনেক দেশের মানুষ নিজেদের মুক্ত করেছে। ভারতও অর্জন করেছে তার স্বাধীনতা।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

তুর্গেনিভ নাকি লিখতেন খোলা জানালার মুখোমুখি বসে। পায়ের কাছে থাকত গরম জলের পাত্র।

রূপক হিসাবে ধরলে খোলা জানালা হচ্ছে বাস্তব আর গরম জলের পাত্র লেখকের প্রেরণা। বাস্তব লেখকের কাঁচামাল। মনের কর্মশালায় প্রেরণার উত্তাপে গলিয়ে তা থেকে লেখক তাঁর শিল্পকর্ম রচনা করেন।

কিন্তু ঠিক কিভাবে এই প্রক্রিয়াটা ঘটে?

সম্প্রতি পাঁচটি দেশের ষোলো জন লেখক বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন। 'পারী রিভিয়ু' পত্রিকায় তাঁদের এই মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। ম্যালকম কাউলির সম্পাদনায় এখন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।* লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন ই-এম ফরস্টার, ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক, ডরোথী পার্কার, আলবের্ত মোরাভিয়া, জেমস্ থারবার, জয়েস কেরি, উলিয়ম ফকনার, জর্জ সিমেনঁ, ট্রুম্যান কাপোট, ফ্রাঁসোয়া সাগঁ প্রমুখ। সকলেই কীর্তিমান লেখক, সমালোচক হিসাবেও দু-একজন বিশ্ববিশ্রুত। কাজেই লেখক হিসাবে এঁদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত নিশ্চয়ই পাঠক-সমাজের শ্রদ্ধা পাবে।

'পারী রিভিয়ু' পত্রিকার পক্ষ থেকে যাঁরা এই সব লেখকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এবং প্রশ্ন রচনা করেছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। তাঁদের কুশলতার জন্যই লেখকেরা এমন অন্তরঙ্গভাবে তাঁদের 'ট্রেড সিক্রেট' উদ্‌ঘাটিত করেছেন যা সমালোচকদের সাহায্য তো করবেই, সাহিত্যের শিক্ষানবীশদেরও কাজে আসবে।

ষোলো জন লেখক এত নানা বিষয়ে কথা বলেছেন যে এখানে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু একটি-দুটি প্রসঙ্গেরই আলোচনা করব।

গল্প লেখার মোটের উপর চারটি স্তর আছে। প্রথমে প্রেরণা, তারপর মনের মধ্যে তাকে কিছুকাল লালন করা, তারপর তাকে কাগজের উপর

* Writers At Work—Edited by Malcolm Cowley; Secker & Warburg. 21S.

কালির আঁচড়ে মুক্তি দেওয়া। তারপর পরিবর্ধন, পরিবর্জনের পালা। সকলেই যে একভাবে লেখেন তা নয়—কেউ লেখেন আর কাটেন, কাটেন আর লেখেন। কেউ বা এক নিঃশ্বাসে লিখে ফেলে তারপর আরম্ভ করেন কাটাকুটি। ডরোথী পার্কার পাঁচটা শব্দ লেখেন তো সাতটা শব্দ কাটেন। থারবার একটা গল্প পনেরো বার লিখেছেন। সিমর্নঁ'র 'মটো' কাব্যময় শব্দ দেখলেই কেটে দিতে হবে। আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের সঙ্গে কতই তফাত এঁদের। সম্পাদকদের তাগিদে একপাতা একপাতা করে লেখা দেন আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরা অনেকেই। এই কারণেই বোধ হয় অভ্যস্ত লেখকদের রচনার মধ্যেও এক এক সময় হাস্যকর অপটু হাতের ছাপ পড়ে।

চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে দু-একটি মূল্যবান নির্দেশ পাওয়া যায় ফরস্টারের বক্তব্যের মধ্যে। ফরস্টারের মতে লেখকদের আগেই মন স্থির করে নেওয়া উচিত উপন্যাসে কি ঘটবে। লিখতে গিয়ে পরিকল্পনার কিছু রদবদলের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আগে মন স্থির করা না থাকলে এলোমেলো পা ফেলতে হয়। উপন্যাসের চরিত্র বাস্তব জগৎ থেকেই আহরণ করা হয় কিন্তু তাই বলে তারা বাস্তবের অবিকল প্রতিকৃতি নয়।

কি করে বাস্তবের চরিত্র উপন্যাসের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়? "A useful trick is to look back up on such a person with half-closed eyes, fully describing certain characteristics. I am left with about two-thirds of a human being and can get to work. A likeness is not aimed at and could not be obtained, because a man is only himself amidst the particular circumstances of his life and not amid other circumstances....When all goes well, the original material soon disappears, and a character who belongs to the book and nowhere else emerges.

এ-সম্পর্কে ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের বক্তব্যও সমধর্মী। মরিয়াক বলেছেন, "There is almost always a real person in the begining, but then he changes so that sometimes he no longer bears the slightest resemblance to the original. In general it is only the secondary characters who are taken directly from life."

প্রসঙ্গত মরিয়াক একটা মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে আধুনিক উপন্যাস একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সে সংকট হচ্ছে এই যে উপন্যাস উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে। চরিত্রগুলিকে আলাদা করে চেনা যায় না।

মরিয়াক যদিও নিজে একজন কট্টর ক্যাথলিক এবং উদ্দেশ্য বলতে হয়তো তিনি ক্যাথলিক আদর্শের প্রচারই বোঝেন, কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রোগনির্ণয়ে তিনি ভুল করেন নি।

উদ্দেশ্য বিষয়ে মরিয়াকের বক্তব্যের সঙ্গে মোরাভিয়া অনেকটা একমত। "Writers like all artists, are concerned to represent reality, to create a more absolute and complete reality than reality itself. They must, if they are to accomplish this assume a moral position, a clearly concieved political, social and philosophical attitude; in consequence, their beliefs are, of course, going to find their way into their work. What artists believe, however, is of secondary importance, ancillary to the work itself. A writer survives *in spite* of his beliefs."

প্রসঙ্গত মোরাভিয়া একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তরুণতর লেখকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

মোরাভিয়া রোমের নিচুতলার মানুষদের জীবনযাত্রা তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। তারা যে ভাষায় কথা বলে লেখার ভাষা তা থেকে স্বতন্ত্র। প্রশ্নের জবাবে মোরাভিয়া বলেছেন, যে বাস্তবতার স্বাদ আনবার জন্য দু-একটা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করলেও তিনি মোটের উপর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিরোধী। I am not particularly predisposed to dialect literature. Dialect is an inferior form of expression because it is less cultivated form. এই ভাষায় সব আবেগ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সুতরাং an occasional word in dialect to capture a particular vernacular nuance ব্যবহার করেই তৃপ্ত থাকা উচিত।

তরুণতর লেখকদের মধ্যে অনেকে আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগের বাড়াবাড়িকে বাস্তবতার কৈবল্যপ্রাপ্তি বলে মনে করেন। কিন্তু ফুটনোট কণ্টকিত এই সব উপন্যাস বা গল্প পাঠকদের তৃপ্ত করে না—পীড়াই দেয়। নতুন কিছু করতেই হবে—সাহিত্যের পক্ষে এইটা সব সময় সুস্থ আদর্শ নয়। নতুন কিছু করার জন্যই যে সব বই লেখা হয়—দেখা যায়, অল্প দিনের মধ্যেই তা পুরানো হয়ে গেছে।

প্রদ্যোৎ গুহ

পুস্তক পরিচয়

চিত্রদর্শন ॥ কানাই সামন্ত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড। পঁচিশ টাকা ॥

শ্রীকানাই সামন্ত নিজে কবি ও শিল্পী। তাঁর কবিতা ও কবিতানুবাদ ছাড়াও, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রকলা সম্পর্কে লেখা তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধের সঙ্গে বাঙলা দেশের পাঠকসাধারণের পরিচয় আছে। সেই সব প্রবন্ধের কতকগুলি এবং ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত কয়েকটি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এগুলির শিরোনাম দেখেই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে: শিল্পের স্বরূপ; চিত্র; কারুকলা; ভারততীর্থদর্শন: ভারতীয় চিত্রকলা; কালীঘাটের পট; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ; গগনেন্দ্রনাথ; অবনীন্দ্রনাথ; নন্দলাল; শিল্পী রবীন্দ্রনাথ; শিল্পিত নেপাল; বাঙলার পল্লীচিত্র; চিত্রসূত্রাবলী।

আর সেই সঙ্গে এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে রঙীন ও একরঙা মোট ৫৮ খানি অতি সুন্দর প্রাচীন ও আধুনিক চিত্র যা এই গ্রন্থের খুব বড়ো আকর্ষণ। এই আটান্নখানি ছবির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অজন্তা ও বাগ গুহার এবং তাঞ্জোর বৃহদীশ্বর মন্দিরের ভিত্তিচিত্র থেকে শুরু করে আকবরনামাহ্-র একটি দরবারী মুঘলচিত্র, কাংড়া কলমে আঁকা দুটি ছবি, একটি উড়িয়্যা-পট, অনেকগুলি কালীঘাট-পট, একটি বীরভূম-পাটা এবং অবনীন্দ্র গগনেন্দ্র নন্দলাল রবীন্দ্রনাথ বিনোদবিহারী সুনয়নী দেবী রামকিঙ্কর ও অন্য কয়েকজন শিল্পীর আঁকা অনেকগুলি ছবি। শান্তিনিকেতনের বাইরের কোন চিত্রকরের ছবি যে এই বইয়ে স্থান পায়নি, সেটাও লক্ষণীয়। তাহলেও, এই সযত্নমুদ্রিত ছবিগুলি বইটির খুব বড়ো সম্পদ—যদিও অনেকগুলি ছবিই ইতিপূর্বে কোথাও-না-কোথাও পূর্বমুদ্রিত। এমন একটি সুমুদ্রিত-চিত্রসম্ভারে সজ্জিত গ্রন্থের জন্যে প্রকাশককে ধন্যবাদ।

এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে জানবার কথা অনেক আছে। ললিতকলা সম্পর্কে আমাদের যেসব প্রাচীন গ্রন্থ আছে, অথবা যেসব শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ললিত-

কলার স্বরূপ প্রকরণ রসলক্ষণ সম্বন্ধে ভাবনা-ধারণা লিপিবদ্ধ আছে, শ্রীকানাই সামন্ত এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে নানা জায়গায় সেগুলি উল্লেখ-আলোচনা করেছেন। অভিলষিতার্থচিন্তামণি, সমরাঙ্গণসূত্রধার, নারদশিল্প ইত্যাদি গ্রন্থে বা কোষগ্রন্থে চিত্রবিদ্যার করণ-প্রকরণ-উপকরণ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আছে। এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে সেগুলির বেশ কিছু উল্লেখ আলোচনা বা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে, এই বই পড়ে প্রাচীন ভারতের শিল্প-ভাবনার সঙ্গে পাঠকের তথ্যের দিক দিয়ে যে-পরিচয় ঘটবে তার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে এই সব সূত্র বা মন্তব্য বিচ্ছিন্ন আকারে নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। যেমন ভারতীয় ললিতকলা-শাস্ত্রের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মূল সূত্র হল চিত্রষড়ঙ্গ। আলেখ্যের রূপভেদ, প্রমাণ, সাদৃশ্য, বর্ণ ইত্যাদি ছটি প্রধান অঙ্গের কথা বলা হয়েছে এই-যে সুবিখ্যাত সূত্রটিতে, সেটা শুধু উদ্ধৃত হয়েছে বাৎস্যায়নের কামসূত্রম্ গ্রন্থের যশোধর-প্রণীত টীকায়। কিন্তু কোন্ আকরগ্রন্থ থেকে যশোধর এটি উদ্ধৃত করেছেন তা এখনও জানা যায় নি। পঞ্চদশী গ্রন্থের চিত্রদীপ অধ্যায়ে, শ্রীকুমার-বিরচিত শিল্পরত্ন গ্রন্থে ও অন্যান্য নানা স্থানে ললিতকলার দর্শন রসলক্ষণ তত্ত্ব ও স্বরূপ সংক্রান্ত বহু মূল্যবান সূত্র অথবা আলোচনা মন্তব্য টীকা ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে।

কলাবিদ্যা সম্পর্কে এই সব প্রাচীন ধ্যানধারণা-ভাবনাগুলির উল্লেখ বা আলোচনা এই 'চিত্রদর্শন'-এর নানা স্থানে করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ধনপালের তিলকমঞ্জরীও উল্লিখিত হবে বলে আশা করেছিলাম। এই রচনাটির অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধনপাল তাঁর কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে তদানীন্তন ভাবনা-ধারণাগুলিকে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সে যাই হোক, এই সব শাস্ত্রগ্রন্থে টীকাগ্রন্থে দৃশ্যকাব্যে শ্রুতিকাব্যে সাধারণভাবে ললিতকলা সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে আলেখ্যদর্শন আর চিত্রবিচার সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব তথ্য আর রীতিবিধি দেওয়া আছে, "সে-সবের সম্পূর্ণ ও সুসংগত তাৎপর্য-উদ্ধার সম্ভব হলে, ভারতীয় চিত্রকলার রীতি প্রকৃতি সম্পর্কে একালের আমাদের ধ্যান ও জ্ঞান প্রত্যয়পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হবে," বলেছেন লেখক। এবং মূল বইগুলি পড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় বলেই, এই বইটি পড়ে সাধারণ পাঠকের সেই ধ্যান ও জ্ঞানের সঙ্গে অন্তত: তথ্যের দিক দিয়ে মোটামুটি একটা পরিচয়

ঘটবে—এটা যে এই বইটির একটা সার্থকতার দিক; সে কথা আবার বলছি।

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'চিত্রসূত্রাবলী' প্রবন্ধটি। উপপুরাণ বিষ্ণুধর্মোত্তরম্-এর অন্তর্ভুক্ত এই চিত্রসূত্রাবলী খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সংকলিত বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পণ্ডিত ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস এর একটি মুদ্রিত পাঠ প্রকাশ করেন। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা বা অনুবাদ বিভিন্ন সময়ে করেছেন পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ('প্রাচীন শিল্প-পরিচয়'—১৯২৩); শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ (ইংরেজি অনুবাদ—১৯২৪); ও সম্প্রতি শ্রীহরিদাস মিত্র ('কনট্রিব্যুশন টু এ বিব্লিওগ্র্যাফি অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট অ্যাণ্ড ইস্থেটিক্স' —১৯৫১)। শ্রীকানাই সামন্ত এই বইয়ের শেষ প্রবন্ধটিতে এই চিত্রসূত্রাবলীর অনেকগুলি সূত্রের অনুবাদ দিয়ে যে তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন তা মূল্যবান।

মুশকিল বেধেছে সেইখানে—যেখানে সামন্ত মহাশয় তাঁর নিজস্ব তাত্ত্বিক-দার্শনিক মতবাদের পাখা মেলে এক অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উড্ডীন হয়েছেন।

সামন্ত মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভাববাদীর। তা নিয়ে কোন আপত্তি নেই। দৃষ্টিভঙ্গি ভাববাদীর হলেও, শ্রীকানাই সামন্তের বইটি পড়ে যে অনেক তথ্য জানা যাবে—বিশেষ করে আলেখ্যদর্শন সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ভাবনা-ধারণা সম্বন্ধে—সে কথা না হয় আরও একবার বলে রাখছি।

কিন্তু নানা জায়গায় সামন্ত মহাশয়ের এই ভাববাদকে যখন রীতিমতো ভাবালুতার উচ্ছ্বাসে ফেনিল হয়ে উঠতে দেখি, তখন একটু ফাঁপর ঠেকে। এই ভাবোচ্ছ্বাস-বহুলতার উদাহরণ হিসেবে 'চিত্রদর্শন' থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

'শিল্পের স্বরূপ' প্রবন্ধটিতে মুণ্ডকোপনিষদ থেকে—

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

একই বৃক্ষে দুই সুপর্ণসখা। একটি পাখি মধুর বা তিক্ত ফল ভোগ করে, অন্যটি চেয়ে দেখে।

—এই শ্লোকটি এবং তৎপরবর্তী শ্লোক-দুটি (যার পাঠ উদ্ধৃত করা

হয়নি) ব্যাখ্যা করে সামন্ত মহাশয় লিখছেন : "সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েনে বোনা জটিলঘন জালে বিজড়িত এই পাখি সহসা ঊর্ধ্বে চেয়ে আবিষ্কার করে আপন মহিমায়, আপন আলোকে প্রচ্ছন্ন, আনন্দিত, অবিচলিত, শান্ত ওই বিহঙ্গকে যে তার আপনারই স্বরূপ ; চেয়ে চেয়ে সত্তা থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে তার ক্ষণিক যতো উল্লাস আর অলীক যতো যাতনা, ক্লেশ—পার্থিব সুখ সেও তো নিশ্চিত দুঃখেরই সম্ভাবনা—চেয়ে দেখতে দেখতে আপন ঋত ও মহিমময় স্বরূপেই হয় এ আবৃত, পায় চিরন্তন আবাস ও নিঃশেষ আত্মপরিচয়।

"মুণ্ডক উপনিষদের আশ্চর্য এই রূপাখ্যান, মন্ত্রময়ী এই বাক্‌পরম্পরা, ঋজুগতি নিশিত শরের মতো বিদ্ধ হয়েছে দেখি নিখিল জীবন-রহস্যের অন্তরতম অন্তরে।" এবং এই প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক "মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে প্রণাম" জানিয়ে বলেছেন, "বৈদিক ঋষি-পরিদৃষ্ট মন্ত্রের বিদ্যুচ্চকিত উদ্ভাসে সংশয়মোহগহন মানস অন্ধকারে সহসা সত্যের দিশা দেখা দিয়েছে।"

তারপরে, এই ফলভুক বিহঙ্গ যে "দেহের আবরণস্তরে আবৃত এই মানবাত্মা" ছাড়া আর কেউ নয়, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না রেখে লেখক বলছেন : "এই মানুষ শিল্পী নয়, কবি নয়, স্বরূপদ্রষ্টা ঋষি নয়। শিল্পী কবি বা ঋষির পদবীতে কখন হয় সে উত্তীর্ণ? যখন আপন মুক্ত শান্ত নিরাবৃত স্বরূপ থাকে তার দৃষ্টি বা চেতনার গোচরে। যতক্ষণ সেই স্বরূপের ধর্মেই থাকে সে বিধৃত, যে ধর্মের স্বল্পও মহাভয় থেকে, অজ্ঞান ও মোহ থেকে ত্রাণ করে। যে পর্যন্ত আপনাকে সে জানে আপন স্বরূপেরই জ্যোতি ও চেতনার, শান্তি ও সমতার, স্বভাবগত ও সর্বগত আনন্দের নিষ্ক্রিয় আধার বা প্রণালীরূপে—উন্মুক্ত দ্বার বা বাতায়নরূপে। যেভাবে বা যে উপলক্ষেই হোক, অন্তরতম আত্মার সঙ্গে এই একাত্মতা যে ভাগ্যবান যে পরিমাণে অর্জন করে সেই পরিমাণেই সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠে তার শিল্প স্রষ্টৃত্ব কবিত্ব বা ঋষিত্ব।"

এ ধরনের মামুলি-ভাববিলাসবহুল আপাত-দার্শনিকতা আমাদের মতো শিল্পজিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকদের 'শিল্পের স্বরূপ' বুঝতে বিশেষ সাহায্য করছে না।

তেমনি, 'চিত্র' প্রবন্ধটিতে লেখক বলে নিয়েছেন যে তিনি অবনীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ আলোচনা করেছেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ-রচিত

পুস্তিকাটিতে চিত্রকলার ছটি অঙ্গের যে মূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠ—কংক্রিট—ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে, এই প্রবন্ধে তা বিশেষ নেই।

'চিত্রসূত্রাবলী'র মতো এমন নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ প্রবন্ধেও লথক এমন উক্তি করেছেন যা পড়ে পাঠক বেশ একটু কৌতুক বোধ করবে। যেমন, চিত্রসূত্রাবলীতে—সত্য বৈনিক নাগর আর মিশ্র—চিত্রের এই চতুর্বিধ শ্রেণীবিভাগ করে বৈনিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে "চতুরস্র ক্ষেত্রে না-দীর্ঘ না-উল্বণাকৃতি প্রমাণ স্থান এবং লস্ত-সমৃদ্ধ সুসম্পূর্ণ যে-রূপের লিখন তারই নাম 'বৈনিক'।" সামন্ত মহাশয় এ সম্পর্কে বলেছেন, "মূলে বৈণিক শব্দ আছে, আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন 'বীণা' বা 'বীণ' শব্দজ, অর্থাৎ সুরেলা, লিরিক্যাল।" কিন্তু এ অর্থ লেখকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়, "বণিজ্ বা বণিক শব্দের সঙ্গে বৈণিকের সুদূর কোন জ্ঞাতিত্ব আছে আছে কি-না" সে কথা তিনি প্রথম থেকেই ভেবে এসেছেন: "মনে হল, পাণিনি বোপদেব সকলেই প্রতিবাদী। কাজেই আশা ত্যাগ করেছি। এমন সময়ে পূজনীয় শিল্পী নন্দলাল বললেন, এ তো কমার্শিয়ল আর্ট-এর কথাই হচ্ছে, অন্য অর্থ এখানে আসে কৈ! অতএব তাঁর পাদবন্দনা করে, পাণিনি বোপদেবকেও দূর থেকে নমস্কার করে (ব্যাকরণের কিছুই জানি নে) অভীষ্ট বাগর্থেরই হেতু প্রদর্শন করতে হয়।"

এই অভীষ্ট বাগর্থের যে-হেতুটি তিনি প্রদর্শন করেছেন, তা হল—বি+ইন+ক থেকে বীনক এবং তা থেকে বৈনিকও সিদ্ধ হতে পারে। বিশেষভাবে সক্ষম দক্ষ অথবা প্রভু যিনি তিনিই বীনক—ক স্বার্থে, অথচ ব্যাখ্যাতার মুখ চেয়ে পরার্থেও বলা চলে—বীনকেরই চমৎকারজনক কৃতি হল 'বৈনিক'।" কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিশেষভাবে সক্ষম দক্ষ অথবা প্রভু যিনি তাঁর চমৎকারজনক কৃতি হলেই সেই আলেখ্যটিকে গুরুর পাদবন্দনা করে কমর্শিয়ল আর্ট বলে ধরে নেব কেন। যে-কোন সার্থক চিত্রই তো আলেখ্য রচনায় বিশেষভাবে দক্ষ ব্যক্তির চমৎকারজনক কৃতি। নন্দলাল মহৎ শিল্পী, তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু যেখানে যুক্তির অবতারণা করা দরকার সেখানে এই ধরনের ভক্তিবিহ্বলতা অবাঞ্ছনীয়।

শ্রীকানাই সামন্তের রচনা থেকে যে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি দিয়েছি, তার থেকে বোঝা যাবে, বিভিন্ন প্রবন্ধের নানা স্থানে অনেক জানার মতো তথ্যের সমাবেশ সত্ত্বেও, তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে এক ভাবাবেগের বাষ্পাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে

এমন একটা বক্তব্যকে উচ্ছ্বসিত ভাষার ঘনঘটায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে যে-বক্তব্য আসলে নিতান্তই আত্মমুখী, নির্বিশেষ আর বিমূর্ত।

'কালীঘাটের পট' প্রবন্ধটিতে একটি ফুটনোটে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আর্ট-ম্যানুফ্যাকচরস্ অফ ইণ্ডিয়া' বইটি থেকে কালীঘাটের পটুয়াদের সম্পর্কে একটা উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এই উদ্‌ধৃতিটুকু দিয়ে শ্রীকানাই সামন্ত এই দুষ্প্রাপ্য আর মূল্যবান বইটির প্রতি পাঠকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেজন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

রবীন্দ্র মজুমদার

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ॥ হরপ্রসাদ মিত্র। সুরভি প্রকাশনী। তিন টাকা ॥

হরপ্রসাদ মিত্রর কবিতা ভালো বা মন্দ লাগার আগেই বোঝা যায়। বোঝার আগেই ভালো বা মন্দ লাগে না। কবিতার এই গুণ সেকালে সুলভ ছিল। একালে সুলভ নয়। আর নয় বলেই তা বৈশিষ্ট্য যার ফল যশোলাভের অনুকূল। 'বোঝা যায় না' বলে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যাঁরা অনীহ 'বোঝা যায়' বলে হরপ্রসাদের কবিতা পড়ে, 'সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা' পড়ে তাঁরা স্পৃহা পোষণ করবেন।

শিমুল সত্যি ছিলো কি সেদিন
সেদিন নদীতে মেঘের ঢেউ
তাই ভেবে ভেবে পদ্য লিখব
লেখেনি যে সব অন্য কেউ।

দুর্বোধ্যতা যে আধুনিক কবিতার একটা লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক জীবনের জটিলতা ও অসংগতি থেকে এর জন্ম। অপরিমেয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে এর বিকাশ। জীবনের এই অন্তঃশীল আবর্তের আভাস হরপ্রসাদের কবিতায় অনুপস্থিত। সেই মহান অসন্তোষের অসুখ থেকে তিনি মুক্ত—যা একালের ছায়া অথবা ব্যাধি। একালের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ও গভীর উপলব্ধিতে যে অদৃশ্য রক্তক্ষরণ হচ্ছে, নিয়তই হয়ে চলেছে—তা থেকে তিনি দূরে, রোগের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সুস্থ।

তার মানে এই নয় যে তিনি শুধু সুখ আর সফলতার কবি। তার মানে এই নয় যে তাঁর কবিতায় অপেক্ষা বা বেদনা নেই।

কোনো খরশান বর্শা ফলকে নাম লিখে
কোনো টান টান ছিলাতে আমার মন ছিল।

দেহের নীচে পিষ্ট প্রাণ, প্রাণের ঘর শূন্য
যখন মন হাওয়ার লাগি হন্যে
দুঃখে কাটে দীর্ঘ দিন, কমে সহনশক্তি।
তখনো বাঁচি ভালোবাসার জন্যে।

অনুভবের এই সব ঘোষণায় তাঁর আক্ষেপ-বেদনা প্রমাণিত। এবং সত্যের সমর্থনে এরকম আরো সাক্ষী-সাবুদ অনায়াসে জোটানো যায়। তাছাড়া এরকম স্তবকের সুখশ্রুতি আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না যখন দেখি পাশাপাশি ভালোমন্দর সহ-অবস্থান এমন দুঃসহ সহ-অবস্থান।

চা খেতে খেতেই ছোট্ট দোকানে
লেগেছিল সে যে কী চুলোচুলি
মালিক চাকরে খিস্তি খেউড়
উলুড়ি ধুলুড়ি কী ধুলোধুলি।

হরপ্রসাদের কবিতার ক্ষেত্র প্রসারিত। তাঁর কল্পনা নানা দিকে ছড়িয়ে অনেক কিছু জড়িয়ে ব্যাপক। শহুরে জীবনের ক্লেদ ক্লান্তি নিঃস্বতা রোদ-বৃষ্টির যাদু, স্মৃতির দুঃখানুভূতি, সন্ধ্যাবিকেলের বিচিত্র রঙবদল, পার্কে-রেঁস্তোরায় জীবনের টুকরো টুকরো অবস্থান আর মাঝে মাঝে এরকম স্বগতোক্তি :

আমার বাড়ি শক্ত ইঁটে তৈরি নয়
দেয়ালগুলো অবিশ্বাস অবিশ্বাস।

এ সবের মিলিত সঙ্গীত একতারের নয়, অনেক তারের ঝংকারের মত তাঁর কবিতায় বাজে। এ বাজনায় নতুন ঘরানার চমক নেই। আছে তাল লয়ের শুদ্ধি আর খানিকটা সুরের খেলা। বাইরে চোখ মেলে তাকিয়ে যা দেখা যায়, অংশ হৃদয়কে নিয়োজিত করে যা বোঝা যায় তাই দিয়ে হরপ্রসাদের কবিতা তৈরি। তাঁর কবিতায় অন্তর্মুখী আবেগের অতলতা

নেই। বহির্মুখী বাতাসের সবল আলোড়নও নেই। আছে, সহজের স্বাতন্ত্র্য এবং সাধারণের শক্তি। এবং আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতার নাম। 'দোর খুলি', 'স্মৃতি বিস্মৃতি', 'নিকট বালি দূর জল', 'ইমারজেন্সি ওয়ার্ড', 'মনকে অতীতকে অনাগতকে।'

ওপরে যে কটি স্তবক নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত করা করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে যে হরপ্রসাদের কবিতায় রুক্ষতা নেই। ইঙ্গিতের চেয়ে ভঙ্গিতেই তিনি সিদ্ধ। তিনি প্রসাধনে পটু এবং উৎসের দিকে যেতে তাঁর আগ্রহ কম। তিনি খুব সাজিয়েগুছিয়ে লেখেন, লিখতে পারেন। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস-নিষ্ঠায় তাঁর কবিতা সাবলীল, সদা প্রস্তুত। প্রসঙ্গত, একথাও সত্য যে হরপ্রসাদ ছন্দের নানা পরীক্ষায় তাঁর প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রেখেছেন। এ প্রচেষ্টা অবশ্য অভিনন্দনযোগ্য, এবং একথাও স্মরণীয় যে আধুনিক কবিতা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। শব্দরা নতুন সাজ গায়ে তুলছে। এই রদবদলে যেন হরপ্রসাদের তেমন সায় বা আগ্রহ নেই। তিনি যেন একান্তই উদাসীন। তাই তার কবিতার সহজ স্বাতন্ত্রের জন্য, সুখশ্রুতির জন্য আমরা তাঁকে যত সাধুবাদই দেই না কেন বাংলাদেশে তরুণতম কবিকে তিনি ঋণী করতে পারেন নি।

চিত্ত ঘোষ

অন্তর্মনা ॥ জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। অগ্রণী বুক ক্লাব। দু টাকা ॥

অনিন্দ্য অন্তর্মনার নায়ক। বয়সে কিশোর। অনিন্দ্যর বাবা, অনিন্দ্যর মা, অনিন্দ্যর ছোড়দি, অনিন্দ্যর বন্ধুরা এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র। সুতরাং এককথায় অনিন্দ্যর অভিজ্ঞতাই হল অন্তর্মনার বিষয়বস্তু। যে-বিষয়বস্তু লেখক বেছে নিয়েছেন তার মধ্যে অনন্য সাধারণত্বের উচ্চাভিলাষ নেই। এবং এই সময়ের বাংলা উপন্যাস যখন বিষয়-গৌরবের জমকদার প্রদর্শনী, তখন দেখা যাচ্ছে দু-তিনজন তরুণ লেখক বিষয়মহিমাকে নয়, বিষয়ে প্রতিফলিত নিজ শিল্পীসত্তার অভিব্যক্তিকেই শিল্পকর্মের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেছেন। অন্তর্মনাতেও দেখা যায় যে অনিন্দ্যর অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিকের তথাকথিত খুঁটিনাটি জ্ঞানের নামান্তর নয়। লেখক বরং অনিন্দ্যর অভিজ্ঞতাকে অনুভব করতে চেয়েছেন। সেই অনুভব করার ভাষাও অনিন্দ্যর ভাষা। এই

অনুভব-ক্রিয়া এই উপন্যাসের মূল সৌন্দর্য। এর ফলে এমন এক শুদ্ধতার প্রসাদ এ-কাহিনীর ফলশ্রুতিতে লভ্য যা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের রিরংসা কলরোলের মাঝখানে দুর্লভ।

লেখকের যথেচ্ছা-বিলাসে এ উপন্যাস যা খুশি হতে পারত। হতে পারত, দরিদ্র শিক্ষক গৃহস্থের শিক্ষক-জীবনের বুকফাটা ট্র্যাজেডির অগ্নিময় কথাচিত্র। হতে পারত, ছোড়দির মনোবিকলনের—ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার আলো-আঁধারী মুহূর্তের রহস্যঘন কাহিনী। হতে পারত, কিশোর বালকের পাড়ার দিদিদের লুকুনো-চিঠি পৌঁছে দেবার বকশিস স্বরূপ তাদের বুকে মুখ গুঁজতে পারার স্বর্গ বর্ণনা। ব্যবসাবুদ্ধিহীন জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের এই বিশিষ্ট স্বর্ণ সড়ক পরিহার করেছেন।

যা তিনি পরিহার করেছেন এবং যা তিনি নির্বাচন করেছেন তা থেকেই স্পষ্ট হয় লেখকের মনোভাব। জীবন সম্বন্ধে এই মনোভাব বা attitude-এর উপর শিল্পোৎকর্ষের তারতম্য নির্ভরশীল। এই মনোভাবের প্রতিফলন থেকেই বোঝা যায় যে আলোচ্য লেখক কবিমানসের অধিকারী। অনিন্দ্যের মনকে লেখক ব্যবহার করেছেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মত নয়। ত্রিশিরা কাচের মত। দুর্বোধ্যকে বোধ্য করে তোলা এর উদ্দেশ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল না—লক্ষ্য ছিল, ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত আলোকের বর্ণ-বিচ্ছুরণের বিশুদ্ধতা। অনিন্দ্যর দুপুর-পালিয়ে দিপুর সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া, দেরিতে বাড়ি ফিরে ছোড়দির সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ, বাবা কোথায় যায় দেখতে গিয়ে সহপাঠী বিশ্ববন্ধুদের বাড়ি বাবার ট্যুইশনি করা আবিষ্কার, যে লোকটা তাদের স্কুলে খাতাপেন্সিল, রুলটানার স্কেল বিক্রি করতে আসে তার বিবরণ, বাংলার মাস্টার কুমুদবাবুর ছড়া বানানো খেলা, শ্বেতা-ছোড়দি-বলাইবাবুর অধ্যায় এবং শেষের দিকে দোতলা বাস, মনুমেন্টের তলা, এবং জনসমাবেশের অভিজ্ঞতা এবং পরিশেষে তারই স্বপ্ন। এই সমস্তই এই গ্রন্থে সেই অসীম-জীবনাগ্রহী কিশোর মনের বিচ্ছুরণ-শক্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে রূপময়। নিচের উদ্‌ধৃতি থেকে দেখা যাবে যে এ কত সাধারণ অথচ কত অসাধারণ। এটি একটি সন্ধ্যার বর্ণনা। অনিন্দ্য এরকম সন্ধ্যা অনেক দেখেছে। দেখেছে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, বাইরের আলো নিভে আসে, তাদের ঘরটা খুব অন্ধকার-অন্ধকার মনে হয় আর ছোড়দি দয়া করে জেলে দেয় হ্যারিকেনের আলোটা। ছোড়দির

মাথাটা নিচু, চোখ দুটো আলোর শিখার দিকে। মাথার চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো।

"অনিন্দ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ সময়। তবু তাকে বই নিয়ে বসতে হবে। কতকগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া পুরুনো বই। অনেক পাতা এলোমেলো হয়ে গেছে। নয়তো বা হারিয়ে গেছে। বইগুলো দেখলে তার মনে হয় এগুলো সে বহুদিন আগে বহুবার পড়ে ফেলেছে। আর নতুন করে পড়বার দরকার নেই। সমস্ত পাতার লাইনের তলায় দাগ কাটা। বইয়ের মাথায় কতজন যে কতবার নাম লিখে রেখেছে তার ঠিক নেই। তার নিজের নাম লেখবার এতটুকু জায়গা নেই। সে প্রত্যেকবার ভেবেছে যে এবারে দু-একখানা নতুন বই নিশ্চয় পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেছে বাবা এখান থেকে, ওখান থেকে পুরনো বইগুলো জোগাড় করে এনে দেবে। হ্যারিকেনের আলোয় বইগুলো খুলে ধরলেই তার চোখ জ্বালা জ্বালা করে ওঠে। সে পড়তে পারে না একটি লাইনও। তার কান্না পায়।"

অথবা,

"সে কেঁদে ফেলল। উপুড় হয়ে শুয়ে মুখটা এক হাতে চেপে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। যতো বেশি কান্না তার এলো ততো বেশি তার মনে হল কেউ তাকে একবার বলবে না কেন কাঁদছে সে। আর এ কারণেই তার কান্না আরো বেশি বেড়ে গেল।"

অথবা,

"সে বারবার ছোড়দির দিকে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ তার মনে হল এ ঘরটার মধ্যে ছোড়দিকে কেমন যেন বেমানান দেখাচ্ছে। ছোড়দি যেন অন্য বাড়ির মেয়ে, তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এক্ষুনি চলে যাবে।"

এইভাবে অনিন্দ্যর মনের আলোকে ফুটে উঠেছে অনিন্দ্যের জগৎ। যে জগৎ নিশ্চয় কলকাতা শহরের ক্লান্ত মন্থর নিম্নমধ্যবিত্ত মানসের স্বপ্নহীন বর্ণহীন জগৎ। কিন্তু এখানেও একটি কিশোরের মৃত্যুহীন মনের স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা, বেদনা এবং সম্ভাবনা বিকশিত হয়। বিশ্ববন্ধুকে বাবা পড়াতে যায় বলে অনিন্দ্যের মনে কোন ঈর্ষা নেই। তার বেদনা শুধু বাবা মিথ্যে কথা বলে কেন। বিশ্ববন্ধু তারই সহপাঠী। তাদের ঐশ্বর্যপূর্ণ পাঠকক্ষের আসবাবপত্র দেখে অনিন্দ্যের মনে শ্রেণী চেতনা জেগে উঠল এরকম কাঁচা ব্যাপার এ গ্রন্থে নেই। অনিন্দ্য শুধু ভেবেছিল যে অত সুন্দর সুন্দর চামড়ায় মোড়া বই যখন,

তখন ওগুলো নিশ্চয় কবিতায় বোঝাই। অরুদের বাড়ি টাকা আনতে গিয়ে অনিন্দ্য যখন আবিষ্কার করে যে বলাইবাবুরা বদলি হয়ে চলে গেছে তখন তার ছোড়দির প্রসঙ্গ মনে পড়ে না। সে ভাবে বলাইবাবুর মা যে বলেছিল—ওদের আর একদিন নিয়ে এস, অরু। চারদিকের কৃত্রিমতার মধ্যে অশ্রু এবং ক্ষোভের মধ্যে তুচ্ছতম অবকাশ পেলেও অনিন্দ্যর মন যেমন আনন্দশুদ্ধ হতে পারে, আবার অতি সাধারণ বিড়ম্বনাতেও বা কপটাচরণে তা তেমনি ভেঙে পড়ে। এক পথের পাঁচালির অপু ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় চরিত্র আর নেই।

অবশ্যই নিশ্চিন্দপুরের নিসর্গ-নির্মলতা এবং সাম্প্রতিক কলকাতার নাগরিক পরিবেশে পার্থক্য আছে। অবশ্যই অপুর নিসর্গ-স্নান এবং অনিন্দ্যের নাগরিক জটিলতার সঙ্গে সংঘর্ষ, এ দুয়েও পার্থক্য আছে। আর সে কারণেই দুই কবি-মনস্ক কিশোরের মধ্যে এক অন্তর্মুখীনতা ছাড়া আর কোনো সাদৃশ্য নেই। নিশ্চিন্দপুরের গ্রামপ্রকৃতি যেমন করে অপুর জন্যে তার স্নেহময় অঙ্ক মেলে ধরে রেখেছিল—কলকাতার আকাশে তার কোনো অবকাশ ছিল না। কাজেই অনিন্দ্যের জন্য পৃথক পৃথক বিন্যাস প্রয়োজন। এই শিল্পবিন্যাস এ রচনার অন্যতম শর্ত। স্বভাবতই এ বিষয়ে জ্যোতির্ময়বাবু সচেতন ছিলেন। কিন্তু এই সচেতনতার পূর্ণ ব্যবহার অন্তর্মনা উপন্যাসে হয় নি। আমার কাছে এইটাই উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি।

নিশ্চিন্দপুরের জগৎ অপুকে কেমন করে তিলে তিলে রচনা করেছে পথের পাঁচালী তারই কাহিনী। কিন্তু নিশ্চিন্দপুর যে অপুকে রচনা করল সে এক কল্পনাচারী অন্তর্মুখী কিশোর। কবিমনস্কতায় যার পরিচয়। নিশ্চিন্দপুরের প্রকৃতিতেও এর বেশি কোনো প্রশ্ন জাগায় নি। এমনকি ইন্দির ঠাকরুনের ব্যাপারটিও পরবর্তী অপুর স্মৃতিচারণে সম্যক ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং উপন্যাসের ন্যায়-ক্রম অনুসারে অপুর পরিণতি বা সৃষ্টি সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর্মনার কলকাতাই-পরিবেশ স্বপ্নধাত্রী নয়। অনিন্দ্যর বয়সও হচ্ছে জীবনের সেই সময় যখন বিস্ময়ের চিহ্ন মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে শুরু করবে, ফুটে উঠতে থাকবে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। অনিন্দ্যের কবিমনস্কতার ন্যায় অনুসারে শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞাতেই খুঁজে পাবে বিস্ময় এবং প্রেরণা। এবং এই ব্যাপারটি এই উপন্যাসে পূর্ণ বিধৃত হয় নি। আমার অনিন্দ্যকেও (দৃঢ় ভাবে বলছি—সর্বত্র নয়, মাঝে মাঝে) অপুর মতই অন্তর্মুখী স্বভাবের ব৻চ

মনে হয়েছে। অপুর গৃহপালিত আত্মার মুক্তিজগৎ ছিল প্রকৃতি এবং গ্রামের বিভিন্ন পরিবেশ। অনিন্দ্যের এ রকম কোনো মুক্তিজগৎ নেই। কিন্তু অনিন্দ্যের জগৎ যদি ছোড়দির স্নেহবিমুগ্ধ জগৎ মাত্র হয় (যেখানে 'বাবা মিথ্যে কথা বলে কেন' থেকে শুরু করে সব প্রশ্নই লীন হয়ে যায়) তাহলে অনিন্দ্যর মনে জিজ্ঞাসাচিহ্নের পরিস্ফুটন সম্পূর্ণ হতে পারে না। বহু সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত অনন্ত সম্পর্কময় মানুষের মন। অনিন্দ্যের ক্ষেত্রে তার একটা বড় অংশ বাদ গেছে অনিন্দ্যের বন্ধুসমাজকে পরিহারের ফলে। দিপুর কথা বা পানুর দাদার প্রসঙ্গে সে ক্ষতিপূরণ হয় নি। কলকাতার এমন এককচারী কিশোর, উপন্যাসে জীবনের সমগ্রতা আনতে পারে তখনই, যখন সমস্ত উপন্যাসকে স্বগত কথনের আঙ্গিকে ধারণ করা হয়। মাঝে মাঝে সে কারণেই জ্যোতির্ময়বাবু অনিন্দ্যকে দিয়ে সেই স্মৃতিচারণের কাজ করিয়েছেন।

তথাপি আমার অনিন্দ্যের মনকে মনে হয়েছে চমৎকার নীল আকাশ। শুভ্র মেঘখণ্ডের মত বিচিত্রাকৃতি ঘটনা, ঘটনাংশ সে মনের আকাশে ছায়াপাত করেছে ঠিকই, রেখাপাত করল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। অবশ্যই লেখকের একটা উত্তর এখানে থেকে যায়—মনোভূমি-প্রধান উপন্যাসে অনুভূতির রাজত্বটাই আসল কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন এই যে, অনুভূতির রাজত্বটা স্বয়ম্ভূ নয়। সেটাও বাইরের রাজত্বের ভাঙন-গড়নেরই ছায়া। সেই ইঙ্গিত এ উপন্যাসে রয়েছে। কিন্তু তা ইঙ্গিত মাত্র।

কিন্তু অবশ্যই এহ বাহ্য। কী হয়েছে-র থেকে কী হলে-হতে-পারত তা কখনই বড় নয়। বহুদিন বাদে একটা বাংলা উপন্যাস পড়ে স্নিগ্ধ অন্তঃকরণে আমরা বই মুড়ে ফেলতে পারি। সে স্নিগ্ধ অন্তঃকরণে আমরা তখন বইখানির বাজে প্রচ্ছদকেও ক্ষমা করে ফেলবার সুযোগ পাই।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ॥ রমেশচন্দ্র সেন। গ্রন্থভবন। দু টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ ॥
সাগ্নিক ॥ রমেশচন্দ্র সেন। সাহিত্য। তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ ॥

প্রবীণ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'শতাব্দী', 'কুরপালা', 'গৌরীগ্রাম' বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের দাবি রাখে।

আলোচ্য বই দুখানি তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস। প্রকাশ কাল যথাক্রমে ভাদ্র ও কার্তিক, ১৩৬৬।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের নায়িকা ইরা উচ্চ শিক্ষিতা আধুনিকা। শুধু আধুনিকা নয়, অতিআধুনিকা। ভালোবাসে প্রশান্তকে। কিন্তু প্রশান্ত ধনী নয়। তাই ইরার ধনী বাবা ইরাকে বিয়ে দিলেন ধনী ব্যবসায়ী দ্বিজদাসের সঙ্গে। উচ্চ শিক্ষিতা আধুনিকা ইরা বিনা প্রতিবাদে বিয়ে করল বাবার মনোনীত পাত্রকে। ভালোবাসল স্বামীকে, ভালোবাসে প্রশান্তকেও। দুজনকে ভালোবেসে, দুজনার ভালোবাসা পেয়েও ইরা নিঃসঙ্গ। কিন্তু কেন? একা একা মোটর চালিয়ে চলতে চলতে দূর আকাশে নিঃসঙ্গ একটা পাখির উপরে চোখ পড়ে ইরার।··· 'যদি সে উড়ে যেতে পারত আকাশ দিয়ে—নিজেকে মুক্ত করতে পারত মাটির বাঁধন থেকে।' আপনা থেকেই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয় উড়ন্ত পাখিটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। নিজের অজ্ঞাতেই সুর ধরে, 'আমি সুদূরের পিয়াসী।' তারপর···'একটা দীর্ঘশ্বাস, একটু অন্যমনস্কতা।' গাড়ি পড়ল পাশের খানায়।···'আঘাতের চিহ্ন নেই, চোখ দুটি তুলে ধরেছে আকাশের দিকে, কি যেন খুঁজছে।···ধীরে ধীরে চোখ দুটি বুজে এল।'

কিন্তু কেন? এখানেও সেই একই প্রশ্ন। বর্তমান যুগের তরুণ-মানসের গভীরে যে জটিল প্রশ্ন সঙ্গোপনে মাথা কুটছে প্রবীন লেখক সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা মাত্র করেন নি। তাই হয়ত এ ভার তাঁর উত্তরসূরিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি 'স্বধর্মে নিধণং শ্রেয়ঃ' নীতিরই অনুসরণ করেছেন।

সাগ্নিকের পটভূমিকা অগ্নি যুগ। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বারোটি তরুণ ও একটি তরুণী স্বদেশী মামলার আসামী। ইংরেজ সরকারের বর্বর পুলিসী সন্ত্রাস, নির্যাতন, প্রলোভন, সহকর্মীদের বীরত্ব, কৃতঘ্নতা, সন্দেহ, ঘৃণা আর ভালোবাসা—তারই ভিতর দিয়ে একটি বেদনা-মধুর প্রেমের ছবি এঁকেছেন লেখক। শুভাশিষ ভালোবাসে সুমিতাকে, সুমিতা শুভাশিষকে। আবার শান্তা ভালোবাসে শুভাশিষকে। এখানেও একটি ত্রিভূজ প্রেমের ব্যাপার। দলের নির্দেশে শুভাশিষ আদালতে স্বীকৃতি দিল। শুভাশিষকে ভুল বুঝল সুমিতা। সুমিতার প্রেম রূপান্তরিত হল ঘৃণায়। কিন্তু নীরব তপস্যা চলল শান্তার। হয়ত বা শেষ পর্যন্ত জয়ীও হল। কিন্তু বিপ্লবের মহত্তর আদর্শের পায়ে বলি হল সমস্ত হৃদয়াবেগ। যে আন্দোলনের পটভূমিকায় উপন্যাস-

খানি লেখা ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তার অবদান অনস্বীকার্য। অবশ্য ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে আমরা ঐতিহাসিকের নির্ভুল যথার্থতা দাবি করি না। তবুও ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনে এ যুগের অবদানের কথা স্মরণ করে এ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও কালকে কিছুটা ইতিহাসসিদ্ধ করার চেষ্টা করলে উপন্যাসের সুখপাঠ্যতা ক্ষুন্ন হত না। বরং একখানি মহৎ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত। প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে এটাই ছিল আমাদের প্রত্যাশা। তবুও আশা করি উপন্যাস দুটি জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

সত্য গুপ্ত

চরকাশেম ॥ অমরেন্দ্র ঘোষ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ। ৩.৭৫ নঃ পঃ ॥

নাগিনী মুদ্রা ॥ অমরেন্দ্র ঘোষ। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ। ৩.৫০ নঃ পঃ ॥

...

চরকাশেম উপন্যাসের পটভূমি পূর্ববাংলার নদী কেন্দ্রিক কোমল আবহাওয়া আর দিগন্ত বিস্তৃত পদ্মার চর। পদ্মার ঘূর্ণিকুটিল আবর্তে সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাত্রা এই উপন্যাসে রূপায়িত। ভাঙ্গার মধ্যেই যে সৃষ্টির সার্থকতা নয়, গড়াতেই তার শ্রেষ্ঠত্ব; প্রবীণ লেখকের কাছে একথা অজ্ঞাত নয়। তার প্রমাণ চরকাশেমের ঘটনাবলী এবং তার টানাপোড়েনে মূল চরিত্রগুলির সদর্থক গুণাবলীর বিকাশে। পদ্মা যেমন একদিকে ভাঙে, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আবার আর একদিকে সে-কালের ডুবে যাওয়া জনপদ ভেসে ওঠে। একালের কাশেমের আশা-স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখা হয় 'চরকাশেম'। 'কলরব আর কোলাহল, ভালবাসা আর হিংসা—আর মহাজনী লোভ আর ঠিকাদারী নারীমৃগয়া' এর পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে নবজীবনের নতুন উপনিবেশ। কালচক্রের আবর্তনে কাশেমের আশার নৌকা বারবার দিকভ্রান্ত হয়। 'তেরশ পঞ্চাশ আসে চরকাশেমের বুকে'। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার, আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যন্ত্রের বিরুদ্ধে চরকাশেমের সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। চরকাশেম উপন্যাস হলেও চরের জীবন্ত মানুষগুলি লেখকের কাছে যে প্রত্যক্ষ সত্য, তা ভূমিকা পাঠ না করেও বোঝা যায়। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের অজস্র কৃত্রিম মানুষের মধ্যে চরকাশেমের মানুষগুলি দোষে-গুণে সত্যিকারের মানুষ হয়ে

উঠেছে। অমরেন্দ্র বাবুর কাছ থেকে, এ জাতীয় মানুষের পরিচয় আরো পাব, এই আশা যে আমাদের সকলেরই তা চরকাশেমের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশই প্রমাণ করছে।

কিন্তু কিঞ্চিৎ সংকোচের সংগেই স্বীকার করতে হচ্ছে, যে মানবপ্রেম অমরেন্দ্র ঘোষের বৈশিষ্ট্য, 'নাগিনী মুদ্রা'-তে তা অনেকাংশে অদৃশ্য। পলিমাটি আর নোনা জলাভূমি বেষ্টিত বাংলার পল্লীগ্রামের ফসল-ঘাঁটা মানুষ বিলাসের অকস্মাৎ বিলাসী হবার সাধ হয়, কিন্তু ভূবন চৌধুরীদের ঝাড়-লণ্ঠনওলা দরদালানের বৃহৎ পটভূমিকা না সৃষ্টি করতে পারলে মতিবিবিকে নাচানো যাবে না—শ্যালক কানু এ ব্যাপারে বিলাসের উত্তেজনা বর্ধনকারী। ফরেস্টার বিশ্বনাথ ওঝার অবসরপ্রবণ খেয়ালী স্মৃতিচারণার ফসল এই কাহিনী। ফলে অমরেন্দ্রবাবুর স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এ-গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত এক জাতীয় ফ্যান্টাসির সৃষ্টি করেছে। ভাল জায়গা না হলে নাচবে না—মতি বিবির এই জাতীয় একটা ব্যক্তিগত খেয়ালকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত এই কাহিনী আবর্তিত। তাহলেও ভাষা ব্যবহারে ও উপমায় মুন্সিয়ানার ছাপ রয়েছে। চমৎকার একটি গল্পও আছে।

মতি নন্দী

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

ক্ষিতিমোহন সেন লোকান্তরিত হয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের সাধনায় এই মনস্বীর অবদান ভবিষ্যতেও স্মরণযোগ্য হবে। মরমীয়া সাধকদের জীবন ও দর্শনের নতুন ভাষ্যকার হিসেবে তিনি বাংলা-সংস্কৃতির এক দিগন্ত উন্মোচনে অগ্রনীর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনবোধ ও বিশ্বভারতীর গঠনকর্মেও আচার্য ক্ষিতিমোহনের অবদান সামান্য নয়।

যখন পৃথিবীব্যাপী কবির জন্ম শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন হচ্ছে, ঠিক তখনই শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহান্তর আমাদের মনে গভীরতর শোকের কারণ ঘটায়।

তবে আপন কীর্তি ও ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্র সান্নিধ্যের কারণে উত্তরকালেও তিনি সংস্কৃতিবান মাত্রেরই শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

অক্ষয়কুমারের শতবার্ষিকী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারে হলেও 'এষা'র কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের শতবার্ষিকী পালন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কালের অমোঘ নিয়মে অক্ষয়কুমার আজ প্রায় বিস্মৃত। কিন্তু উনিশ শতকে ছদ্ম মহাকাব্যের অবসান ও নবীন গীতিকাব্যের সূচনা লগ্নে—অক্ষয়-কুমারের ভূমিকা ঐতিহাসিক।

অক্ষয়কুমারের অত্যন্ত ব্যক্তিক ভিত্তির গীতিকবিতায়ও বহু মানুষের পদধ্বনি সে যুগে শোনা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসূরীদের প্রয়াসে বাংলা কবিতার এই উন্নত পর্যায়ে বড়াল কবিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

অভিনন্দন

গত ১৯শে মার্চ পঞ্চাশ বছর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে সংবর্ধনা জানান হয়েছে। সর্বস্তরের গুণী ও সাধারণ মানুষের উদ্যোগ এবং উপস্থিতিতে

অনুষ্ঠিত এই সভায় যোগ দিতে পেরে আমরা গভীর আনন্দ লাভ করেছি। বিমলচন্দ্র বয়েসে ও কবি-কর্মে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতায় উজ্জ্বল। সুতরাং তাঁর প্রতি এই সময়োপযোগী আন্তরিকতা প্রকাশে আমাদের পক্ষে আহ্লাদিত হবার কারণ আছে। এই অনুষ্ঠানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের আনন্দ দিয়েছে। গ্রামের কৃষক, কারখানার মজুর, আপিসের কেরাণী এবং বহুখ্যাত দেশনেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় প্রায় দু হাজার টাকা সংগ্রহ করে বিমলচন্দ্রের জীবন ও কবিকর্মের প্রতি শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে অর্পণ করা হয়েছে। এই ঘটনাটি গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত।

প্রবীণ এবং নবীন বহু লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এই উপলক্ষে 'অর্ধশতাব্দী' নামে একটি নাতিবৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। বিমলচন্দ্রের কাব্যকলার মূল্য বিচারে এই সংকলন উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করবে, এমন আশা সঙ্গতভাবেই করা যায়।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘদিন অসুস্থ এবং দৈন্যদশায় পীড়িত। তবু তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চা আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাথেয় করে তিনি দীর্ঘজীবী হোন, বাংলা কাব্য সাহিত্যকে যথার্থ সমৃদ্ধ করুন—আমরা সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করি।

চিত্রাঙ্কনে কেন্দ্রীয় আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন 'পরিচয়'-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শিল্পী সোমনাথ হোড়। আমরা প্রথমাবধি তাঁর গুণমুগ্ধ। কিছুদিন আগেও তাঁর শেষ প্রদর্শনী দেখে গভীর আনন্দ পেয়েছি। শ্রীযুক্ত হোড়ের সম্মানে তাই আমরাও সম্মানিত।

সামগ্রিক কবিকর্মের স্বীকৃতিকে এই বছরের 'উল্টোরথ' পুরস্কার পেয়েছেন মণীন্দ্র রায়। 'পরিচয়'-এর একজন নিয়মিত লেখক ও ঘনিষ্ঠ সুহৃদের এই সম্মানে আমরাও গৌরবান্বিত। মণীন্দ্রবাবুর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'অমিল থেকে মিলে' কিছু আগে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যচর্চার অবিচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করে আমাদেরও ক্রমশই তাঁর সঙ্গে মিলের পথে সহযাত্রী হবার বাসনা সুদৃঢ় হচ্ছে।

আফ্রিকার গান

পারীর দেওয়াল যখন ক্রুশ্চফের সংবর্ধনায় মুখর হয়ে উঠল, দিল্লীর রাজপথে যখন নাসেরের পা পড়েছে, চৌ-এন-লাই যখন ভারতবর্ষে যাত্রার আয়োজন করছেন—তখন খবর এল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি ভিজে গেছে কালো মানুষের রক্তে। এবং এবারও দেখা গেল সে রক্তের রঙ লাল।

কাগজের এই ছোট্ট সংবাদটিও প্রায় একই সময়ে চোখে পড়েছিল। জনৈক তরুণ মার্কিনী ঔপন্যাসিক দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রো সমাজের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ জীবন পর্যবেক্ষণের অভিপ্রায়ে ডাক্তারী কৌশলে দিন কয়েকের জন্য কালা আদমী সেজেছিলেন। তারপর শ্বেতাঙ্গদের হাতে তাঁর যে মর্মান্তিক লাঞ্ছনার ইতিহাস আমরা জেনেছি, তা শুনলে মানুষ চমকাতেও ভুলে যায়। সভ্যতাভিমানী আমেরিকান সমাজের নরকে বিদ্বেষ, অপচয় ও বিনাশের আগুন এখনও জ্বলছেই।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যখন সোভিয়েটের ভালবাসা প্রসারিত হতে যাচ্ছে তখন ফ্রান্সের আণবিক বিস্ফোরণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতা-বাদের বর্বরতা, আমেরিকায় ধনতান্ত্রিক নীরোর বেহালাবাদন আমাদের কাছে একটি সত্যই সূচিত করে।

মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেদনায় 'আফ্রিকা' লিখেছিলেন। হয়তো তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর পূর্বাহ্নেই আমরা আফ্রিকার নবজন্ম দেখতে পাবো।

দেবী

পর্দাটা অন্ধকার হয়ে গেল। তৃতীয় নয়ন ভেসে উঠল, তারপর দুটি চোখ। অন্ধকারের মধ্যে চোখ তিনটি আশ্চর্য অনিবার্যতার মত এক প্রৌঢ়, বিপত্নীক, সংস্কারাচ্ছন্ন জমিদারকে তাড়া করে নিয়ে গেল পুত্রবধূর শয়নকক্ষে। প্রতাপান্বিত অথচ স্নেহময় শ্বশুরকে মা সম্বোধনে প্রণাম করতে দেখে দয়াময়ীর সুকুমার পা দুটি কুঁচকে গেল, হাতের নরম নখ বসে গেল শক্ত দেয়ালে। তারপর দেবীর জন্ম।

আমাদের বিচারে 'দেবী' সত্যজিৎ রায়ের সবু থেকে উচ্চাকাংক্ষী প্রয়াস। তাঁর ট্রিলজির সমস্যা মূলত সম্পর্ক বোধ, পরিবেশ ও সময়ের দ্বন্দ্বে গঠিত। দেবীতে উপরন্তু একটি চরিত্রের অদৃশ্য উপস্থিতি আগাগোড়া অনুভব করা

যায়। অপুর সংসারে অপর্ণার মৃত্যু প্রসঙ্গে এই নিয়তি এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে আসতে পারত। কিন্তু 'দেবী'র সূচনা অর্থাৎ টাইটেলেই তার দেখা মিলল।

অলক্ষ্যে নিয়তির উপস্থিতি আর প্রত্যক্ষে মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস ও পারিবারিক বিন্যাসের দৃঢ়ভিত্তিতে সত্যজিৎ গোটা কাহিনীকে বেঁধেছেন। তাঁর ছবির ভাষা স্বতন্ত্র। যদিও ইওরোপের কাছে তাঁর ঋণ সামান্য নয়, তবু একথা সত্য নিজের ভাষা আবিষ্কারে সত্যজিৎ রায় প্রথমাবধি অকুণ্ঠ নিরীক্ষায় এগিয়েছেন। বারবার নিজেকে অতিক্রম করাই তাঁর সাধনা।

নিছক স্বপ্নদর্শনের দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করলেই সত্যজিৎ কল্পনায় কত প্রাগ্রসর অথচ মননে কি পরিমাণ বাঙ্গালী, তা স্পষ্ট হবে। আধুনিক সাহিত্যে আমাদের বহু লেখক রূপকল্প, প্রতীক, স্বপ্ন, চিন্তাপ্রবাহ, মনোবিশ্লেষণের আশ্চর্য অবতারণায় য়ুরোপীয় লেখকদের কাছে নিজেদের ঋণের স্পষ্ট পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় স্বপ্নের চোখও যে পটের চোখ হওয়া দরকার—তা সব সময় তাঁরা মনে রাখতে পারেন না। আধুনিক জীবন ও শিল্পের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক আবিষ্কারে সত্যজিৎ সে কারণেই সদাসতর্ক।

আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন অথচ কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন ও সূক্ষ্ম প্রবাহে ঐক্যবদ্ধ জীবনকে ধরাই সত্যজিতের পথ। দুই নব্যযুবকের মুখে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ অথবা উনিশ শতকের উদারনীতিক অধ্যাপকের অবতারণা কিংবা পুত্রের অভিযোগের উত্তরে বিচলিত পিতার ধ্রুপদী কাব্য আবৃত্তি সে কারণেই আমাদের কাছে অপরিহার্য মনে হয়। তাই বৃদ্ধ জমিদারকে চাক্ষুস দেখার আগে নেপথ্যে তাঁর স্খলিত পাদচারণায় দীর্ঘস্থায়ী খড়মের শব্দ আমাদের মনে শুধু একটা মধ্যযুগীয় জমিদারবাড়ির আবহাওয়াই সৃষ্টি করে না, চরিত্রটিরও আভাষ দেয়।

যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রেখে পরোক্ষে, আভাষে, পরিবেশ তৈরি করা সত্যজিতের বিশেষ কবিধর্ম। 'পথের পাঁচালী'তে প্রকৃতি, পশু, পাখি এমনকি, মাছি আর মরা ব্যাঙও তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। 'অপরাজিতে' সর্বজয়ার বাড়ির পেছনে ট্রেণ লাইনে বারবার গাড়ি যেতে দেখেছি। 'দেবী'তে সত্যজিৎ সাহায্য নিয়েছেন ধ্বনির। নানারকমের শব্দ, বিশেষতঃ ঝিঁঝির ডাক রাতগুলিকে করেছে ভয়াবহ। সমস্ত কাহিনীর

রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ সৃষ্টিতে ও দয়াময়ীর রুদ্ধ বেদনা প্রকাশে এই প্রয়াস অসামান্য সাফল্য এনেছে।

আঙ্গিকগত কৌশলে সত্যজিৎ রীতিমত প্রবীণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতীক-ব্যঞ্জনা সৃষ্টির মোহে বা ক্যামেরা এ্যাঙ্গলে চমক দেখাবার চেষ্টায় কোন দৃশ্যই ছবি ছাপিয়ে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে না। 'অপুর সংসারে' কয়েকবার আমাদের এ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। শুধু দয়াময়ীর দেবী-খ্যাতির পর সুশংখল জনতার দীর্ঘ সারিটি আমাদের কৃত্রিম মনে হয়েছে। অথচ টাইটেলে মাটির কাঠামো, মূর্তি, পূজা, বলি এবং তারপরই যেন রক্তের ফিনকি তুলে আকাশে বাজি উড়ল এবং সব শেষ প্রতিমার ভাসান—শুধুমাত্র এই অংশটুকু বিশ্লেষণ করলে ক্যামেরার অসামান্য কৌশল, সেট তৈরির আশ্চর্য শিল্পবোধ এবং গোটা ছবির পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রতীক ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা মনকে অভিভূত করে। অপুর সংসারে অপু যেখানে পাণ্ডুলিপির পাতা উড়িয়ে দিচ্ছে, কাহিনীর পক্ষে সেই অমোঘ অথচ সৃষ্টিতে কৃত্রিম দৃশ্যটির সঙ্গে এখানে কতো পার্থক্য। প্রাচীন নাটকের মত অত্যন্ত শক্ত হাতে একেবারে শুরুতেই পরিচালক গোটা ছবির কথা বলে দর্শকের নাট্যকৌতূহল জাগ্রত করেছেন।

আধুনিক শিল্পীর সেই অপরিহার্য প্রবণতা সত্যজিতেও উপস্থিত। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য ও কবিতার ব্যবধান কমছে। আলোকচিত্রে রেখাচিত্রের প্রভাব পড়ছে। আর ফিল্ম যখন সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি তাবৎ শিল্পকলার সমবায়ে গ্রথিত, তখন স্বভাবতই আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষাও কিছু পরিমাণে বদলাচ্ছে। নিছক স্থুল ঘটনার সংঘাতই তাঁর প্রধান উপজীব্য নয়। মোটা দাগের কাজও তিনি সর্বত্র পরিহার করেছেন। সত্যজিৎ কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ এবং দর্শকের কল্পনা ও অনুভব শক্তির প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে একটি অখণ্ড বক্তব্য হাজির করেন।

সে কারণেই দয়াময়ী কম কথা বলেছে। তবু তার ওপর আরোপিত দেবীত্বের পাষাণভার, পরবর্তীকালে আপন দেবীত্ব সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দুঃসহ দ্বন্দ্ব, শেষে প্রায় শিশুহত্যার মাধ্যমে মোহভঙ্গ—সব মিলিয়ে একটি জীবনের যন্ত্রণা অনায়াসে বুঝতে পারি। আর এই আশ্চর্য যন্ত্রণার একদিকে মধ্যযুগীয় সংস্কার মাথা খুঁড়ছে, অন্যদিকে উনিশ শতকের নবীন চেতনা ক্ষোভে গর্জাচ্ছে। কিন্তু নিয়তির অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে মানুষের পরাজয় হল। শিল্পের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও মূঢ় সংস্কারের

হাতে জীবনের লাঞ্ছনার মহৎ বেদনা সৃষ্টিতে এইভাবে সত্যজিৎ সাফল্যের দিকে এগিয়েছেন। শিল্পের নামে বক্তব্যবিহীনতার সোনার পাথরবাটি সৃষ্টিতে কোনদিন তাঁকে ব্যাপৃত দেখি নি।

দয়াময়ীর মৃত্যুতে শ্বশুরের স্বপ্নভঙ্গের ট্র্যাজেডি আরও নিষ্ঠুর এবং বলিষ্ঠভাবে এলে এ ছবি আমাদের বিচারে অসাধারণত্বের মর্যাদা পেত। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে নিজের এ্যাটিচিউড নিশ্চিত ছিল না বলেই 'দেবী' 'অপরাজিতে'র মত মহৎ সৃষ্টি হলনা। অথচ 'দেবী'তে মহত্ত্বের সমস্ত উপাদানই আছে।

'দেবী' সম্পর্কে কিছু তকমাধারী সমালোচকের কটূক্তি আমরা সকৌতুকে উপভোগ করেছি। প্রতিভার লাঞ্ছনা বাংলা দেশে এই প্রথম নয়। চলচ্চিত্র ফিল্মের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে আধুনিক জাগৃতির সূচনা 'পথের পাঁচালী'তে এ সত্য অস্বীকার করার মূঢ়তা যেন আমাদের না হয়! সিনেমার পোস্টারও যে উঁচুদরের শিল্পকর্ম, তা কি আমরা দু-দিন আগে ভাবতে পারতাম?

সমালোচকের কাজ ব্যাখ্যা করা। সত্যজিতের ছবির ভাষা, তাঁর আঙ্গিকগত প্রয়াসের বিশিষ্ট পদ্ধতি, তাঁর বক্তব্য—সরল, তরল এই দেশে তথাকথিত সাধারণ দর্শকের সহজেই ভালো লাগার কথা নয়। তাছাড়া সৎ ছবি দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কম, ঐতিহ্যের তো কোন বালাই নেই। তাই সমালোচকরা সৎ এবং স্থিতধী না হলে এই নতুন শিল্প আন্দোলনের পক্ষে জনপ্রিয় হওয়া শক্ত। তবু আশার কথা আজ চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ দর্শকও ভাবতে শিখছে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা ও পরীক্ষা

এ বছর কলিকাতায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীরা পুনরায় তিনদিন পরীক্ষা পণ্ড করেছেন। পরীক্ষাভঙ্গ আন্দোলনের রীতিমত একটা প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ ইনভিজিলেটারদের মারধর করা, যে কলেজে পরীক্ষা হচ্ছে সেই কলেজের প্রিনসিপ্যালকে অপমান করা এবং চেয়ার-বেঞ্চি, জানলা-দরজা ভেঙ্গে দেওয়া, ইচ্ছুক ছাত্রদের খাতা ছিঁড়ে ফেলা, এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে অভিযান করে সেখানে পরীক্ষা পণ্ড করা, ইত্যাদি!

মাঝে মাঝে ধ্বনি ওঠে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আমাদের ক্রুদ্ধ তরুণ যুবকেরা পরীক্ষকদের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করে চান একটা নিউ অর্ডার! এই নিউ অর্ডারটার মূল কথা হল ছাত্র-ছাত্রীরা যেসব প্রশ্ন প্রত্যাশা করেন, যেগুলি সম্বন্ধে তাঁরা 'সাজেসচান্‌স্‌' বা 'টিপ্‌স্‌' পেয়েছেন, সেই সব প্রশ্নই প্রশ্নপত্রে থাকা চাই! নইলে বুঝতে হবে যে, তাঁদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে!!

'সাজেসচানস' দেওয়ার ব্যাপারটা মূলতঃ বোধ হয় নির্দোষ আমোদের পর্যায়ভুক্ত। মাস্টার মশাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মাধ্যমিক-বোর্ডের গত বছরের প্রশ্নপত্র বাদ দিয়ে, তার আগের তিন চার বছরের প্রশ্নপত্র থেকে আন্দাজে বাছতে আরম্ভ করেন কি কি প্রশ্ন আসতে পারে। যে নীতি অনুসারে প্রশ্ন বাছাই হয় তা নিছক জুয়াড়ীর কুসংস্কার! মাস্টার মশাই নিজেই সব চেয়ে ভাল করে জানেন যে, আন্দাজী প্রশ্নের একটাও 'কমোন' না আসতে পারে! তবু তিনি আশায় আশায় থাকেন যদি মিলে যায় এবং ছাপা অক্ষরে প্রশ্নপত্র না দেখা পর্যন্ত যাবতীয় দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন! মাস্টার মশাই যে প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন বাছাই করেন ছাত্রেরা নিজেরাই অবশ্য সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে প্রশ্ন বাছাই করতে পারেন। জুয়াড়ী হিসাবে মাস্টার মশাইদের যোগ্যতা ছাত্রদের যোগ্যতার চেয়ে একটুও বেশী নয়। তবু মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে এলে 'সাজেসচানস'গুলি অদ্ভুত এক পদমর্যাদ লাভ করে। এ বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্রের মনোভাব অত্যন্ত প্রিমিটিভ!

বেশীর ভাগ ছাত্র অধীত বিষয়কে কিছুমাত্র আয়ত্ত না করেই পরীক্ষা দিতে আসেন। সুতরাং কয়েকটি বাছাই প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে তাঁরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। স্বভাবতই প্রাইভেট টিউটারের কাজ হল প্রশ্ন বাছাই করে ছাত্রকে সেই সকল প্রশ্নে তালিম দেওয়া। কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে 'সাজেসচানস' দেওয়ার প্রয়োজন অবশ্য নেই। কিন্তু তিনিও অনেক সময়ে নিজের কলেজের পশ্চাৎপদ ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ চেয়ে এবং কলেজের রেজাল্ট ভাল করার জন্য এই কাজে অবতীর্ণ হন।

কলেজের অধ্যাপক এবং অধিকাংশ প্রাইভেট টিউটার অবশ্য এমন কথা বলেন না যে, তাঁদের 'সাজেসচানস'-এর পিছনে কোনো ভিতরকার খবর আছে। তাঁরা এমন কোনো গ্যারান্টি দেন না যে, বাছাই-করা প্রশ্নগুলি আসবেই বা এইগুলি তৈরি করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী! কিন্তু আজকাল

আরো নানা ধরণের 'সাজেসচানস' বাজারে চলতে আরম্ভ করেছে। কোনো কোনো কোচিং প্রতিষ্ঠান 'সাজেসচানস'-এর ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে সাফল্যের গ্যারান্টি দেন এবং ফেল করলে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা অনেক সময়ে এই বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন যে, তাঁদের 'সাজেসচানস'-গুলির আশী শতাংশ বা নব্বুই শতাংশ 'কমোন' এসেছে। শর্টকাট বা মেড ইজি সিরিজের বইগুলি সম্বন্ধেও অনেক সময়ে এই ধরণের বিজ্ঞাপন বেরয়। তারপর আজকাল আমাদের পাতালপুরীর অর্থ ও মস্তিষ্ক নিযুক্ত হচ্ছে নিয়মিত ভাবে প্রশ্ন আউট করার কাজে! তাঁদের সাফল্য বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য! এ বছর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজীর তৃতীয় প্রশ্নপত্রের খানিকটা আউট হয়েছে। যতদূর মনে হচ্ছে, এ বছর মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ১৯৫৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী রচিত সব প্রশ্নপত্রই অল্পবিস্তর আউট হয়েছে। জনশ্রুতি এই যে, বিশুদ্ধ বলে বিজ্ঞপ্ত প্রশ্নপত্রের সমগ্র সেট ৪০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়েছে। এবং প্রো রেটা ভিত্তিতে আলাদা প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নপত্রের অংশবিশেষ পাতালপুরীর বাজারে কেনা-বেচা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এটা অবশ্যম্ভাবী যে পাতালপুরীর যেসব লোক সত্য সত্যই প্রশ্ন আউট করতে পারেননি, তাঁরাও ভিতরকার খবর বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেকী প্রশ্নপত্রের হাজার হাজার কপি বিক্রয় করেছেন। এইগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছয় এবং তাঁরা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত এইগুলির উত্তর তৈরি করেন। পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়ে যদি তাঁরা দেখেন যে, এই সব প্রত্যাশিত প্রশ্ন আসেনি তাহলে তাঁদের হিষ্টিরিয়া ব্যাপারটিকে অন্ততঃ বোঝা যায় যদিও তাঁদের মূঢ় ও উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসকার্য একান্তই নিন্দনীয়।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সিভিক্স, বাণিজ্যিক ভূগোল এবং পদার্থবিদ্যার প্রশ্নপত্রের মডারেশনের কিছু কিছু সুবিধা ও আবশ্যকতা হয়ত বিদ্যমান ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করবেন। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নপত্রগুলি এমন কিছু কঠিন হয়নি যে পাশ করা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। একই প্রশ্নের ভাষা একটু অন্যরকম হলেই বহু ছাত্র-ছাত্রী মনে করেন যে, অন্য প্রশ্ন দেওয়া হল এবং তাঁদের প্রত্যাশা ভঙ্গ করা হল! তথাকথিত সহজ প্রশ্ন এলেই কি সব পরীক্ষার্থী পাশ করতে পারেন? তা আদৌ সত্য নয়। অনেক বছর দেখা গেছে যে, সকল বিষয়ে প্রশ্নপত্র যথেষ্ট

সহজ হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রশ্ন সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো প্রকাশ্য বিক্ষোভ না থাকা সত্ত্বেও কৃতকার্যতার অনুপাত অত্যন্ত কম হয়েছে এবং অবশেষে গ্রেস নম্বর দিয়ে পাশের শতাংশকে জোর করে বাড়ানো হয়েছে। ছাত্রদের কোনরূপ বিক্ষোভ ব্যতীতই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পশ্চাৎপদ ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিশেষ অনুকম্পার সহিত চিন্তা করেন। এই কারণে উচ্চাত্মাদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট নিন্দিত। বিশ্ববিদ্যালয় যখন পশ্চাৎপদ ছাত্রদের কথা নিজে থেকেই চিন্তা করেন এবং যখন পাশের শতাংশকে বাড়ানোর জন্য গ্রেস নম্বর পর্যন্ত দেন, তখন পরীক্ষা ভাঙ্গার উচ্ছৃঙ্খল অন্তরের পিছনে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বা কি যুক্তি থাকতে পারে, তা বুঝতে পারা যায় না। দুটি প্রশ্নের উত্তর ভাল করে লিখলে এবং বাকী চারটি প্রশ্নকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নম্বর পাওয়া যায়। সিভিক্স, বাণিজ্যিক ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার প্রশ্নপত্রে যেসব ছাত্র দুটি তিনটি প্রশ্নও 'কমোন' পাননি, বুঝতে হবে যে, তাঁরা ন্যূনতম প্রস্তুতি বিনাই পরীক্ষা দিতে চান। তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে দাবী করেন যে, 'সহজ' প্রশ্নের ভিত্তিতে এই বছরই আবার পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোনো প্রশ্নকর্তার পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়, তথাকথিত 'সহজ' প্রশ্ন বলতে ছাত্রেরা কি বোঝেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্রশ্নকর্তারা সজ্ঞানে অত্যন্ত সহজ প্রশ্নই রচনা করে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মনোমত প্রশ্নকর্তা কোথায় পাওয়া যাবে? তারপর প্রথমবার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত না হয়ে উত্তর লেখার সৎ প্রচেষ্টা করলে তাঁরা যত নম্বর পেতেন, দ্বিতীয়বার পরীক্ষা গৃহীত হলে তাঁরা যে তার চেয়ে বেশী নম্বর পাবেন, এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। সহজ প্রশ্নপত্রের উত্তরকেও যথেষ্ট প্রশ্রয়ের সহিত না দেখলে বর্তমান অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের পনের থেকে কুড়ি শতাংশের বেশী কিছুতেই পাশ করতে পারবেন না।

এই জন্যই ছাত্রদের পরীক্ষা ভাঙ্গার ও আবার পরীক্ষার আন্দোলনটি শুধু যে উচ্ছৃঙ্খলতার ও ধ্বংসকার্যের কারণে একান্ত নিন্দনীয় তাই নয়, তা তাঁদের পাশ করার দিক থেকেও একান্ত মূঢ় ও অনাবশ্যক। উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন না করেই তাঁরা ইস্কুল থেকে কলেজে আসেন। ইস্কুলে ও কলেজে তাঁদের শিক্ষাদান করার ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা ফুলো বুড়ো আঙুলের মত আমাদের কাছে প্রকট! আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট এড়ানোর জন্য মাল খালাস করার প্রবৃত্তি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রোমোশন

দিই ও পাশ করাই। আমাদের শিক্ষা ফ্যাক্টরীগুলির উৎপাদনের টেকনিক ও স্ট্যাণ্ডার্ড অত্যন্ত অবনত। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা পরিসরে অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে এবং ইস্কুলে ও কলেজে অত্যন্ত অযত্নের মধ্যে লেখাপড়া শেখেন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য দায়ী নন। বরং তাঁরা এই শিক্ষাব্যবস্থার বলি! অত্যন্ত কম যোগ্যতা নিয়ে এবং মোটের উপর অতি সামান্য সাহায্য পেয়ে তাঁরা নিজেদের তৈরি ফুটো নৌকায় উচ্চতর পরীক্ষার সমুদ্র পার হতে চান। দুঃখ হয় যখন শুনি যে, উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার হলে ভূগোলের এক পরীক্ষার্থী অন্যকে জিজ্ঞাসা করছেন, রোম কোথায় এবং যখন উত্তর এল, ইটালীতে, তখন আবার প্রশ্ন করা হল, ইটালী কোথায়? কিংবা হয়ত প্রশ্ন উঠল, সাংহাই কোথায় এবং পাশ থেকে উত্তর এল, সাংহাই পিকিংয়ের রাজধানী! যে সামান্যতম প্রস্তুতির সহিত এবং যে অস্বাভাবিক অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং পরীক্ষা দিতে বসেন, সেই অবস্থায় সামান্য কারণেই বা অকারণেই তাঁদের মানসিক হিষ্টিরিয়া বোধগম্য!

শিক্ষাব্যবস্থার ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক। আমরা আজকাল এদেশে শিক্ষার নীচু মান দেখে লজ্জিত হয়ে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শিক্ষার মান বাড়ানোর কথা চিন্তা করছি। বাড়ানো অবশ্যই দরকার। কিন্তু শুধু পরীক্ষার মান বাড়ালেই যে শিক্ষার মান বাড়বে, দুর্ভাগ্যবশতঃ একথা সত্য নয়। শিক্ষার মান ও পরীক্ষার মান উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ। মোটের উপর দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভর করে। যদি শিক্ষার মান বর্তমান নীচু অবস্থায় থাকে, তাহলে শুধু পরীক্ষার মান বাড়ানোর চেষ্টা করলে উভয়ের অসাম্যের ফলে আরো অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। প্রশ্নপত্র রচনা করার সময়ে একথা মনে রাখা কর্তব্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছাত্রদের এক অংশ পরীক্ষাগৃহে হাঙ্গামা বাধিয়ে পরীক্ষা সমস্যাটিকে একটা অ্যাকাডেমিক সমস্যার স্তরে না রেখে এটিকে একটি রাষ্ট্রীয় আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যায় পরিণত করে ফেলছেন। ইতিমধ্যেই জেলখানায় বা কেল্লায় পরীক্ষা নেওয়ার রব ওঠানো হচ্ছে! কেউ কেউ পরীক্ষা সম্পর্কে সর্বপ্রথমে পুলিশী ও মিলিটারি ব্যবস্থার কথাই চিন্তা করছেন। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিন্তু ছাত্রেরা নিজেরাই এই অবস্থার সৃষ্টি করছেন।

ছাত্রদের দুর্নীতির ও জবরদস্তির নিন্দা করি, তবু মনে মনে এই দুর্বলতা আমাদের অনেকেরই মনে হয়ত খুব ভুল ভাবেই রয়ে গেছে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের যথাসম্ভব প্রশ্রয়দানই বয়স্ক লোকের বয়স্কতার পরিচায়ক। এরূপ আশা করতে পারা যায় কি যে, ছাত্রদের প্রতি বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের একান্ত শুভেচ্ছার কথা স্মরণ করে তাঁরা এবার থেকে নিজেরাই আত্মসমালোচনা করে ও সচেষ্ট হয়ে পরীক্ষাগৃহে হাঙ্গামার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবেন ? অন্ততঃ তাঁরা পরীক্ষা সমস্যাটির অ্যাকাডেমিক সমাধানের সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে দিন। ইতিমধ্যে সমগ্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হোক। প্রশ্নপত্র আউট করার নোংরা ব্যবসায়ে এবং ছাত্রদের পরীক্ষাভাঙ্গার ব্যাপারে প্ররোচনা দেওয়ার কার্যে পাতালপুরীর যেসব নৈঃশব্দ্যচারা লিপ্ত আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও মিলিটারীকে নিযুক্ত করলে অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটবে বলে বিশ্বাস করি।

অনিমেষ রায়

ভ্রম সংশোধন

মুদ্রণ-প্রমাদবশত ফাল্গুন সংখ্যায় লুই আরাগঁর প্রবন্ধটির অনুবাদক হিসেবে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের নাম ছাপা হয় নি।—সম্পাদক

সূচীপত্র

২৯শ বর্ষ ॥ বৈশাখ, ১৮৮২ ; ১৩৬৭ ॥ ১০ম সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

২৯ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৮৮২ ; ১৩৬৭

এই বৎসরে

গোপাল হালদার

একশত বৎসর পূর্বে ইং ১৮৫৯ থেকে ইং ১৮৬১, মোটামুটি এই সময়ের মধ্যে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য তার প্রস্তুতির পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে সৃষ্টির পর্বে পদার্পণ করে। সাহিত্য বলতে যদি রস-সাহিত্য বা কাব্য-সাহিত্য ধরা যায় তাহলে এই সময়েই সেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্য ভূমিষ্ঠ হয়, আর তারই পরম প্রকাশের সম্ভাবনা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হন রবীন্দ্রনাথ। আমরা বাঙালীরা যদি আগামী একটি বৎসর সেই কবির নামে আর আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের নামে উৎসর্গও করি তাহলে অন্যায় হবে না।

কবির জন্ম-শতবার্ষিকী শুধু অবশ্য বাঙালী বা ভারতবাসীই পালনের অধিকারী নয়, বিশ্বের সকল জাতিরই তিনি আত্মীয় আর আত্ম-সচেতন সকল জাতিই তা পালনে আগ্রহান্বিত। সোভিয়েত দেশ ও সমাজ-তান্ত্রিক জাতিরা এবং বিশ্বশান্তি পরিষদ তা পালনে ইতিপূর্বেই উদ্যোগী হয়েছেন—এ কথাও আমরা পূর্বেই জেনেছি।

এ উৎসব পালনের প্রধান দায়িত্ব ও গৌরব বিশেষ করে তবু আমাদেরই —ভারতবাসীর। পৃথিবীর অন্য জাতির অন্য পরিচয় আছে, তাঁরা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন, বিজ্ঞানের আলোক জেলেছেন। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের চিন্তার রাজ্য বিস্তার করেছেন। আমাদের কিন্তু আধুনিক কালের পৃথিবীতে সেরূপ পরিচয় নেই। ইতিহাসের কাছে আমাদের 'পরিচয় বুদ্ধ ও অশোকের নামে—আর বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর নামে। টাটা-বিড়লার নামে কোনো শ্রদ্ধাই আমরা বিশ্ববাসীর মনে জাগাতে পারব না; গান্ধীজীর নাম করেই দাবি করতে হয় সে-সভায় আসন, রবীন্দ্রনাথের নাম করেই দাবি করতে হয় স্বীকৃতি। একথা, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও

সুবিদিত। 'বুদ্ধ-জয়ন্তীর' মতই 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীও' যে জাতীয় মহিমা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদারই অতুলনীয় উপকরণ, সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের এ চেতনা আছে। স্বভাবতই তাই 'বুদ্ধ-জয়ন্তীর' মতই রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালনেও তাঁরা আগ্রহশীল; রাজ্যে-রাজ্যেও তাঁরা রাজ্যোৎসবের নির্দেশদানে কার্পণ্য করেন নি।

নিশ্চয়ই রবীন্দ্র-উৎসবের বিশেষ দায়িত্ব আমাদের, বাঙালীদের—ভারতবর্ষের অন্য জাতির নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বপ্রকাশ হলেও বাঙলা ভাষাতেই তা স্বচ্ছন্দ; বাঙলা ভাষাও সেই প্রতিভাতেই স্বমহিমায় সচেতন। পৃথিবীতে সে ভাষার পরিচয়—বাঙলাই রবীন্দ্রনাথের ভাষা—the tongue that Tagore Spake; আর বাঙালীরও পৃথিবীতে এই পরিচয়ই যথেষ্ট—'আমরা রবীন্দ্রনাথের জাতি।' বৎসরের পর বৎসর 'পঁচিশে বৈশাখে'র উৎসব যেমন করে আমাদের বিজয়া ও সরস্বতী পূজার মতই জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই—বাঙলা ১৩৬৭ সালের এই দিনটি থেকে আমরা ১৩৬৮ সালের সেই দিনটির জন্য দিন গুণব। গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উৎসাহে বান ডাকবে। কারণ, কবি-পূজা, বাঙালীর একটা বিশিষ্ট কৃতিত্ব ও প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে জয়দেব জন্মেছিলেন কেন্দুবিল্বে। সাত-আট শত বৎসরের এপারে—বল্লাল সেনই বলি, আর ধর্মপালই বলি—কারো স্মৃতিই এসে পৌছয় নি, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এতদিন ধরে পালিত হয়ে আসছে কেঁদুলীতে জয়দেব ঠাকুরের মেলা। পৃথিবীতে এমন অভিনব কবিপূজার ব্যবস্থাও বোধ হয় আর কোথাও নেই, পুরাতন কবিপূজার ঐতিহ্যও বোধ হয় আর কোনো জাতির নেই। রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবেও যদি আমরা 'মেতে না উঠি' তা হলেই তা হবে বিস্ময়কর।

পরম সৌভাগ্যক্রমে স্বাধীনতা লাভের পরে জাতির এই আগ্রহকে আজ আমরা রাজ-মহিমায় রূপায়িত করবার মত সুযোগও লাভ করেছি—যে সুযোগ ১৯২১-এর 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' পালনে, বা ১৯১১-এর 'রবীন্দ্র-সংবর্ধনা'কালেও আমাদের ছিল কল্পনার অতীত, ১৯৪৭-এর পরে সেই সুযোগও আমাদের করায়ত্ত। দায়িত্ব পালনের যে অধিকার আমরা এখন লাভ করেছি তাতে সমুচিত মহিমায় এ উৎসব পালন করতে না পারাই হবে আমাদের পক্ষে দুরপনেয় অপরাধ—পৃথিবীও তা ক্ষমা করবে না, ইতিহাসও না।

বাঙলার সমস্যা হয়তো এখানেই :—জনসাধারণের আন্তরিক উৎসাহ ও রাজ্য পরিচালকদের অভ্যস্ত জন-বিমুখতার মধ্যে একটা সুসঙ্গত সম্পর্ক গড়ে তোলা—আক্ষুদ্র সকল মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসকে সার্থক হতে দিয়েও সমগ্রভাবে রাজ্য ও জাতীয় প্রয়াসের পরিকল্পনা করা ; যাতে রবীন্দ্র-উৎসব সর্বাঙ্গীণ হয় ও সার্বজনীন হয়, সর্বব্যাপক হয় ও সুশৃঙ্খল হয়, আর কবির মর্যাদার ও জাতির মমতার সমন্বয়ে হয় সম্পূর্ণ ও সার্থক।

বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্রোৎসব যেভাবে পালিত হতে যাচ্ছে, তাতে বাঙলার উৎসবে ত্রুটি ঘটলে তা হবে আমাদের জাতীয় কলঙ্ক, স্বাধীনতার যুগের অনস্বীকার্য অপঘাত, জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনারও দূরপনেয় অপমান।

সর্ব-ভারতীয় সংকল্প

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের সংকল্প ভারতবর্ষের কোথায় কীভাবে রূপায়িত হচ্ছে, তা সঠিক রূপে জানা এখনো প্রায় অসম্ভব। পরিকল্পনা বোধ হয় কোথাও সম্পূর্ণ হয় নি—সংকল্প আলাপ-আলোচনার স্তরেই এখনো বহু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

ভারত-সরকারের থেকে একটি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে—ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে এ-উপলক্ষে 'জাতীয় নাট্যশালা' বা ন্যাশনাল থিয়েটর প্রতিষ্ঠিত হবে—কবির নামে হবে তার নামকরণ ; আর এই 'জাতীয় রঙ্গশালা' প্রতিষ্ঠায় ভারত সরকার প্রত্যেক রাজ্যকে যথোচিত (এক লক্ষ টাকা ?) করে অর্থসাহায্যও করবেন। নয়াদিল্লীতে নৃত্য-নাট্য আকাদমির বিরাট ভবন নির্মাণ প্রায় আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যসমূহের মধ্যে অন্ধ্ররাজ্যের হায়দরাবাদ্ শহরে জাতীয় রঙ্গশালার জন্য ৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে—পশ্চিম বাঙলায়ও জাতীয় রঙ্গশালার সিদ্ধান্ত এবং অবস্থানভূমি যে মনোনীত হয়েছে, একথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কিছুদিন পূর্বে বণিকদের শিল্পপ্রদর্শনীর শেষ সভায় ঘোষণা করেছেন—অবশ্য তা যথার্থই জাতীয় হবে কিনা, না শুধু কন্‌ট্রাক্টার-পোষক ইমারতী-বিলাস ও দলপুষ্টির রঙ্গমহল হয়ে উঠবে, তা বলা অসম্ভব। অন্তত 'জাতীয় রঙ্গশালা' সম্বন্ধে এর বেশি তথ্য এখনো জানা যায় নি। এই 'জাতীয় নাট্যশালার' আদর্শ ও সংগঠন, উদ্যোক্তৃ-মণ্ডলী ও পরিচালকমণ্ডলী সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয় নি। তথাপি ভারত সরকারের এই 'জাতীয় রঙ্গশালা' স্থাপনের সংকল্প দেশের সকলেরই সানন্দ অভিনন্দন লাভ করেছে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সম্বন্ধে ভারত সরকারের মুখপাত্র প্রধানতঃ তাদের সংগঠিত 'সর্বভারতীয় শতবার্ষিকী কমিটি' (All India Tagore Centenary Committee)—পণ্ডিত জওহরলাল যার সভাপতি, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ প্রতি-সভাপতি, সংস্কৃতি-মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবির সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গোপাল রেড্ডি কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রমুখ অন্য কয়েকজনা মন্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যার সদস্য। সাধারণের সভা ডেকে এ সমিতি গঠিত হয় নি। নয়াদিল্লীর মত সাংস্কৃতিক মরুভূমিতে হয়তো এরূপভাবে কমিটি গঠন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বিশুদ্ধ সরকারী উদ্যোগে ও ব্যক্তিবিশেষের মনোনয়নে এরূপ সর্ব-ভারতীয় উৎসব কমিটি গঠন পদ্ধতির দিক থেকে নির্দোষ নয়; এবং কার্যত রূপের দিক থেকেও তা জন-সম্পর্কশূন্য আমলা-আয়োজনে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা। দুর্ভাগ্যক্রমে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টান্তই রাজ্যে রাজ্যে রবীন্দ্র-উৎসব কমিটি গঠনে গৃহীত হয়েছে—নয়াদিল্লীর পক্ষেও এই মূল ত্রুটি কাটানো সম্ভব (ক) যদি এই সদস্যমণ্ডলে আরও দু-একজন রবীন্দ্রানুরাগী স্থান পান যাঁরা কর্তৃপক্ষের কারো বশংবদ নন, এবং (খ) যদি উৎসবের এমন কার্যক্রম গৃহীত হয় যা আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সহকারিতা লাভ করে এবং স্বদেশী জন-সাধারণকেও কবি-প্রতিভার ও বিশ্ব-সংস্কৃতির পরিচয়-গ্রহণে উদ্যোগী করে। নয়াদিল্লীর উৎসবে অবশ্য সমারোহ ও আন্তর্জাতিক অতিথির অভাব হবে না; কিন্তু কেরানি ও কেরিয়ারিস্ট ব্যতীত স্বদেশীয় সংস্কৃতি-অনুরাগীদের তাতে সমাবেশ সুসম্ভব নয়—রাজ্যোৎসবে তা অপরিহার্য। উৎসবের কার্যক্রমে অবশ্য সভাই একমাত্র কথা নয়, সে-সব দিকেও জনসাধারণকে নানারূপে সহযোগী করে তোলা যায়। যদি তার প্রয়োজন অনুভূত ও স্বীকৃত হয়।

সর্বভারতীয় সমিতির প্রধান একটা উদ্দেশ্য অবশ্য দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্র-উৎসবের সংহত রূপদান—সকলের কার্যধারার সুসঙ্গতি সাধন। সর্বভারতীয় সমিতির প্রভাবে বিশেষ করে গৃহীত হবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটির উপদেশে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের রবীন্দ্র-উৎসবের কার্যক্রম; আকাদেমির কার্যক্রম এবং 'আকাশবাণীর' কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কার্যক্রম এখনো কিছুই প্রকাশিত হয় নি; অন্তত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের কথা আমরা জানি না। অথচ উদ্যোগী হলে তাঁরা এমন কার্যসূচী গ্রহণ করতে পারেন যাতে সমস্ত দেশকে তাঁরাই দিতে পারেন প্রেরণা, আর নিজেদের

প্রতিষ্ঠানকেও তাঁরা বাঙলা সাহিত্য সাধনার ও সৃষ্টি প্রেরণার, বিশ্ব-সাহিত্যে পাঠের ও বিশ্ব-সংস্কৃতি পরিচয়ের পীঠস্থান রূপে গঠিত করতে পারেন—এ সম্ভাবনা আর কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। কিন্তু কোথায় সেই সাহস, সেই সংকল্প, সেই উদ্যোগ? কোনো পরিকল্পনা কি কেউ গ্রহণ করেছেন—কলকাতা বা যাদবপুর? 'বিশ্বভারতীরই' বা পরিকল্পনা কি?

এখন পর্যন্ত 'সাহিত্য আকাদেমির' দিক থেকেই একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে—আর এক অর্থে আমরা আকাদেমি আয়োজিত ৭ খণ্ডে রবীন্দ্র-সংকলন ও অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনাকেই শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করি। কারণ, রবীন্দ্র-সাহিত্য ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এখনো ধারাবাহিক রূপে পরিবেশিত হয় নি, এমনকি হিন্দীতেও হয় নি। লজ্জার কথা হলেও মানতে হবে—রুশ ভাষায় যে ৮ খণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ আছে—এখন ১৬ খণ্ডে তার বিস্তৃততর পরিচয়ও প্রকাশিত হবে। এতকাল ভারতবর্ষে তেমন কোনো প্রয়াস দেখা যায় নি। হয় নি বলেই অধিকাংশ ভারতবাসী রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়-বঞ্চিত। ইংরেজি ভাষার মারফতে যে শিক্ষিত ভারতবাসী রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করেন আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, রবীন্দ্র-প্রতিভার কতকটা পরিচয় হয়তো তাঁরা পান, কিন্তু রসাস্বাদনে তাঁরাও বঞ্চিত। এ কথা হয়তো রুশ অনুবাদ সম্বন্ধেও মিথ্যা নয়; কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরস যে অক্ষুণ্ণ থাকে নি, তা সত্য। তাই ভারত-সরকারের সংস্কৃতি-পাণ্ডা বা কেউ কেউ এমনও মনে করেন—'রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে।' আকাদেমির প্রয়াসে ১৪টি ভাষায় যে ৭ খণ্ডে অনূদিত সাহিত্য প্রকাশিত হবে তাতে এই মহামোহোপাধ্যায়দের উপকার হবে না; কিন্তু আমাদের আশা সাধারণ ভারতবাসী কিছুটা রবীন্দ্র-পরিচয় লাভ করতে পারবেন। তাঁরা পাবেন (১) ১০১টি নির্বাচিত কবিতার কবিতাখণ্ড; (২) ৫০০টি গানের গীতখণ্ড; (৩) ২১টি ছোট গল্পের গল্পখণ্ড; (৪) বিসর্জন, চিরকুমার সভা, চিত্রাঙ্গদা, ডাকঘর, রাজা, রক্তকরবী, মুক্তধারা সংবলিত নাট্যখণ্ড; (৫) চোখের বালি, গোরা, যোগাযোগ, শেষের কবিতা (?) শুদ্ধ উপন্যাসখণ্ড, আর (৬) জীবন-স্মৃতি, রস-রচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ এবং (৭) সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি প্রবন্ধ সংবলিত দুই খণ্ড গদ্য-রচনা। সমগ্র ৭ খণ্ডের আবার দুটি রূপ—একটি মূল বাংলার নাগরী অক্ষরে, অন্যটি বিবিধ ভাষার অনুবাদমালা নিজ নিজ অক্ষরে।

আমরা অবশ্য নাগরী অক্ষর অপেক্ষা রোমক অক্ষরে এই মূল ৭ খণ্ড রচনা প্রকাশ বেশি যুক্তিযুক্ত হত বলে মনে করি। সে যাই হোক, মোটের উপর এই বিরাট আয়োজনের দ্বারা আকাদেমি যে দেশের লোকের নিকটে নিজের সার্থকতা প্রমাণিত করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

আকাদেমির হাতে দ্বিতীয় ভার পড়েছে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে একটি সুমনোহর গ্রন্থ প্রকাশের। দেশ-বিদেশের মনস্বীদের লেখা ছাড়াও তাতে থাকবে রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী ও বহু প্রতিকৃতি। এ গ্রন্থ সুশোভন হবে, আমরা জানি, কিন্তু লেখা সংগ্রহে যে নীতি অনুসৃত হয়েছে, তাতে আমরা আশ্বস্ত নই। যতদূর জানি—চীন তো বর্জনীয়ই, সোভিয়েত দেশেরও কেউ লিখবার জন্য আহূত হন নি। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক মণ্ডলের কোনো লেখক, কোনো মনস্বী, কোনো বৈজ্ঞানিক আহূত হয়েছেন কিনা জানি না—আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সংস্কৃতিগঠনের এ এক বিচিত্র ধাঁচা। আকাদেমির মধ্যে এই প্রবণতা নতুন নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। সোভিয়েত দেশের রবীন্দ্র-সমাদরেও কি ভারতীয় উদ্যোক্তাদের শিক্ষা হবে না? রবীন্দ্র-উৎসব নিয়ে এই ক্ষুদ্রতা রবীন্দ্রনাথেরই বিরোধিতা।

অবশ্য সাহিত্য আকাদেমী নিউইয়র্কের ম্যাকমিলান কোম্পানিকে এ উপলক্ষে ইংরেজিতে একটি রবীন্দ্র-সঞ্চয়ন প্রকাশে সাহায্য করছেন। সেখানে অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী তার সম্পাদক। তাতে নিশ্চয়ই 'রাশিয়ার চিঠির' নামগন্ধও থাকবে না। যে ন্যাশনালিজম-এর বক্তৃতাবলী ম্যাকমিলান কোম্পানি আর প্রকাশিত করেন নি, তা এ উপলক্ষে প্রকাশিত হবে কিনা জানি না। তা এখন দুর্লভ।

'আকাশবাণী' থেকে দেশ-বিদেশের মনস্বীদের কথিকা প্রভৃতি রেকর্ডও প্রচার করার ব্যবস্থা হবে, রবীন্দ্র-সংগীতও ভারতের নানা ভাষায় (মূল সুর রেখে ?) প্রচারিত হবে, এরূপ শুনেছি। 'আকাশবাণীর' উৎসবের ভার লাভ করেছেন শ্রীযুক্ত অমল হোম। কাজেই সেখানে সুব্যবস্থা হবে বলেই আমাদের আশা যদি নয়াদিল্লীর নির্দেশ তাঁর বাধা না হয়।

পশ্চিম বাঙলার রাজ্য-উৎসব সঙ্কল্প

পশ্চিম বাঙলার রাজ্য-উৎসব কমিটি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি। নয়াদিল্লীর পদ্ধতি অনুসরণ করে তা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বারাই গঠিত, আর

তন্মধ্যেও আবার সেই ১১৯ জনের কমিটির সমস্ত ক্ষমতা ছিল তাঁরই মনোনীত কার্যকরী সমিতির উপর সমর্পিত। কিন্তু পশ্চিম বাঙলা সাংস্কৃতিক মরুভূমি বেষ্টিত মুঘল রাজধানী নয়—কাজেই নয়াদিল্লীর পদ্ধতি যে এখানে সর্বাংশেই অচল তা বলা বাহুল্য। সম্ভবত তাই কমিটিতে যে-সব যোগ্য লোক আছেন তাঁরা কিছুমাত্র এ-সম্পর্কে দায়িত্ববোধ করেন না, আর কার্যকরী সমিতিতে যাঁরা আছেন তাঁরাও জানেন—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কমিটি একটি পকেট কমিটি, তার ভাবনাচিন্তাও ডাক্তার রায়ের পকেটস্থই থাকবে। এ জন্যেই গত ৯ই এপ্রিলের পূর্বে প্রায় কোনো প্রস্তাবই আলোচিত হয় নি—এবং তারপরেও যে কার্যক্রম গৃহীত হবে, কার্যভার কিভাবে ন্যস্ত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে সুস্থির কিছু জানা যায় নি।

ইতিমধ্যে ২০. ৪. ৬০ তারিখের দৈনিকপত্র মারফত জানা গেল যে, চূড়ান্ত প্ল্যান গৃহীত হয়েছে : ৫০ লক্ষ টাকা তোলা হবে—যদিও ৯ তারিখ পর্যন্ত ১,১৪৮ টাকা মাত্র তোলা হয়েছে ; তিন ধারার কার্যসূচী প্রণীত হবে, যথা, স্থায়ী উদ্যোগ, উৎসব-পালন ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকাশন। স্থায়ী উদ্যোগের মধ্যে প্রধান কাজ—'রবীন্দ্র-ভারতীর' সহযোগে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবনে রবীন্দ্র-মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা ; উৎসবে থাকবে সাহিত্য-সম্মেলন, আলোচনা, নৃত্য-নাট্য-পরিবেশন ও মেলা প্রভৃতি ; আর প্রকাশনে সস্তাদরে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকাশনের ব্যবস্থা। আগামী পঁচিশে বৈশাখ শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন হবে। বলা উচিত যতটুকু এ সংবাদে জানা মনে হয়—রাজ্য-সমিতি অর্থাৎ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও বাঙলা দেশের মনোভাব কিছুটা উপলব্ধি করে কার্যসূচী প্রণয়ন করতে চান ; এই কার্যসূচীতে তার আভাস কতকটা পাওয়া যাচ্ছে—এইটুকু আশার কথা। অবশ্য জানা গেল না—কমিটি গঠনের পদ্ধতি কতকটা সংশোধিত করে তা তিনি ব্যাপকতর করতে চান কি না, শিক্ষিতসাধারণ দক্ষিণা দিয়েও সহযোগী সদস্যপদ লাভ করতে পারবে কিনা, ছাত্রগণ স্বল্পদক্ষিণায় ছাত্র-সদস্য গণ্য হবে কিনা। একবার ১৯৩১-এর 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' সমিতির গঠনপদ্ধতি ও তার সদস্য-তালিকার দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি—এই 'ফ্যুহ্রার প্রিন্‌ৎসেপে' কমিটি গঠন করার গলদ কোথায়—সভ্যদের কারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও মনে হয়—'এই কি বাঙলার অবস্থা!' ঠিক এই নিরুৎসাহের ছাপই

দেখা যায় অর্থ সংগ্রহের হিসাবে। আমরা জানি, জন-সাধারণের থেকে অর্থ সংগ্রহ না করেও মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন—যেমন অর্থ পুঁজিপতিরা জোগান তাঁর জন্মদিনের ভাণ্ডারে। তিনি তা করুন অপত্তি নেই। কিন্তু রবীন্দ্র-উৎসব কেবল ঐ শ্রেণীর 'বাণিজ্যে' পরিণত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়—সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরেও সেই মঙ্গলঘট ভরা চলে। সংগঠন ও অর্থ ছাড়াও যে কার্যসূচীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার সফলতা ও কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করবে—উদ্যোক্তাদের পরিশ্রম ও যোগ্যতার উপরে। যোগ্য কর্মী নেই তা নয়,—অন্তত সাব-কমিটির আহ্বায়কগণ অক্ষম নন বলেই আমাদের বিশ্বাস;—কিন্তু 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মই' যদি মূলনীতি থাকে তাহলে ভরসার কারণ দেখি না—যে জন্য এতদিন পর্যন্ত কার্যসূচী আলোচিতও হল না, যেজন্য কমিটির আপিসটি দপ্তরখানায় সুবিখ্যাত শিক্ষা-বিভাগের কুক্ষিগত হয়ে রইল, যেজন্য কমিটির সাধারণ চিঠিপত্রের কাগজপত্র পর্যন্ত মুদ্রিত হল না, প্রস্তাবিত মুদ্রা (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা ?) অঙ্কিত হলেও গৃহীত হতে পারল না—তার মূল এই—সকল কার্যের ভার কার্যকরী সমিতির একমাত্র কর্তা ডাক্তার রায়, আর ৯ই এপ্রিলের পূর্বে তাঁর সময় হবে না।

রবীন্দ্র-মহোৎসব

রবীন্দ্র-উৎসব সরকারের বা কোনো বিশেষ যূথের নয়। আমাদের অভিমত এই যে, রাজ্য-উৎসব কমিটি যথারীতি সাধারণের মত নিয়ে পুনর্গঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ কথা আমরা জানি—তা না হলে সেই পদ্ধতিতে এখন স্বতন্ত্র কোনো উৎসব কমিটি গঠন করায় বিপদ অনেক—তৎক্ষণাৎ দলাদলির ধুঁয়ো তুলে সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলতে সরকারী দল ত্রুটি করবেন না। বিভ্রান্ত জনগণ তাতে আরও বিভ্রান্ত হবেন। তাছাড়া, অনেক স্থায়ী কার্যসূচীই একালে রাজ্য-সরকারের বিমুখতায় সম্পন্ন করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুচিন্তিত প্রস্তাবের সঙ্গে প্রায় সর্ব বিষয়ে এক মত হলেও আমরা স্বতন্ত্র সমিতি গঠনে তাই দ্বিধান্বিত। রবীন্দ্র-উৎসব সম্বন্ধে আমরা এই নীতিই অনুসরণের পক্ষপাতী—কবির মর্যাদা ও জাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে সরকারী-বেসরকারী যত আয়োজন, যত উৎসবের ব্যবস্থা যেখানেই হয়, সকলের সহকারিতা করা এবং ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে

জনসাধারণকেই কবির সাধনার উত্তরাধিকারী ও উত্তর-সাধক রূপে গড়ে তোলা। ঠিক এই কারণেই আমাদের আশা—রাজ্য-সরকারের আয়োজন ছাড়াও দেশের সকল প্রতিষ্ঠান, সকল মণ্ডলী নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করবেন। সর্বজনীন উৎসাহের, আনন্দের, বৈচিত্র্যের অজস্র ধারা এসে মিলিত হবে কবিপূজার মহোৎসবে।

এ মহোৎসব উদ্‌যাপন সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রস্তাব পূর্বেও উত্থাপন করেছি। রাজ্য-সমিতির কার্যক্রমে এখন তা কতকাংশে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু সত্যই তা উদ্‌যাপিত হবে কিনা তা জানি না। এ উপলক্ষে (১) একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবের ব্যবস্থা করে তাতে ব্রিটেন, আমেরিকা, রুশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার নৃত্য, নাট্য, সংগীত-মণ্ডলীকে আহ্বান করা সমুচিত ; (২) প্রতি বৎসর রবীন্দ্র-মেলা নামে বঙ্গ সংস্কৃতি-মেলা ও তার প্রধান অঙ্গস্বরূপ 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের' (পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের শুদ্ধ) বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ; (৩) জনশিক্ষার, (৪) সস্তায় রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের, (৫) জলাভাব দূরীকরণের এবং (৬) শিক্ষায় ও রাজকর্মে রাজ্যভাষা প্রবর্তনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করাও এই বৎসর (১৯৬১) থেকে আবশ্যক—এসব আমাদের ধারণা। অবশ্য তা ছাড়াও বহু সৎ প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়—যেমন সৌমেন্দ্রনাথ করেছেন। কোনো উৎসব সমিতিই শুধু হুজুগ ও হুল্লোড়ে যেন শেষ না হয়, এই আমাদের কামনা।

আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব বাঙালী জাতীয় মহোৎসব রূপেই উদ্‌যাপিত করবে, শুধু রাজ্য-শাসকদের নেতৃত্বেই উৎসবের শেষ হবে না—এবং শুধু দিল্লী বা কলকাতার মত রাজধানীতে তা নিবদ্ধ থাকবে না। অন্তত বাঙলা দেশের অসংখ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষালয়, আপন আপন শক্তি অনুযায়ী তা উদ্‌যাপন করবে—প্রত্যেকের প্রচেষ্টাতেই অপরের সহায়তা লাভ হবে এবং প্রয়োজনীয় কাজে সংহতিরও অভাব হবে না। রাজ্য-সরকার ছাড়াও যেসব প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে অগ্রসর হবে আমরা তাদের কারও কারও কথা ইতিপূর্বেই জানি—যেমন, বিশ্বশান্তি পরিষদের পক্ষ থেকে সংকল্প গৃহীত হয়েছে (১) ইংরেজিতে একটি শান্তি ও মৈত্রী বিষয়ক রবীন্দ্র-রচনা সংকলন প্রকাশের ; (২) একখণ্ড বিশ্বমনস্বীদের রচনাসম্ভার গ্রন্থ

প্রকাশনের (সর্বভারতীয় সমিতিও এরূপ চেষ্টা করছেন); এবং (৩) বিশ্বমনস্বীদের উপস্থিতিতে কলকাতায় রবীন্দ্রমেলার অধিবেশনের। তাছাড়া আমরা আশা করি, বাঙলা দেশের লেখকসমাজ, সাধারণভাবে, শিল্পীসমাজ, সাংবাদিক-সমাজ ও প্রকাশক-সমাজ, শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজ এমনকি শ্রমিক ও কর্মচারী সমিতিও নিশ্চয়ই নিজেদের উদ্যোগে গ্রন্থাদি প্রকাশের, শিল্প-প্রদর্শনীর, আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করবেন—রাজ্য-সমিতি বা অন্য কোনো সমিতির আয়োজনই ওপক্ষে যথেষ্ট নয়, তাঁদের নিজেদেরও অর্ঘদানের অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার্য ও পালনীয়।

কলকাতা ছাড়িয়ে বাঙলার জন-সমাজের মধ্যে রবীন্দ্র-বাণীকে বহন করে নেবার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। মফঃস্বলে সরকারী নেতৃত্বে গঠিত উৎসব সমিতি সে-পক্ষে যথেষ্ট নয়; স্থানীয় সংস্কৃতি সমিতি সমূহ একত্রিত হয়ে কলকাতার লেখক ও শিল্পী সমাজের সহায়তা সার্থকভাবে এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করবেন,—ব্যক্তিগতভাবে শিল্পী ও লেখকেরাও তা প্রদান করবেন, নিশ্চয়। বিশেষ করে এজন্য সম্মেলিত কার্যসূচী গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। যেমন, (১) রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ ও বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে সম্মেলিত আলোচনার ভার গ্রহণ করতে পারেন শিক্ষক, ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান সমূহ একযোগে; এবং মফঃস্বলের কলেজে-স্কুলে এ আলোচনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে তাঁরা প্রতিনিধি প্রেরণও করতে পাবেন। (২) সমবায় আন্দোলনের কর্মীরা ও নানা পল্লীমঙ্গল সমিতির কর্মীরা নিশ্চয়ই একযোগে সমবায়ের মহাপুরোহিত ও শ্রীনিকেতনের মহাগুরুর স্মৃতিতে শহরে ও গ্রামে ওরূপ সম্মেলন, আলোচনা-সভা ও প্রচার-সভার ব্যবস্থা করতে পারেন। (৩) বিশেষ করে, বাঙলার কৃষক আন্দোলন, যুব আন্দোলন ও গণনাট্য সঙ্ঘের মত বিবিধ সংগীত ও নাট্য সমিতির কর্মীরা একত্রে বসে শহরে গ্রামে—দেশব্যাপী এই উৎসব পালনের একটি সমুচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন—তাহলেই সরকারী ও বেসরকারী সাংস্কৃতিক আয়োজনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে সার্বজনীন সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে—জন-সমাজও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী রূপে সংগঠিত হয়ে উঠবেন।

এই বৎসরে আমরা যেন আমাদের এ পরিচয়কেই সত্য করে তুলতে পারি—আমরা রবীন্দ্রনাথের জাতি।

ধর্মশিক্ষা

রাজশেখর বসু

[স্বর্গীয় রাজশেখর বসুর এইটিই বোধ হয় প্রকাশিত শেষ নিবন্ধ (দোল-সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। একটি গুরুতর জাতীয় সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কমিউনিস্ট দেশ, বিশেষতঃ চীন সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল না, তাঁর সেই সব ধারণাও সর্বস্বীকৃত নয়। কিন্তু এ প্রবন্ধের মুখ্য বিচার-বিশ্লেষণ ও বক্তব্য-সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। যুক্তিশীল মনস্বীর এই শেষ লেখাটি আমরা পুনর্মুদ্রণ করছি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।—সম্পাদক]

আমাদের দেশে সব রকম দুষ্কর্ম আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। চুরি ডাকাতি প্রতারণা ঘুষ ভেজাল ইত্যাদি দেশব্যাপী হয়েছে, অনেক রাজপুরুষ আর ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর কর্মে অসাধুতা প্রকট হয়েছে, জননেতাদের আচরণেও অসংযম আর গুণ্ডামি দেখা দিয়েছে, ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত হয়েছে। অনেক সরকারী অফিসে কাজ আদায়ের জন্যে চিরকালই আমলাদের ঘুষ দিতে হত। এখন তাদের জুলুম বেড়ে গেছে, উপরওয়ালাদের বললেও কিছু হয় না, তাঁরা নিম্নতনদের শাসন করতে ভয় পান।

প্রাচীন ভারতে চোরের হাত কেটে ফেলা হত। বিলাতে দেড় শ বৎসর আগে সামান্য চুরির জন্যেও ফাঁসি হত। দুর্গেশ দুমরাজ কুলনারীহরণের জন্যে নিজের পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এই রকম কঠোর শাস্তির ভয়ে দুর্বৃত্তরা কতকটা সংযত থাকত কিন্তু একবারে নিরস্ত হত না।

সমাজরক্ষার জন্যে যথোচিত দণ্ডবিধি অবশ্যই চাই, কিন্তু তার চাইতেও চাই এমন শিক্ষা আর পরিবেশ যাতে দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি না হয়। অনেকে বলেন, বাল্যকাল থেকে ধর্মশিক্ষাই দুষ্প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। রিলিজস এডুকেশনের জন্যে বিলাতে আইন আছে, সকল খ্রীষ্টান ছাত্রকেই বাইবেল পড়তে হয় এবং তৎসম্মত ধর্মোপদেশ শুনতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান মাত্রেই এই শিক্ষা আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু যুক্তিবাদী র‍্যাশনালিস্টরা (যাঁদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা মনীষী আছেন) বলেন,

খ্রীষ্টিয় বা অন্য কোনও ধর্মের ভিত্তিতে মরালিটি বা সামাজিক কর্তব্য শেখানো শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকরও বটে, তাতে বুদ্ধি সংকীর্ণ হয়।

বাল্যকাল থেকে সুনীতি আর সদাচার শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য, এ সম্বন্ধে মতভেদ নেই। কিন্তু সেকিউলার বা লোকায়ত ভারতরাষ্ট্রের প্রজার জন্যে এই শিক্ষার ভিত্তি কি হবে? শিক্ষার্থীর সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু জৈন শিখ মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র, অথবা শাস্ত্রনিরপেক্ষ শুধুই নীতিবাক্য?

রিলিজন শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। ক্রীড বা নির্দিষ্ট বিষয়ে আস্থা না থাকলে রিলিজন হয় না। হিন্দুধর্ম ঠিক রিলিজন নয়, কারণ তার বাঁধা ধরা ক্রীড নেই। কিন্তু যেমন মুসলমান আর খ্রীষ্টিয় ধর্ম, তেমনি জৈন শিখ বৈষ্ণব আর ব্রাহ্ম ধর্মও রিলিজন। ভারতীয় ছাত্র যদি মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন শিখ বৈষ্ণব ব্রাহ্ম ইত্যাদি হয় তবে তার সাম্প্রদায়িক ক্রীড অনুসারে তাকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু ছাত্রকে কিংবা মিশ্র সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে কি শেখানো হবে? শুধু অল্পবয়স্কদের জন্যে ব্যবস্থা করলে চলবে না, প্রাপ্তবয়স্করাও যাতে কুকর্মপ্রবণ না হয় তার উপায় ভাবতে হবে।

ধর্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ অতি ব্যাপক—যা প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধিসমূহই ধর্ম, যাতে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় তাই ধর্ম। ইংরেজীতে gentleman-এর একটি বিশিষ্ট অর্থ—chivalrous wellbred man। জেণ্টলম্যান্ বা সজ্জনের যে লক্ষণাবলী, তা যদি বহুগুণ প্রসারিত করা হয় তবে তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে। শুধু ভদ্র বেশ, ভদ্র আচরণ, মার্জিত আলাপ, সত্যপালন, দুর্বলকে রক্ষা ইত্যাদি ধর্ম নয়, শুধু ভক্তি বা পরমার্থ তত্ত্বের চর্চাও ধর্ম নয়। স্বাস্থ্য বল বিদ্যা উপার্জন সদাচার সুনীতি বিনয় (discipline) ইন্দ্রিয়সংযম আত্মরক্ষা দেশরক্ষা পরোপকার প্রভৃতিও ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে গুণাবলীর অনুশীলন ও সামঞ্জস্য বিবৃত করেছেন তাই ধর্ম। মানুষের সাধনীয় ধর্মের এমন সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আর কেউ বোধ হয় করেন নি।

ভারতীয় বিদ্যার্থী সেকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা পেত তাকে তখনকার হিসাবে সর্বাঙ্গীণ বলা যেতে পারে। বিবিধ বিদ্যা আর শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান বা ritual এর সঙ্গে সদাচার আর সামাজিক কর্তব্যও শিক্ষণীয় ছিল। এখন গুরুগৃহের স্থানে স্কুল কলেজ হয়েছে, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তায় আস্থা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এখনকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের

সংখ্যা অত্যল্প, ধর্ম বা সামাজিক কর্তব্য শেখাবার তাঁদের সময় নেই যোগ্যতাও নেই।

ধর্মশিক্ষার জন্যে কেউ কেউ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করে থাকেন। ছেলেরা নিয়মিত গায়ত্রী জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, স্তোত্রপাঠ, গীতা অধ্যয়ন ইত্যাদি করুক। মেয়েরা মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে নানা রকম ব্রতপালন আর শিবপূজা করুক। ছাত্র ছাত্রীদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি শোনবার ব্যবস্থা হক। সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ভক্তি যাতে হয় তার চেষ্টা করা হক।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। অনেকে বলেন, স্বর্গ-নরকে সাধারণের আস্থা কমে যাওয়াই নৈতিক অবনতির কারণ। Pie in the sky আর hell fire, অর্থাৎ পরলোকে গিয়ে পুণ্যবান স্বর্গীয় পিষ্টক খাবে আর পাপী নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবে, এই বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়—Jesus Christ can save to the uttermost! ফ্রেমে বাঁধানো অনুরূপ আশ্বাসবাক্য দেশী ছবির দোকানে পাওয়া যায়—'একমাত্র হরিনামে যত পাপ তরে, পাপিষ্ঠের সাধ্য নাই তত পাপ করে।' কিন্তু এই সব বাণীতে কোনও ফল হয় না, কারণ জনসাধারণ ইহসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

দুষ্ক্রিয়া বৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। বোধ হয় একটি প্রধান কারণ, জুয়াড়ী প্রবৃত্তি বা gambling spirit-এর প্রসার। লোকে দেখছে, দুষ্কর্মাদের অনেকেই ধরা পড়ে না, যারা ধরা পড়ে তাদেরও অনেকে শাস্তি পায় না। অতএব দুষ্কর্ম করে নিরাপদে লাভবান হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এক শ জন দুষ্কর্মার মধ্যে যদি পঁচাত্তর জন সাজা না পায় তবে সেই পঁচাত্তরের মধ্যে আমারও স্থান হতে পারে, অতএব আইনের ভয়ে পিছিয়ে থাকব কেন? ঝুঁকি না নিলে কোনও ব্যবসাতে লাভ হয় না, দুষ্ক্রিয়াও একটা বড় ব্যবসা। লোকনিন্দা গ্রাহ্য করার দরকার নেই, আমি যদি ধনবান হই তবে আমার দুষ্কর্ম জানলেও লোকে আমাকে খাতির করবে।

বহুকালের সংস্কার সহজে মুছে যায় না, স্বর্গ নরকে বিশ্বাস কমে গেলেও পাপের জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন অস্বস্তিবোধ অনেকের আছে এবং তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় তারা সুসাধ্য উপায় খোঁজে। বিস্তর লোক মনে করে, গঙ্গাস্নান, একাদশী পালন, দেববিগ্রহ দর্শন, গো-ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ সেবা,

মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি কর্মেই পাপস্খালন হয়। হরিনাম-কীর্তনে বা খ্রীষ্ট-শরণে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই উক্তির সঙ্গে উহ্য আছে—আগে অনুতপ্ত হয়ে পাপকর্ম ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু লোকে কুকর্মের অভ্যাস ছাড়তে পারে না, মনে করে ভগবানের নাম নিলেই নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে। লোভী ডায়াবিটিক যেমন মিষ্টান্ন খায় আর ইনস্থলিন নেয়।

আইনের ফেসাদে পড়লে লোকে যেমন উকিল মোক্তার বাহাল করে, তেমনি অনেকে পাপস্খালনের জন্যে গুরুর শরণ নেয়। সেকেলে মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতিপত্তি এখন কমে গেছে, আধুনিক জনপ্রিয় সাধু-মহাত্মারা গুরুর স্থান নিয়েছেন। তাঁরা একসঙ্গে বিপুল ভক্তজনতাকে উপদেশ দেন, যেমন গৌতম বুদ্ধ দিতেন এবং একালের রাজনীতিক নেতারা দেন। অনেকে মনে করে, আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি, গুরুকে যদি ভক্তি করি আর ঘন ঘন তাঁর কাছে যাই তা হলে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। আমাদের দেশে সাধু-সন্তের আবির্ভাব চিরদিনই হয়েছে, জনসাধারণের কাছে তাঁরা ভক্তি-শ্রদ্ধাও প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু এখনকার জনপ্রিয় গুরু-গুর্বীর সন্নিধানে যে বিপুল ভক্তসমাগম হয় তা বোধ হয় বুদ্ধ আর চৈতন্যদেবের কালেও দেখা যায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীঅরবিন্দেরও এমন ভক্তভাগ্য হয় নি।

একদিকে গুরুভক্তির তুমুল অভিব্যক্তি, অন্যদিকে দুষ্কর্মের দেশব্যাপী প্লাবন, এই দুইএর মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ আছে কি? একথা বলা যায় না যে গুরুভক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলেই দুষ্কর্মের প্রবৃত্তি বেড়ে গেছে, কিংবা গুরুরা জাল ফেলে চুনো পুঁটি রুই কাতলা ভক্ত সংগ্রহ করছেন। সাধুসঙ্গকামী ধার্মিক সজ্জন এখনও অনেক আছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন হতে পারে যে দুষ্কর্ম বৃদ্ধির ফলেই সাধু মহাত্মা গুরুর চাহিদা বেড়ে গেছে, বিনা আয়াসে পাপমুক্ত হবার মতলবে এখন অসংখ্য লোক গুরুর দ্বারস্থ হচ্ছে।

ভক্ত অথচ লম্পট মাতাল চোর ঘুষখোর ইত্যাদি দুশ্চরিত্র লোক অনেক আছে। তথাপি দেখা যায়, যারা স্বভাবত ভক্তিমান তারা প্রায় শান্ত সচ্চরিত্র হয়। কিন্তু স্বভাবিক যোগ্যতা না থাকলে কোনও লোককে যেমন গণিতজ্ঞ বা সংগীতজ্ঞ করা যায় না, তেমনি কৃত্রিম উপায়ে অপাত্রকে ভক্তিমান করা যায় না। মামুলী নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম করলে বা স্তোত্র আবৃত্তি করলে চিত্তের পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। পুরোহিত মন্ত্র পড়ান— অপবিত্র বা পবিত্র যে কোনও অবস্থায় যদি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করা হয়

তবে বাহ্ আর অভ্যন্তর শুচি হয়ে যায়। কেবল নাম স্মরণেই যদি দেহশুদ্ধি আর চিত্তশুদ্ধি হত তবে লোকে অতি সহজে দিব্যজীবন লাভ করত। গোঁড়া আচারনিষ্ঠ স্ত্রীপুরুষত কত মন্দ হতে পারে তার অনেক চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়।

যে স্বভাবত সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান আর জিজ্ঞাসু, সে নিজের রুচি অনুসারে ভক্তি কর্ম বা জ্ঞানের চর্চা করে। শুনেছি বিদ্যাসাগর প্রায় নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতন কর্মবীর পরোপকারী সমাজহিতৈষী অল্পই জন্মেছেন। গান্ধীজী ভক্তবিশ্বাসী, নেহরুজী অভক্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু দুজনেই অক্লান্তকর্মী লোকহিতৈষী সাধুপুরুষ।

মনুর বচন বলে খ্যাত একটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

পরস্পরভয়াৎ কেচিৎ পাপাঃ পাপঃ পাপং ন কুর্বতে।
রাজদণ্ডভয়াৎ কেচিৎ যমদণ্ডভয়াৎ পরে ॥
সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মা যময়তাং যমঃ।
আত্মা সংযমিতো যেন যমস্তস্য করোতি কিম্ ॥

—কোনও কোনও পাপমতি পরস্পরের ভয়ে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, কেউ রাজদণ্ডের ভয়ে, কেউ বা যমদণ্ডের ভয়ে। কিন্তু সকল শাসকের উপর শাসন করে আত্মা বা অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ যে সংযমিত করেছে যম তার কি করবে?

মোট কথা, ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তঃকরণের সংযমন বা বিনয়ন, disciplining the mind। বিনয়নের উপায় অন্বেষণ করতে হবে।

শোনা যায়, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অবিনীত লোককে বিনীত করা হয়। প্রথমে হয় brain washing বা মস্তিষ্ক ধোলাই, অর্থাৎ লোকটির মনে যেসব কমিউনিস্ট-নীতিবিরুদ্ধ পূর্ব সংস্কার আছে তার উচ্ছেদ করা হয়, তার পর অবিরাম মন্ত্রণা দিয়ে এবং দরকার মতন পীড়ন করে নূতন সংস্কার বদ্ধমূল করা হয়। এই indoctrinationএর ফলে বহু নবাগত বিদেশী পূর্বের ধারণা ত্যাগ করে কমিউনিস্ট শাসনের আজ্ঞাবহ ভক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রজাদের শিশুকাল থেকেই শেখানো হয়—পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের স্বার্থের চাইতে রাষ্ট্রের স্বার্থ বড়, রাষ্ট্রশাসকদের বিধান শিরোধার্য করাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অন্য দেশে যে ডিমোক্রেসি আছে তা দুর্নীতিপূর্ণ ধাপ্পাবাজি মাত্র, প্রকৃত গণতন্ত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই

আছে, সেখানকার প্রজাই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে। অবশ্য এমন লোক অনেক আছে যারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রজা না হয়েও স্বেচ্ছাক্রমে সেখানকার শাসনতন্ত্রের বশংবদ ভক্ত এবং তার কোনও দোষই মানতে চায় না।

এই রাষ্ট্রবিহিত একদেশদর্শী শিক্ষার ফলে কমিউনিস্ট প্রজার মানসিক পরিণতি কি হয়েছে তার আলোচনা অনাবশ্যক, অনেকে সে সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু যেসব পর্যটক অপক্ষপাতে দেখেছেন তাঁরা কমিউনিস্ট শাসনের শুধু দোষ আবিষ্কার করেন নি, অনেক সুফলও লক্ষ্য করেছেন। সম্প্রতি (২৪-১০-৫৯) স্টেট্‌সম্যান পত্রে প্রকাশিত একজন নিরপেক্ষ দর্শকের বিবরণ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি—

China today is free of all signs of jobbery and corruption, and that is no mean achievement. ...One does feel that we, in our country, could do with a little more honesty. There is an air of efficiency everywhere in the new China.... One does not have to worry about things like the purity of food,...or short measure or incorrect prices. These things are the result of strict controls. I miss these on my return to India....The people have been made conscious of the need to keep their homes and the streets clean....Is it fear that drives him or is it patriotism ? The truth probably is, a bit of both....The Communist Party has...used two methods : coercion and "education".

ডিক্‌টেটর-শাসিত রাষ্ট্রে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদিত হয়, সেখানকার প্রজা ভয়ে বা ভক্তিতে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে চলে। গণতন্ত্রে ততটা আশা করা যায় না, কারণ, দুষ্ট দমনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সেখানকার শাসকদের নেই। যারা দুষ্ট আর দুষ্টের পোষক, তাদেরও ভোট আছে, সুতরাং তারা অসহায় নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ—প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বেশী হস্তক্ষেপ না করে এমন শিক্ষা, পরিবেশ আর দণ্ডবিধির প্রবর্তন যাতে লোকে সুবিনীত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অনুকরণ না করেও সেখান থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি।

Indoctrinationএর একটি ভাল প্রতিশব্দ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেয়েছি—কর্ণেজপন, চলিত কথায় যার নাম জপানো বা ভজানো। শব্দটি মন্দ অর্থেই চলে, কিন্তু ভাল মন্দ মাঝারি সকল উদ্দেশ্যেই এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হতে পারে। শিশুকে যখন শেখানো হয়—সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না, ঝগড়া মারামারি করবে না, গুরুজনের কথা শুনবে ইত্যাদি, তখন শিশুর মঙ্গলের জন্যেই তার কর্ণেজপন হয়। ভোটের দালালরা যখন নিরন্তর গর্জন করে—অমুককে ভোট দিন ভোট দিন, তখন পাড়ার লোকের কর্ণেজপন হয়। ধর্মঘটী আর রাজনীতিক শোভাযাত্রীর দল অবিরাম যে স্লোগান আওড়ায় তা সর্বসাধারণের কর্ণেজপন। কিন্তু এই ধরণের স্থূল ঘোষণায় বিশেষ কিছু ফল হয় না, কর্ণজপন হলেও তা প্রায় অরণ্যে রোদনের তুল্য।

ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাও কর্ণেজপন। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে সত্য মিথ্যা আর অত্যুক্তির এমন নিপুণ মিশ্রণ থাকে যে বহু লোক মোহগ্রস্ত হয়। ‘তেল ঘি খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না, অমুক বনস্পতি খান, পুষ্টির জন্যে তা অপরিহার্য, আধুনিক সভ্য আর শিক্ষিত জনের রান্নাঘরে তা ছাড়া অন্য কিছু ঢুকতে পায় না।’ সম্প্রতি লোকসভায় একজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে এরকম বিজ্ঞাপন আপত্তিজনক, কিন্তু এমন আইন নেই যাতে এই অপপ্রচার বন্ধ করা যায়।

বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ, অকারণে শিকল টেনে গাড়ি থামানো, রেল-কর্মচারীকে নির্যাতন, গাড়ির আসবাব চুরি ইত্যাদি নিবারণের জন্যে সরকার বিস্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীকে আবেদন জানাচ্ছেন, কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না, কারণ, কুকর্ম নিবারণে শুধু কর্ণেজপন যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা আর লোকমতের প্রবল সমর্থন আবশ্যক। ভেজাল ধরা পড়লে যে শাস্তি হয় তা অতি তুচ্ছ। অপরাধী ধনী হলে তার নাম প্রায় প্রকাশিত হয় না। একই লোক তেল-ঘিএ ভেজালের জন্যে বহুবার জরিমানা দিয়েছে এবং স্বচ্ছন্দে সসম্মানে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।

বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, নব মৃৎপাত্রে যে সংস্কার লগ্ন হয় তার অন্যথা হয় না। বাল্যশিক্ষার অর্থ, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ হিতকর সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করা। এর প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্যে বিচক্ষণ

মনোবিজ্ঞানীদের মত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষার সবটাই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, চারিত্র-গঠনে অভিভাবন বা suggestionএরও স্থান আছে। যে শিক্ষক ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দেবেন তাঁকে শিক্ষণের পদ্ধতি শিখতে হবে। কিন্তু বাল্যশিক্ষাই যথেষ্ট নয়, বয়স্থ জনসাধারণ যাতে সংযমিত থাকে তার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। শুধু উপদেশে বা সরকারী বিজ্ঞাপনে কাজ হবে না, বর্তমান দণ্ডনীতি কঠোরতর করতে হবে এবং সেই সঙ্গে প্রবল জনমত গঠন করতে হবে।

সংকর্ম আর সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক জনসাধারণের প্রশংসা, দুষ্কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক জনসাধারণের ধিক্কার। ট্রামকর্মী, মোটর-বাস ও ট্যাক্সির চালক, মুটে ইত্যাদির সাধুতা, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের সাহসিকতা ইত্যাদির বিবরণ মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যায়। এইসব কর্মের প্রশংসা আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। সাধারণের কাছে সিনেমাতারকা, ফুটবল-ক্রিকেট-খেলোয়াড়, সাঁতারু ইত্যাদির যে মর্যাদা, সৎকর্মা আর সাহসী স্ত্রীপুরুষেরও যাতে অন্তত সেই রকম মর্যাদা হয় তার চেষ্টা করা উচিত। দুষ্কর্মের নিন্দা তীক্ষ্ণ ভাষায় নিরন্তর প্রচার করতে হবে, যাতে জনসাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। শুধু মামুলী দুষ্কর্ম নয়, রাস্তায় ময়লা ফেলা, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা, পানের পিক ফেলা, রাস্তার কল খুলে রেখে জল নষ্ট করা, নিষিদ্ধ আতসবাজি পোড়ানো ইত্যাদি নানা রকম কদাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দরকার। সংবাদপত্রের কর্তারা যদি বিবিধ রাজনীতিক সভার বিবরণ, সিনেমা চিত্রের বিস্তারিত পরিচয়, রাশিফলের আলোচনা ইত্যাদি কমিয়ে দিয়ে সৎকর্মের প্রশংসা আর কুকর্মের নিন্দা বহুপ্রচারিত করেন তবে তা সার্থক কর্ণেজপন হবে, লোকমতও প্রভাবিত হবে। যেমন দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, তেমনই দেশব্যাপী দুর্নীতি, কোনোটাই উপেক্ষিত নয়। আমাদের রাজনীতিক আর সাংস্কৃতিক নেতাদেরও এই জনমত গঠনে উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য।

সাধারণের পক্ষে ফ্যাশনের বিধান প্রায় অলঙ্ঘনীয়। যে নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ ফ্যাশনের বিধি-নিষেধ মেনে চলে, সেই রকম নিষ্ঠা বিহিত-অবিহিত কর্ম সম্বন্ধেও যাতে লোকের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয় তার জন্যে সুকল্পিত ব্যাপক আর অবিরাম প্রচার আবশ্যক।

পঞ্চশীল ভঙ্গ করে চীন দুঃশীল হয়েছে, ক্রূর কর্ম করে ভারতবাসীকে

ক্ষুব্ধ, বিদ্বিষ্ট করেছে। চীনের শাসনতন্ত্রে যতই স্বেচ্ছাচার নির্দয়তা আর কুটিলতা থাকুক, প্রজার স্বাধীন চিন্তা লতই দমিত হক, সে দেশের জনসাধারণের যে নৈতিক উন্নতি হয়েছে তা অগ্রাহ্য করা যায় না। কিছুকাল আগেও দুর্নীতির জন্যে চীন কুখ্যাত ছিল, কিন্তু গত দশ বছরে ভাল-মন্দ যে উপায়েই হোক, চীনের প্রজা সংযমিত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর আমাদের দেশে তার বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কোনোও অবতার বা মহাপুরুষ অলৌকিক শক্তির দ্বারা আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না। কমিউনিস্ট পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না করেও আমরা সমবেত চেষ্টায় দেশের কলঙ্ক মোচন করতে পারি। যদি হাল ছেড়ে দিয়ে যদ্‌ভবিষ্য নীতি আশ্রয় করি তবে আমাদের রক্ষা নেই।

উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

উপন্যাসের গল্পাংশ বা আখ্যানভাগকেই উপন্যাসের বিষয় বলে না। Forster সাহেব যে story বা plot-এর কথা বলেছেন উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে শুধু তাদেরও বোঝায় না। তেমনি আবার কেবলমাত্র সৃজিত চরিত্রাবলীর ঘোরাফেরা, তাদের গতি-পরিণতিও উপন্যাসের বিষয় নয়। আনা কারেনিনা এবং মাদাম বোভারির গল্পাংশে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও (বিবাহিত নারীর প্রেম) এই দুই উপন্যাসের বিষয়বস্তু পৃথক। বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল দুটো উপন্যাসই পুরুষের দ্বিচারিতার বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও এই দুই উপন্যাসের লক্ষ্য এক নয়—কাজেই এরা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাস। যে কারণে শুধু শৈশবকল্পনার চিত্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে জঁা ক্রিস্তফের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে পথের পাঁচালির সাদৃশ্য-সন্ধান নিরর্থক, যেমন নিরর্থক শুধু যুদ্ধের উত্থান-পতন ব্যবহৃত হয়েছে বলে রাজসিংহের সঙ্গে ওআর অ্যাণ্ড পীসের তুলনা সন্ধান। কেননা, বিষয়গৌরব এক একটি উপন্যাসের এক এক রকমের।

Subject-matter বা বিষয়বস্তু বা উপন্যাসের বিষয় বিষয়াশ্রয়ী বক্তব্যের রূপক। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন বিষয়াতিগ নয়। সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই যেমন একথা সত্য যে শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত ব্যাপার, শিল্পাতিগ কিছু নয়—উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সে কথা সমান প্রযোজ্য। শিল্পের বক্তব্য শিল্প-নিহিত। Ode to Nightingale কবিতার যা বক্তব্য তা কবিতাটির সরল গদ্যীকরণের মধ্যে অপ্রাপ্য—সে বক্তব্য শুধু ঐ কবিতাটির শিল্পসারের মধ্যে সন্ধেয়। তেমনি একটি উপন্যাসের যা বক্তব্য বা জীবনব্যাখ্যা তা উপন্যাসের সমগ্র প্যাটার্নের মধ্যে নিহিত থাকে। উপন্যাস-কার যখন তাঁর গল্প নির্বাচন করেন, চরিত্র ধ্যান করেন; চরিত্র-পরিবেশ এবং ঘটনার পরস্পর সম্পর্কের কথা চিন্তা করেন তখনই জীবন সম্বন্ধে তিনি কী বলতে চান তাও

ভাবা হয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিপর্যায়ের এই স্তর শিল্পীর পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রণাময় স্তর। লেখক স্বভাবতই সচেতনভাবে জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য স্থিরীকরণের পর উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হন না। তাঁর গল্পের এবং চরিত্রের পরিভাষায়, তাদের মাধ্যমে তিনি জীবন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে রূপময় করে তোলেন। এই রূপান্বিত বক্তব্যই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একজন ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু কী সে-কথার উত্তরে আমরা এই রূপান্বিত বক্তব্যের কথাই বলে থাকি। এ শুধু আখ্যানভাগের সারাংশ লিখন নয়।

॥ দুই ॥

এ শুধু আখ্যানভাগ নয় বলে, এর সঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের প্রশ্নও জড়িত থাকবে বলে, উপন্যাসের প্রসঙ্গে পট এবং পটবিধৃত মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা প্রধান। উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ পিকারেস্ক-জাতীয় উপন্যাস থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই পরিবেশ এবং পটের প্রসঙ্গ প্রভাবী হয়ে উঠেছে। Outcast বা সমাজচ্যুত মানুষ যে সমাজকে উপেক্ষা করে, এবং যাকে সমাজ উপেক্ষা করে, তার প্রতিক্রিয়া সমাজের নির্দিষ্ট ছকে কোন্ আলোড়ন সৃষ্টি করে পিকারেস্ক উপন্যাসের রস পরিণামে সেটাই লক্ষ্য। ব্যক্তি বা Individual-এর যে প্রশ্ন পরবর্তী উপন্যাসসমূহে প্রধান হয়ে উঠল পিকারেস্ক উপন্যাসে তারই প্রথম সূত্র। ব্যক্তির প্রশ্ন উপন্যাসের প্রধান প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের রূপ দ্বিবিধ। ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সম্পর্কে এর এক রূপ ; সমাজ বা সভ্যতার সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিরূপণে এর দ্বিতীয় রূপ। গোরা উপন্যাসের গোরা-চরিত্র এর আশ্চর্য নিদর্শন। গোরা-সুচরিতা-আনন্দময়ীর সম্পর্ক অথবা গোরা-বিনয়ের সম্পর্ক-সূত্র বা পরেশবাবু-ললিতার সম্পর্ক এই উপন্যাসের ব্যক্তিসম্পর্কের দিক। আবার গোরার যন্ত্রণায় পরেশবাবুর শান্ত দৃঢ়তায় বিনয়-ললিতার বিবাহে এই উপন্যাসের সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্কের দিক। আমরা যেভাবে পৃথক করে এখানে বিষয়টির বর্ণনা দিলাম সেভাবে উপন্যাসে ব্যক্তি সমাজ সম্পর্কের পৃথক রূপায়ণ ঘটে না। ব্যক্তির মৌল প্রশ্নের সঙ্গে পরিবার এবং সমাজের বিস্তৃত পটভূমি জড়িয়ে যায়। যখন এইভাবে পটবিধৃত ব্যক্তির যন্ত্রণাময় কর্মশীল বা অনুভূতিময় সংবেদনশীল সত্তাকে ঔপন্যাসিক রূপময় করে তুলতে পারেন তখনই সার্থক উপন্যাসের জন্ম। যেমন ম্যাজিক মাউণ্টেন, ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট, যেমন

রেসারেকসন এবং যোগাযোগ। এগুলি মহৎ উপন্যাস। এবং এই অনুভূতিময় সংবেদনশীলতার জন্যই জেমস জয়েসের ইউলিসিসও মহৎ সৃষ্টি।

এই ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের মূল্যবান প্রশ্নটি উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসগত কারণেই প্রাসঙ্গিক। সমাজ এবং সভ্যতা কোথাও স্থিতিশীল নয়। সুতরাং এই প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার বৃহৎ দায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে, আবার ব্যক্তি কীভাবে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করছে উপন্যাসের ব্যক্তিসমাজ সম্পর্কে এই প্রশ্নটি অন্যতম প্রশ্ন। সাহিত্য জীবনেরই একটি অংশ। জীবন প্রতিমুহূর্তেই রূপান্তরমুখী। কালাশ্রিত জীবনের এই রূপান্তরমুখিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই একথা বলা হয় যে every age is an age of transition। সুতরাং ব্যক্তি এবং সমাজের পরস্পর সম্পর্কের এই সূত্রটি গানিতিক সূত্রের মত লেখকের মাথায় ভর না করে থাকলেও উপন্যাসের রচয়িতার কাছে যে-কটি বিষয় আপন মননের সাহায্যে অনুধাবনীয় এই বিষয়টি তার মধ্যে প্রধান। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে আমরা ব্যক্তি এবং সভ্যতার সম্পর্কের এই বিশিষ্ট প্রশ্নটিকেই বুঝি। Outsider উপন্যাসে নায়কের যন্ত্রণা বর্তমান সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। এই কারণে উপন্যাসের আলোচনায়—তথা তার বিষয়বস্তুর আলোচনায় দেশকালের আলোচনা উত্থাপিত না হয়ে পারে না। যদিও শেষ পর্যন্ত শিল্পরূপ প্রধান হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক তথাপি যেহেতু শিল্পরূপ কোনো নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপার নয় সেইহেতু আধুনিক কালের এই প্রধান শিল্পকে দেশকালের কঠিন মৃত্তিকা থেকেই জীবনরস সংগ্রহ করতে হয়। এক এক দেশের উপন্যাস সেই সেই দেশের সমাজ এবং সভ্যতার জটিল এবং বঙ্কিম গতির চিহ্নধর। সে-কারণে ঔপন্যাসিকের জীবন সম্বন্ধে বক্তব্যের (যেটা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অন্যতম অঙ্গ একথা আমরা পূর্বে বলেছি) তারতম্য এবং পার্থক্য এই দেশকাল-সাপেক্ষ সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন গতির জন্য সম্ভবপর হয়। একই ধরনের উপন্যাসে মোটামুটি গাল্পিক বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তু যে শেষ পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায় সে বিচারও এই দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয়।

মাদাম বোভারি এবং আনা কারেনিনা উপন্যাস দুটির নাম চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা এ প্রসঙ্গে উত্থাপনযোগ্য। উভয় নারী সমাজজীবনের

প্রচলিত ছকের বাইরে চলে গিয়েছিল। উভয় নারীর জীবনে জীবন সম্বন্ধে ক্ষুধার বিচিত্র অভিব্যক্তি আমরা অনুভব করেছি। উভয়েরই বিয়োগান্ত পরিণতি আমাদের নিষ্ঠুর জীবনের ক্ষমাহীন অনিবার্যতা সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তলস্তয় এবং ফ্লবেয়ারের Idea of writers subject বা বিষয়-ধারণা এক নয়। ফ্লবেয়ারের ক্ষুরধার মনীষা উপন্যাসের আঙ্গিক-রীতির ইতিহাসে মাদাম বোভারির মত চিরস্মরণীয় সৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেলেও আনা কারেনিনার বিশাল নৈতিক তাৎপর্য মাদাম বোভারির নেই। একটা ছোট মফঃস্বল শহরের চিকিৎসক-বধূ, যার ভাবপ্রবণ ক্ষুধা এবং নির্বোধ পল্লবগ্রাহিতা পণ্ডিতম্মন্য স্বামীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে নিজ-তৃপ্তি খুঁজে পায় নি—একটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও—সেই বধূটি মাদাম বোভারি—উপন্যাসের নায়িকা। অবশ্যই মাদাম বোভারি উপন্যাসে শিল্পীর শিল্পবোধের পরীক্ষা হয়েছে চূড়ান্তভাবে। ফ্লবেয়ারকে ব্রতী হতে হয়েছে শিল্পীর দ্বৈত-সাধনায়। বিষয়ীর নিরাসক্ত বাস্তব-চেতনা এবং বিষয়ের যথাযোগ্য রূপসাধনা—যে কোনো ঔপন্যাসিকেরই দ্বৈত সাধনার দুই দিক। এক্ষেত্রে ফ্লবেয়ারের পরীক্ষাও ছিল এই জাতীয়। কিন্তু এ জাতীয় পরীক্ষা হলেও ফ্লবেয়ারের পরীক্ষা ছিল কঠিনতর। বাস্তব দৃষ্টি এখানে রোম্যান্টিক নারীমানসের সমগ্রতাকে রূপায়িত করতে ব্যয়িত হয়েছে। কাজেই কল্পনাচারিতা এবং বাস্তববুদ্ধির উভচর শক্তিকে আয়ত্তাধীন করেছেন লেখক। এর যে কোনো একটির ঈষৎ আতিশয্যে যে রূপসিদ্ধির জন্য উপন্যাসটির ক্ল্যাসিক মর্যাদা সেই রূপেরই হানি ঘটত। এ পথ ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্যকে স্বীকার করেও একটা প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত অনাহত থাকেই। এমা বোভারির জীবনের ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোন্ তাৎপর্যকে বহন করছে—লেখকের বিষয়ধারণার দিক থেকে এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। এমার অভিজ্ঞতা, এমার দুঃখভোগ, এমার সমুদয় চাওয়া এবং বিড়ম্বনার পরম মূল্য কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর না দিলে শিল্প-জিজ্ঞাসা জীবন-জিজ্ঞাসার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে না। কেননা, সতর্ক শিল্পবোধে বিশিষ্ট জীবনবোধের প্রতিফলন। এ-কথা শিল্পসাহিত্যের যে কোনো শাখা সম্বন্ধে প্রযোজ্য—উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি করে সত্য। তাই ফ্লবেয়ারের অমিত কীর্তিধর প্রতিভাকে ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি

শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুপ্রণাম জানিয়েও এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে বোভারি-দম্পতির মফঃস্বল-জীবনের নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত মানস একটা নির্দিষ্ট পটভূমির সঙ্গে যেন দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে নি। নির্দিষ্ট কোনো পটভূমিগত ব্যাপ্তি ছিল না বলে এমার চাওয়া এবং পাওয়ার বিড়ম্বনা এমাকে কেন্দ্র করেই শুধু বেঁচে রইল। ততোধিক কোনো ব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পারল না।

অথচ এই প্রসঙ্গেই আমরা যখন আনা কারেনিনার কথা চিন্তা করি তখন আনার সমস্ত জীবন ব্যাপারকে এমন তাৎপর্যান্বিত হতে দেখি যা উপন্যাসের বিষয়কে অনন্যসাধারণ গৌরবে মণ্ডিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাসের ব্যক্তি কদাচ একক ব্যক্তি নয়। ব্যক্তি-কাহিনীও একক কাহিনী নয়। পরস্পর সম্পর্কের টানাপোড়েনে ব্যক্তির জীবনের শুধু নয়, সমষ্টিরও মূল্যবোধের নানা দিক এবং তাদের যথার্থতা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ব্যক্তিজীবনের মুকুরে সমাজজীবনের মূল্য-বোধের যাচাই হয়। কাজেই পটভূমির প্রসঙ্গকে পরিহার করে উপন্যাস বিচার অসম্ভব। আনার ভিতরে এমন কোনো বিশেষ ধরনের অসঙ্গতি নেই যার ফলে তাকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় বলে মনে করতে পারি। বস্তুত আনার জীবনাচরণে আর পাঁচজনের ব্যতিক্রম নেই—অন্তত প্রথমে ছিল না। এমা বোভারির মতো নির্বোধ রোম্যান্টিক ক্ষুধার সাক্ষাৎ আনা-র ক্ষেত্রে পাই না। এই অসীম জীবনাগ্রহী সুস্থ তরুণী যখন থেকে প্রচলিত ছকের বাইরে চলে গেল তখন থেকে ভ্রন্স্কির প্রসঙ্গে না বিচার করলে এই গোটা ব্যাপারটির মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কোনো বিখ্যাত সমালোচক বলেন যে আনা-ভ্রনস্কি এবং কারেনিনের কাহিনীতে বুর্জোয়া দাম্পত্য জীবনের ও প্রেমের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিরই রূপায়ণ ঘটেছে। একেবারে এমনভাবে সূত্রানুসারী বিচারপদ্ধতি না অনুসরণ করেও বলা চলে যে আনার অভিজ্ঞতার ফলে প্রচলিত সমাজপটের একটা নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে—যে ব্যাখ্যা আনার জীবন-নির্যাসে যুক্ত বলেই শিল্পসম্মত হতে পেরেছে।

কারেনিনকে বিবাহ আনার হৃদয়ে কোনো নতুন প্রত্যাশার জাগরণ ঘটায় নি। All happy families are alike—এই উক্তির ভিতরে তলস্তয় তাঁর বক্তব্য বলেছেন। কারেনিন এবং আনার দাম্পত্য-জীবন সচরাচর উচ্চ মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-জীবন। কারেনিনের যান্ত্রিক জীবনধারা এবং

সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারকে লেখক যথোপযুক্ত সুবিচারের সঙ্গে এঁকেছেন। কারেনিনকে যে আনা আবেগের সঙ্গে কোনোদিনই ভালবাসতে পারে নি—এর জন্যে কারেনিনের কোনো অস্বাভাবিকতাকে লেখক দায়ী করেন নি। আনার ব্যাপার যে সৃষ্টিছাড়া কিছু ব্যাপার নয় সে সম্বন্ধেও লেখকের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। ভ্রনস্কির মায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখই যথেষ্ট। আনা বর্তমান সামাজিক জীবনের সম্পত্তিবাদী স্বামীর পত্নী। সে আশাহত আবেগহত অনুভূতিশূন্য অ্যাভারেজ মধ্যবিত্ত ঘরনীর ক্লান্তিময় দাম্পত্য-জীবনে যে চূড়ান্ত বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে তারই প্রতীক। সেই জন্যই তার গোটা অভিজ্ঞতা এমা বোভারির মত মাঝারি অভিজ্ঞতা নয়।

আবার যে লোকটা আনাকে প্রচলিত জীবনের ছকে অনুগত থাকতে দিল না তার সম্বন্ধেও তলস্তয়ের অভিনিবেশ লক্ষণীয়। ভ্রনস্কি-আনার প্রেম এবং আনার মৃত্যু এই উভয়ের প্রত্যক্ষ হেতু। কী করে সে আনার প্রেমকে জাগ্রত করল, আবার কী করে সে আনার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল তুইই অনুধাবনযোগ্য।

আশ্চর্যের বিষয় উভয় ব্যাপারই সংঘটিত হচ্ছে ভ্রনস্কির ব্যক্তিচরিত্র এবং সামাজিক চরিত্রের টানাপোড়েনে। যে ভ্রনস্কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিমুক্ত প্রাণাবেগের প্রতীক, যে ভ্রনস্কি সামরিক-বিভাগ পরিহার করে নাগরিক জীবনে সন্ধানী, যে ভ্রনস্কি উদারতাবাদী রুশযুবকদের তৎকালীন প্রতিভূ—যে ভ্রনস্কি নিজ জীবনের ধারা-ধরনের পরিবর্তন প্রয়াসী সেই ভ্রনস্কি আনার হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ সম্ভব করে তুলেছিল। আনা কারেনিনের ঘরনী হিসাবে যে যান্ত্রিক জীবন বহন করছিল তার জন্যে তার মনে ফল্গু-বিক্ষোভ বিদ্যমান ছিল, যাকে সে নিজেও হয়তো ভালো করে চিনত না। ভ্রনস্কির প্রতি আসক্তি সেই বিক্ষোভের সুড়ঙ্গ-পথ। আবার এই একই ভ্রনস্কির ভিতরে উদারতাবাদী রুশ মধ্যবিত্ত যুবকের সর্বাঙ্গীণ অসঙ্গতিও উপস্থিত। সে নিজের জীবনের ধারা পরিবর্তনের প্রয়াসী, কিন্তু এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা তাকে যা করে তোলে তা হল সূক্ষ্মতাবিলাসী dillettante। এই সূক্ষ্ম রুচিবিলাসীর জীবনের মূল অসঙ্গতিই হল এখানে যে এর সামর্থ সীমিত। কাজে কাজেই আনার সমুদয় প্রেমের দায় সে বহন করার যোগ্য নয়। চায়ের টেবিলে আনার চা খাওয়ার ভঙ্গিকে তার মনে হয় কুৎসিত।

এমনি করে আনারও ঘোড়দৌড়ের ঘটনার পরে মনে হয়েছিল যে কারেনিনের কানগুলো খুব বড় বড়। কিন্তু তলস্তয়ের বিষয়চেতনা এমনই মর্মগ্রাহী যে পাঠকের কাছে আনার মনে হওয়াটাকে মনে হবে নির্দোষ। মনে হবে যে সেটা হল কারেনিনের নিরাবেগ অভ্যাসিকতা-মন্থর জীবনের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি। আর ভ্রনস্কির মনে হওয়াটাকে মনে হবে কদর্য। কেননা ভ্রনস্কি প্রেমের দায়কে বহন করার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলছিল। ঘটনার উজ্জ্বল নায়ক অনিবার্য প্রতিমুখে স্থাপিত হয়ে স্তিমিত হয়ে গেল। দেখানো হল, আধুনিক যুগের—তথা সভ্যতার বিশিষ্ট পর্যায়ে কিবা দাম্পত্য-জীবন, কিবা প্রেম উভয়েরই সংকট ও অন্তর্জটিলতা কতখানি কঠিন, কতখানি অমোচনীয়। এই অন্তর্জটিলতা সম্বন্ধে সচেতনতায় আনা কারেনিনা উপন্যাসে নৈতিক সচেতনতা সক্রিয় হয়ে রয়েছে। এবং এই বিচারেই এমা বোভারির মাঝারি অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আনা কারেনিনার গভীর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তাৎপর্যবহ। উপন্যাসের এই পট এবং পটবিধৃত ব্যক্তির সম্পর্ক প্রসঙ্গে তরুণ মোঁপাসাকে লিখিত ফ্লবেয়ারের একটি চিঠি আলোচ্য। মোঁপাসাকে ফ্লবেয়ার লিখেছিলেন যে যদি শিল্পীকে একটি বিশেষ গাছের বিষয় বর্ণনা করতে হয় তাহলে তিনি ততক্ষণ ধরে সেই গাছটিকে প্রত্যক্ষ করবেন যতক্ষণ না সেই বিশেষ গাছটিকে অন্য সকল গাছ থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফ্লবেয়ারের ধারণা ছিল এই পদ্ধতিতেই নাকি সেই বিশেষ গাছটির সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়বে। কিন্তু আংশিকভাবে এর কার্যকারিতা মেনে নিলেও এই পদ্ধতির সীমিত দিকটিও আমাদের দৃষ্টিতে আনা উচিত। এই পদ্ধতির ফলে ঐ বিশেষ গাছটি যে প্রকৃতির বিস্তীর্ণ পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাতেই যে পূর্ণ শিল্পবোধের ব্যত্যয় ঘটে শিল্পীর সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

॥ তিন ॥

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঔপন্যাসিকের বিষয়চেতনা অন্য শিল্পের মত শুধু প্রকাশচেতনা বা বৃহৎ অর্থে আঙ্গিক-সচেতনতা নয়। তদতিরিক্ত কিছু। এইখানে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মিলিয়ে দেখতে চাওয়াটাই ঔপন্যাসিকের দেখতে চাওয়া। এই ব্যক্তি আর

পরিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী কোথায় মিলছে না। অসমন্বয়ের এই যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকল প্রেমে, সকল কর্মে মানুষ তার সৎ-স্বরূপকে খুঁজছে। ব্যক্তিমানুষের এই সন্ধানী যাত্রায় ঘন ঘন করাঘাত সমাজ-পরিবেশের বুকের ওপরেই বাজতে থাকে। তাতে যে সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় উপন্যাসের ফলশ্রুতি নির্মাণে তার ভূমিকা অন্যতম। সে কারণে বলা যায় যে যন্ত্রণাই সমস্ত উপন্যাসের বিষয়—এ যন্ত্রণা অস্তিত্বের যন্ত্রণা।

এ প্রসঙ্গে আমরা বর্তমানে আলোচনা করব—একদিকে রাসকল্‌নিকফ ও নেখল্যুডফের অভিজ্ঞতার কথা ; আর একদিকে ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের বৌঠানের অভিজ্ঞতার মূল্য।

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট এবং রেসারেকশনের নায়ক রাসকল্‌নিকফ এবং নেখল্যুডফ জীবনের বহুধা বিস্তৃত পটে বিশাল কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট নায়ক। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট এবং রেসারেকশনের কাহিনীতে অবশ্যই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু এই দুই নায়কের যন্ত্রণার সাদৃশ্যটুকু লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্য দ্বিবিধ: প্রথম, উভয় নায়কেরই এক পাপকৃতির চেতনা রয়েছে—নেখল্যুডফের মাসলোভা সংক্রান্ত স্মৃতি এবং রাসকল্‌নিকফের খুনের এবং পরস্বাপহরণের স্মৃতি। দ্বিতীয়, উভয়েই এই পাপচেতনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নিজেদের শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধান করেছে। এই সন্ধানের জটিল বিস্তৃত পর্যায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস দুটি শেষ হয়েছে। দুই উপন্যাসের শেষ বাক্য হচ্ছে এক পর্যায় সমাপ্ত হল। যে নব পর্যায়ের শুরু হল তা কেমন হবে সে গল্প আর এক গল্প (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট), একমাত্র ভবিষ্যৎ তার বিচারক (রেসারেকশন)।

দুটি উপন্যাসে প্রেমের ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে। এই প্রেমের আখ্যান রাসকল্‌নিকফ এবং নেখল্যুডফের জীবনের পরিণতি রচনায় মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে দুঃখদহনের স্বেচ্ছা-বরণে এই দুই নায়কের শুদ্ধতার জন্য সংগ্রামের পরম নিদর্শন, প্রেম তাকে উভয় ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু দুই উপন্যাসে দেখা যায় যে প্রেম-কাহিনীর ব্যবহার কোনো গতানুগতিক পদ্ধতিতে হয় নি। যন্ত্রণার পথে প্রেম এসেছে যন্ত্রণাকে বৃহত্তর তাৎপর্য দানের জন্য, যন্ত্রণাকে পরম রমণীয় করে তোলা এই দুই প্রেমকাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল না। সে কারণে বলা চলে

যে মহৎ উপন্যাসের যোগ্য আবহাওয়া রয়েছে এই প্রেমের আখ্যান-ভাগে। উপন্যাসের মুস্কিল আসানের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক উপায়ক্রম হিসাবে এদের ব্যবহার ঘটে নি। রেসারেকশনে নায়কের দীর্ঘযাত্রার শেষে দেখা গেল নায়িকা মাসলোভা নেখল্যুডফকে বিবাহ করতে অক্ষম। দানব্রতী কর্ণের কবচকুণ্ডল পরিহারের মত নেখল্যুডফকে মাসলোভার এই প্রত্যাখ্যানও শেষ পর্যন্ত বরণ করতে হ'ল। এবং জীবনের যে সৎস্বরূপকে অভিজ্ঞতার ছকে ছকে সে নানাভাবে খুঁজল তার সেই জীবন-পিপাসারও চূড়ান্ত পরীক্ষা হল এই শেষ যন্ত্রণার কষ্টিপাথরে। আবার রাসকল্‌নিকফের যন্ত্রণাকেও সহনীয় করে তোলার জন্য সোনিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারটিকে ব্যবহার করা হয় নি। সাইবেরিয়ায় মাসলোভা নেখল্যুডফকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে সেক্ষত্রে রাসকল্‌নিকফ সোনিয়াকে সাইবেরিয়ার উষর বন্দীজীবনের মাঝখানে স্বীকার করে নিল। অবশ্যই দুটো ব্যাপারের নিষ্পত্তি হচ্ছে দুরকম ভাবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দুই লেখক একটা বিন্দুতে আশ্চর্যভাবে স্থির। তলস্তয় এবং দস্তয়ভস্কি কোনো শিল্পী-সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেন নি। নায়ককে জীবনের যন্ত্রণার মুখে স্থাপিত করে, পরে প্রেমের উপাদানের সাহায্যে সে-যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তোলার আয়োজন করলে সেই সুবিধাবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হত। 'আমি সমস্ত কিছু স্বীকার করব'—এই সিদ্ধান্তের পরমুহূর্ত থেকেই রাসকল্‌নিকফ সোনিয়ার সঙ্গে দূরত্ব রচনা করার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। সে সোনিয়ার কাছ থেকে যখন বিদায় গ্রহণ করেছে তখন মৌখিক বিদায় সম্ভাষণ করাও প্রয়োজন মনে করে নি। সাইবেরিয়ার কারাবাসে সোনিয়াকে দেখে প্রথম প্রথম যে ব্যবহার সে করেছিল সে-ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং উদাসীন। সুতরাং প্রেমের আকাশে মুক্তি পাবার প্রলোভনে সে গ্লানিমোচনের পথে পা বাড়ায় নি। নেখল্যুডফ এবং রাসকল্‌নিকফ এদের দুজনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অস্তিত্বের গভীর অন্তস্তল থেকে যন্ত্রণার উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছে। এই যন্ত্রণা থেকে এরা উভয়ে পৃথিবীর পীড়িত স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে—বুঝেছে যে পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন। এই সমস্যা গোটা ব্যক্তি-বিবেকের সমস্যা। যেহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা একক অংশীভবনের ভেতর দিয়ে বলা যায় না, সেইহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিটা যে সমাজের অংশ, সভ্যতার যে পর্যায়ের সে প্রতিনিধি তার বিচিত্র রূপও এই সব

ব্যক্তি-জীবনের মুকুরে নানাভাবে ছায়াপাত করে। ঔপন্যাসিকের বিষয়-চেতনা এই সকল কিছুকেই আত্মসাৎ করে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ভ্রমর এবং কুমু। কৃষ্ণকান্তের উইল এবং যোগাযোগ অবশ্যই এক ধরনের এবং এক ভঙ্গীর উপন্যাস নয়, কিন্তু এই উপন্যাসদ্বয়ের নায়িকাযুগলের মূলভিত্তিক সমস্যার একটা সুদূর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সমস্যাটা এই যে, উভয়েরই স্বামী নামক আইডিয়ালের প্রতি, বা স্বামীত্বের ভাবাদর্শের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ; কিন্তু গোবিন্দলাল বা মধুসূদন উভয়েরই ব্যক্তি-জীবনের আচরণের সঙ্গে ভ্রমর এবং কুমু সেই ভাবাদর্শের সঙ্গতি কেমন করে রক্ষা করবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সমস্যার উদ্ভব হল উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনাগতির চূড়ান্ত সীমায় বা climax-এ উপস্থিত হয়ে। রোহিনী-হত্যার পর। যোগাযোগে এ সমস্যা উন্যাসের প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। উপন্যাসটি অসমাপ্ত। কাজেই এ সমস্যার শেষ পরিণতি কী তা জানা সম্ভব নয়।

তথাপি একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে সমস্যার মূল সূত্র নিহিত হয়ে রয়েছে দুই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধে। ভ্রমর বলেছিল তার স্বামীকে যে, যতদিন তার স্বামী শ্রদ্ধার পাত্র ছিল ততদিন সে শ্রদ্ধা করেছে। আবার কুমুর ক্ষেত্রে সমস্যাটা এসেছিল এইভাবে যে জীবনযাত্রার এক বিপরীত বিন্যাসের বা ছকের মাঝখানে গিয়ে কেমন করে সে নিজেকে তার সঙ্গে মেলাবে। ভ্রমর তার যা কিছু ethical শিক্ষা সংগ্রহ করেছিল তার স্বামী গোবিন্দলালের কাছ থেকে। গোবিন্দলাল তাকে যা শিখিয়েছিল তা উনিশ শতকের সম্পত্তিবান যুবকের নীতিবিশ্বাস প্রণোদিত শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আমরা কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে পাই না। কিন্তু সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল ভ্রমরকে আমরা এই উপন্যাসে নানাভাবে দেখতে পাই। গোবিন্দলালের প্রদত্ত শিক্ষা নিশ্চয়ই ধনবান একান্নবর্তী সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের বিরোধী কোনো শিক্ষা নয়। কাজে কাজেই বধূ হিসেবেই ভ্রমরের অস্তিত্ব। তার বাইরে ভ্রমরের কোনো অস্তিত্ব নেই। ভ্রমরের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল আলোকে তখনই দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠা সম্ভব হল যখন সে স্বামীরই প্রদত্ত বিচারবোধের মাপকাঠিতে স্বামীকে বিচার করে বসল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলেছিল যে, তুমি শ্রদ্ধার উপযুক্ত নও, আর বলেছিল মৃত্যু মুহূর্তে, 'আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই।'

এই দুটো কথাই হিন্দুসমাজের প্রচলিত পত্নীত্বের সংজ্ঞাবিরোধী। সর্বাবস্থায় পতি হিন্দুনারীর পূজ্য এবং পতিগতপ্রাণতায় তার সুখ, ভ্রমর এই দুই ধারণারই বিরুদ্ধতা করল। এইখানেই ভ্রমর চরিত্রের নৈতিক মূল্য। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে বঙ্কিম নিজে উদ্ভাসিত ছিলেন ভ্রমরের চরিত্রের ভেতর দিয়ে তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। ভ্রমরের চরিত্র তার নিজ ন্যায়কে অনুসরণ করতে করতেই বঙ্কিমের আন্তর-সত্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই যে reflection of writer's innerself—শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-কীর্তির এটা একটা বড় নিদর্শন। ভ্রমরের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু অসঙ্গতি রয়ে গেছে। ভ্রমরের জা নেই, শাশুড়ি থেকেও নেই (সূর্যমুখীরও এই অবস্থা ছিল)। ফলে ভ্রমরের অন্তঃপুরের পারিবারিক জীবনযাত্রার সমস্ত প্রকার সম্পর্কগুলোকে ঠিকমত উপস্থাপিত করা হয় নি। এইভাবে উপস্থাপিত করলে ভ্রমর আরও বেশি real হয়ে উঠতে পারত। কারণ আমরা জানি আমাদের মেয়েদের জীবন এত বেশি ছক-অনুবর্তী ও এত বেশি সমস্ত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল যে শুধু দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতর দিয়ে একটি নারীর সর্বস্ব উপলব্ধি হয় না। রোহিনীকে যেমন আমরা রোহিনীর সমশ্রেণীর ঝি-চাকরানী প্রমুখ পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত অবস্থাতেই সর্বদা পাচ্ছি, ভ্রমরকে সে জায়গায় একক অন্তঃপুরচারিণী বলে মনে হয়। ভ্রমরকে যে কেবল শেষ পর্যন্ত একটা ideal-এর মূর্ত প্রতীক বলে ভ্রম হয়েছে সেটা এই কারণে। নারীর সহস্র গ্রন্থিল পারিবারিক জীবনে চাপ এবং প্রতিক্রিয়া যদি প্রতিমুহূর্তেই তার ওপর পড়ত তাহলে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না।

কিন্তু এইভাবে সামাজিক ও পারিবারিক পটের দিক থেকে সম্পর্কগত খানিকটা ব্যত্যয় থাকলেও অন্য একদিক থেকে ভ্রমর একটি নিরুপম আদর্শের সৃষ্টি করেছে। সেটি ইতিহাসের দিক থেকে। এ কথাটি একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এক হিসাবে শিল্প-সার্থক প্রতিটি উপন্যাসই ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের কুশীলবেরা এই ঐতিহাসিক লক্ষণকে বহন করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তায় তার ব্যক্তি-জীবনের ন্যায়-ক্রম যতটা ক্রিয়াশীল থাকে ইতিহাসের সমকালীন টানাপোড়েনও ততটা না হোক কম-বেশি করে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ। কিন্তু একটি স্বার্থক লক্ষ্য উপন্যাসের চরিত্রাবলী কখনই এই ইতিহাস ব্যাখ্যার সীমাকে লঙ্ঘন করে

চলতে পারে না। রবিনসন ক্রুশো চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপের সম্যক আলোচনায় আমাদের নিশ্চয় কেবলমাত্র ডিফো-র কালের ইংলণ্ডীয় সমাজ-ইতিহাসের নজির আকর্ষণ করলেই চলবে না, তার সাহিত্য সমালোচনাই সেখানে মূল কথা। কিন্তু এ সাহিত্য সমালোচনাও আবার পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না ডিফোর শিল্পীমানসের নিজস্ব বিচিত্র গতিকে আমরা সকল দিক দিয়ে উপলব্ধি করছি। এই উপলব্ধি আরো বহুকিছুর সঙ্গে ঐতিহাসিক পটবিচারেরও মুখাপেক্ষী। টুর্গেনিভের বিখ্যাত নায়ক বাজারভের প্রসঙ্গও এ-ক্ষেত্রে তুলনীয়। বাজারভকে রুশ মধ্যবিত্ত যুবকদের তাৎকালিক চিন্তাগত পটভূমিকায় স্থাপন করা ছাড়া তার অভিজ্ঞতার পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভ্রমরের ব্যাপারেও অনুরূপ বিচার পদ্ধতি প্রয়োজন।

ভ্রমর বাংলা দেশের নারীসমাজের এক বিশিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধি। কিন্তু তাই বলে ভ্রমরকে শুধু সেই আখ্যায় ভূষিত করলেই তার স্বরূপাবিষ্কার সম্ভব হবে না। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উনিশ শতকের নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ভ্রমরের চিন্তায় এবং চেতনায় পরোক্ষ উদ্ভাসন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু লেখকের অন্তরাত্মার এই বিশিষ্ট প্রতিফলন গণিতের সরল সূত্র অনুসরণ করে সম্ভব হয় নি। সৃষ্টিক্রিয়ার গূঢ় এবং জটিল পন্থার অনুসরণ এখানে লক্ষণীয়। চরিত্রের প্যাটার্নের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে ভ্রমর সম্পূর্ণভাবে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের প্রচলিত ছকের অঙ্গীভূত চরিত্র। সে একান্নবর্তী সামন্তপরিবারের বধূ। সেই বধূত্বের যে ফ্রেম, সেই ফ্রেমকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেই তার সম্ভাবনা এবং প্রতিশ্রুতিকে ব্যবহার করেছেন লেখক। এই সূত্র থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে ভ্রমরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সমষ্টিরূপ এবং ব্যক্তিরূপের মধ্যস্থিত এই দ্বন্দ্বময় রূপের শিল্পায়নই ঔপন্যাসিকের কাজ। ভ্রমর সে-হিসাবে খাঁটি ঊনবিংশ শতকের বাঙালী বধূ। যার বধূ-চেতনায় চিরকালের বাংলাদেশ ক্রিয়াশীল—যার নীতি-চেতনায় ঊনবিংশ শতকের প্রভাব। এই ঔপন্যাসিক-লক্ষণের বিদ্যমানতার জন্যই ভ্রমর-চরিত্রের পটভূমিকা-গত সীমাবদ্ধতার ক্ষতিপূরণ হতে পেরেছে।

কুমুর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যাপকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদনের পরিবারে কুমুর অস্তিত্বকে নানা সম্পর্কের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। মধুসূদনের রুচি এবং কুমুর রুচির মধ্যে যে

বিরোধ তা অবশ্যই জীবনের দুটো বিন্যাসের বিরোধ। দুটো ব্যক্তিত্বের বিরোধ। সম্পত্তিবান মধুসূদনের অধিকারের বোধের সঙ্গে নিজ শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধানী এক নারী, যে পত্নীও বটে, তাদের অমীমাংসার সমস্যা যোগাযোগের সমস্যা। ভ্রমরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের উৎস যেখানে কুমুর উৎস তদপেক্ষা আরো গভীরে। এ কারণে কৃষ্ণকান্তের উইল অপেক্ষা যোগাযোগের বিষয় অধিকতর গভীর।

ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের ছোট বৌয়ের কাহিনীর তুলনা-মূলক বিচারে তিনজন লেখকের বিষয়বস্তুর উৎকর্ষের তারতম্য-বিচারও সুসাধ্য। ভ্রমরের চিন্তার সংকট এসেছে একটা অতি স্থূলচরিত্রের ঘটনা থেকে। তার স্বামী চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে গেল। ভ্রমর এবং গোবিন্দলাল উভয়ে মিলে জীবনের যে ছক গড়ে তুলেছিল বহির্নিক্ষিপ্ত একটা ঘটনার আঘাতে সেই ছকের বাইরে চলে গেল ভ্রমরের স্বামী। রোহিনীর বিষয়ে গোবিন্দলাল নিরাসক্ত থাকলে ভ্রমরের সংকট সম্ভব হত না। তারা উভয়েই সচরাচর অনুসৃত জীবনযাপন করতে পারত। পুণ্যবান মানুষও দুর্বল বলেই পাপের প্রলোভনে সাড়া দিয়ে ফেলে—শুধু এই ঘটনার আতিশয্যেই এই উপন্যাসের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত হয়ে অপেক্ষা করছিল। এইখানে যোগাযোগের তুলনায় বিষয়গত গভীরতার ন্যূনতা। এ ধরনের ঘটনাচক্র এবং অদৃষ্টের আকস্মিক দুর্যোগ যোগাযোগে অনুপস্থিত। মধুসূদন একদা পুণ্যবন্ত ও অধুনা পাপাসক্ত নীতিশাস্ত্র পড়া যুবক নয়। উপন্যাসের সমস্যারম্ভ তথাকথিত নৈতিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে নয়। কুমুর জীবন এবং মধুসূদনের কাছে জীবনের মানে পৃথক, সমস্যারম্ভ এখানে। মধুসূদন এবং কুমু পরস্পরকে পরিহার করতে চাইলে সমস্যার কোনো অস্তিত্বই সম্ভব হত না। এখানে এরা দুজনে পরস্পরকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চায়। তার পথে যে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে রয়েছে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল সেই বাধার সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী। সে-বিচারে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে লেখক অপার নৈতিক সচেতনতার বা moral awareness-এর পরিচয় দিয়েছেন। সেটা হল: আমরা ভালবাসতে চাইলেই যে ভালবাসতে পারব এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে ব্যক্তিমানস একটি জটিল সৃষ্টি। সেই ব্যক্তিমানসের সারীভূত রূপ হল ব্যক্তিত্ব। আমাদের নিভৃত ভালবাসার অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রেও সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানস তার ভূমিকা হারিয়ে ফেলে

না। কুমুর অভিজ্ঞতার মূল্য (যেটি উপন্যাসের বিষয়) এই কারণেই ভ্রমরের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক গভীর।

এই সব সাহিত্যাদর্শের পাশে সাহেব-বিবি-গোলামের ছোট বৌঠানের অভিজ্ঞতার প্রতিতুলনা যদি করা যায় তাহলে দেখা যায় বৌঠানের অভিজ্ঞতার মূল্যের সীমাবদ্ধতা কোন্‌খানে? বিষয়বস্তু হিসাবে বৌঠানের অভিজ্ঞতা তাৎপর্যহীন। এ-গল্পে অবশ্যই বৌঠানের ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু স্বামীর ওপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে বধূটি মদ্য পান করে ও আত্মবিসর্জন দেয় সে বধূটির নিঃসহায় কারুণ্যের মূল্য কতটুকু? নির্যাতিত নারীত্ব বা জমিদারবাড়ির কেচ্ছা এ ছাড়া কোন্ তাৎপর্যে একে অর্থবান করা যাবে? নিজে মদ্যপানাসক্ত হয়ে স্বামীর কাছে বেশ্যাদের বিকল্প রচনা করে ট্র্যাজিক মহিমা তবেই অর্জন করা যেত যদি নীতিবোধ সম্বন্ধে বৌঠানের কোনো দৃঢ় সুস্পষ্ট চিন্তা ছিল, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট পূর্বপ্রমাণ আমাদের হাতে থাকত। তবেই মদ্যপানের ভেতরে বৌঠানের দ্বন্দ্বময় আর্তি রূপায়িত হতে পারত। এর অবর্তমানে যা হয়েছে তা হল সত্যিই চাকরের চোখে দেখা একটি বিশেষ জমিদার বাড়ির অ্যাভারেজ কেচ্ছা কাহিনী মাত্র।

॥ পাঁচ ॥

এ সব উদাহরণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আত্মাহীন দেহ যদি বা সম্ভব, বক্তব্যহীন উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু লেখকের জীবনার্থের ধারক এবং পোষক। বিষয়বস্তুর মর্যাদা নিরূপিত হবে তা কতখানি লেখকের জীবন-দর্শনের প্রতিফলন সেই মাপকাঠিতে। সে-কারণেই অশ্লীল বিষয় বলে কোনো কথা সার্থক উপন্যাসের আলোচনা-কালে উত্থাপিত হতে পারে না। যে বিষয়বস্তুকে অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে তা যদি লেখকের বিস্তৃত জীবন-সংক্রান্ত গভীর বক্তব্যের অংশীভূত হয় তবে তা কোনো মতেই অশ্লীল পদবাচ্য নয়। উপন্যাসের প্রতিটি অংশ—ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনা—সকল কিছুই উপন্যাসের নির্দিষ্ট শিল্প-কর্মের অংশ—পক্ষান্তরে গোটা শিল্পকর্মটাই এক অখণ্ড মূর্তি ধারণ করতে পারে লেখকের জীবন-বিষয়ক বক্তব্যকে প্রকাশ করার তীব্র প্রেরণায়।

কাজেই উপন্যাসে সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গের বাইরের যা কিছু তাই কুশিল্প অথবা অশিল্প—তাই অপ্রকাশ্য।

॥ ছয় ॥

এবং এই বিচার-দৃষ্টিতেই বর্তমান শতাব্দীর মনোভূমি-প্রধান বা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুর মূল্যও অনুধাবনযোগ্য। আমরা জানি যে গত শতাব্দীর প্লট-নির্ভর বা ঘটনাশ্রয়ী উপন্যাস আর এ শতাব্দীর অনুভূতি-সঞ্চারী উপন্যাসে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এও জানি যে গত শতকের উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল যেখানে নায়ক-নায়িকার জীবন-বৃত্তান্তকে, তাদের অভিজ্ঞতাকে বিধৃত করা, এ শতাব্দীতে সেখানে নায়কের চেতনার স্রোতস্বিনীর নানা তরঙ্গ-শীর্ষে প্রতিফলিত চিন্তার আলোকরশ্মিকে পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট করাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। কাজেই বাস্তবের মায়া সৃজনের জন্য নির্বাচনশীল হওয়ার ঝোঁক এখনকার ঔপন্যাসিকের নেই। বরঞ্চ তিনি যে নির্বাচনশীল নন—এই মায়া সৃজন করতে পারলেই অনুভূতির শতমুখী সামগ্রিক চেহারা পরিস্ফুট হতে পারে।

সুতরাং নায়কের অনুভূতিই এখানে বিষয়বস্তু। স্বভাবত সে অনুভূতি নায়কের অভিজ্ঞতার নামান্তর ব্যতীত আর কিছু নয়। Every thought is a part of a personal consciousness—সুতরাং চিন্তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে পুরো ব্যক্তি-চেতনার আভাস মেলে। যেহেতু ব্যক্তি-চেতনা স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়, সমাজ এবং সভ্যতার বিশেষ অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির যোগফল হল ব্যক্তিচেতনা, তাই শেষ পর্যন্ত একটি ব্যক্তিচেতনার মুকুরে সভ্যতার চেহারাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সভ্যতা এবং সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা এখানে একটি পরোক্ষ পটভূমির মত বিরাজমান।'

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে বলতে হয় যে আধুনিক উপন্যাস যদিও অতিকায়-বিষয়ভারে মন্থরগতি বিপুল গ্রন্থ আর নয়, তথাপি যে বিশেষত্ব নিয়ে শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের আবির্ভাব আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস সে বৈশিষ্ট্যে বঞ্চিত নয়। মনের সমগ্র চেহারায় সভ্যতারই সমগ্র চেহারা সেও আঁকতে চায়।

অ্যাংগ্রি ইয়াং মেন

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো একটি গল্পের নায়কের চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—তার দেহে যৌবনের আলোর চেয়ে উত্তাপটাই বেশি। ইংরেজী সাহিত্যে যৌবনের আলো বহুদিন হল নির্বাপিত হয়েছে; মাঝে মাঝে যে উত্তাপটা পাওয়া যেত, আজ বোধহয় তাও স্তিমিত হয়ে আসছে। ইংলণ্ডের সর্বাধুনিক তরুণ লেখকদের সাহিত্য-কর্ম এই নিস্তেজ মুমূর্ষু যৌবনেরই অন্তিম স্বাক্ষর।

সাম্প্রতিককালে বিলেতের সাহিত্যজগতে যে লেখকসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, এবং যার হট্টগোলের প্রতিধ্বনি বিলেতী সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের দেশেও এসে পৌঁছেছে, তার সাড়ম্বর নামকরণের মধ্যে একটা চমকের ভাব আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 'অ্যাংগ্রি ইয়াং মেন'—এই কথাগুলি সৃষ্টির পেছনে, গোড়ার দিকে উল্লেখিত লেখকসম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকলেও, আজ তাঁরা এই আখ্যা-প্রদানের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছেন। তার একটা হেতু, তাঁরা কোনো গোষ্ঠীভুক্ত হতে অনিচ্ছুক। আর এর থেকেও বড় কারণ, নিজেদের 'অ্যাংগার' বা ক্রোধের যাথার্থ সম্বন্ধেই আজ তাঁরা সন্দিহান। বস্তুত, নামগ্রহণের ক্ষেত্রে এই যে দ্বিধা-সংকোচের ইঙ্গিত পাচ্ছি, এই আস্থাহীন, আত্ম-সন্দিগ্ধ মনোভাবই এঁদের সাহিত্যের মূল সুর। পারস্পরিক অনেক মতানৈক্য থাকলেও, ভাবধারার এই সমজাতীয়তা, এঁদের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করার ভিত্তি হতে পারে। এ ছাড়াও, এঁরা প্রায় সবাই তরুণ; জন্মকাল এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যে। এঁদের অধিকাংশই আসছেন মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসার থেকে; কয়েকজনের জন্ম শ্রমিক পরিবারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের যৌবনে পদার্পণ। যুদ্ধোত্তর প্রথম লেবর সরকারের সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতির কোলাহলে কেটেছে যৌবনের প্রথম কয়েক বৎসর। এবং তারপর লেবর

সরকারের পূর্বাবধারিত পতন এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের আশাভঙ্গের পটভূমিকাতে এই যুবকসম্প্রদায়ের লেখক-জীবনের সূত্রপাত হয়েছে। এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, এঁদের সাহিত্যচিন্তার সমধর্মিতার একটি প্রধান সূত্র।

স্নতরাং 'অ্যাংগ্রি ইয়াং মেন'-দের সাহিত্যকর্মে যে অবিশ্বাসের স্বরের কথা বলেছি, তার উৎস রয়েছে তাঁদের সামাজিক চিন্তাধারার মধ্যে। লেবর পার্টির পরাজয়ের ফলে এই তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনে স্বভাবতই একটা নৈরাশ্য এবং রাজনীতির প্রতি অনাস্থা দেখা দিয়েছিল। এককালীন উন্মাদনায় নিজেরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন—এই চিন্তাটা আত্মগ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়াল। সেই পুরনো ভ্রান্তির কথা স্মরণ করে একজন দুঃখ করে বলছেন :

> "We did not then know that power was being given to a party imprepared for it and that the intoxicating ideals and slogans by which some men had sustained their lives and with which others, like myself, had grown up would be incapable of translation into practical, workaday terms." (George Scott : *Time and Place*)

কিন্তু নিজেদের এই অক্ষমতার দিকে ফিরে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই, সমগ্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাগুলিও খুব স্পষ্ট হয়ে এই তরুণ লেখকদের স্বচ্ছ, বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে পড়ল। তাদের সমগোত্রিয় মানুষের নীচতা, কপটতা, সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি এবং ধনিকশ্রেণীর উন্নাসিকতা ও স্বার্থপরতা—এই সমস্ত কিছু 'অ্যাংগ্রি ইয়াং মেন'-দের সাহিত্যের উপাদান হয়ে দাঁড়াল। শ্রেণী-বিভক্ত সমসাময়িক সমাজের প্রতি বিরক্তি ও সেইহেতু এ সমাজ-গ্রহণে অসম্মতি এবং এর থেকে মুক্তিলাভে নিজেদের অক্ষমতা—এই সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিক বিরাগ—একজন সমালোচকের ভাষায় cosmic disgust—আধুনিক ইংরেজ তরুণ লেখকদের সাহিত্যের মূল উপকরণ।

এই সার্বজনীন অসন্তোষের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায় জন অসবোর্ণের নাটক 'Look Back in Anger'-এ। তিন অঙ্কের এই নাটকটির প্রধান চরিত্র জিমি পোর্টার। নাটকটির অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে নিজের স্ত্রী অ্যালিসন-কে উত্যক্ত করে তুলবার জন্য তার বিরুদ্ধে জিমি-র তিরস্কার,

অপবাদ ও নিন্দার গোলা দাগা। বিরক্তির শেষ পর্যায়ে গিয়ে হেলেনা (নাটকের আর একটি চরিত্র)-র ভাষায় পাঠকদের অনুযোগ করতে ইচ্ছে করে: "Why do you try so hard to be unpleasant?" এর জবাব অবশ্য পরে পাই যখন জানতে পারি অ্যালিসন, সৈন্যবিভাগীয় উচ্চপদস্থ কোনো এক কর্মচারীর কন্যা এবং শ্রমিক সন্তান জিমির প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে, নিজের পিতা-মাতার মতের বিরুদ্ধে সে তাকেই বিবাহ করে। অ্যালিসনের প্রতি জিমির বিরাগের কারণ এই শ্রেণী-বিদ্বেষপ্রসূত; জিমি ও তার বন্ধুর সম্বন্ধে অ্যালিসনের কথাগুলি এ-ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ: "They both came to regard me as a sort of hostage from those sections of society they had declared war on." অ্যালিসন সহ্যশক্তির শেষ সীমা অতিক্রম করে, জিমিকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু নাটকের শেষ অঙ্কে তার সদ্যজাত সন্তানকে হারিয়ে অ্যালিসন আবার জিমির কাছে ফিরে আসে এবং চিৎকার করে নিজের পরাজয় ঘোষণা করে: "I want to be corrupt and futile! Don't you see! I'm in the mud at last! I'm grovelling! I'm crawling!" অ্যালিসনের এই প্রত্যাবর্তনকে, অনেকে তার ধনিক-আসক্তির পরাজয় বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন, কিন্তু গল্পের অধঃস্রোত হিসেবে থাকলেও শ্রেণী-বিদ্বেষ এ নাটকের মূল বিষয় নয়। জিমি পোর্টারের সার্বজনীন বিতৃষ্ণার উগ্র উদ্গীরণের আড়ালে শ্রেণী-বৈষম্যপ্রসূত ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষোভটি প্রায় হারিয়ে গেছে। তার বিরাগের লক্ষ্য সমগ্র জগৎ-সংসার; কোনো শ্রেণী, এমনকি কোনো মানুষও নয়। কারণ অ্যালিসনকেও সে ভালবাসে, যদিও তার cosmic disgustকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনে অ্যালিসনকে সে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আসল শত্রুকে সনাক্ত করতে গিয়ে জিমির এই যে অক্ষমতা তার সমর্থনকল্পে হেলেনা বলেছে: "He was born out of his time··· There's no place for people like that any longer—in sex, or politics or anything." জিমিকে যুগবহির্ভূত বলে প্রমাণিত করার এই চেষ্টাটা লক্ষণীয়।

শ্রেণীগত ক্ষোভকে বিশ্বের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে গিয়ে Look Back in Angerএ যতটা উত্তেজনা প্রকাশিত হয়েছে, অ্যাংগ্রি ইয়াং মেনদের অন্যান্য বইতে সে উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত, যদিও বিদ্বেষটা উপস্থিত।

বিলেতী সমাজে চিরপরিচিত শ্রেণীবৈষম্যের উগ্র আত্মপ্রকাশ, ধনিক সমাজের অর্থের আস্ফালন, উপবাসী মধ্যবিত্ত মনকে পাগল করে তোলে। কিন্তু তার ফলে এই উচ্চশ্রেণীর প্রতি তার ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা থাকলেও, ঐ সমাজে স্থান করে নেবার একটা গোপন আশা থেকে সে কখনও মুক্ত হতে পারে না। সমাজের ঐ উচ্চস্তরে পৌছবার প্রলোভনটা মধ্যবিত্ত মনের আনাচে-কানাচে উঁকি মারে। চিরাচরিত মধ্যবিত্ত মানুষের এই দুর্বলতা, মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে জন ব্রেইনের উপন্যাস Room at the Top-এ। নায়ক জো ল্যাম্পটন শ্রমিক সন্তান। ইয়র্কশাইরের একটি শহরে অ্যাকউন্ট্যান্সির কাজ নিয়ে যেদিন সে প্রথম পদার্পণ করল, সেইদিন থেকেই সে তার চলার পথ বেছে নিল। ঐ শহরের উচ্চশ্রেণীর সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাটাই তার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল; পোশাক-পরিচ্ছদে, কথোপকথনে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে, ধনিক সম্প্রদায়ভুক্তদের সঙ্গে জো পাল্লা দিতে শুরু করল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আগাগোড়া জো এই সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে। এদের প্রতি তার আসক্তিতে কোনো ভাবাবেগের বন্ধন নেই, নিছক অর্থলোলুপতা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটা প্রকাশ করতে সে কখনই পিছপা হচ্ছে না। তার পরিচিত মহিলাদের সে নির্মমভাবে বিভিন্ন দলে ভাগ করে, তাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা অনুসারে। এক ধনিক-কন্যা যখন প্রশ্ন করে জো তাকে কতখানি ভালবাসে, জো জবাব দেয়: "A hundred thousand pounds worth." কিন্তু জোর এই উচ্চসমাজে স্থান লাভের পথে সে নিজেই বাধা সৃষ্টি করল, মধ্যবয়স্কা বিবাহিতা এলিসকে ভালবেসে। এলিসের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন তাকে শ্রেণীগতভাবে এগিয়ে দিতে তো পারবেই না, বরং কলঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াবে; অপরপক্ষে, ধনী ব্যবসাদারের কন্যা সুসানকে যদিও সে ভালবাসে না, কিন্তু বিবাহ করতে পারলে শ্বশুরের কৃপায় তার দরিদ্র জন্মকে ভুলে গিয়ে সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। যুক্তি ও হৃদয়াবেগের এই দ্বন্দ্বের সমাধান জো শেষে নিজেই স্থির করে যুক্তিকে মেনে নিয়ে। অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেদীতে, এলিসের ভালবাসাকে সে বলি দিল। এলিস আত্মহত্যা করল। জো তার মনুষ্যত্ববোধের অবশিষ্টাংশের কাছে কৈফিয়ত দিল এলিসের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে: "O God", I said, "I did kill her. I wasn't there, but I killed her."

জোর এই পরিণামের বর্ণনার আড়ালে, তার নীচতা ও কপটতার দুর্বলতার প্রতি লেখক তীক্ষ্ণ শ্লেষসহকারে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নারী-পুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত পুরুষের যে চিরাচরিত রক্ষণশীল মনোভাব, তার অদ্ভুত পরিচয় পাই যখন দেখি জো, এলিসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছে একটা তুচ্ছ কারণে। জো নিজে একাধিক নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেও নিজেকে অপরাধী মনে করে না। কিন্তু যেদিন জানতে পারল যে এলিস, জীবনের এক দীন মুহূর্তে, অর্থের জন্য এক শিল্পীর 'মডেল' হয়েছিল, সেদিন সেই ঘটনাটাকে একটা ছুতো হিসেবে আঁকড়ে ধরে এলিসকে সে পরিত্যাগ করল।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত মনের এই সব নানা ধরনের দুর্বলতার প্রতি যখনই অ্যাংগ্রি ইয়াং মেনরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তখনই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজকে ঘৃণা করেও সেই জগতে প্রবেশলাভের অদম্য ইচ্ছা পোষণ (যেমন Room at the Top-এ), শক্তিশালী শত্রুর ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, আবদ্ধ আক্রোশকে কাছের দুর্বল মানুষের প্রতি সঞ্চালিত করার সহজ পন্থা (যেমন Look Back in Anger-এ), মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে চ্যুত হয়ে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কাছাকাছি চলে এসেও, আবার কোনো ধনী কন্যার প্রণয়ের টানে অর্থবান হবার ইচ্ছা (যেমন Hurry On Down-এ)—নিম্ন-মধ্যবিত্ত মনের এই বিচিত্র ঘাত-সংঘাতের এত অকপট খাঁটি বিশ্লেষণ আধুনিক সাহিত্যে খুব দুর্লভ।

কিন্তু এই দুর্বল চরিত্রগুলিকে নায়কের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই 'অ্যাংগ্রি ইয়াং মেন'রা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির রন্ধ্রপথের সন্ধান দিয়েছেন। বর্তমান পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের অস্তিত্বের শেষ অঙ্কের আড়ম্বরের প্রতি লোভনীয় সামগ্রীর চটকদার মিছিলের প্রতি জো ল্যাম্পটন বা চার্লস্ লাম্‌লে (Hurry on Downএর নায়ক)-এর আসক্তি অমার্জনীয়। কারণ এরা ঐ সমাজের দম্ভের আড়ালের অসারতা সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। সুতরাং চোখ খুলে গর্তে পা দিলে, পরিণাম খুব বেদনাদায়ক হলেও, এঁরা কোনোমতেই সহানুভূতি দাবি করতে পারেন না। অবশ্য এর পেছনের সামাজিক কারণটা খুবই স্পষ্ট। 'ওয়েলফেয়ার স্টেটে'র কৃপায় এঁদের ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অংশ-বিশেষ জুটেছে। এই ঘটনাটা একই সঙ্গে শ্রমজীবী সমাজ থেকে তাঁদের বিচ্যুতির কারণ এবং

উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি সংসক্তির বন্ধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণী ত্যাগের এই নিদর্শন ইংলণ্ডে আজ নতুন নয়। ১৮৮৯ সালে এঁদেরই পূর্বগামীদের সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌স্‌ মন্তব্য করেছিলেন :

> "The most repulsive thing here is the bourgeoise 'respectability' bred into the bones of the workers"
>
> (F. A. Sorge-কে লিখিত চিঠি)।

বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এই 'লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট'দের সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচক বলছেন : "this plebian elite who have been creamed off from the admass for higher education and managerial duties" (Kemeth Allsop : The Angry Decade) এঁদের কাছে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অসারতা স্পষ্ট; কিন্তু তাঁরা ভুলতে পারছেন না এই ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধনতান্ত্রিক রক্ষাকর্তারাই তাঁদের দান করছে বিদ্যার্জনের সুযোগ-সুবিধা। এইটেই তাঁদের মূল দ্বন্দ্ব। এই দ্বিধারই ছাপ রয়েছে জো ল্যাম্পটনের ধনিকসমাজের প্রতি আস্থাহীন আসক্তিতে। জো ল্যাম্পটনের পক্ষে যেমন আর শ্রমিকসমাজে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, জিমি পোর্টারের পক্ষেও তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, নিজের ক্রোধকে বাস্তবরূপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ এরা যুদ্ধোত্তর লেবর দলের রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যর্থতার শহীদ। স্বভাবতই রাজনৈতিক হতাশা, রাজনীতি থেকে বহুদূরে এদের ঠেলে দিয়েছে। "I think the best and most trustworthy political motive is self-interest" (Kingsley Amis : Socialism and the Intellectuals)। জন ওয়েইনের উপন্যাস "Hurry On Down"-এর নায়ক চালস্‌ লাম্‌লের জীবনের আদর্শ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'আত্মসচ্ছল দারিদ্র্য' (Self-sufficient poverty) এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নিরুপদ্রব অজ্ঞাতবাস। অন্য একটি চরিত্র লাম্‌লের বর্ণনা দিচ্ছে এই ভাষায় : "Doesn't want to take sides in all the silly pettiness that goes on. Doesn't want to spend his time scratching and being scratched."

চারপাশের সামাজিক ঘটনার প্রতি এই অনীহা প্রকাশ করে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রমাণের চেষ্টা লক্ষ্য করেছি আগে "Look Back in Anger"-এ, যেখানে হেলেন, জিমিকে 'born out of his time' বলে সমর্থন করছে।

বস্তুতপক্ষে, একটা উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ছাপ অ্যাংগ্রি ইয়াং মেনদের সাহিত্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বর্তমান সমাজের মূল্যবোধ অর্থহীন এবং নিজেরাও অক্ষম—এই ব্যক্তিগত সমস্যার একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত খুঁজবার চেষ্টায় এঁদের ফরাসী existentialism বা অস্তিত্ববাদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। কলিন উইলসনের Outsider যখন এদেশে প্রথম আসে তখন স্বাভাবিক কারণেই বুদ্ধিজীবী মহলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। কারণ উইলসন শ্রমিকসন্তান; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েও মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসেই ইংলণ্ডে Existentialist আন্দোলনের পুরোধারূপে প্রতিষ্ঠিত। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে, বইটির ওপর যে মোহের আস্তরণ পড়েছে, সেটা সরিয়ে নিলেই, বক্তব্যের আসল চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। উইলসনের মতে আধুনিক সমাজের সাধারণ আটপৌরে জীবনকে গ্রহণ করতে বুদ্ধিজীবী অক্ষম ; কারণ এ জীবন-যাপনের কোনো মূল্য নেই। সুতরাং সে সমাজে থেকেও সমাজ-বহির্ভূত। কিন্তু যেহেতু সে জীবনের অর্থহীনতা সম্পর্কে সচেতন, আর পাঁচজন অন্ধের মধ্যে সে-ই একমাত্র এক-চোখা। Wells-এর ভাষায় "in the country of the blind the one-eyed man is king"। এর ফলে বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে? জবাবে উইলসন, কামুর L'Etranger-এর নায়ক Meursault-এর কথা স্মরণ করছেন। Meursalt-কে যখন খুনের জন্য বিচার করা হচ্ছে, সে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন, কারণ সামাজিক কোনো মূল্যবোধের প্রতি তার আস্থা নেই। তার হাবভাব, কাজ-কর্মে কে কি মনে করছে—সে সম্বন্ধেও তার কোনো ঔৎসুক্য নেই। এই ঔদাসীন্য ও চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা লক্ষণীয়। অবশেষে উইলসনের মতে বুদ্ধিজীবীর মুক্তির পথ : ভগবৎ-বিশ্বাসী অতি-মানবের আদর্শ।

সে যাই হোক। কিন্তু Meursault-এর অনাস্থা ও অনীহার প্রতিধ্বনি অ্যাংগ্রি ইয়াং মেনদের উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে প্রায়ই পাওয়া যায়। মানুষের ভাবনা-চিন্তা, রুচি-পছন্দর প্রতি একটা প্রচণ্ড অবজ্ঞা এদের বৈশিষ্ট্য। Thomas Hinde-এর "Happy as Larry"র ল্যারি ভিনসেণ্ট বেকার যুবক। তার স্ত্রী বেটী রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে। ল্যারি দৃশ্যটা দেখেও না দেখার ভান করে চলে যায়। পরে আহত বেটীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় বেটীর বাবা। বেকার ল্যারির চাকরি জুটিয়ে দেবার চেষ্টা

করে তার বন্ধু-বান্ধবেরা। চাকরির ইণ্টার্ভিউকালীন ল্যারির নিরুত্তাপ ব্যবহার Meursault-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু Meursault-এর ঔদাসীন্যের পেছনে আত্ম-বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা ছিল; ল্যারির নিষ্ক্রিয়তার একটা কারণ তার মানসিক দুর্বলতা এবং দায়িত্ব গ্রহণে ভীতি। Happy as Larry-তে নায়কের অনীহা ক্লীবত্বের সীমায় গিয়ে পৌঁছলেও, কিংস্‌লে অ্যানিসের 'Lucky Jim'-এ জিম ডিকসনের অনাস্থার একটা স্বাস্থ্যকর দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এ চরিত্রটি একটি ছোট সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজের চাকরিটি বজায় রাখবার জন্য তাকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ Ned Welch-কে নানাভাবে প্রীত করতে হচ্ছে, যদিও Welch-এর বিদ্যা-বুদ্ধিতে তার কোনো আস্থা নেই। মনের এই অবিশ্বাসকে গোপন রেখে ক্রমান্বয়ে চাটুভাষীর অভিনয় করতে গিয়ে জিম ডিকসন প্রায় ভেঙে পড়ে। মাঝে মাঝে তার মনের আসল চিন্তাগুলো বিচিত্ররূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। গম্ভীর আলোচনা সভায় হাস্যকর মুখভঙ্গি করে বা ভয়-দেখানো চিঠি বেনামে পাঠিয়ে আর পাঁচজনের দুশ্চিন্তাকে উপভোগ করে বা টেলিফোনে ডেকে অন্যপক্ষকে নাজেহাল করে—জিম তার আবদ্ধ বিতৃষ্ণার নির্গমপথ খোঁজে। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে তার অনাস্থা প্রকাশ করবার জন্য লেখক যে-সব অদ্ভুত হাস্যরসাত্মক ঘটনার বিন্যাস করেছেন, সে সম্পর্কে ওয়াল্টার অ্যালেনের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ: "...the impossible situations arise from the fact that he can never wholly kid himself that the racket is worth playing." মানুষের হাবভাব, চলন-বলনের অসারতাই জিমের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়ে তার কৌতুক-বোধের দ্বার খুলে দেয়।

অ্যাংগ্রি ইয়াং মেনদের নিজেদের সমাজের বিশ্লেষণ অত্যন্ত খাঁটি; কিন্তু এই সমাজের দুর্বল চরিত্রগুলিকে যেখানে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করে, ফুটিয়ে তোলা দরকার ছিল, সেখানে তাদের ট্র্যাজেডির কোমল সহানুভূতির স্পর্শ দিয়ে, স্থূল অতি নাটকীয়তার কানা-গলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; সচেতন চরিত্রগুলিকে বলিষ্ঠ সত্যান্বেষী রূপে আশা করতে গিয়ে পাঠক হতাশ হয়ে পড়ে যখন দেখে ইস্কুল-পালানো ছেলেদের তামাসা বা আবদেরে শিশুর অভিমানই এদের বিদ্রোহের মূল উপাদান। অ্যাংগ্রি ইয়াং মেনদের দৃষ্টিভঙ্গির এই দুর্বলতা তাঁদের রচনার বলিষ্ঠতাকে অনেকাংশে পঙ্গু করেছে।

এঁদের প্রসঙ্গে এ আলোচনা-সমাপ্তির আগে, আর একটি বইয়ের উল্লেখ না করে পারছি না। কলিন উইলসনের Outsider প্রকাশের প্রায় কুড়ি-বছর আগে জনৈক ইংরেজ যুবক "Studies in a Dying Culture" নামে একটি বই লিখেছিলেন। কডওয়েল যাঁদের নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, উইলসনও তাঁদের অনেককে তাঁর বইয়ের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কডওয়েলের বিষয়ও ছিল বুদ্ধিজীবী এবং স্বাধীনতার সম্পর্ক। 'অ্যাংগ্রি ইয়াং মেন'দের চরিত্রগুলির ক্রোধের কারণ উচ্চসমাজে আরোহণের পথে ধাক্কা—এই চিরপরিচিত সত্যটি কডওয়েলেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি।

> "It is the peculiar suffering of the petit-bourgeoisie that they are called upon to hate each other……No companionship, or solidarity is possible. One's hatred extends from the workers 'below' that abyss always waiting for one, to the successful petit-bourgeois just above one whom one envies and hates." (Wells-এর পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধ)।

D. H. Lawrence প্রসঙ্গে কডওয়েল বলেছেন :

> "Like Wells, he strove to climb upwards into the world of bourgeois culture ; …He succeeded in entering that world and drinking deeply of all its tremendous intellectual and aesthetic riches, only to find them riches turning into dust. The shock of that disillusion, added to the pain endured in that climb, filled him finally with a hatred for bourgeois values."

বাস্তবিকই, ধনিকশ্রেণীতে উঠতে গিয়ে প্রতি পদে হোঁচট খেতে খেতে এই পদস্খলনকে সমন্বয় সাধনের সংগ্রাম বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টার মধ্যে বুদ্ধি-জীবীর মুক্তির পথ থাকতে পারে না। মুক্তির ইঙ্গিত কডওয়েল দিচ্ছেন লরেন্স প্রসঙ্গে আর একটি মন্তব্যে :

> "…had that sunlit world never appealed to him so irresistibly, he might have seen that it was the proletariat—to whom he was so near at the start of his climb —that was the dynamic force of the future."

কলিন উইলসনের সমাজবহির্ভূত বুদ্ধিজীবীর Nietzche পরিকল্পিত

অতি-মানবের স্বপ্ন দেখা বা উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে স্থিরবিশ্বাসী হয়ে Meursault -এর উন্নাসিক অনীহার মধ্যে এ মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না। কডওয়েলের ভাষায় :

> "Man, the individual, cannot do what he wants alone. He is unfree alone. ···He can only attain freedom by social co-operation. He can only do what he wants by using social forces.... But in order to use social relatious he must understood them. He must become conscious of the laws of society, just as, if he wants to lever up a stone, he must know the laws of levers." ('স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে প্রবন্ধ)

সমাজের ক্রমবিকাশের সূত্র সম্বন্ধে এই সচেতনতাই আধুনিক বুদ্ধিজীবীর সামনে একটা সর্বব্যাপী মূল্যবোধ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তার সৃষ্টির পথে প্রেরণা-রূপে দেখা দিতে পারে। ইংলণ্ডের বর্তমান তরুণ সাহিত্যিকদের বিশ্লেষণধর্মী শ্রেণী সচেতন মননের কাছ থেকে এই উপলব্ধিই আমরা আশা করি।

উত্তরঅয়শ্চক্রে, প্রদক্ষিণ

সিদ্ধেশ্বর সেন

আমরা ঘুরতে ঘুরতে কখন, উত্তরায়ণের
দেউড়ীতে এসে পড়লাম
ভুবনডাঙ্গার মাটি, চাঙর-মাটি, ধুলো, গেরুয়া
থেকে থেকে লাল ছোপ, গেরুয়া

গেরুয়া টানে টানে একটা বিরাট, দিগন্ত-
প্রয়াসী অস্ত, বিদায়
নীচু বাংলার আতুর সন্ধ্যা, অবিলোপী
খোয়াইয়ের পাটাতনের উপর বিচ্ছিন্ন, একা
প্রবল মূর্হায় মুক্ত-বন্ধ
প্রকৃতি

মুক্ত
অন্তর্চেতনা
বন্ধ
আমার মধ্যে সমস্ত বহির্দেশ
অথবা বহিঃচরাচর বিন্যস্ত, বাস্তব, যেখানে
তোমার আমার সাযুজ্য, সত্তা
তারা
কত তারা তব আকাশে
আকাশের খচিতপ্রান্তর জুড়ে জুড়ে কতোযুগ
নির্নিমেষ, তারা
আমআমলকী-সপ্তপর্ণীর চৈতন্যপ্রহর
চলে বাউল বীথিকা,—উদয়াস্ত গান
আমার মিলন লাগি

তুমি
তোমার বিপুল জাগরণ
আনন্দরূপমমৃতম
অয়শ্চক্রে প্রদক্ষিণের পর, উত্তরাবর্তকক্ষে
অনুস্বর, বিন্দু
যদ্বিভাতি
দিঙ্মণ্ডল প্রসারিত, প্রসারিত, ঘূর্ণিত বাষ্পেমেঘে
যদ্বিভাতি

তোমার বিপুল জাগরণের মধ্যে, আমার
প্রবল মূর্ছা
প্রকৃতি, অপ্রাকৃত সুন্দর
বিপরীত ও সুন্দর
আনন্দরূপম্
নাকি আমাদের বহনের ক্লান্ত হাত, ক্লান্ত হাত
বহনের ক্লান্ত হাত, অমৃতকুম্ভ
ভেঙে প'ড়ে, ছত্রখান
কোপাইয়ের পাড়, কেয়াকাশের ডাক, গেরীমাটির লোহিত-
স্তব্ধতা যেখানে, তোমার

বিচিত্র আনন্দ, বাজে ॥

নিয়ত বাজাবে ভেরি

মণীন্দ্র রায়

ভেবেছ সভয়ে আমি স'রে যাব ? পথে যেতে যেতে
খাড়াই পাহাড় দেখে থেমে যাব পাইন ছায়ায় ?
হায় প্রিয়তমা, ভুলে গেছ
আমার রক্তের কাছে আমি প্রতিশ্রুত,
এখনো কি চেননি আমায় !

প্রতীক্ষা যতই দীর্ঘ হোক,
এ আকাশ থেকে অন্য আকাশের নীলের পাখায়।
রৌদ্র অবগাহনের প্রহরে প্রহরে যত দেরি—
বহুদূর থেকে তবু পৃথিবী আমার
শুশ্রূষার নীড় মেলে ইথারে ইথারে শব্দহীন
নিয়ত বাজাবে তার ভেরি।

সময় আমার কাছে কিছু নয়। এই করতলে
আয়ুর মতোই আমি কয়েকটি রেখায়
বন্দী করে রেখেছি ত্রিকাল।
তোমার হৃদয়শ্বাস যদি লাগে এ বুকে আমার,
আলোড়িত যন্ত্রণার আনন্দের সূর্যের চাকায়
সে মুহূর্তে রক্তাক্ত পাতাল॥

তোমার জানলায় সেই তারা

রাম বসু

তোমার অন্ধকার জানলায় সেই তারা
একা একা চুপি চুপি এসে দাঁড়ালে
এক মুখ শীতল উজ্জ্বলতা নিয়ে
ছাখো তোমার ঘর
তোমার ঘর নীল-লুব্ধ উদগ্রীব পাখি
নীলিমা মুখর করে আরো গাঢ় নীলিমার দিকে মিশে যায়।

তোমার অন্ধকার জানলায় সেই তারা
ছাখো আমাদের উপড়ে নিয়ে যায়
দৃশ্য, দৃষ্টির অবিশ্রান্ত উচ্চারণ থেকে
পাখনা ও শিশিরের তরল ধ্বনিত সীমান্তে, তোমার উৎসে
উৎসের মুক্ত উষ্ণ প্রখর নির্জনে,—যেখানে শুদ্ধ তুমি
নগ্ন, তীব্র, বীজ, বিকশিত
বিকশিত মোহনায় আমি অকস্মাৎ স্পর্ধিত গাছ
তোমার গন্ধের ছায়ায় অম্লান মর্মরিত
ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার ছাখো
শ্যাওলার ওপর ক্ষীণ চাঁদের ঝাপসা সমারোহে
আমাদের একটি সমুদ্র পর্বত আকাশ, মিলিত নিঃশ্বাস
আমাদের একটি জীবন, আমাদের মিলিত জীবন।

ছাখো আমাদের পিছনে দুঃখ
দুঃখের অরণ্য ক্রমাগত গাঢ়, ঘন, কালো
কালো হয়ে নৈশ নিবিড়তায় স্বপ্ন-স্বর-কলরব
কলরব একটি নামের মন্ত্রে সম্মোহিত
আর আমাদের মুখ
আমাদের প্রবাহিত মুখ বাতাসের দিকে, দিগন্তের ওপারে দিগন্তে
তার দেহলীতে আমরা নতজানু, কৃতার্থ, বলি :
এইবার আমাদের ভস্মীভূত কর।

স্থিরজ্যোতি

শিবশম্ভু পাল

বেতসবনের ভিতর ওই আলো
ধ্রুবতারার মতন জ্বলে স্থির :
জ্যোতির্ময় চিরকালের ভালো
যেন মায়াবতী নদীর তীর।

ছন্দে লয়ে বাজনা বাজে মধুর
শিল্প হয়ে রাজে বেতসবন ;
দিগন্তের নীলের মতো বঁধুর
হাসির ঢেউ পাতার কম্পন।

পরাণবঁধু তোমার ডাক শুনি
হৃদয় জুড়ে রাধার ব্যাকুলতা।
রক্তে বয় ব্যাকুল স্বরধুনী ;
বেতসবনের মর্মমূলে, গুণি,
প্রবেশ করে বরণ করে নেব
আলোকময় কবির স্তব্ধতা ॥

সঙ্গীতে

স্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

কী সঙ্গীতে ভেসে ওঠে ওই মুখ, স্মৃতি উবছায়
অরণ্যে সমুদ্রে নদীশাখানদীউপনদীছায়
মনের গভীরে ছলছল কলকল কত কথা
আলোকে আঁধারে কথানীরবতা গাঢ়নিবিড়তা।

সত্তার গভীরে একছায়া ঘোরে ফেরে। বিষণ্নতা
চোখ বুজে হাতড়ায়। ছায়া ঘোরে ফেরে অচৈতন্যে
একাছায়ানিঃসঙ্গতা নদীস্রোতধারাজলে কথা
নিরবধিবধিরতা ছায়াজলে স্মরণ-সৌজন্যে।

স্মৃতিধারা স্ববহতা! কালস্রোতে বিন্দুবিন্দুজল
ঢেউফেনা টলটল ছলছল থলথল কথা
নীরবতা ছায়াঘোরেফেরেদেখে ছায়াঅবিচল
সত্তার গভীরে ছুঁয়ে রাখে সে-ই হিমনীরবতা।

যে-সঙ্গীতে ভেসে ওঠে ওই মুখ, স্মৃতিউতরোল :
আরেক আলোকস্পর্শে নিভে যায় আঁধার-আদল।

অর্ধদশকের ঝিনুকে

তরুণ সান্যাল

কেউ কী আনন্দে আছে, নাই বলে দুর্বিনীত কথা,

পথে যেতে মনে হল বউল এসেছে আমে, কাঞ্চন ফুটেছে,
শব্দ ও বক্তৃতা সাঙ্গ হলে দেখা রাঙা ফুল, লতা,
যৌবন, আমিও আছি প্রেমের স্মৃতির স্নেহে বেঁচে,
(প্রতিমার চালচিত্র জলে ধুয়ে নষ্ট সম্ভাবনা
ভাসানের ঢাকঢোলে স্বস্তি নাই, স্মৃতির যন্ত্রণা)

পায়ের নীচেই আছে শৈবালের আশ্লেষ, প্রণয়,
কেউ ঝরা পাতা রাখে, কেউ ছবি, কেউ কোন কথা,
সকাল গড়ালে দেখি ঢলে পড়ে বাঁচার সময়—
তুষ্ট হয়ে ফেটে পড়ে শব, শতাব্দীর বিবর্ণতা,
(বসন্তকে ভালবেসে ফোটা ফুলে, রক্তে হয়ে চিতা
পিছল স্মৃতির পথে ফিরে গেল আমার কবিতা)।

মাঝে মাঝে মনে হবে, সুখেই ছিলাম আমি, তারা,
ঝরায়ো না তাকে রাত্রি শিশিরে, না-জালায়ো প্রদীপে,
অর্ধেক দশক আমি ঝিনুকের খোলায় ফোয়ারা
জলে ও মুক্তায় তুলে, এইবার যেতে চাই নিভে।

কেউ কী আনন্দে আছে, নাই বলে দুর্বিনীত সুখে
আমিও অনেক হাসি, দুঃখের আগুন সেঁকা মুখে ॥

ইএটসের কবিতা

বিষ্ণু দে

॥ এক বন্ধুকে ॥

এখন খুলেছে গোটা সত্যের চেহারা,
এবারে প্রচ্ছন্ন হও, মেনে নাও হার,
চেঁচাক না যত কাংস্যকণ্ঠ বেহায়ারা।
কি ক'রে যে তুমি হবে প্রতিযোগী তার
যার কথা মিথ্যা জানে সবাই প্রমাণে
তবু তার লজ্জা নেই চক্ষুতে নিজের
কিংবা পাড়াপড়শীর, আজন্ম ইমানে
মানুষ হয়েছ তুমি! হোক্ হেরফের।
মানুষ হয়েছ আরো কঠিন সাধনে,
সাম্রাজ্যজেতার চেয়ে আরো ক্ষুরধার,
চ'লে এসো, হাস্যময় তারের ঝনঝনে
যেমন বাজায় ক্ষ্যাপা হাতের সেতার
তেপান্তরে চতুর্দিকে পাথরে পাথর,
তেমনি প্রচ্ছন্ন হও আনন্দে তন্ময়,
কারণ এ-বিশ্বে জেনো সবার উপর
কিছুই কঠিনতর তার চেয়ে নয় ॥

॥ বাহাল ॥

সরকারের কাণ্ড দেখে চিত্ত হল চিটা,
উন্মুল শিকড় একটা তুলে করি তাক্
যেখানে দুরন্ত দৃপ্ত কাঠবিড়ালীটা
চলে, তার মহাসুখ দিতে পারে লাফ ;
আর সে হাসির মতো মিহি চিঁহি ডাকে
আবার লাফিয়ে ওঠে আর চ'লে যায়
আরেক গাছের ডালে নিমেষের ফাঁকে।
কোনো ভীরু নির্দেশে বা ছাপোষা ইচ্ছায়,
চিন্তিত ভ্রূভঙ্গ ভারে লালিত পালিত
নয় হিংস্র দাঁত, ঐ দেহের বাহার,
যার বলে ডালে ডালে সে হাস্যে উচ্ছ্রিত ;
বাহাল করে নি ওকে কোনোই সরকার।

পৌরুষ

অমল দাশগুপ্ত

'স্পুৎনিকা' মাসিকপত্রের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাটি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। পত্রিকার স্টলে দাঁড়িয়ে পত্রিকা দেখার অভ্যেস যদি আপনার থাকে তাহলে এই পত্রিকাটি অবশ্যই আপনার চোখে পড়েছে। কারণ এই পত্রিকাটির নামে যেমন নতুনত্ব আছে, তেমনি আছে প্রচ্ছদপটের ছবিতে। স্পুৎনিককে কল্পনা করা হয়েছে একালের নায়িকা হিসেবে। স্পুৎনিকা। তার মাথার লম্বা বেণীটি হয়েছে বেতারের অ্যান্টেনা, দুই স্তনে দুই সেট ব্যাটারি, নিতম্বে ট্র্যান্সমিটার। ক্যারিয়ার রকেটটিকে আঁকা হয়েছে রোবোটের মতো যান্ত্রিক চেহারায়। নিচের মস্ত কালো পৃথিবীটা অন্ধকার দিয়ে তৈরি নীহারিকার মতো পাক খাচ্ছে। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, এটি হচ্ছে আধুনিক কল্পনায় রাজপুত্তুরের রাজকেন্যকে উদ্ধার করার ছবি। কিন্তু পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদপটের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তা এই: "বিশ্বের কামনা-মানসী মহাবিশ্বের ডাক শুনেছে। অপরাজেয় পৌরুষ তার সঙ্গী। সনাতনী প্রেম পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভের আহ্নিক আবর্তনে লীন হয়ে যাক। কস্‌মিক ঔদার্যে নভোজাগতিক সীমাহীনতায় উজ্জীবীত হোক এ-যুগের রকেট-তীব্র প্রেম।"

বিশ্বের কামনা-মানসী মহাবিশ্বের ডাক শুনেছে কিনা তা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা নাও থাকতে পারে। কসমিক ঔদার্যে নভোজাগতিক সীমাহীনতায় রকেট-তীব্র প্রেম উজ্জীবীত না হলেও আপনার হয়তো কোনো ক্ষতি নেই। তবুও আপনাকে অনুরোধ করছি, স্পুৎনিকার একটি কপি কিনুন। পত্রিকাটির এই সংখ্যায় এমন একটি ঘোষণা আছে যাতে আপনারও আগ্রহ থাকতে পারে। এমনকি কিছু আর্থিক সুরাহা হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। না, সূচীপত্র দেখার দরকার নেই। সূচীপত্রে যে-সব লেখকের নাম রয়েছে তাঁরা সকলেই স্পুৎনিক-যুগের লেখক। নামে খ্যাত না হলেও যুগ-পরিচয়ে বিশিষ্ট। তাঁদের লেখার স্বাদ এমনিতে আপনি হয়তো তারিফ করতে

পারবেন না। কিন্তু আপনার রুচির ওপর থেকে ভালো-মন্দ সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার প্রলেপটুকু চেঁছে ফেলুন, তাহলেই টের পাবেন যে স্পুৎনিকার লেখা পড়ে নতুন এক আস্বাদে আপনার গোটা অস্তিত্বটাই তারিয়ে উঠছে।

তবে আপাতত এতখানি মেহনত আপনাকে আমি করতে বলছি না। যে বিশেষ ঘোষণাটির জন্যে পত্রিকাটি আপনি কিনেছেন সেটিই বরং পড়া যাক।

"রকেট-শ্রী প্রতিযোগিতা। এ-যুগের পৌরুষের প্রতিচ্ছবি রকেট। রকেটের তীব্র বেগ। রকেটের দীপ্ত জ্বালা। আপনার জীবনের কাহিনী আমাদের কাছে লিখে পাঠান। আমরা সেই কাহিনীর মধ্যে থেকে রকেটের তীব্র বেগ আর দীপ্ত জ্বালাকে আবিষ্কার করব। এই বেগ আর জ্বালা যদি আপনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে আপনিই হবেন রকেট-শ্রী। আপনার কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে। আপনিই হবেন নায়ক।"

আশা করি এই ঘোষণা আপনার কাছে অস্পষ্ট মনে হয় নি। আপনার জীবনের কাহিনীটি লিখে পাঠাতে হবে। বিচারকরা বিচার করবেন, সেই কাহিনীর মধ্যে কতখানি পৌরুষ আছে। আসলে এটি হচ্ছে পৌরুষের প্রতিযোগিতা।

আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আপনি তেমন উৎসাহিত হন নি। এই ঘোষণা পড়ার পরেও যদি আপনি উৎসাহিত না হন তাহলে কিন্তু আপনার পৌরুষ সম্পর্কেই সন্দেহ জাগতে পারে। পৌরুষ কথাটার মানে জানেন তো? সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম বলে রাগ করবেন না যেন। আপনি ভেবে দেখুন, শক্ত জিনিস জানতে গিয়েই আমাদের এত সময় দিতে হয় যে অনেক সময় অনেক সহজ জিনিস জানা হয়ে ওঠে না। শক্তের সঙ্গে সহজের চিরকালের একটা বিরোধ আছে। শক্ত অঙ্ক জানা লোক সহজ অঙ্কে ঘোল খায়। দূর-পাল্লার মোটর-রেসের দুঁদে চালক শহরের রাস্তায় পঁচিশ মাইল বেগে মোটর চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। আমরা সূর্য ও গ্রহমণ্ডলের মহাকর্ষের টানকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারি কিন্তু তরুণ-তরুণীর প্রেমের টানকে মাপা যেতে পারে এমন কোনো ফর্মুলা আজও অনাবিষ্কৃত।

যদি রাগ না করেন তো একটা অনুরোধ করি। অভিধান খুলে

দেখুন পৌরুষ কথাটার মানে কি। দেখুন, অভিধানে লেখা আছে, পৌরুষ মানে পুরুষত্ব, পুরুষোচিত উদ্যম, সাহস, পরাক্রম। ইংরেজিতে ম্যান্‌লিনেস্‌। পুরুষত্ব কথাটা বাদ দিন। পৌরুষ মানে পুরুষত্ব, দয়ালু মানে দয়াবান— এ থেকে কিছু বোঝা যায় না। বাকি থাকে পুরুষোচিত উদ্যম সাহস আর পরাক্রম। এবার ভালো করে ভেবে দেখুন, এই গুণগুলো আপনার মধ্যে আছে কিনা, থাকলে কতখানি আছে।

আপনি হয়তো ভাবছেন যে পুরুষোচিত উদ্যম আর সাহসের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এই যে আপনি প্রেম করে বিয়ে করেছেন। কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমারও তাই ধারণা ছিল। আমি তো জানি, সবিতার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে আপনি একবছর পরীক্ষায় ফেল করেছেন, সবিতাকে বিয়ে করার জন্যে আপনাকে পাঁচ বছর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, এবং আপনার তন্নিষ্ঠ প্রেমের বন্যায় আপনাদের বাড়ির ও সবিতাদের বাড়ির সমস্ত আপত্তি কুটোর মতো ভাসিয়ে দিয়ে আপনি সবিতাকে জীবনসঙ্গিনী করেছেন। সমস্তই আমি জানি। আমি সত্যিই ভাবতাম যে অন্তত এই একটি ব্যাপারে আপনি সত্যিকারের পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু স্পুৎনিকার বর্তমান সংখ্যাটি পড়ে আমার ধারণা পালটে গেছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, বিয়ে করার মধ্যে সত্যিকারের পৌরুষ কিছু নেই, পাঁচ বছর ধরে একই মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে তো একেবারেই নেই। স্পুৎনিকায় প্রকাশিত 'পৌরুষ' নামে গল্পটি পড়লে আপনাকেও আমার মতে সায় দিতে হবে।

হ্যাঁ, গল্পটির নামও 'পৌরুষ'। প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় বক্তব্যের পরেই গল্পটি ছাপা হয়েছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে স্পুৎনিকার পক্ষ থেকে গল্পটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা, এই গল্পটি পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন, রকেটের মতো তীব্র বেগ আর দীপ্ত জ্বালা সমন্বিত পৌরুষের চেহারাটা কি রকম হওয়া উচিত।

নায়কের নাম শান্তশীল। নায়িকার নাম উল্কা। দুজনের প্রথম সাক্ষাৎকার কোথায় কখন কিভাবে তা নিয়ে গল্পলেখক মাথা ঘামান নি। নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার ঘটবেই। আমাদের এই পৃথিবীর পক্ষে যেমন কক্ষচ্যুত হওয়া সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার না ঘটা। এই অবধারিত সত্যটুকু এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো লেখকও মেনে নিতে পারেন নি। তাই নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার ঘটাবার জন্যে

তাঁকে নৌকো ডোবাতে হয়েছে বা মোটরগাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ির অ্যাকসিডেণ্ট ঘটাতে হয়েছে। আশা করি, আপনি নিজেও স্বীকার করবেন যে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার হওয়াটা এমন কিছু একটা ঘটনা নয় যে-জন্যে ভয়ানক কিছু একটা ঘটনা ঘটা দরকার। আপনি টুইশনি খুঁজছিলেন আর সবিতা পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিল—কাজেই খুব স্বাভাবিক নিয়মেই আপনাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছে। শান্তশীল ও উল্কার মধ্যে হয়তো এমনি কোনো ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রথম সাক্ষাৎকার।

কিন্তু আপনি মুশকিলে পড়েছিলেন সবিতার কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে। অনেক দিন অনেকভাবে মহলা দিয়েও আসল মুহূর্তটিতে আপনার মুখে কথা যোগায় নি। শান্তশীল কিন্তু উল্কাকে বলছে, 'যদি বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে আমি বলব তুমি তোমার সংস্কার এখনো কাটিয়ে উঠতে পারো নি। আর যদি জানতে চাও আমি তোমাকে ভালোবাসি কিনা তাহলে আমি বলব আমি আমার ভালোবাসার চেয়েও অনেক বড়ো।'

সেই দিনটির কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে। পড়াতে পড়াতে আপনি সবিতার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যে সবিতা লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু তারপরেও আপনি মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারেন নি। আর তারপরেও সারাক্ষণ সবিতার মুখে লজ্জার রেশটুকু আশ্চর্য সুন্দর একটা গানের সুরের মতো ফুটেছিল। আর সবিতাও কোনো কথা বলতে পারে নি।

কিন্তু উল্কা সবিতা নয়। সে বলছে, 'শান্তশীল, তোমার খোকাপনা কবে ঘুচবে বলো দিকি। অন্যকে ফাঁকি দাও ক্ষতি নেই কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা কোরো না।'

শান্তশীল বলছে, 'উল্কা, তোমাকে আমার এই কথাটুকু বুঝতে হবে যে আমি পাঁকের কীট নই। পৃথিবী ছাড়িয়ে, সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে, গ্যালাক্সি ছাড়িয়ে—'

উল্কা হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু পঞ্চভূতে গড়া তোমার শরীরটা? ওটাও কি কসমিক ভাবালুতায় তৈরি? একটু আগে তুমি যখন আমাকে চুমু খেয়েছিলে তখন কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম যে আরো কিছু তোমার চাই।'

শান্তশীল উল্কাকে আরেকবার চুমু খেয়ে বলে, 'কথাটা কি জান উল্কা, উপোষী মানুষের একমাত্র চিন্তা হয়ে ওঠে খাদ্য। বড়ো কিছু ভাবনার জন্যে তাকে তৈরি করতে হলে খাদ্যের জন্যে তার কাঙালপনা ঘোচানো দরকার। কথাটা পুরনো, তবুও তোমাকে বলি, খাদ্যের জন্যে বাঁচা নয়, বাঁচার জন্যে খাদ্য। অর্থাৎ বাঁচাটাই আসল।'

উল্কা বলে, 'তোমার কথা শুনলে হাসি পায় শান্তশীল। ভোজনের একটা নিয়ম আছে, সময়-অসময় আছে। যখন-তখন যা-তা খেলে বদহজম হতে পারে। উপোষী থাকার চেয়ে তা আরো বেশি কষ্টের।'

আপনার মনে আছে, সবিতাকে আপনি একদিন বলেছিলেন, 'সবিতা, তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না।' কথাটা শুনে সবিতার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। সে-সময়ে আপনার সঙ্গে সবিতার স্বাভাবিক সাক্ষাৎকারের রাস্তা বন্ধ। নানাভাবে চেষ্টা করে নানা কারসাজির ভেতর দিয়ে অনেক দিন পরে পরে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে সবিতাকে চোখের দেখা দেখতে পেতেন। অনেক কথা বলার থাকত কিন্তু কোনো কথাই বলা হত না। তবুও সেই অল্প কিছুক্ষণের সান্নিধ্যই আপনার দিন-রাত্রির প্রতিটি ক্ষণকে রাঙিয়ে রাখত।

শান্তশীল বলে, 'জীবনটা যখন কতকগুলো বন্ধনের মধ্যে আটক পড়ে তখনই তা হয়ে ওঠে ফসিল। এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণার ব্যাপার উল্কা। যেমন ধরো নিউট্রন আর প্রোটন যতোক্ষণ গা-জড়াজড়ি করে থাকে ততোক্ষণ তাদের প্রচণ্ড তেজ থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেই তেজের বহিঃপ্রকাশ বটে তখনই যখন প্রোটনকে তার বিবর থেকে বার করে আনা সম্ভব হয়। উল্কা, আমিও চাই আমার অন্তরের তেজ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হোক। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বিবরবদ্ধ করতে চাও না?' এই বলে শান্তশীল উল্কাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে।

আপনি হয়তো ভাবছেন, গল্প এখানেই শেষ। নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ ও মিলনের পরে আর কী বলার থাকতে পারে? সবিতার সঙ্গে আপনার বিয়ের কিছুকালের মধ্যে আপনি নিজেও তো বুঝতে পেরেছিলেন যে অন্তত আপনার জীবনে আর কিছু ঘটবে এমন সম্ভাবনা নেই। সে-সময়ে একটা উপমা আপনার মনে এসেছিল। অনেক বাধা পার হয়ে অনেক রকম অবস্থার ভেতর দিয়ে জলের স্রোত যেন উঁচু পর্বতের ওপর থেকে সমতল

জমিতে নেমে এসেছে এবং সেখানে একটি আধারকে আশ্রয় করে হ্রদের মতো টলটল করছে।

সবিতা একদিন বলেছিল, 'চলো না আমরা কিছুদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে যাই।'

সেদিন কিন্তু আপনি আগেকার মতো বলতে পারেননি: 'সবিতা, বাইরের দৃশ্য দিয়ে আমাদের কি হবে! তুমি আর আমি যদি ঘরের কোনেও মুখোমুখি বসে থাকতে পারি তবে তাই হবে আমাদের স্বর্গ।' আপনি চুপ করে থেকেছিলেন। কিছুদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে যেতে হলে যে অনেকগুলো টাকা দরকার—সেই হিসেবটা আপনার মনে পড়েছিল। এর আগে আর কোনো দিন সবিতার কোনো কথায় আপনাকে টাকার হিসেব করতে হয় নি। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিতা বোধ হয় কিছু বুঝতে পেরেছিল, আপনার গলা জড়িয়ে ধরে আধো আধো স্বরে কানে কানে বলেছিল, 'জানো, আমাদের দেখে পাড়ার বৌরা হিংসে করে। কী বলে জানো? কপোত-কপোতী।'

আশ্চর্য, শান্তশীলও এই একই কথা বলছে অসীমাকে: 'জানো অসীমা, আমার বন্ধুরা আমাদের হিংসে করে। কী বলে জানো? কপোত-কপোতী।'

আপিস-ফেরত ক্লান্ত অসীমা মিষ্টি করে হাসার চেষ্টা করে, বলে, 'তাই বুঝি!'

শান্তশীল বলে, 'আর আমি কী বলি জানো? আমি বলি, উঁহু, কপোত-কপোতীর উপমাটা ঠিক হল না। কারণ কপোত-কপোতীর মধ্যেও ছাড়াছাড়ি আছে। বহুচারিতা আছে। বরং বলো যুগল-তারা। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা ভাবাই যায় না। ঠিক বলি নি অসীমা?'

অসীমা মুখ টিপে হেসে বলে, 'সারাদিন বাড়ি বসে বসে শুধু বুঝি ভাবো যে আমার সঙ্গে দেখা হলে পরে কি-কি লাগসই কথা বলবে?'

শান্তশীল বলে, 'উঁহু, শুধু তাই নয়, আরো একটা কাজ করি।'

'কী কাজ?'

'একজনের ধ্যান করি।'

'কার?'

'তোমার।' এই বলে অসীমার গালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে শান্তশীল হাত পাতে: 'পাঁচটা টাকা দাও তো!'

অসীমা বলে, 'কেন, সকালে তো একটিন সিগারেট কিনে দিয়েছি।'

শান্তশীল উদাত্ত স্বরে বলে, 'জীবনে এমন অনেক তাগিদ আছে যার কাছে সিগারেট তুচ্ছ। হে দেবী, অনুমতি দাও তো তোমাকে আজ আমি ফুলের সাজে সাজাব।'

অসীমা বলে, 'ঢঙ!'

শান্তশীল বলে, 'প্রসন্ন হও দেবী। মাত্র পাঁচটি টাকা।'

আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে আপনার অসুখের সময় সবিতা তার গয়না বিক্রি করেছিল। সেরে উঠে আপনি বলেছিলেন, 'সবিতা, আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি নি। যা দু-একটা গয়না তোমার ছিল তাও আমার জন্যেই গেল।'

সবিতা বলেছিল, 'এভাবে বলো না, আমার কষ্ট হয়।'

আপনি বলেছিলেন, 'তুমি তো জানো সবিতা, তোমাকে নতুন গয়না গড়িয়ে দেব এমন ক্ষমতা আমার নেই। আমার এই অক্ষমতাকে—'

কথাটা আপনি শেষ করতে পারেন নি। সবিতা আপনার মুখ চাপা দিয়ে কেঁদে ফেলেছিল।

তারপর থেকে আপনি কিন্তু সবিতার খালি গলার দিকে ভালো করে তাকাতে পারেন না। এমন কি মাঝে মাঝে একথাও ভাবেন যে সবিতাকে বোধ হয় আপনি সুখী করতে পারেন নি।

ওদিকে সিনেমার শো শেষ হবার পরে শান্তশীল গৌরীকে নিয়ে এসেছে এক অভিজাত হোটেলের পর্দাঘেরা কামরায়। গৌরীর একটা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলছে, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না গৌরী?'

গৌরীর মুখে কথা নেই।

শান্তশীল আবার বলে, 'গয়নার ওপরে তোমার এত মোহ!'

এবার গৌরী অস্ফুট স্বরে বলে, 'আমি তো তোমাকে সবই দিয়েছি।'

বাঁকা হাসি হেসে শান্তশীল বলে, 'কী দিয়েছ গৌরী? তোমার ওই শরীরটা? কিন্তু মন দিতে পেরেছ কি?'

গৌরী চুপ করে থাকে।

গৌরীকে বুকের ওপরে টেনে নিয়ে শান্তশীল আবার বলে, 'তুমি কি বিশ্বাস করো না যে আমি তোমারই।'

প্রায় ঘুমন্ত স্বরে গৌরী বলে, 'করি।'

আলতোভাবে গৌরীর গলা থেকে হারছড়াটা খুলে নিয়ে শান্তশীল বলে, 'বোকা মেয়ে!'

গৌরী বলে, 'তাহলে আমাকে অন্তত একটা নকলসোনার হার কিনে দাও। জানো তো বাড়ির লোকটিকে—'

শান্তশীল হেসে উঠে বলে, 'তা বরং দিচ্ছি।' তারপর আদরে আদরে গৌরীকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সবিতাকেও একদিন এমনি আদর জানিয়ে ভোলাতে হয়েছিল। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন দুজনে আর সেখানে সবিতাকে শুনতে হয়েছিল যে সে কোনোদিন মা হতে পারবে না। ফিরে এসে সবিতা একটি কথাও বলে নি। শুধু রাত্রিবেলা আপনি যখন তার গায়ে হাত দিতে গিয়েছিলেন তখন খানিকটা সরে গিয়ে সে শুধু বলেছিল, 'তুমি আবার বিয়ে করো।'

আপনি নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সবিতা কোনো কথা শুনতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত আদর দিয়ে ভোলাতে হয়েছিল তাকে। তারপরে সে কি কান্না সবিতার! সে-দৃশ্য আজও আপনি ভুলতে পারেন নি।

শুধু তাই নয়, তারপর থেকে সবিতা যেন আপনাকে অপত্যস্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। সবিতার কাছে আপনি যেন শিশু—আপনাকে নিজের হাতে খাইয়ে পরিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে সবিতার শান্তি।

মনে আছে, আপনার আপিসের এক সহকর্মিনী আপনার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে এসেছিল। সবিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন বলে সবিতাকে ডাকবার জন্যে ঘরের বাইরে এসে আপনি টের পেয়েছিলেন যে সবিতা আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন রাত্তিরে আপনি সবিতাকে বলেছিলেন, 'চলো সবিতা কিছুদিনের জন্যে পুরী বেড়িয়ে আসি।'

সবিতা বলেছিল, 'কেন, তোমার বান্ধবী বুঝি পুরীতে যাচ্ছে?'

আপনি শুধু বলেছিলেন, 'ছিঃ সবিতা!' তারপরে সবিতাকে কাছে টেনে নিতেই সবিতা কান্নাভাঙা গলায় বলে উঠেছিল, 'আমাকে তুমি ত্যাগ করো। আমি তোমার উপযুক্ত নই।'

আপনি আবার বলেছিলেন, 'ছিঃ সবিতা!'

শান্তশীল কিন্তু মালতীকে বলছে, 'আমাকে দশটা টাকা দাও—তাহলে আজ রাত্তিরের মতো তোমাকে রেহাই দিতে পারি।'

প্রায় মাঝরাত্তিরে মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে শান্তশীল এসে ঘা দিয়েছে মালতীর দরজায়। আর মালতী কোনো রকমে শাড়ি সামলে বাইরে এসে বলেছে, 'আজ আমার ঘরে লোক আছে, আজ তুমি যাও।'

শান্তশীল বলেছে, 'মানুষের সঙ্গে পশুর তফাত কোথায় জানো মালতী? প্রেমের একনিষ্ঠতায়। আমি তোমাকে একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।'

মালতী প্রায় মিনতির স্বরে বলেছে, 'তোমার পায়ে পড়ি আজ তুমি যাও।'

শান্তশীল বলে, 'পায়ে পড়তে হবে না মালতী, দশটা টাকা দিলেই আমি চলে যাই।'

তারপর টলতে টলতে এসে কুসুমের দরজায় ঘা দেয় শান্তশীল। কুসুম বেরিয়ে এসে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'টাকা আছে তো?'

শান্তশীল দশ টাকার নোটটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে কুসুমের মুখের ওপর। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে আসে বড়ো রাস্তায়। গল্পটি শেষ হয়েছে রাস্তার সঙ্গে আকাশের ছায়াপথের একটি তুলনাগত বর্ণনা দিয়ে। নক্ষত্রের মতো জ্বলছে সারি সারি ইলেকট্রিকের বাতি। কোটি কোটি নক্ষত্র। কোটি কোটি জগৎ। ইত্যাদি।

আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি গল্পটি পড়ে আপনি থ হয়ে গিয়েছেন। আপনার খেয়ালই নেই যে ওদিকে চারটে বেজে গিয়েছে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সবিতা অস্থির হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। আমি এও জানি আপনাকে এখন একথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই যে আপনি এখানে এসেছিলেন সবিতার জন্যে ফল কিনতে। সবিতা আপনার মন থেকে মুছে গিয়েছে।

দিশেহারার মতো পা ফেলে আপনি কোথায় চলেছেন তাও আমি বলে দিতে পারি। আপনি শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হবেন স্পুৎনিকা পত্রিকার আপিসে। সেখানে আপনি 'পৌরুষ' গল্পের লেখকের ঠিকানা জানতে চাইবেন। তারপরে আপনাকে যে-ঠিকানাটি দেওয়া হবে তা দেখেই কিন্তু চমকে উঠতে হবে। ঠিকানাটি একটি যক্ষ্মা-হাসপাতালের। চমক ভাঙলে আপনি দেখতে পাবেন, আপনার সামনে একটি কৌটো বাড়িয়ে ধরা হয়েছে। 'পৌরুষ' গল্পের লেখকের চিকিৎসার জন্যে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে আপনার কাছ থেকে। আপনার পকেটের পাঁচটি টাকা কৌটোর মধ্যে ফেলে দিয়ে আপনি ছুটে আসবেন হাসপাতালে সবিতার সঙ্গে দেখা করতে। সবিতা মুখ ফিরিয়ে থাকবে। আর আপনি তখন ভাববেন, সবিতার অভিমানটুকুও কী সুন্দর।

আপনি আমাকে সত্যিই হতাশ করেছেন! রকেট-শ্রী হবার কোনো যোগ্যতা আপনার নেই।

পশ্চাৎভূমি

দেবেশ রায়

বাতাস ছিল এলোমেলো—সারাটা দিন। সারাটা দিন চৈত্র মাসের মতো বাতাস ছিল এলোমেলো—সারাটা দিন। ক্লাস শেষ করে কমনরুমে যাবার সময় বিনয়ের চোখ পড়েছে তাদের ইসকুলের উত্তরের বাড়িটার ওপরে। কমনরুম থেকে ক্লাসে যাবার সময় বিনয়ের চোখে পড়েছে ইউক্যালিপটাস গাছের মাথা—কবরখানাটা এখান থেকে দেখা যায় না, যার পুব-দক্ষিণ কোনায় ঐ গাছটা।

সেই বাতাসে শরীরের জলীয় অংশ অতিরিক্ত পরিমাণে উবে যাওয়ায় সমগ্র চামড়াটা শুষ্ক, খরখরে। মুখে হাত বোলালে জরজর গন্ধ। কিংবা কাপড়-চোপড় যদি পরিষ্কার হত, ধোপদুরস্ত, আজকের ভাঙা, দাড়িটা আজকের কামানো—তবে এতটা শুষ্ক-খরখরে লাগত না।

ইসকুলের উত্তরের বাড়িটার মাথায় আকাশ ছাড়া কোনোদিন কিছু ছিল না, ইউক্যালিপটাস গাছের মাথার চেয়ে উঁচু কিছু ছিল না। সেই আকাশ আর ইউক্যালিপটাস সম্পূর্ণ না থেকে শূন্যতাকে প্রতিভাত করল, গুরুদশাগ্রস্তের উপস্থিতির পেছনে শূন্যতার মতো। কিছু যেন ওখানে ছিল, এখন নেই—সমাপ্ত যাত্রার আসরের মতো। এই শূন্যতাকে বিনয় নিজের সঙ্গে এত মিলিয়ে ফেলেছিল যে, এই বে-মাসি বসন্তের হাওয়ায় তার যেমন চঞ্চল, আনন্দিত ও হৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল তা হতে না-পেরে, দেহে ও মনে একদা-বর্তমান সম্প্রতি-অতীত কোনো অনুভূতির জের টানছিল। মাঠে অশোক ছেলেদের নিয়ে ক্রিকেট পিটছে। অশোকের পরণে প্যাণ্ট, আর উইকেটের পেছনে তার প্রস্তুত ভঙ্গিই বিশেষ করে বিনয়েব মনোহরণ করেছিল। ক্লাস এইটের ছেলেরা বলেছিল—"স্যর, মাইকেল এঞ্জেলোর গল্পটা অর্ধেক হয়ে আছে, সেটা বলুন।" "আজ ছবি আঁকো, পরে একদিন হবে।" কালো বোর্ডে সাদা চক দিয়ে আঁকা গাছের একটি ডালে উড়তে উদ্যত একটি পাখির দিকে তাকিয়ে বলেছিল বিনয়, তারপর, দরজায়

দাঁড়িয়ে এলোমেলো বাতাসটার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। দাড়িটা যদি আজকের সকালের কামানো হত, বা জামাকাপড়টা যদি আজকের ধোপভাঙা তবে, বসন্তের এ-বাতাসকে সে আমন্ত্রণ হিসেবে গ্রহণ করত, জলীয় পদার্থ শুকিয়ে যাওয়া মুখে, ফাটা গালে বাতাস লাগিয়ে, চোখ কুঁচকে বিনয় যেন নিজেকে অপচয় করছিল। বসন্তের বাতাস দখিন-মলয়। এটা উত্তর-বাংলা, দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, সমুদ্রের তীরে কলকাতা। কলকাতা থেকে এ বাতাস আসছে—এমন একটা সিদ্ধান্ত যেন বিনয়কে অপচয়িত হবার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। পরবর্তী ক্লাসে তাই সে বোর্ডে এঁকেছিল নিছক ডিসের ওপর কাপ।

সন্ধ্যাবেলায় বাতাস পড়ন্ত। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম, চাঁদ বিলম্বিত। পড়ন্ত বাতাসে রাত্রির কঠোরতর শীত অপেক্ষিত। পথের ধুলোবালি পরিষ্কার।

স্যাণ্ডেলটার এমন এক অবস্থা, চলতে গেলে পদশব্দের একটি বিশিষ্ট ধ্বনি জাগে, ল্যাংচানো, যা জনতার পদশব্দে অশ্রুত থাকে, অথচ সান্ধ্য জনহীনতার সুযোগে তখন বিনয়ের কানে স্পষ্ট। ল্যাংচানো পদধ্বনি কানে আসছে, গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ভাঙা ঘুমে যেমন ঘড়ির শব্দ—অভ্যস্ত, ব্যতিক্রমহীন, অর্থশূন্য। এত একঘেয়ে, নিশ্চিত ও বিরক্তিহীন যে বিনয়ের মনে হল এ থামবে না, চলবেই। বিনয় হঠাৎ একবার থামল। পদশব্দ থামলো। 'তবে, এ শব্দ আমারি পায়ের। আমারি পথ-চলার। আমারই।' এই সিদ্ধান্তে এসে বিনয় আবার চলতে লাগল, ল্যাংচানো, বিরক্তিহীন, অভ্যস্ত, বদলাবে না, থামবে না। 'এখুনি স্যাণ্ডেলটা ঠিক করে নেব, এখুনি।' চারপাশে এবং সামনে চাইল। উপায় নেই। 'কলকাতা হলে এখুনি ঠিক করে নেয়া যেত, এখুনি। কলকাতা হলে ঠিক করার দরকার হত না, সবার পায়ের শব্দে আমার শব্দ ঢেকে যেত—এখানে আর কারো পায়ের শব্দ নেই।' মুমূর্ষু রোগী যেমন বিকারের ঝোঁকে শরীর সঙ্কুচিত-প্রসারিত, হাত সঞ্চালিত ও চোখ বিস্ফারিত করে অত্যন্ত অপরিহার্য, নিতান্ত আবশ্যক কিছু অনির্দেশ্য দাবি জানিয়ে পরমুহূর্তেই নেতিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, তেমনি করেই, জুতো সারানোর দাবিটাতে চঞ্চল ও ব্যস্ত হয়ে বিনয় পরমুহূর্তেই নেতিয়ে পড়ল, ও, দাবির কথাটা একেবারে ভুলেই গেল। 'ছ—কর ছক্। ছ—কর ছক্। ছ—কর ছক্।' একই শব্দ, একই। অন্ধকার হোক আর আলোকিতই হোক, কৃষ্ণ-শুক্ল যে পক্ষই হোক, দাড়ি

কামান হোক, চাই না-হোক,—একই শব্দ। যদি জনতা থাকত—। নেই—। অতএব—। 'ছ্যাকরা গাড়ি চলুক, গরুর গাড়ি চলুক, ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাঁদুক, ক্যাঁকর ক্যাঁকর কাঁদুক, মাননেওয়ালা নেই, খবর্দার নেই, কোই নেহি নোকর, কোই নেহি মালিক, সব হ্যায় পাবলিক, ছ্যা—কর ছ্যাক, ছ্যা—কর ছ্যাক।' জ্বরাক্রান্ত রোগীর মতো কতকগুলি কর্কশ ধ্বনি উচ্চারণ করে বিনয় যেন নিজের অনুভূতিগুলোকে মুক্তি দিতে চাইল, আর পায়ের শব্দ থেকে তার মনে এল, এ-পায়ের শব্দ থামাবার কোনো প্রক্রিয়া তার জানা নেই, এ শহরটারও জানা নেই, অতএব ছ্যা—কর ছ্যাক চলুক।

নিজের সারাদিনের অনুভূতিকে বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায়, পথ-চলার বেলায়, ঐ ভাষায় প্রকাশ করে বিনয়ের তলপেট থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত ভক্-ভক্ হাসির একটা বমির মতো ভাব জট পাকাল।

হাসবার লোকাচার ভুলে, বিনয় প্রাণপণে একটা মাতালের মতো হেসে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল, বোধহয়, হাসিতে দুর্গন্ধ শোঁকবার মতলবে। উদ্‌গারের প্রথম চেষ্টার সময় সে থামলো না, কারণ তখন সে চিন্তা করছিল —'অন্নপ্রাসনের পর থেকে কম জিনিস তো আর পেটে জমে নি, পচে-পচে পচে-পচে ঢোল—আঃ হাঃ কেয়াবাৎ, লাগাও পেঁয়াজ-আলুকাবাব, সাঁঝ-বেলা—।' ভাবনাটা শেষ করতে করতে সে তিন-চারবার ঢেকুর তুলতে গিয়েছে, গলনালীতে একটা টান লেগেছে, ভাবনা শেষ করে দু-একবার চেষ্টার পর একটা ঢেকুর তুলল, মুখ হাঁ করতে ভুলে গেছে বলে গন্ধ শোঁকা হল না, এবার মুখ হাঁ করে বার দুয়েক চেষ্টার পর—'আহ্ কী হচ্ছে'— বলে নিজেকে ধমকে সে আবার পথ চলা শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই আওয়াজটা উঠল—ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। সে শব্দটা না-শোনার ভাব করে বিনয় ভাবল—'চলছি, কিন্তু কোথায় তা তো ভাবছি না, ভেবেছি? না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ও তো ভাবি নি, সকাল বেলার চা-খাওয়ার মতো কি সন্ধ্যাবেলাতে সুধীরদার বাড়িতে যেতেই হবে? কি হবে গিয়ে, হয়তো কাগজটা আর একবার পড়ব। কিংবা বাইরের চৌকিটায় শুয়ে থাকব, কিংবা, ওই মেয়েটার নাম কি? গোলাপ, টগর, যুঁই কি? মেনি বেড়াল টেড়াল কি?'—ভাবনার সূত্র হারিয়ে ফেলল বিনয়। এবং ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে যাবার পরই সে আর একটা সুতো

দেখল—ছ্যা—কর ছ্যাক, ছ্যা—কর ছ্যাক। যে পদশব্দ সম্বন্ধে সে অচেতন ছিল, কোন এক ফাঁকে তা তাকে আবার আক্রমণ করেছে। ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। 'যাবো না, যাবো না, সুধীরদার বাড়িতে যাবো না।' গলিটা সামনে এসে গেছে। তাই আরো একবার বিনয় নিজেকে শোনাল 'যাবো না, যাবো না, কিছুতেই যাবো না, যাবো না।' গলিটা এসে গেল। বাঁয়ে, না বেঁকে 'যাবো না যাবো না' বলতে বলতে আরো দু-এক পা গিয়ে বিনয় থেমে নিজেকে ধমকাল—'কী হচ্ছে, যতো সব, তাও তো সুধীরদার বাড়ি আছে, যাই, নইলে তো সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকতে হতো।' বাঁয়ে বেঁকলো বিনয়। ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। 'এ এক আচ্ছা জ্বালা তো। সব কথা গুলিয়ে দিচ্ছে। আজ গিয়ে বাবুইয়ের গানের খাতায় ছবি এঁকে দেবো।' ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। একই শব্দ। একই। অন্ধকার হোক আর আলোকিতই হোক। সুধীরবাবুর বাড়ির কাছাকাছি এসে বিনয় প্রথম দুঃখিত বোধ করল। কলকাতার জন্য সে খুব বেদনা পেল, কলকাতার জন্য সে খুব কাতর হল। মা-বাবা ভাই-বোন ভর্তি এখানকার বাড়ি থেকে, বন্ধু-বান্ধবী ভর্তি কফি হৌস থেকে, লোকভর্তি ট্র্যামে করে সে এখানে নামল। একঘেয়ে পদশব্দটাকে কিছুক্ষণের জন্য থামাল গেট খুলবার জন্য। গেট খুলতে খুলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কলকাতার জন্য। তারপর আবার ছ্যা—কর ছ্যাক, ছ্যা—কর ছ্যাক। একই শব্দ।

একই। অমাবস্যা হোক আর পূর্ণিমা হোক, শীত হোক আর গ্রীষ্মই হোক, দৃশ্য একই। স্থির দৃশ্য, নাকি চলচ্চিত্র। ঘড়ির মুরগি ধান খোঁটে। চলৎ না স্থির। এক ধানখোঁটা ছাড়া সে কিই বা করবে। চিরকেলে আকাশ চাঁদ নক্ষত্র ও বৃক্ষের সঙ্গে আর যারা এ দৃশ্য রচনা করে, তারাও নিষ্প্রাণ, অথচ এই স্থির পটে তাদের অভিনয় করবার কথা ছিল। আর এই পাত্র-পাত্রীগুলো সব জীবনের অনুকরণ করতে শিখেছে। অনুকরণে শিল্প হয় না। 'যদি এরা শিল্প রচনা করত তবে এই স্থির সনাতন দৃশ্যপটেই কতো ট্র্যাজেডি বা কমেডি ঘটত, তা নয়, সব প্রহসন হয়ে গেল—হায় রে।'

একই। আলো হোক, আর অন্ধকার হোক—(কৃষ্ণপক্ষ হলে মাঝরাতে দৃশ্য বদলাবে, বদলটা অবিশ্যি সন্ধ্যাবেলার তুলনায়। শুক্লপক্ষের প্রথম রাত আর কৃষ্ণপক্ষের শেষরাত প্রাগৈতিহাসিক)। পূব-দক্ষিণ কোনার আমগাছটায়

শীতকালে রোদ বিলম্বিত। 'রোদ খুঁজে নিয়ে বসা যায়, চাঁদ খুঁজে ?' রান্নাঘরটা লম্বায় খুব ছোট নয়, কিন্তু বেঁটে, বেঁটেও নয় খুব, মাথার টিনগুলো বদলান হয় নি, বড় মেয়ের বিয়ের সময় সুধীরবাবু মেঝে বাঁধিয়েছিলেন আর তখন যে রেলিঙ দিয়েছিলেন সেটা প্রায় চাল ছুঁই ছুঁই। দম-আটকানো গোছের। বারান্দার এক কোন ঘিরে হবিষ্যি—সুধীরবাবুর মায়ের। রান্না-ঘরটা পূব ভিটেয়, পশ্চিম-মুখো। উত্তরের ভিটেয় দু-কুঠরি-অলা একটা আর দক্ষিণে লম্বা আরো একটা ঘর।

সেই একই দৃশ্য, একই। আলো হোক আর অন্ধকার হোক।—সকালের দৃশ্যগুলো বদলে যায়। শরৎকালে বোধহয় সকালের একটা ঈষৎ-স্থির রূপ আছে—তাছাড়া তো সে চলমান। চলন্ত, ছুটন্ত, সকাল নিয়ত বদলায়, বদলায়, বদলায়।—দুপুরটা ডুবসাঁতার।—বিকেল থাকতে নেই, নেই, সস্তা নারকোল তেলের গন্ধ, মুড়ির বাটির গায়ে, মিনুকে বিকেলে চুলও বাঁধতে হয়, চুল না-বেঁধে পথেই বা মিনু যায় কি করে, অথচ পথে তো মিনুকে যেতেই হবে, মিনু যে পঞ্চদশী—দাদাকে, ইশকুল থেকে ফেরার পর মিনুর দাদাকে, আমাকে, বিনয়কে গুড়-মুড়ি খেতে না-দিয়ে সে যায়ই বা কি করে। তাই মিনুর হাতের নারকোল তেল গন্ধ বিলায় আমার মুড়ির বাটিতে—আজ মিনুটার কি কষ্ট, ওঃ, মিনুটার কি জ্বালা।—সন্ধ্যাবেলা, এখন এই সন্ধ্যাবেলায়—আতুরঘরের বাইরের নীরবতা। চরাচরে ? নাকি এই বাড়িতে ? সে নাকি আমার বাড়িতে ? নাকি আমার মনে ?—ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। সবাই চলছে। এই বাড়িটা। আর আমরা এই বাড়ি-গাড়ির যাত্রী। কখন যে ইষ্টিশন আসবে !

দু-কুঠরি-অলা উত্তরের ঘরের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকবার টিনের দরজা। ঘরটার তিনদিকে অনেকগুলো জানলা, পশ্চিমদিকের দেয়ালে লাগান বাবুইয়ের টেবিলে সরস্বতীর একটা ছবি আর মাথা-ধরার একটা ওষুধ। পড়ার টেবিলের ওপরের লণ্ঠনের আলো বাবুইয়ের বোনা দিয়ে ঢাকা, আলোটা দেখা যায় না। কিন্তু বাবুইয়ের চারপাশ দিয়ে আলোটা স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়। পশ্চিমের জানলাগুলো বন্ধ, পূবের জানলাগুলো খোলা, পূবের জানলার দিকে পেছন ফিরে বাবুই বসে। তাই বাবুইয়ের মুখের চারপাশ দিয়ে আলোর স্রোত পূবের জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। যদি কোনো দর্শক থাকত সে দেখত বাবুইয়ের টেবিলের লণ্ঠনের আলোটা

পূবের জানলা গলে এই টিনের দরজার ওপরে একটা কুয়াশার মতো আলোর আভা রচনা করেছে। যদি কোনো দর্শক থাকত সে দেখত ঐ লণ্ঠনের অলোর সামনে বাবুইয়ের মুখের সীমারেখা দেখা যাচ্ছে, (অথচ সে রেখায় গোলত্বের ইঙ্গিত, ঈষৎ ভাঙ্গচুরে অবয়বের বিশেষত্ব), আর তাতে অনেক উড়ো চুল। বাবুই জানে না ও একটা ছবি, ছবি জানে না যে সে একটা ছবি, দর্শক জানে মানুষ ছবি হয়, কবি জানে ছবি মানুষ হয়, বাবুই গান গায়, তুমি কি কেবলি ছবি ?

টিনের দরজা দিয়ে ঢুকে কুয়োপাড়ের বেড়া আর উত্তরের ঘরের দেয়ালের মাঝখানে অন্ধকার, বাঁশের বেড়ায় আঁকা একটা জানলা ও তার শিক। জানলার সামনে টেবিল, টেবিলের সামনে চন্দন। চন্দনের আঙুলের ডগা দাঁতের আগায়। পশ্চিমের দিকে পেছন করে, পূবের দিকে মুখ করে চন্দন। লণ্ঠনের আলো তার মুখে আলোছায়া ফেলে চরিত্র রচনা করেছে। আলো-অন্ধকারের স্বেচ্ছাকৃত পতনে কি চরিত্র আসে। লণ্ঠনটা ডানদিকে, চন্দনের নাকটা উঁচু, তাই বাঁ চোখের কোনে অন্ধকার। চওড়া কবজি। খেলোয়াড়দের মতো ছোট চুল। চোয়াল দৃঢ়। সবই দৃঢ়। চোখ অমন অদৃঢ় কেন ? নখের আগা ছেঁড়ে কেন চন্দন ? সম্মুখের জানলা দিয়ে বহির্গত আলোকস্রোতে অপসৃয়মান মানুষের মুণ্ডু, ধড় নেই। চন্দন ভীত ?

অতঃপর একটুকরো উঠোনের বাঁয়ে রান্নাঘর, রান্নাঘরের বারান্দায় হবিষ্যিঘরের ভেতর কুপির অসংযত শিখা, ছায়া ফেলে—মোছে, আলো ফেলে —মোছে, বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সুতোর মতো আলোর রেখা উঠোনে, রান্নাঘরের সিঁড়ির ছায়া উঠোনে, রান্নাঘরের নিচু চালটারও ছায়া পড়তে পারত, যদি, ছায়া ধরবার জন্য আকাশটা নিচে নামতে পারত, নিচে, ঠিক চালটার মাথার ওপরে। বারান্দার এক কোনে ঘুঁটে, কাঠ, বস্তা, কয়লা—অন্ধকারে জড়াজড়ি, আলোর আকস্মিকতায় ত্রস্ত—গল্পের সরাইখানার পথিকদের মালপত্রের মতো। হবিষ্যি ঘরেব ভেতর একটা ছোট উনুনের ছোট আগুনের সামনে খাবার তৈরি করে সুধীরবাবুর স্ত্রী। কুপির পরিচিত আলোর চৈত্রের বাতাসের মতো ছটফটানিতে সুধীরবাবুর তিরিশ বৎসরব্যাপী স্ত্রী অপরিচিত।

সন্ধ্যাবেলা গোধূলিতে চরাচর স্পষ্ট। সন্ধ্যায় অপসৃত। ভাবো। সন্ধ্যাবেলা। ভাবো।

আচ্ছা, পড়ার সময় এরা কী ভাবে? বাবুই, চন্দন, ও-ঘরে, সোনা-রুপো-হীরা, কী ভাবে? পড়ার সময় ভাবে, নাকি সন্ধ্যাবেলায় ভাবে। ভাবতেই হবে, সন্ধ্যাবেলায়। আমি কি ভাবতাম? যখন সোনা-রুপো-হীরার মতো ছিলাম, তখন? যখন চন্দন-বাবুইয়ের মতো হলাম, তখন? যখন আমি আমার মতো হলাম, তখন, তখন, এখন, এখন, এই সন্ধ্যাবেলায় কি ভাবছি? সুধীরদার মতো যখন হবো, কি ভাবব? সোনা-রুপো-হীরার মতো ভাবনা এখন আর আমি খুঁজেই পাব না—তখন স্বপ্ন বিশৃংখল, ভাবা মানে স্বপ্ন দেখা বা স্বপ্ন ভাঙা। সে-বয়েসের স্বপ্নের থই পাব না। চন্দন ক্লাস টেনে পড়ে। বাবুই নাইনে। আমি এবার ভাবব, বৌদির সঙ্গে দুটো কথার কথা বলে, দক্ষিণ ঘরের বারান্দার চৌকির ওপর শুয়ে ভাবব—কী-কী ভেবে ভেবে, আমি এখন, কী ভাবনা ভাবছি?

"কে?" বৌদি-র গলা শুনেই চোখ দুটো বোঝা যায়। ছোট উঁচু সিঁড়ির ওপর হাঁটু দুটো তুলে বসে, হাঁটুর ওপর বাহুর ভর, ডান হাতে খুন্তি জাতীয় কিছু। বাঁ-হাতে কি? পায়ের শব্দ শুনেই কোমরের থেকে ওপরের অংশটা সোজা করে তুলেছেন, গলাটাও উঁচু করে।

"আমি, বিনয়"—রান্নাঘরের সিঁড়িতে বিনয় পা দেয়।

"বিনয়, এসো,—বাড়ির সবাই ভালো তো"—বিনয়ের জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঊর্ধাঙ্গ শিথিল বৌদির, বাঁ-হাতে খড়ি ফেলেন উনুনে। ফুলকি কয়েকটা, চোখ কুঁচকে মুখ সরান, উত্থাপিত প্রশ্নের ভঙ্গি এতোক্ষণে মুখে ফুটিয়ে বিনয়ের দিকে চান। বিনয় সর্বদা এ-প্রশ্নের জবাবে একটা 'হুঁ' বলে চৌকাঠে বসে। বৌদি এ-প্রশ্ন কেন করেন, প্রতিদিন? অভ্যাসে? প্রতিটি দিন এক, এক। প্রতিটি দিনের কথা এক, এক। বেলা বোধ হয় সেটা বোঝেন না। তার মনের ঘনিষ্ঠতাই কণ্ঠে দূরত্বের স্বর আনে।

"বো—সো"—উপবিষ্ট বিনয়কে বৌদি। বিনয় একটা কাঠি সংগ্রহ করার জন্য প্রসারিত-কর। টুকরোটা হাতে নিয়ে মেঝেতে আঁকি-বুঁকি কাটে। বৌদি কাঠিটাও দেখেন, আঁকিবুঁকিটাও। বিনয় কাঠিটা ফেলে দেয়। গুন্‌গুন্ গান কেউ দেখিয়ে-শুনলে গাওয়া যায় না।

"ইশকুলে গিয়েছিলে?"—বৌদির প্রশ্ন। বৌদির সঙ্গে একা একা কথা বলার বড় অস্বস্তি। এর পরে প্রশ্ন হবে, কী দিয়ে ভাত খেলে, তার আগেই উঠব। আর একজন কেউ এলে বৌদি ভালো আড্ডা মারতে

পারবেন। তাঁর নিজের কোনো কথা নেই। বৌদির বাপের বাড়ি থেকে তিরিশ বছর আগে যে কথা কটি শিখে এসেছিলেন—পাঁচ বছরেই তা ফুরিয়ে গেছে। এখানে, এই গেঁয়ো শহরটাতে কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কলকাতার পথে-ঘাটে প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা সারাদিন কথা বলে। এ-শহরে তাদের ছেড়ে দিলে ভারি মজা হয়। কথাই পাবে না। আবার সেই বমির মতো হাসির ভাবটায় বিনয়ের তলপেট থেকে গলা অবধি ভরে গেল। কথা যেখানে জন্মায় সেই জায়গাটা বৌদির তৈরি হয় নি।

"ভালো করে কথা বলতে না-পারলে এত্তো খারাপ লাগে, না?" (বাবুই)। "এজন্যই তো আমার সঙ্গে দুদিনের বেশি কারো বন্ধুত্ব হয় না, এমন ভোন্দা না সব, হিউম্যার দিলে বোঝে না" (চন্দন)। বৌদি এমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? ভদ্রমহিলার চেহারায় একটা কৈশোর আছে, যা দেখলে বোঝা যায়, বাবুই-চন্দন-সোনা-রূপা-হীরা—এ নামগুলো তিনি রাখলেন কি করে। এখন তা নেই, কেন? উনুনের পাড়ে গরম? চোখে ধোঁয়া?

"সুবীর আসে নি?" বিনয় দাঁড়িয়ে বৌদিকে।

"না। চললে কোথায়?" বৌদি উনুনের দিকে চেয়ে বিনয়কে।

"ও-ঘরে আছি—সুধীরদা ফেরেন নি?"

"টুইশানিতে গেছেন।"

কী যেন ভাববো ঠিক করেছিলাম? সন্ধ্যাবেলায় ভাবনার ইতিহাস। প্রথম অধ্যায়—সোনা-রূপা-হীরা—তথ্যের অভাব। দ্বিতীয় অধ্যায়—চন্দন বাবুই। তৃতীয় অধ্যায়—আমি। চতুর্থ অধ্যায়—বৌদি। পঞ্চম অধ্যায় —সুধীরদা।

চন্দন আর বাবুই কী ভাববে? চন্দন চায় হানিফ হতে, বাবুই সুচিত্রা মিত্র। এতো স্পষ্ট ভাবে ভাবতে পারে? সারাদিন খেলে, ভাবনাটাকে পিছনে রেখে,—মোস্ট-আন অর্থডক্স ব্যাটসম্যান, মাঠে নামবো একটু লিম্প্ করে, ওভাল—লর্ডস, ইডেন-গার্ডেনস, ব্রেবোর্ণ; দু-ওভারে আউট করলে তো করলে, নইলে দু-সেঞ্চুরির আগে নয়, ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভেঙেছে হানিফ, হানিফেরটা কে?—তবে চন্দনের চোখ দুটো অত ভীতিত্রস্ত কেন? নখ-খোঁটায় অসহায়তাই বা কেন? সারাদিনের খেলায় দেহে অবসাদ, স্বপ্নে অবসাদ, হানিফ আর আমি সমান-বয়সী, এখনো কলকাতাতেই গেলাম

না? আঠারো মতো বয়েস চন্দনের। অন্য ভাবনাও তাহলে আছে? বিবেকানন্দের ছবি এঁকেছে বছর দেড়েক আগে। আমি কার ছবি এঁকে ছিলাম?—অবনীন্দ্রনাথের; ইশকুলে আছে বোধ হয় ছবিটা এখনো, ইন্দুবাবু স্যার আঁকিয়েছিলেন, বাবুই বলেছিল সুচিত্রা মিত্রের একটা ছবি এঁকে দিতে। দিই নি। দেব না। বাবুই তুই পড়া ছাড়, গান ছাড়। কাপড়-চোপড় কাচ, রান্নাঘর ধো, হাতে হলুদের গন্ধ হোক্, গায়ে মেখে লাল-সালুর স্বাগতমের নিচে দিয়ে বিগতম্ হ'। নইলে তুই মরবি। মরবি। যা মর্। হাসি পেল বিনয়ের, পেটে নয়, ঠোঁটে। চন্দন বসু, বাবুই বসু,—মরতে আসছ, বাঁচাবে কে? সন্ধ্যাবেলায় ঐসব কুভাবনা ভাবতে মানা, দক্ষিণ দুয়োরে যেতে মানা, দক্ষিণ দরজা খুলেছ, মরেছ গো মরেছ।—বহুদিনের শয্যাশায়ী রোগীর ওষ্ঠের হাসির মতো, নিজের হাসিটাকে দেখতে পেল বিনয়। তাই কেমন রোগক্লান্ত ভাবনা ভাবল—কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সরস্বতীর ছবির পাশে মাথাধরার ওষুধের দিকে তাকিয়ে সুচিত্রা মিত্রের কথা কি বাবুই ভাবে? ভাবে। আবার এখন যা বয়েস, অন্য ভাবনাও ভাবে। সব ভাবনা জড়িয়ে জড়িয়ে মনটা বড় হয়, মনটা বড় হয়ে হয়ে···। শেষে আমার মতো ফক্কা। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-যামিনী রায়, তিস্তার-চর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ইশকুলের পাশের রমা দত্ত, পাড়ার উষা, সুহাসের বোন বেগনি—সব জড়িয়ে জড়িয়ে ও-বয়েসে যে-ভাবনা ভাবতে সুরু করেছিলাম—এখন দেখি, তা হাওয়া। এতোদিন পরে লোভ করছি নাকি? এতোদিন? ছাপ্পান্ন সালে বি. এ পাশ করেছি—তিন বছর। এই তিনটি বছরকে এতো বছর মনে হচ্ছে। না, মাঝে-মাঝে ছবি আঁকতে হবে। যদি একবার কলকাতায় ব্যবস্থা করতে পারি। কমার্সিয়াল আর্টের এখন তো ভালো বাজার। টাকাই যখন চাই, ছবি-ই আঁকব। কালকেই আঁকব, বাবুই সুচিত্রা মিত্রের ছবি চেয়েছে, সেটাই আঁকব—তার আগে ওই গানটা শুনতে হবে—'আর রেখো না আঁধারে মোরে দেখতে দাও'—আঁধার, বড় আঁধার গো—'আমার আপনারে দেখতে দাও'—তোকে-ও একটা এঁকে দেব চন্দন, হানিফের না—তুই তো হানিফকে বাইরে স্বীকার করিস না, ব্র্যাডম্যানের দেব—'সারাজীবন শূন্য খোঁজা, হায়-রে।'

"মা দেখ, মেজদা ঘুমচ্ছে"—হীরা চিৎকার করল।

"না না"—রূপোর প্রতিবাদ।

"দাঁড়া, দেখাচ্ছি সব ঝিমুনো, সারাদিন ঘুড়ি ওড়ানো, আর এখন, দাঁড়া—"

বৌদি যেন মুখস্থের মত রূপোকে বললেন। হীরার নালিশ শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই বৌদি চিৎকার করেছেন, অভ্যাসে, হীরার নালিশের স্টিমুলাস ঠিক রেসপন্সটিই টেনে এনেছে। এই বালক-বালিকারাই বিনয়কেও এতক্ষণ ভাবাচ্ছিল—বিচিত্রভাবে, জটিলভাবে, কি ভাবাচ্ছিল: অবনীন্দ্রনাথের ছবি এঁকেছিলাম,. ইশকুলে আছে, সুচিত্রা মিত্রের ছবি আঁকব। বেলা এতক্ষণ কি বিচিত্রভাবে কিছু ভাবছিলেন ? না। বেলা চিন্তা নয় শরীর, চৈতন্য নয়, অস্তিত্ব। আমিও তাই হব। বেলার ধমকটা যদি ব্যক্তিত্বের সুচিন্তিত কাজ হত, তবে কত সুন্দর হত। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে। ব্যক্তি নগরে থাকে। আমার ব্যক্তিত্ব নেই। তাই এঁদের চেঁচামেচিতে আমার মনোযোগ ছিন্ন হয়েছে। সে যখন এতদিন পর ছবি আঁকবে ঠিক করছিল, তখনও সে একাগ্র নয়, তার শিল্পী-ব্যক্তিত্ব এত দুর্বল।

আসল সমস্যাটাই এখানে। এই মফঃস্বলে ষ্টিমুলাস নেই। ষ্টিমুলাসের বৈচিত্র্য যত অধিক হবে, রেসপন্সের বৈচিত্র্য তত বাড়বে। এখানে ষ্টিমুলাস শরীরের। মনের ? কোথায় ? মন, একটুকরো ঘাস, এত কোমল, সরু, মন, তুমি কোথায় ? ও মন, তুমি কোথায় ? মন রে, তুই আমার দেহে আয়! আয়! আয় রে! আয় রে আমার শুকনো দেহে ঝড় নেমে আয়। মন নেমে আয়! আয়!

মনের প্রসঙ্গে ঝড়ের কথা ভাবতেই আকাশ-সমুদ্র-পাহাড় সব মিলেমিশে তার মনে এক আশ্চর্য ছবি তৈরি করল। এত সব ছোটখাটো চেঁচামেচি শুনতে শুনতে বড় কিছু হারিয়ে যায়। বড়, বিস্তৃত, ওয়াইড, ওয়াইল্ড (ওয়াইডের সঙ্গে মিল বশতই ওয়াইল্ড এল, বিনয় তা বুঝেও সেটাকে নাকচ করল না) ওয়াইডের মধ্যে তো ওয়াইল্ডনেস থাকেই—কিছু না থাকলে ছবি আঁকার ইচ্ছে জন্মাবে কোত্থেকে ? এখানকার ছবি, লণ্ঠনের চারপাশে ভুতুড়ে মুখ, শিশুদের, চেনা যাবে না, মানুষের শরীরের রেখার ইঙ্গিত, রঙ : লাইনের আলোয় উজ্জ্বল রঙে ছায়া পড়ে, কিংবা বৌদির কোমর থেকে ওপরের অংশের হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে ওঠা, কোনো পদশব্দে দ্রোনলতার মত রেখা, দুপায়ের মাঝে মুখ গোঁজা কুকুর হঠাৎ চোখ তোলে, জন্তুও সুন্দর, চোখে মানুষী, কিন্তু বৌদির চেহারার সেই কৈশোরটা গেল কোথায় ?

সে সময় বিনয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল খুব চড়া রঙে বড় কিছু, চওড়া কিছু, মস্ত কিছু, আঁকে। আর সেই ইচ্ছা জাগ্রত হচ্ছিল, সম্মুখের সমস্ত বিষয়ের রেখাগত সঙ্কীর্ণতা ও বর্ণগত নিষ্প্রাণতা থেকে। উত্তরের ঘরে বাবুই-চন্দন, দক্ষিণের বারান্দায় বিনয় কোনো দর্শকের কাছে মনোরম দৃশ্য হতে পারত। সন্ধ্যাবেলায় ওরা ভাবছিল। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কিছুক্ষণ আগে বিনয় ভেবেছিল ভাবা মানে তো স্বপ্ন দেখা বা ভাঙা। কিয়ৎক্ষণের জন্য সে চতুষ্পার্শ্বকে বিস্মৃত হতে চাইছিল। সে কেমন একটা আচ্ছন্নতা বোধ করছিল। মধ্যযুগের কতকগুলি কাহিনীতে যেমন একজাতীয় জাদুকরের পরিচয় পাওয়া যায়, (উইলিয়ম মরিসের একটি কবিতায় এমনি এক জাদুকরের মস্ত বড় দাড়ি ছিল, জাদুকরদের দাড়ি থাকা ভালো নয়), তেমনি কোনো একজন এই বাড়িটার (এক বিঘা জমির ওপর এ বাড়ি অবস্থিত, মালিকানী সরলাসুন্দরী দেব্যা, তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু) ওপর জাদু দিয়েছে সবাইকে সন্ধ্যাবেলার বিশেষ প্রকার ভাবনায় ভাবিত করতে। জমিটা যদিও সরলাসুন্দরীর, সন্ধ্যাটা তাঁর নয়। সমগ্র পূর্ব-গোলার্ধে এ-সন্ধ্যা বিস্তৃত, পূর্ব-গোলার্ধের মালিক এখনো বর্তমান থাকলে তাঁর নাম করা যেত, অবস্থা বর্তমানে সেরূপ নয়। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত— চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং মূল-মধ্যরেখা থেকে একশো আশি ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত স্থান একচেটিয়া মালিকানার অন্তর্ভুক্ত থাকায়, সেই উপমিত জাদুকরটির পীঠস্থান নির্দেশ করা যায়। সরলাসুন্দরী দেব্যার বাড়ি উত্তরবঙ্গে। গোলার্ধের হিসাব বাদ দিয়ে বলা যায়—জাদুকরটি দাঁড়িয়েছিল বঙ্গদেশের দক্ষিণে সমুদ্রের কিছু দূরে কলকাতা নামক পীঠস্থানে। কল্পনা করা যায়, সেই একই জাদুকর সমকালে, বোম্বাই-মাদ্রাজ, করাচী-চট্টগ্রাম, ইয়াকোহামা, সাংহাই, ক্যাণ্টন, জাকার্তা, সেলিবিস, হ্যানয়, সিঙ্গাপুর, পোর্ট সৈয়দ, এডেন, ইত্যাদি ইত্যাদি বিশিষ্ট কয়েকটি জায়গা থেকে ভাবুনি-বান ছাড়ছে। যদিও সেই জাদুকর, যে-মালিকের অধীনস্থ ছিল তার জমি খাস হয়ে গেছে, তবু সে জাদুকর জমি ছাড়ে নি। এমন অনেক 'যদিও…তবু' আছে বলেই বিনয়, চন্দন, বাবুই প্রভৃতি সন্ধ্যাবেলায় ভাবছে। অবান্তর হলেও জ্ঞাতব্য যে, কলকাতা নামক পীঠস্থান থেকে উচ্চারিত মন্ত্র উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে কার্যকরী।

চারপাশের রক্তশূন্যতা, অবয়বহীনতা, বিবর্ণতা, সঙ্কীর্ণতা সইতে পারছিল না বলেই বিনয় চোখ বুজে তার চোখের সামনে সহসা একসারি চিত্রমালা দেখতে পেল, সে দেখতে লাগল ও আপনার ভাবনার প্রতিবিম্ব খুঁজতে লাগল।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা যক্ষপুরী, (অস্পষ্ট আলো, ত্রিকোণ আলো-ছায়া-পাতে কখনো স্বর্ণস্তম্ভের, ক্বচিৎ মানুষ-শরীরের ইঙ্গিত, নন্দিনীর প্রসারিত কটি আঙুল, রক্তকরবীর গুচ্ছের লাল—অসম্ভব জটিল, অসম্ভব, না) ; অবনীন্দ্রনাথের শাজাহান—(বড় মেলানকোলি, বিষণ্ণ, ফিগারগুলো যেন আছে কি নেই, রেখাগুলো যেন মুছে যেতে পারে, শীতকালে যেমন আয়নার ওপর নিঃশ্বাসের পরদা—সূক্ষ্ম, সয় না, সয় না) ; রবীন্দ্রনাথের নৃত্য, (প্রাচীন মিশরীয় এলিমেণ্টালিটি—হাতের আর পায়ের সরল ভঙ্গিতে, এলিমেণ্টালিটি-ই তো চাই, আহ্, এ-লি-মে-ণ্টা-ল, হিব্রু মন্ত্রোচ্চারণ, এ-লি-মে-ণ্টাল্, লাউড রেখা, কিন্তু রঙ এত জটিল কেন, ভঙ্গি ক্রমশ শয়তানের আরতির মতো কেন, আর মুখে যেন মৃতদেহের আধারের ওপরে আঁকা গাত্র-চিত্রের অমানুষিকতা, সয়ে যাওয়া, বেঁচে ওঠা কই লাউড রঙে, লাউড রেখায়—বাবুই, এ জন্যই তো তোর গান এত ভালোবাসি, লাউড গলা, উদার, উদাত্ত, সুচিত্রার মতো, বাবুই, তুই সুচিত্রা মিত্র হবি। বাবুই, তুই সুচিত্রা মিত্র হবি ?)। নন্দলাল বসুর শিব, (না, না, নাগো, না। অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে, এ-বড় দারুণ পরমাদ। পরমাদ, প্রমাদ, প্রমাদ। না, না, নাগো, না)। যামিনী রায়ের জন্মাষ্টমী (মরি, মরি, বঙ্কিম-মুরলী ত্রিভঙ্গ মুরারী, ত্রিভঙ্গ কোথায় ? শুধু এক হাঁটু বাঁকা, তাতে সমস্ত শরীরের ভার ঢলের মতো নেমেছে, বন্যার মতো নেমেছে। শাল গাছের মতো ঋজুতা, একটি মাছের মতো চোখ, পুরো চোখটাই একটি পুরো মাছের মতো, স্বচ্ছ জলে লীলা-রত, মণিতে কিশোরীর বিস্ময়—হায় রে, এত স্বচ্ছতা, এত সরলতা, এত বিস্ময়—আমার বইবার ক্ষমতা নেই) ; ভ্যান গগের ক্রোম অন্ দি ষ্ট্রিম—(আহ্, আমায় বাঁচাও, আমি সইতে পারি নে এ যন্ত্রণা, কালো কাক, কোকিল নয়, কালো কাক, আকাশের গতি, উদ্‌গ্রীব, পাখায় পাখায় শৃঙ্খল, ঝড়, নিচে মহাকাব্যের নদী ; হায় এ আমি সইতে পারি নে, কে আছ আমায় বাঁচাও, হায় আমায় কে বাঁচাবে, কালো কাকের পাখার আড়ালে সূর্য নিরুদ্দেশ, এ অন্ধকারের টানে নিচের স্রোত কূলপ্লাবী, আমি অকূলেতে ভাসতে নারি, আমায় কূল দাও, বাসা দাও,

বাবুই, তুমি কোথায়, কাকগুলো রক্তচোষা হয়ে যায়, আমার বুকে আর রক্ত নেই গো, এ কালো আঁধারে আমার খুনে মহাকাব্যের দরিয়া লাল হয়ে গেল, বাবুই তুমি কোথায়, মন তুমি কোথায়, আমার পাঁজরায় বড় ব্যথা, ভ্যান গগের কাকের পাখা নন্দলালের শিবের পাঁজরা হয়েছে) ; নন্দলালের অর্জুন, অর্জুন, আহা, শায়িত অর্জুন, রাফ ড্রয়িঙ, রাফ রেখা, বিরাট মুখ, বিরাট বুক, উরু গোলাকারে নেমে গেছে জানুতে, জানু বক্র, এক কনুইয়ের ওপর ভর, সে বাহুর পেশী যেন স্থলপদ্মের পাঁপড়ি, আর এক হাত আশ্রয়ের মতো— বিদ্রোহের মতো, সমস্ত শরীরের পেশীগুলোতে সচকিত ভঙ্গি যেন দুই থাবার মধ্যে মুখ গোঁজা সিংহ চমকে উঠেছে মর্মর-ধ্বনিতে, পশুর ভঙ্গিও সুন্দর, পিঠ আশ্রয়ের মতো—অশ্বত্থ গাছের কাণ্ড যেন (আমি পেয়েছি গো, এলিমেণ্টাল আর লিরিক, আমি পেয়েছি গো, আমি পেয়েছি, আমি ছবি আঁকব— সমুদ্রের মতো রাফ, চরাচরের মতো সাজান, এপিকের মতো সে মহৎ, লিরিকের মতো সে করুণ, আমি আঁকব।)

এই প্রতিজ্ঞার মুহূর্তে চোখ খুলে তাকিয়েই আবার বন্ধ করে নিল বিনয়। মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ল রান্নাঘরের ছিটে-বেড়ার ফাঁক দিয়ে গুটি গুটি পোকার মতো আলোর বিন্দু উঠোনে, উঠোনে রান্নাঘরের ছায়া, এ-ঘরের ভেতর থেকে আলো এসে চৌকাঠে গড়িয়েছে ভেজা শাড়ির মতো, ওদিকের দুটো ঘরের আলো কুয়াশার মতো। আমি পেয়েছি গো, আমি আঁকব—এই মন্ত্র জপতে জপতে চোখ খুলে, জপতে জপতেই বন্ধ করে সে বুঝতে পারল—আর এক শ্মশানের কান্না অনেক গভীরে গভীর-রাতে বহু দূরের শিয়ালের ডাকের মতো, শোনা যাচ্ছে—পালালে, পালালে, পালালে, হল না, হল না, হল না। লণ্ঠনের ভূতুড়ে আলোর চারপাশে ভাঙা রেখায় মুখ, লণ্ঠনের বিবর্ণ আলোতে উজ্জ্বল রঙগুলো ফ্যাকাশে—ভেজা শাড়ির মতো আলো, আলোর পোকার মতো আলো, দ্রোণ-লতার মতো শরীরের রেখা, হঠাৎ উপস্থিত কৈশোরের হঠাৎ নিরুদ্দেশ, বেড়ায় আঁকা ছায়ার জানলা আর দেয়ালের জানলার মাঝখানে কিশোরের বিব্রত চোখ, পেছন ফেরা কিশোরীর মানিনীর ভঙ্গি—পারলাম না, পারলাম না, পালালাম, পালালাম। চারপাশের বর্তমানের বাস্তবতার ধিক্কারের মাঝখানে করুণভাবে বিনয় যেন বলতে চাইল—"আমি শিল্পী নই, প্রসন্ননারায়ণ বিদ্যালয়ের ড্রয়িঙ শিক্ষক, আমি আঁকব গো, আমি ছবি আঁকব!"

"কে? বিনয়-কাকা?" "হুঁ।" "চুপচাপ শুয়ে যে?" "কী করব,

তোর পড়া হয়ে গেল ?" "ধুত্ পড়তে ভালো লাগে না!" "কি ভালো লাগে ?" "গান গাইতে।" "গা।" "না, মা বকবে।" "বকবে না, আমি বলছি তো।" "আজ নরেনকাকাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, ওঁদের নিচের তলায় ব্যানার্জীরা গান শোনার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন।" "কি কি গাইলি ?" "খুব ভালো লাগছিল।" "কেন ?"

তুমি যে পরের-ই সোনা আগে তো ছিল না জানা—হস্টেলের বারান্দায় আলো নেভা অন্ধকার—দূরে কলকাতার পথ—চিতপুরের বুড়ো ভদ্রলোকের পেছনে বহু টাকা খরচ করেছিলাম শ্রীধর কথক আর নিধুবাবুর গান কটি শেখার জন্য। উনিশশো সাতাশ সালের পর কলকাতা। আহ্। এদিকে অতুলপ্রসাদের বাংলা ঠুংরির সঙ্গে এসে মিশল নজরুলের গজল, তার আগেই তো নিধুবাবু মারফত রবীন্দ্রনাথের টপ্পা এসে গেছে, শিশিরবাবু পেশাদার হলেন, আবার ক্যালকাটা কংগ্রেসের উত্তেজনা। মোটে ছ-সাত বছর ছিলাম—ছত্রিশ সালের শেষেই তো চলে এলাম—মোটে ছ-সাত বছর—যদি সারাজীবন হত !

শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু উনিশশো সাতাশ-আটাশ সাল থেকে ছত্রিশ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। অভিনয় করতেন, পেশাদার মঞ্চে ঢুকবার চেষ্টাও করেছিলেন। আজ বিশ বছর হয়ে গেল প্রায় প্রসন্ননারায়ণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

"কে ? বিনয় নাকি ?" "হুঁ।" "কি, তুমিও কি ঐ দলে নাকি ?" উঠে বসল বিনয়—"কি ব্যাপার ?" "আরে সুধীরের সঙ্গে দেখা হল, ও যে কলকাতায় অ্যাপলাই করেছিল, তার জবাব এসেছে বিকেলে।" উৎসাহে বিনয় ব্যস্ত "কি লিখেছে ?" "প্রায় জয়েনই করতে বলেছে। অশোক বলেছিল একমাস আগে জানাতে, ওরা জানিয়েছে—সামনের মাসেই জয়েন করতে, মানে দিন পনেরোর ব্যাপার।" সুধীরবাবু ভেজা-শাড়ির মতো আলোটা মুছে ভেতরে ঢুকে গেলেন, বিনয় চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বাবুইয়ের দিকেই তাকিয়ে বলল—"বাঃ"। আর কয়েকটি মুহূর্তের জন্য—ও-ঘরের বারান্দায় চৌকাঠ ধরে ঝুঁকে দাঁড়ান স্যাণ্ডো-গেঞ্জি পরা চন্দন, এ-ঘরের বারান্দায় চৌকির ওপর দেয়ালে হেলান দিয়ে দু হাঁটু জড়িয়ে বসা বাবুই, আর এক হাতের ওপর ভর দিয়ে বসা ব্যগ্র বিনয়—একটা অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার ছবি তৈরি করল—সে আকাঙ্ক্ষার আবহ-সঙ্গীত রচনা করলেন সুধীরবাবু—

"আমি বলে দিয়েছি অশোককে—এটা কি তোমাদের বেড়াবার জায়গা নাকি হে? চাকরি-বাকরি পাওয়ার আগে একটু ঘুরেফিরে গেলে—বিয়ের আগে পিরিতের মতো," (খারাপ কথা বলতে সুধীরবাবু অভ্যস্ত, শুনতে এরাও) "আবার যেমনি কলকাতায় একটা সুযোগ পেলে অমনি ভোঁ-কাটা, তুমিও কি ঐ দলে নাকি বাপু?"

সবাই চুপ করে রইল। সেই স্থির চিত্রের মধ্যে একমাত্র রেখা তৈরি করে সুধীরবাবু এসে বাইরের চৌকির ওপর বসলেন।

"কলকাতা, কলকাতা, আরে বাবা, এখানে মাইনে পেত দেড়শো, ডুয়ার্স অ্যালাউন্স চল্লিশ,—ট্যুইশনও জুটত—ওখানে তো মাইনে দেবে একশো,—লাভটা কি শুনি?" সুধীরবাবু যেন নাটকের সংলাপ বলে অন্ধকারের মধ্যেই একটা ভঙ্গি নিলেন। "আর দিন পনেরো মধ্যেই তো যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে—কী লাভ হবে বল তো?" সুধীরবাবু নাটকের ধৃতরাষ্ট্রের খেদোক্তি করলেন।

বিনয় নিরুত্তর। বাবুই কোনো কথা বলে না, বাবাদের ইশকুলের ব্যাপার, আসা-যাওয়া তো চলছেই, এ তো আর নতুন ব্যাপার কি। চন্দন ও-ঘরের চৌকাঠ ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, ওর স্যাণ্ডো গেঞ্জি আর পাজামা-পরা দেহটাতে একটা ছন্দ এসেছে। উঠোনে, হবিষ্যি ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলা আলোর পোকার মত আলো। ওরা চারজন পরস্পরের দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঐ আলোকবিন্দু-চিহ্নিত জায়গাটিতেই বদ্ধদৃষ্টি। বিনয় জানে, অশোক কেন কলকাতা যাবে এ-কথা সকলের চেয়ে বেশি জানেন সুধীরবাবু নিজে। সে আর কি জবাব দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল আজ সারাটা দিন চৈত্রের মতো বাতাস দিয়েছে এলোমেলো। তার ফলে প্রকৃতিতে ও তার দেহে একটি শূন্যতাবোধের জন্ম হয়েছে। বাবুই ভাবল অশোককাকা খুব বেশি আমাদের এখানে আসেন নি, চন্দনদের কাছে গল্প শুনেছি—ওঁদের খুব ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছেন, কিন্তু অশোককাকা কলকাতার ছেলে এবং কলকাতাতে ফিরে যাচ্ছেন। চন্দন মাথার ওপরকার দৃঢ়-আশ্রয়ে নিজেকে বেঁধে যেন অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা পাচ্ছে—তার দাঁড়াবার জায়গা থেকে ঐ আলোকবিন্দু-চিহ্নিত জায়গাটি সবচেয়ে দূরে, আর সে কারণেই সে সেদিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে-মুখে এমন শোক যা সুদূরতার মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়। ঐ উঠোনটাকে কেন্দ্র করে চারজনের মধ্যে

এমন এক নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে শুরু করল যা যে কোনো মুহূর্তে সশব্দ দীর্ঘশ্বাসে গর্ভপাত ঘটাবে। আর সেই সর্বনাশটাকে প্রতিরোধ করার জন্যই যেন ওরা চারজন চোখ-মুখের একরকম স্বগত-ভঙ্গিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করল। তখন, চারজনেরই চোখের সামনে একটা নাম, নানা রূপ নিয়ে, নানা আকারে ভেঙেচুরে, আবার নতুন হয়ে নতুনভাবে ভেঙে আবার নতুন গঠন নিতে লাগল। ক-ল-কা-তা। গত প্রায় বিশ বছর সুধীরবাবু কলকাতা যান নি। গত বছর আড়াই বিনয় কলকাতা যায় নি। তার আগে একসঙ্গে বছর খানেক। আর চন্দন? আর বাবুই? কোনোদিন যায় নি। না। যাবে? কে জানে? চন্দন যেতে পারে, কিন্তু বাবুই? "কলকাতা না-গেলে মানুষ মাতৃগর্ভে থাকে।" বাবুই আর চন্দনের সামনে কলকাতা স্বপ্নের রূপ নিল—মাতৃগর্ভে বাইরের স্বপ্ন। সুধীরবাবু যেন মাতৃগর্ভে শুয়ে বহির্পৃথিবীর স্মৃতিতে ডুবলেন, আর বিনয় ভাবল মাতৃগর্ভের ইমেজে কী করে কলকাতার একটা ছবি আঁকা যায়। ও-ঘরের চৌকাঠ থেকে লম্বা শরীরটা নেমে এল উঠোনে—"গেল, তাও অশোক-কাকার কাছে ক্রিকেটের গ্রিপিঙ, বোলিঙ শিখছিলাম; তাও গেল—এখানে তো আর একজন লোকও পাওয়া যাবে না।" "বাঃ নতুন কেউ আসবেন না?" সুধীরবাবু যেন এই মফঃস্বল শহরটার হয়ে কৈফিয়ত দিচ্ছেন।

"হ্যাঁ, সে কবে আসবে, কে জানে—" চন্দন এ-ঘরের সিঁড়ির ওপর হতাশ হয়ে বসে পড়ল।

"আমিও অশোককাকার সঙ্গে চলে যাই—" এতক্ষণে বাবুই অত্যন্ত শান্তস্বরে সামান্য সুর দিয়ে বলল কথাটা—আর সঙ্গে সঙ্গেই সুধীরবাবুর চোখেমুখে এক আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল—যা যাত্রায় কখনো তুলসীদাসের, কখনো বা মোহাম্মদীবেগের ঠোঁটে দেখা যায়। হিস্টিরিয়ার রোগী যেমন কিছুক্ষণ অপার্থিব ও অনির্দেশ্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে পার্থিব ও নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে অসহায়ের মতো তাকায়, ঠিক তেমনি করে এই চারজন পরস্পরের দিকে চাইছে, এখন। সুধীরবাবু হাসলেন, মেয়ের দিকে তাকিয়ে, যেন এমন কোনো মা যার বুকে একটুও দুধ নেই, অথচ সন্তানরা দুধ চাইছে এবং একটি পুত্র আর-এক স্বাস্থ্যবতী ও দুগ্ধবতী জননীর সন্ধান পেয়ে চলে গেছে ও অন্যরা তার শরীর সম্পর্কিত অভিযোগ তুলতে প্রস্তুত।

এই অন্ধকারে বিনয় ছাড়া ও-হাসি শুনে কি কেউ গেল ? সুধীরবাবু, যিনি অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন, নিজের মেয়েকে, যে গায়িকা হতে চায়, ঠাট্টা করছেন, না সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন ? বিনয় তাড়াতাড়ি বাবুইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—"কই, বললি না তো, কি হল নরেনবাবুর বাড়িতে ?"

"সে কথা বলিস নি এখনো ?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

মুখের সম্মুখে হাঁটু আড়াল দিয়ে এতক্ষণ নিজেকে গুটিয়ে বসেছিল বাবুই, এবার সে ভঙ্গি বদলে জোড়াসনে বসল। আর একবার মাথা ঝাঁকিয়ে চুল-টুল কিছু ঠিক করল। আর ওর গল্প শোনার জন্য সবাই-ই নিজ নিজ ভঙ্গি পরিবর্তন করল। বাবুই যেন জল-পায়রা হয়ে গেল, সবাই-ই, সবাই-ই ঐ চারটি অক্ষরকে ঝেড়ে ফেলে দিল বাতাসে—'ক—ল—কা—তা'।

নরেন-কাকীমা তো অনেকদিন ধরে যেতে বলছেন, যাওয়াই হয় না, আজকে আমি ইশকুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলাম, ফিরে দেখি চন্দন ঘরেই আছে। দুজনে মিলে গেলাম।"

গল্পের মধ্যে ধীর-শান্ত একটি গতি আনতে চেষ্টা করছে বাবুই। কিন্তু গল্পের মধ্যবিন্দুতে পৌঁছবার ব্যগ্রতায় সে ঈষৎ ব্যস্ত, তাই গল্পটি ঈষৎ দ্রুত আর বিষম তালে অগ্রসর হতে লাগল।

"নরেন-কাকীমা তো অনেক কিছু খাওয়ালেন, তারপর বললেন, 'চল নিচের ভদ্রমহিলা তোমার গান শুনতে চান, একটু শুনিয়ে আসবে।' আমি বললাম—'কোনোদিন যাই নি, ওঁকেই ডাকুন না আপনার এখানে।' উনি বললেন—'উনি কেমন করে আসবেন' ?"

সুধীরবাবু প্রশ্ন করলেন—"কেন ?"

"উনি যে অন্ধ। বসন্ত হয়েছিল তো, অন্ধ হয়ে গেছেন।"

গল্পটায় তরঙ্গ এসেছে। যেন কোনো আদিবাসী গোষ্ঠির জনৈক দুঃসাহসী তার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কাহিনী বলছে। গল্পটাকে তরঙ্গিত করার কোনো ইচ্ছে বাবুইয়ের ছিল না। সে, বৃদ্ধা পিতামহীর মতো, গল্পটাকে সুন্দর করতে চাইছিল। অথচ গল্পটার মধ্যে বাবুইয়ের কোনো কোনো খবর দেবার প্রয়োজন ছিল বলে, অপ্রয়োজনীয় কাহিনীর বক্তার মতো সে নিরাসক্ত হতে পারল না।

"আমি গেলাম নিচে। হার্মনিয়ম নিয়ে বসামাত্র সব বাচ্চা-কাচ্চা

একেবারে চুপ করে বসে গেল। একটুও নড়চড় নেই। আমি তো দেখেই খুব খুশি।”

কথা বলতে বলতে হেসে সেই খুশিটা দেখাতে চাইল বাবুই। বাবুই যদি না হেসে গল্পটা বলত, তবে, গল্প বলার ধরনেই সে বক্তব্য হাজির করতে পারত। না হাসলে তো সেই দিদিমা-ঠাকুমার মতো নিষ্প্রাণ গলাও হতে পারত—যে গলার কোনো বক্তব্যই থাকতে পারে না? যদি বাবুইয়ের না-হাসিটা গল্পের স্রোত থেকে উঠত, তবেই তাতে প্রাণ থাকত! হ্যাঁ, প্রাণ! আর গল্পের মধ্যে তেমনি একটা প্রাণ কোথাও আছে—এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েও বাবুই সেই প্রাণ অনুসন্ধান করছিল কখনো অভিনয় করে, কখনো বর্ণনা করে।

“তারপর ভদ্রমহিলা একটার পর একটা গান বললেন—ওগো নিঠুর দরদী, কে আজি এলে আবার, যদি দুখের লাগিয়া—আর রবীন্দ্রনাথের দীপ নিবে গেছে মম। উনি ঐ গানটা বলার পর আমি নিজে থেকেই গাইলাম আঁধারে একেলা ঘরে, তারপর তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে,—তারপর যেমনি ও চাঁদ চোখের জলে গাইতে গেছি না, ভদ্রমহিলা একেবারে হারমনিয়মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সে চুল খোলা, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, মুখ হাঁ, আমি এত ভয় পেয়ে গেছি—নরেন-কাকীমা আমার কানে-কানে বললেন—‘ও গান গেয়ো না’।”

নিজের অজ্ঞাতেই বাবুই গল্প বলার ভঙ্গি পালটে দিয়েছে। সে সমস্ত ঘটনাটা বলে যাচ্ছে, তার মন খুঁজে পায় নি গল্পটার প্রাণ কোথায়, সমস্ত গল্পটাই সে মেলে দিচ্ছে—বিনয়কাকা—আপনি প্রাণ খুঁজে নিন, চন্দন—তুই প্রাণ খুঁজে নে, বাবা—তুমি কিছু পেলে?—ওগো তোমরা সবাই আমাকে একটু-একটু দিও, আমি বুঝতে পারি না প্রাণটা কোথায় আছে?

“কেন?” বিনয় আর সুধীরবাবু একসঙ্গে বললেন।

“ঐ গানটা গাইতে গাইতে ওর বড় মেয়ে মারা গিয়েছিল তো”—রান্নাঘরের বারান্দা থেকে বাবুইয়ের মা বললেন, তার মুখে এক ধাঁধা-ধরা হাসি, উত্তরটা কেউ পারে নি, তিনি বলে দিলেন। অথচ ঘটনাটা তিনিও জেনেছেন কয়েক ঘণ্টা আগে ওরা ফেরার পর।

মায়ের কথা শোনামাত্র বাবুই ক্ষেপে গেল,—“আহ, তোমরা না কাউকে একটু ভালো করে কথা বলতে দেবে না—তুমিই বলো না কেন,

একটা ভালো করে কথা বলতে গেলেই না সবাই কথা বলবে। আমি বলবো না, যাও।"

বিনয় শুধু ভাবল বাবুই ঘটনাটাকেই জানাতে চায়, নাকি, ভালোভাবে সহৃদয়ভাবে জানাতে চায়—সেটা কি ঘটনাটিকে খাঁটি মর্যাদা দেবার জন্য নাকি, নিজের কথা সুন্দর করার জন্য। কথা যেখানে তৈরি হয় সেটা যে বাবুইয়ের উপছে উঠছে—বৌদির নেই।

"সে কি, গান গাইতে গিয়ে মারা গেছে, মানে? বিনয়ের প্রশ্ন। প্রশ্নটার পর এক মিনিট সবাই চুপচাপ। রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়ান বেলার মুখে ধাঁধাঁ-ভরা হাসি অথচ মেয়ের জন্য কথা বলতেও পারছে না। বাবুইয়ের মুখে আধমিনিট পুরনো রাগ, আর আধমিনিট নতুন করে আরম্ভ করার প্রস্তুতি।

"ওঁর বড়ো মেয়ে না খুব ভালো গাইতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের গান। খুব সুন্দর ছিল দেখতে, এই বিরাট কালো চুল, ফরসা টকটকে রঙ, এমনি কোনো অহঙ্কার ছিল না"—

বাবুইয়ের গলার আবেগ, গল্পটার মূলকেন্দ্রে পৌঁছবার অস্থিরতা কাহিনীটির মধ্যে এক চাঞ্চল্য আনল—আর এতক্ষণে নিজের গল্পের প্রয়োজনেই দু-একটা অপ্রয়োজনীয় খবর দিয়ে বাবুই ভঙ্গিটাকে প্রায় রূপকথার কাছাকাছি নিয়ে গেছে। রূপকথার সনাতনত্ব যেন এই কাহিনীর মধ্যে চালিয়ে দিতে চায় বাবুই।

"যে যখন গাইতে বলতো গাইত। একদিন সকাল থেকে এক বাড়িতে বসে গান গেয়েছে। বিকেলে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছে, খুব সুন্দর গাইত তো, সেখানেও গাইতে বলেছে, ও বলেছে পারছে না, তাও শোনে নি, জোর করে ধরেছে, তানপুরা দিয়েছে, একটি গান গেয়েছে, তারপর ওই গানটি গাইতে গিয়ে—"

বাবুই অস্থির গল্পের শেষে পৌঁছুবার জন্য। তার নিশ্বাসের দ্রুত উত্থান-পতনের ব্যাকুলতা—আর বাকি সব শ্রোতার চোখে-মুখে-ভুরুতে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এইবার আদিবাসী গোষ্ঠির সেই দুঃসাহসী নায়কটি দেবতার আবির্ভাবের কথা বলবে।

"ওই গানটি—ও চাঁদ চোখের জলে লাগলো জোয়ার—গাইতে গিয়ে মাঝখানে গলা আটকে তানপুরার ওপরই এলিয়ে পড়েছে।"

পরবর্তী নীরবতায় অন্য সবাইয়ের মতো বাবুইও সেই মেয়েটার রূপ দেখতে লাগল। মেয়েটি হয়তো অত সুন্দরী ছিল না। এখন যখন দেখা যাবে না, আরো সুন্দরী হতে বাধা কি? হয়তো মেয়েটা ততো ভাল গাইতেও পারত না—এখন যখন গাইবে না তখন আরো ভাল গাইতে আপত্তি কি? হয়তো মেয়েটা গান গাইতে গাইতে মারাই যায় নি—মেয়েটার বিশ-বাইশ বছর বয়েস হয়েছিল, সে গান গাইতে পারত ও সে মারা গেছে—এই তিনটি ঘটনা এক সঙ্গে যোগ করে বাবুই কি কিছু বলতে চাইছে? কিন্তু বাবুইকে বলেছে নরেনকাকীমা, নরেনকাকীমাকে বলেছে আর কেউ, বাবুই যাদের বলবে তাদের কাছ থেকে কথাটা আরো ছড়াবে, আরো। এমনি ভাবে মেয়েটি আরো সুন্দরী হয়ে, আরো ভাল গাইতে গাইতে তানপুরার ওপর মাথা রেখে শেষ তানটি বিস্তৃত করবে। এমন এক মৃত্যু আছে—এ-জীবনে কে-ই বা তার খোঁজ রাখি। এ-জীবনে, এই পশ্চাৎভূমির জীবনে?

"পাকিস্থানের এক ক্রিকেট প্লেয়ার খেলতে খেলতে মাঠের মধ্যে বুকে বল লেগে মারা গেল সেদিন" চন্দন বলল।

"A soldier's death in the front"—সুধীরবাবু হেসে বললেন।

সব ভ্রমণকাহিনী শোনার শেষে মনে যেমন এক বিষাদ জন্মে, তেমনি এক বিষাদের স্রোত এসে এদের ঘিরে আবর্ত তুলল। বিনয় তার দাড়িতে খসখস করে হাত বুলিয়ে জ্বর জ্বর গন্ধ শুঁকল। আসবার সময় এ-বাড়ির গেটে কলকাতার কথা মনে হওয়ার স্মৃতি তার মনে এল। আবার ছেঁড়া স্যাণ্ডেলে বোল তুলে তাকে বাড়ি ফিরতে হবে—সে ভাবল। মা ভাত বেড়ে রেখেছে। ডালের জল টলটল, মাছের ঝোল, কুমড়ো ঘণ্ট।

ভাবনার এমন বিন্দুতে সুধীরবাবুর বলা লাইনটার সৈনিক কথাটিতে ভর দিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছল, যুদ্ধ মানে প্রতিপক্ষ আছে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ, ফল, জীবন কিংবা মৃত্যু, জীবন-সংগ্রাম। জীবন-সংগ্রাম? প্রতিপক্ষ কে? জীবন, আকাঙ্খার সমুদ্র, আমি একটি বিশেষ জায়গায় স্রোত আবর্ত, মৃত্যু—তার মধ্যে ভেসে যাওয়া। মেয়েটি জীবনের মাঝখানে মারা গেছে। ক্রিকেট খেলোয়ারটি পিচের ওপর পড়ে গেছে। ও-ঘর থেকে লণ্ঠনের আলো দোলাতে-দোলাতে সুধীরবাবুর আশি বৎসর বয়স্কা মা এ-ঘরের দিকে রওনা দিয়েছেন। জীবন-সংগ্রাম? মানে? জয় বা পরাজয়? না।

সংগ্রামের ফল সংগ্রাম, যুদ্ধের ফল যুদ্ধ, জীবন সংগ্রামের ফল বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার ফল জীবন সংগ্রাম।

"অশোক তাহলে চললো—" সুধীরবাবুর গলা। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে সেই উঠোনে ঐ চারটি অক্ষর নাচতে লাগল ক-ল-কা-তা। আর ঐ চারটি অক্ষর উঠোনে সুধীরবাবুর মাকে ঘিরেই যেন নাচতে লাগল, আর সুধীরবাবুর মা যেন ঐ চারটি অক্ষরকে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে মধ্যযুগের কোনো রূপসী বর্ষীয়সী সম্রাজ্ঞীর মতো এগিয়ে আসছেন, তাঁর পায়ের তলা থেকে ছাড়া পাবার পর অক্ষরগুলো ফুল হয়ে ফুটতে চাইছে, পারছে না। পারছে না।

কলকাতা ফুল হতে পারত আরো পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সমস্ত দেশের শিল্পীকরণ দ্বারা, এখন আর তা সম্ভব নয়। পঞ্চাষৎ বৎসর পূর্বে যে চক্রেশ্বরী হতে পারত এখন তার মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। কাপালিকের মন্ত্রোদ্বদ্ধা সে নায়িকা নতুন বেশ পরতে পারবে না, পুরনো বেশ আর চলবে না, অতএব, কলকাতা মরবে।—সুধীরবাবু আর বিনয় নামক দুই বয়স্ক ভদ্রলোক এই বলে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তখন বিষাদে আচ্ছন্ন।

"কলিকাতা ভাগীরথী তীরস্থিত একটি বন্দর—সমগ্র আসাম, বাংলাদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ ইহার পশ্চাৎভূমি।"

সেই বিষাদের স্রোতটা পাক খেতে খেতে যেন বাবুইয়ের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, আর বাবুই চড়া গলায় গান ধরল "নিশীথে কী কয়ে গেল মনে।"

প্রথম পাঁচটি শব্দের মধ্যেই বিষম তাল পড়ে ছন্দিত হয়ে উঠল। প্রথম 'কী জানি' ধ্বনিত হল খাদে, তরল স্বরে, দ্বিতীয় 'কী জানি' ধ্বনিত হল চড়ায় তরলতর স্বরে। গম্ভীর তরলের বিপরীত সংঘাতে ব্যাকুলতা।

'সে কি ঘুমে'—সরল গম্ভীর 'ঘু'-র উর্ধ্বগামী 'উ'-তে নিম্নগামী সহসা স্তব্ধ 'মে'-তে উৎকর্ণ মৃগনাভি হরিণী, দ্রোণলতার মত রেখা।

'সে কি জাগরণে'—জা-গ-র-ণে—প্রত্যেকটি শব্দের পর একটি করে ছোট্ট তরঙ্গ, আনন্দ-দ্বিধা-সংশয়-আগ্রহ। আবার সেই খাদে নিম্নস্বরে 'কী জানি' চোখ বন্ধ। এই উঠোনের অন্ধকারের মতো, অস্পষ্ট আলো ঐ আমগাছটার জন্য, চাঁদের আলো পৌঁছচ্ছে না, গান শেষ করার আগেই পড়ে গেলাম, মরে গেলাম—

"নানা কাজে নানা মতে ফিরি ঘরে ফিরি পথে"—এ-ঘর থেকে ও-ঘর,

ও-ঘর থেকে সে ঘর, পথে, একা, আর সব সময় নিশীথে-দিবসে কী কয়ে গেল কানে, মীনুকে বিকেল বেলা ডাকে, আমার মুড়ির বাটিতে নারকেল তেলের গন্ধ ; মাকে রাত্রিবেলায়, মা তোমার ঘুম আসে ? "সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে"—বুঝি না, জানি না। নিজের শরীরের যে অংশটা দেখতে পাই তার অন্তরালে কোথাও, নাকি এই শরীরের অবস্থানের বাইরে কোথাও —হৃদয় নামে একটি স্থান আছে—যদি জানতেম! জানি না, বুঝি না— হাহাকার গো, হাহাকার, "সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়"—গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীতের মত একসঙ্গে চারটি ধ্বনি, শেষেরটি বিস্তৃত, "এ কী ভয়" আর সেটি ফিরে যেতে না যেতে আর একটা ঢেউ "এ কী জয়"—ঢেউয়ের পর ঢেউ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তটভূমি বিস্রস্ত, একটা প্রচণ্ড প্রার্থনা সমুদ্র-তরঙ্গের মতো আঘাতে আঘাতে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে, ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, সংকীর্ণ ক্ষুদ্র মাংস গলিয়ে হাড়ের মজ্জা বের করে, শিরার রক্ত বের করে, টকটকে লাল রক্তবর্ণের প্রবাল দ্বীপ, সৃষ্টির দ্বীপ গড়ে। আহ্ গড়ে, রক্তবর্ণ, আহ্ সৃষ্টি-সৃষ্টি-সৃষ্টি। পৃথিবী ভরা বাতাস তোলপাড়—সৃষ্টি। এ-লি-মে-ন্-টা-ল্, লি-রি-ক্যা-ল্। আমি ছবি আঁকব, আমি গান গাইব, আমি হাতে ব্যাট নিয়ে দু-পায়ের ওপর নাচব, আমি সমুদ্র দেখব, আর এ-রা যে যা চাইছে সব হোক। আহা গো—বাবুই অমন করে নিজের গলাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে কোন্ আগ্রহে, কোন্ যন্ত্রণায় শুকনো ঠোঁটে, ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের পদতলে ভক্তের মতো? আহা গো—চন্দন অমন করে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে তার চওড়া পিঠটাকে য়্যাটলাসের মতো রেখে গান শোনে কোন বিষাদে, কোন যন্ত্রণায় ; আহা গো, বিনয় কাকা অমন করে মাথার পেছনে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, বড় সহ্য শক্তি বিনয় কাকার, বাবুইয়ের চন্দনের, সুধীরবাবুর বেলার, সবাই সইছি, সবাই, "নিশীথে, এ নিশীথে, কী কয়ে গেল মনে" সয় না, সয় না, "কে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয় আর নয়, আর নয়"—স্তিমিত দৃষ্টি, ধ্যানের দৃষ্টি, অর্ধ-স্তিমিত নয়ন, শিবের, ধ্যানের, দুই ভুরুর পাশে দুই লম্বা চুলের রেখা, বাঁশি বাজে, মনোমাঝে না বনমাঝে? বাঁশিতে কে ডাকে, কী ডাকে, কী জানি, কী জানি, "সে কথা কি নানাসুরে বলে মোরে চলো দূরে"—প্রতিটি চারটি শব্দের ছোট্ট তরঙ্গ ; ধ্যানের কথা, অন্তরের কথা, উৎকর্ণ, মৃগনাভি হরিণী, প্রার্থনা তরঙ্গে বিধ্বস্ত তটভূমির আত্মলয়, চলো দূরে, চলো দূরে দূরে,—সমুদ্র সঙ্গমে, দূরে মধ্য সমুদ্রে, দূরে—সমুদ্রের মৃত্তিকায়, দূরে—

নীলাম্বু রাশির অতন্দ্র তরঙ্গ তলে, দূরে—সমুদ্রের তলের আকাশে, আমার শিরা থেকে রক্ত বের করে নাও, হাড় থেকে মজ্জা, একটি সৃষ্টির দ্বীপ, প্রবালদ্বীপ, রক্তবর্ণ আবেগের দ্বীপ রচনা কর। পাহাড় থেকে নদী সমুদ্রে যায়, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বাহিত পলিমাটিতে একটি দেশ, ভূগোলের একটি নাম, পৃথিবীর কয়েকটি মানুষ নিসর্গের কয়েকটি শোভা—রচনা কর। নদী সমুদ্রে যায় "চলো দূরে;" মোহনা, গঙ্গার মোহনা, কলকাতা একটি বন্দর, কলকাতা একটি নাম, সমুদ্রের কিনারে, তার পেছনে পাশে আরো কত নাম। কলকাতা, তারপর সমুদ্র। তারপর মধ্যসমুদ্র। তারপর সৃষ্টির রক্তবর্ণ প্রবাল দ্বীপ—নানা কাজে নানা মতে ফিরি ঘরে ফিরি পথে, সে-কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে চলো দূরে।

এই অন্ধকারে আমরা ছ জন রবীন্দ্রনাথের একটি গানের পাণ্ডুলিপি—কেটে দেয়া কথা, ভাঙা চরণ, ইতস্তত হস্তাক্ষর, আর সাদা, সমুদ্রের মতো, সুরের মতো, আমাদের কজনের অন্তবর্তী ভরাট শূন্যতার মতো সাদা। আর মহৎ।

কলকাতা সমুদ্রের নিকটে ভাগীরথী তীরস্থিত একটি বন্দর—আসাম বাংলা বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ তার পশ্চাৎভূমি।

সমালোচকের অভিজ্ঞতা

সুকোমল চৌধুরী

বিনা ভূমিকাতেই শুরু করব। গত এক বছরে প্রায় একশখানা বই নানা পত্রিকায় আমাকে সমালোচনা করতে হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ছিল ইংরেজি বই, অল্প কয়েকখানা ছোটদের বই, গুটিকয় অনুবাদ গ্রন্থ। সাকুল্যে এর সংখ্যা খান কুড়ির বেশি হবে না। এই সংখ্যা বাদ দিলেও, অন্তত আশি-পঁচাশি খানা বয়স্কপাঠ্য বাংলা বই আমাকে পড়তে হয়েছে।

বই নির্বাচনের ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না। তবে, সম্পাদকেরা বেছে বেছে আমাকে খারাপ বই দিয়েছেন, এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। যখন যা এসেছে, ভালো-মন্দ-মাঝারী সব রকমের বই-ই আমার বরাতে পড়েছে—তার মধ্যে খ্যাতনামা এবং উদীয়মান উভয় ধরনের লেখকের বই-ই ছিল। সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও তার অধিকাংশই আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। সবগুলিই যে চিবিয়ে চিবিয়ে হজম করেছি তা নয়, তবে সব ক'টা পাতা অন্তত একবার করে উল্টে দেখেছি।

অবশ্য এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গত এক বছরের বাংলাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত রায় দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা যে বইগুলি আমি পড়িনি সেগুলি হয়ত আমার সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি নাকচ করে দেবে, অন্তত বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন দাবি করবে। তা যদি হয়, তাহলে আমি খুশিই হব—মনে কোনোরূপ কিন্তু না রেখে একথা আমি বলতে পারি। এ নিয়ে অযথা বাগবিস্তারের প্রয়োজন নেই। কেন না, বাংলাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত রায় দেবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নি। সে ধৃষ্টতা বর্তমান লেখকের নেই, যোগ্যতারও অভাব আছে।

ঘটনাধীন পরপর ৮০।৮৫ খানা বাংলা বই আমাকে পড়তে হয়েছে। আর তা পড়তে গিয়ে কতগুলি কথা মনে হয়েছে। সেই কথাগুলিই এখানে সূত্রাকারে হাজির করছি যোগ্যতর ব্যক্তিদের আলোচনার সূত্র হিসাবে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ থেকে যদি বৃহৎ এবং ফলপ্রসূ কোনো আলোচনার সূত্রপাত হয় তাহলেই এর উদ্দেশ্য সফল হবে।

ডাক্তারদের মত সুধী ব্যক্তিরাও কদাচিৎ একমত হন কিন্তু এক বিষয়ে তাদের আশ্চর্য মতৈক্য দেখা যায়, তা হচ্ছে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অধঃপাতিত অবস্থা সম্পর্কে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য কিছু হচ্ছে না—এ কথা তাঁরা একবাক্যে বলে থাকেন। কথাটার প্রতিবাদ করতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু দুঃখের সঙ্গে হলেও স্বীকার করতেই হয়, নানা পত্রপত্রিকায় যাঁরা পুস্তক সমালোচনা করে থাকেন তাঁরা সকলেই ঐ কাজের যোগ্য, এমন কথা বলা যায় না। আজ পর্যন্ত, অধিকাংশ পত্রপত্রিকাতেই সামালোচনার জন্য যথাযোগ্য দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা নেই। কাজেই যোগ্য ব্যক্তিরা এই বেগারের কাজ নিতে চান না। যদি বা কখনও উপরোধে ঢেঁকি গেলেন, তাহলে এমনভাবে কাজ সারেন যাতে তাঁদের যোগ্যতার পরিচয় থাকে সামান্যই। কাজেই এ-জগতে তাঁরাই রাজত্ব করেন যাঁদের যোগ্যতা সবচেয়ে কম। কথায় আছে, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। এর উল্টোটাও বোধহয় সত্য। অবিদ্যা ঔদ্ধত্যের জন্ম দেয়। তাই দেখি সাময়িক পত্রের ক্ষুদে সমালোচকেরা অচিরেই ছড়ি ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন। এঁদের সাঙ্গোপাঙ্গসুলভ বীরদর্প অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যরসের উদ্রেক করে। কিন্তু সে অন্য কথা।

বাংলা সমালোচনা কিছু হচ্ছে না, অন্তত বিশেষ কিছু হচ্ছে না তা ঠিক কিন্তু তার জন্য শুধু সমালোচকেরাই দায়ী নন। আমাদের দেশের লেখকেরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, খ্যাতনামারা তো বটেই এমন কি নবাগতরাও। বই সম্পর্কে মন খুলে কথা বললে বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে।

কথায় আছে কাকের মাংস কাকে খায় না। কথাটা আর যাঁদের সম্পর্কেই হোক, আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে খাটে না। আড়ালে পরস্পরের নিন্দে করেন না, এমন দুজন লেখক এদেশে খুঁজে পাওয়া ভার কিন্তু সামনা-সামনি তাঁরা পরস্পরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কাজেই তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে। সমালোচকদের যেহেতু আড়াল নেই তাই তাঁদের 'লাইন অব লিস্ট্ রেসিসটেন্স'—নিম্নতম প্রতিরোধের পথ বেছে নিতে হয়। অতএব তিনিই সবচেয়ে কৃতি সমালোচক যিনি অনেক কথা বলেও কিছু বলেন না।

কিন্তু শুধু লেখকদের দোষ দিলে হবে কেন, প্রকাশকেরাও কিছু সীজর পত্নী নন। তাঁরা ব্যবসা করতে নেমেছেন। সুতরাং টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব তাঁরা করবেনই। বই ছাপাতে আজকাল বিস্তর টাকা লাগে। লেখকদের মোটা হারে দক্ষিণা দিতে হয়। রঙচঙে মলাট চাই, ঝকঝকে ছাপা চাই। কাজেই খরচ বাড়ছে, বাড়বে। মুনাফা সেই অনুপাতে না বাড়লে চলবে কেন। সুতরাং পয়সা খরচ করে তাঁরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। আর পাত্র ধরার বিজ্ঞাপনে কে আর নিজের কানা মেয়েকে কানা মেয়ে বলে!

কিন্তু প্রকাশকেরা শুধু যদি বিজ্ঞাপনেই কানা মেয়েকে পদ্মপলাশলোচনা বলে চালিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে কথা ছিল না। তাঁরা পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেন, সেই টাকায় সাময়িক পত্র চলে। সুতরাং, সমালোচনার পাতায় প্রকাশকদের পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে বেয়াড়া কথা লিখলে চলবে কেন!

অনেক ব্যবসায়ে ফাউ দেবার রীতি প্রচলিত আছে। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় প্রকাশকেরা জায়গা কেনেন পয়সা দিয়ে, সমালোচনার পৃষ্ঠায় জায়গা পান ফাউ হিসেবে। নইলে ভাও পোষাবে কেন।

এই যখন অবস্থা তখন বাংলা সমালোচনা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণ করে চলবে—এটা কি করে আশা করা যায়!

কিন্তু সমালোচনা সাহিত্যের অধঃপাতিত অবস্থা সম্পর্কে শুধু এইটুকু বললেই সব কথা বলা হয় না

সাহিত্য আগে, সমালোচনা পরে। যোগ্য সমালোচক সাহিত্যিকের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যের মানোন্নয়নে সাহায্য করতে পারেন। রুশ দেশে বেলিনস্কি কি ডব্রুলিউবভ তা করেছেন। কিন্তু সমালোচক তো কোনো স্বকপোলকল্পিত আদর্শ প্রচার করেন না, তাঁকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রচলিত ঐতিহ্যের রত্নভাণ্ডার থেকে।

গত একশো বছরে বাংলাসাহিত্যে নিশ্চয়ই গৌরবময় ঐতিহ্য গঠিত হয়েছে। যোগ্য সমালোচকের তাই রসদের অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু যখন আদর্শ ও বাস্তবে আকাশ-জমীন ফারাক দেখা দেয় তখন সমালোচক কি করবেন?

নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনোরূপ ফাঁপান-ফোলান ধারণা আমার নেই, তবে এটুকু বলতে পারি, আগে যে সব সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ

করেছি, তার চৌহদ্দির মধ্যে—বইয়ের প্রতি সাধ্যানুযায়ী সুবিচার করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এক বছরের অভিজ্ঞতায় দুঃখের সঙ্গেই এ কথা স্বীকার করতে হচ্ছে, যে-সব বই আমি পড়েছি (সমালোচনার জন্যই হোক বা কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই হোক) তার মধ্যে এমন বই কমই পেয়েছি, যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব। আমি অবশ্য গল্প-উপন্যাসের কথাই বলছি।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্য রসাতলে গেছে—এমন কথা বলতে চাই না। যুগান্তকারী প্রতিভা কোন দেশেই রোজ রোজ জন্মায় না। সেদিক থেকে আমরা বরং সৌভাগ্যবান, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হোন, তারাশঙ্কর-মানিকের মতো প্রতিভাধর লেখক আমাদের দেশে জন্মেছেন। তাঁদের পরে যাঁরা সাহিত্যের আসরে এসেছেন বা হাল আমলে যাঁরা লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে শক্তিমান লেখকের অভাব নেই। বলতে কি আঙ্গিক নৈপুণ্যে, ভাষার ঔজ্জ্বল্যে তাঁরা এমন কি তাঁদের পূর্বসূরীদেরও অনেক সময় ম্লান করে দিতে পারেন। তবু তাঁদের বই মন ভরায় না, যদিও হয়ত অনেক ক্ষেত্রে চোখ ধাঁধাঁয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এক যুগ কেটেছে। কিছু হয় নি হয় নি করেও শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে। সাধারণভাবে লোকের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি না হলেও, একশ্রেণীর লোক দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখছেন। আর বাংলাদেশের জল-বায়ুর গুণে সেই পয়সা কিছু তাঁরা বইয়ের পেছনেও খরচ করছেন। নতুন নতুন লাইব্রেরী খোলা হয়েছে। সরকারী আনুকূল্যে তাঁরাও বেশ কিছু বই আজকাল কেনেন। কাজেই বইয়ের কাটতি বেড়েছে। লেখকেরাও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছেন। তাতে অবশ্য আপত্তি করার কিছুই নেই।

কিন্তু স্বচ্ছলতার একটা অভিশাপও আছে। ভিশিনস্কি বলেছিলেন, মিঙ্ক কোটের মধ্য দিয়ে হৃদয়কে স্পর্শ করা কঠিন। কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে, আমাদের সমাজে অর্থ, অর্থের লিপ্সা বাড়ায়। বাড়ি হলে, লোকে গাড়ি চায়। আর এই বাড়ি-গাড়ির মোহ সাহিত্যিককেও অনেক ক্ষেত্রে করে তোলে বিদূষক—নানান ভাবে লোকের মনোরঞ্জন করাই যার কাজ। বাংলাদেশের সব লেখকই বিদূষকবৃত্তি অবলম্বন করেছেন—এমন কথা বললে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করা হবে। তবে, যদি বলি লেখকরা আগের তুলনায় আজকাল জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অনেক

বেশি সচেতন হয়েছেন, তাহলে বোধ হয় মিথ্যে বলা হবে না। অন্তত অনেকের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য হবে। যে সব উপাদান থাকলে বই জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা, অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, লেখকেরা সচেতনভাবে তার সমাবেশ করছেন। গুরু বক্তব্য সম্পর্কে অনীহা অতিমাত্রায় প্রকট হয়েছে হাল আমলের গল্প-উপন্যাসে। এমন বই লেখাই ক্রমশ আদর্শ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যা লোকে ট্রেনে যেতে যেতে পড়বে, শুয়ে শুয়ে পড়বে, এমন কি পড়বে কমোডে বসে। দুঃখের বিষয়, যারা এককালে একটু অন্য রকমের লেখা লিখতেন, তাঁরাও যেন এই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাচ্ছেন। অভ্যস্ত সাফল্যের পথে পা মেপে মেপে চলার দুর্লক্ষণটাই ক্রমশঃ অতিমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অবশ্য এর বিপরীত ঝোঁকও লক্ষ্য করেছি। তরুণতর লেখকেরা অনেকে এই জনপ্রিয়তার মোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁদের বিদ্রোহের প্রেরণাটা সৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু পথটা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে না। কেননা এই বিদ্রোহ প্রধানত রীতিগত। রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে—কিন্তু সেটাই সব নয়। সমালোচকেরা বলে থাকেন, 'মাদাম বোভারী' আঙ্গিকের দিক থেকে নিখুঁত উপন্যাস। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। কিন্তু আঙ্গিকগত ত্রুটি সত্ত্বেও জীবনবোধের গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর কাছে মাদাম বোভারী' নিষ্প্রভ। দুঃখের বিষয় যাঁরা সাহিত্যে নতুনের প্রয়াসী তাঁরা এই দিকটা সম্পর্কে সচেতন নন বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের আদর্শ তাই হয় কল্ডওয়েল, টেনেসি উইলিয়মস্, বড়ো জোর কামু,—টমাস মান নয়।

ত্রিশের যুগে ইওরোপীয় সাহিত্যে এই ধরনের নতুনত্বের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল—কিন্তু সে নদী মরুপথে হারিয়ে গেছে, পরবর্তী কালের সাহিত্যে তার প্রভাব কমই পড়েছে। নতুন জীবনবোধের অনুশীলনই সাহিত্যে প্রাণ-শক্তির জোগান দিতে পারে, অন্য কিছু নয়। কিন্তু হাল আমলের সাহিত্যে সেদিকটাতেই যেন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

নতুন এবং পুরান, উভয় গোষ্ঠীর লেখকদের সম্পর্কেই কথাটা খাটে। লেখকরা অধিকাংশই এসেছেন মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে, প্রায় সকলেই তাঁরা শহরের বাসিন্দে, জগত তাঁদের সংকীর্ণ। বাংলা সাহিত্য এই সংকীর্ণ গণ্ডির

মধ্যেই পাক খেয়ে মরছে। তথাকথিত 'ভূগোল বাড়াও' আন্দোলনের নামে যা চলছে, তাতে প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল হয়ত কিছু পরিমাণে মেটে, তার বেশি কিছু হয় না।

সাহিত্যকে দর্পন বলা হয়ে থাকে। তাই যদি হয় তো তার সামনে দিয়ে রঙচঙে কোন মিছিল চলে গেলে তাতে দর্পনের কী ক্ষতিবৃদ্ধি! দর্পনের পেছনকার পারদের প্রলেপটা গাঢ় করে লাগালে তবেই প্রতিবিম্বের ডৌল এবং গভীরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই দিকটাই অবহেলিত হচ্ছে।

গত কয়েক বছরে ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে কথাসাহিত্যের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রগতি হয়েছে সামান্যই। দ্বিধাবিভক্ত বাংলায় সমস্যার অন্ত নেই—উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সমাজজীবনে দুর্নীতির সমস্যার চাপে বাঙালীর জীবন আজ বিপর্যস্ত। কিন্তু বাংলা গল্প সাহিত্যে অল্পই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

কয়েক বছর আগে 'টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে' স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের খতিয়ান করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের মূল সুর নৈরাশ্য। এখন সেই নৈরাশ্য ঔদাসীন্যে পৌঁছেচে। এটাই সবচেয়ে বড়ো দুর্লক্ষণ। নৈরাশ্যের মধ্যে বেদনা এবং জ্বালাবোধ থাকে কিন্তু ঔদাসীন্যের নির্লিপ্ততা সাহিত্যকে করে নিরক্ত, প্রাণহীন। তাই দার্শনিক দৃষ্টি এবং গভীর জীবনবোধের অভাবে বাংলা গল্প-সাহিত্য বিবর্ণ, পানসে।

বাংলা নাটকের রূপ ও রীতি

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাংলা নাটকের রূপরীতি কোন পথে তা নির্দেশ করার সময় এখনও আসেনি। তার প্রধান কারণ আমাদের দেশে নাটকের যুগের সবেমাত্র উন্মেষ হয়েছে। নাটক সম্পর্কে চারিদিকে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, বহু নাটক রচিত ও অভিনীত হচ্ছে, নাটককে তার যোগ্য মর্যাদা দেবার জন্য জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে ঔৎসুক্যের অভাব নেই। নাট্যসাহিত্য আজ সরস্বতীর আসরে বেশ শক্ত হয়ে বসেছেন—দ্বাররক্ষকদের ধমকানি সত্ত্বেও। ক্রমবিকাশের সূত্রে এই গঠনমূলক যুগের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হলে, পৃথিবী-সৃষ্টির বিবর্তনবাদকে টেনে আনতে হবে। নাটক সৃষ্টির পর্যায়ে এটাকে সেই সময় বলা যেতে পারে যখন নবীন পৃথিবী সবে শীতল হতে শুরু করেছে। তার ওপরকার শান্তি ভেতরকার উন্মত্ত বিশৃঙ্খলার কোনো নিদর্শন নয়। যে কোনো মুহূর্তে এই শান্তভাব নষ্ট হয়ে, ভেতরের উত্তাপ প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে।

আজ নানা ঘটনাপুঞ্জের একত্রীকরণে একটি নাট্যান্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। যার মধ্যে নানা দল, নানা মত, নানা সংগঠন দানা বাঁধতে চেষ্টা করছে। এই আন্দোলনের মধ্যে কেবলমাত্র নাটক আর অভিনয় নয়, এমন অনেক স্রোত এসে মিশেছে যার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে নাটকের কোনো যোগ নেই—যেমন ধর্মান্দোলন, সমাজসেবা, রাজনৈতিক মত ও তার ব্যবহার, ইত্যাদি। এই সব মতামত নাটককে প্রভাবান্বিত করতে পারে—এটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা দেখেছি যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইসব নিদর্শনগুলি নাট্যবস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে পারেনি—বরঞ্চ তাদের প্রতিষ্ঠালাভের দৌরাত্ম্য নাট্যবস্তুকে বা নাট্যকারের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে;—নাটককে প্রচারধর্মী করে নাট্যরসকে ব্যাহত করেছে। বক্তব্যধর্মী যত নাটক দেখেছি ভাবধর্মী নাটক সে তুলনায় অতি স্বল্প। আমাদের জাতীয় জীবনের ব্যবহারিক অসহিষ্ণুতা কোনো নাটকের বক্তব্যের মধ্যে পথ পায় নি। এর কারণ সম্পর্কে কোনো গবেষণা, আলোচনা বা মতামত কোনো নাটকের

ভেতর আজও ভাষা পায়নি—অথচ গঠনমূলক অসহিষ্ণুতা আর সময়ক্ষেপের আশঙ্কা বহু নাট্যকার আর তাঁদের নাটককে নষ্ট করে দিয়েছে।

বিষয়বস্তুর পরে আসে নাটকের প্রকাশ ভঙ্গিমা। এখানেও রূপান্তরের সঞ্চরণশীলতা চোখে পড়ে। মুক্তাঙ্গন মঞ্চ, মাধ্যমিক মঞ্চ (arena) থেকে আরম্ভ করে চিরাচরিত স্থিতিশীল মঞ্চের প্রচলিত ধারায় অভিনয় হতে দেখেছি। বিভিন্ন অভিনয়শৈলীকে কায়েম করার প্রচেষ্টা চলছে। প্রযোজনার রীতিনীতির নানা সমাবেশে আনন্দিত হয়েছি, আশান্বিত হয়েছি। প্রমাণিত হয়েছে যে জ্ঞানী অভিনেতা হলেই অভিজ্ঞ পরিচালক হওয়া যায় না। পরিচালকের কাজকে নতুন করে সম্মানিত করা হয়েছে, সুগভীর দায়িত্ব মণ্ডিত করা হয়েছে।

এই গঠনমূলক কাল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিরোধের ভেতর দিয়ে। এ বিরোধ চিরকালীন ভাবগত বা জ্ঞানগত বিরোধ নয়। এ বিরোধ মৌলিক বর্ণনা নির্দেশের নীতি নিয়ে। নাটকের কি বিচার কি সংজ্ঞা আধুনিক নাট্যশাস্ত্রে লেখা হবে তাই নিয়ে এই বিরোধ। সেইজন্যে এই বিরোধ কেবল প্রাচীনে নবীনে সীমাবদ্ধ নেই, প্রাচীনে প্রাচীনে এবং নবীনে নবীনে উগ্র মতান্তর আমাদের চোখে পড়েছে। নাটকে যান্ত্রিক সাহায্যের কথাই যদি ধরা যায়, উদাহরণ স্বরূপ আমরা জানি এ বিষয়ে কি রকম বিতণ্ডা বর্তমান। একথা অনস্বীকার্য যে, এই সব বিতণ্ডা সমাধানের দিন এখনও আসে নি।

নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা দেখতে পাই। ভাল অভিনয়ের গুণে সমালোচকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, নাটকের ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে যায়। তেমনি অভিনয়ের দোষে ভাল নাটক কদর্য লাগে। এ ছাড়া আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাট্যশৈলী এবং অভিনয়ধারার নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনাও প্রয়োজন। নাটকের বক্তব্যবিচার, সুষ্ঠু নাট্যসমালোচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলা বাহুল্য, এত প্রচুর বক্তব্যবিহীন নাটক সমালোচকদের দেখতে হয় যে ক্লান্ত হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

নাটকে বক্তব্যের প্রয়োজন আছে কিনা, এ নিয়ে তর্ক করা যায়। আমার মনে হয় দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে আনন্দ, হাসি কিংবা ব্যথাদুঃখের জোয়ার তোলার কোনো মানেই থাকবে না—যদি তার কোনো বলার কথা না থাকে। শরৎচন্দ্রের একান্ত ঘরোয়া গল্প উপন্যাসের মধ্যে তাঁর এই বক্তব্যের প্রকাশ বারবার দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশের তাগিদের কাছে কখনো

কখনো নাটকও গৌণ হয়ে গেছে। আজ তাই নাটকের বক্তব্যের ওপর বিশেষ জোর দেবার সময় এসেছে। পেশাদারী-অপেশাদারী অভিনয়ে, শুকনো প্রয়োজনহীন নাটকের সংখ্যা দিনে দিনে এত বেড়ে চলেছে যে ভয় হয়, অতিরিক্ত খড় জন্মালে ধানের ভাগ কমে যাবে।

আধুনিক নাটকের সমালোচনা তাই হতে পারে দুইভাবে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমালোচনা হতে পারে নাড়ি টিপে, জিভ আর চোখ দেখে, বুকে স্টেথিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে। তা না হলে দূরবীক্ষণ দিয়ে নাটকের একটি দোষ নির্ণয় করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় তা পরীক্ষা করতে হবে। দেশী মতে সমালোচনা করা মানেই হাতুড়ী ছেনি দিয়ে ঠোকঠুকি করা। নাটককে খুঁড়ে খুঁড়ে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা যখন আর কিছুই থাকবে না। বলা বাহুল্য, এই দুই ব্যবস্থার কোনোটাই আনন্দের নয়। সুতরাং প্রশ্ন থেকে যায় বাংলা নাটকের রূপরীতি কিভাবে নির্ণীত হবে।

বর্তমানকালের নাটকের মধ্যে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যে ধরনের নাটক উপস্থিত করা হয়েছে তার সঙ্গে অপেশাদারদের অভিনীত নাটকের বহু তফাৎ আমরা দেখেছি। কেবল নাটকে নয়, অভিনয়ে, বিন্যাস-কৌশলে এবং কলাকুশলতায় এই ভিন্নতা স্পষ্ট বোঝা যায়। গত এক বছরের মধ্যে সবিস্ময়ে দেখলাম অপেশাদারী সংস্থাসমূহ পেশাদারী মঞ্চকে নানাভাবে প্রভাবিত করলেন। কয়েকটি মঞ্চ এই প্রভাব-বন্যাকে স্বীকার করে নিলেন। অন্যগুলি নানাভাবে আপোস নিষ্পত্তির ভেতর দিয়ে—গাছের ফল খেয়ে, মাটির ফল কুড়োবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই লক্ষ্য করেছি পরিপূর্ণ নাটক তাঁরা কেউই সৃষ্টি করতে পারেন নি। আজও আমরা অপেক্ষা করে আছি। মহত্তর সৃষ্টির আশায়। যা আমাদের মনে সাড়া জাগাবে, হৃদয়কে ভরে দেবে।

আজকের অসাফল্যের কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হবে না। আজ আমাদের দেশে সেই নাট্যকারের অভাব যাঁদের নাটক আমাদের চিন্তা আর হৃদয়কে একসঙ্গে নাড়া দিতে পারবে। আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ নাটক গল্পের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। ঘটনার দৌরাত্ম্য নাটকের মধ্যে ডাকাতি করে যায়। আমরা ভুলে যাই ঘটনার সন্নিবেশ নাটক নয়। তেমনি হয় সংলাপের অনুর্বর ক্ষেত্রে। কোনো ক্ষেত্রেই সংলাপে ফসল জন্মায় না, তার জন্যে চাই মানুষ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই মানুষের অভাব

আমরা ইদানীংকার নাটকের মধ্যে অনুভব করছি। এ শুধু নাটক লেখার মানুষ নয়—নাটকের মানুষও। পানসে নায়ক, নাকে কাঁদুনে নায়িকা, টাইস্ম্যাটে সমাচ্ছন্ন কুচক্রী, আজও আমাদের দৃষ্টিপথ ছেয়ে আছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রে যে তিনটি বস্তু বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়ছে তা হল অসহিষ্ণুতা, অসংযম আর অজ্ঞানতা। নাটকের বর্ণপরিচয়কে উপেক্ষা করে যে সব পণ্ডিত আমাদের কাছে নাটকের নতুন নতুন থিওরি উপস্থাপিত করেছেন যদি তাঁরা কেবল অপেশাদার অভিনয়গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ নবীন নাট্যকার হতেন তাহলে এত শঙ্কিত হতাম না।

বর্তমান পেশাদার মঞ্চগুলির অভিনয় বিচার করলে বাংলা নাটকের রূপরীতি হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে। সব থেকে রক্ষণশীল মঞ্চ 'স্টার'—যে সব নাটক ইদানীং কালে তাঁরা করেছেন, সেগুলির সবই হয় বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ, না হয় ধর্মসম্পর্কীয়। মনে হয় এদেশের থিয়েটার-ব্যবসায়ের মূলসূত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর লণ্ডনের থিয়েটার মালিকদের কাছ থেকে ধার করা। তাঁদের মতে, 'পুরুষরা থিয়েটার দেখে না। সুতরাং এমন থিয়েটার কর যাতে দলে দলে মহিলারা যাবেন,—এবং তাঁরাই পুরুষদের টেনে নিয়ে আসবেন।'

'বিশ্বরূপা' পর পর দুটি Formulae নাটক করেছেন। ক্রমবিবর্তনে অপেশাদার মঞ্চের অনেকগুলি অতিনামী, স্বল্পনামী শিল্পীকে নিয়ে অভিনয় করাচ্ছেন। কিন্তু পরিচালনার দায়িত্ব 'বিশ্বরূপা' নিজেদের হাতে রেখেছেন, এবং তাঁদের নাট্যকার—নবীন নাট্যকারের নাট্যবস্তুর চুম্বকটুকু গ্রহণ করেছেন। এইখানে 'রঙমহল' আর একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। নতুন নাট্যকার, অপেশাদার পরিচালক-অভিনেতাকে মঞ্চের ভার দিয়ে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তার ফল আমরা দেখেছি। পালে নতুন হাওয়া লেগে নৌকা দুলে উঠেছিল। এখন আবার পাল ছিঁড়েছে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পরিপূর্ণভাবে অপেশাদারীদের নিয়ে অভিনয় হচ্ছে 'মিনার্ভা থিয়েটারে।' অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা এঁদের প্রচেষ্টাকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু এঁদের বর্তমান নাটকের অপূর্ব অভিনয় যেখানে পৌছেচে—নাটক সেখানে পৌছতে পেরেছে কি ? পারে নি বলেই অসাফল্যের গ্লানি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে। তবে আশা আছে গ্রহান্তরের মহৎ ইচ্ছায় যদি দলভঙ্গ না হয় এঁদের কাছ থেকে আমরা পরিপূর্ণ নাটক ভবিষ্যতে আশা করতে পারি।

নাটক সম্পর্কে কোনো আলোচনাই 'বহুরূপীর' উল্লেখ না করে শেষ হতে পারে না। বাংলা নাটকের প্রসারে এই সংস্থার প্রভাব নাটকের ইতিহাসে লেখা থাকবে। প্রতিদিন কাগজ খুললে দেখা যায় যে পেশাদার থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁদের নামাঙ্কিতা অভিনেত্রীর নাম—সব থেকে বড় অক্ষরে লেখা থাকে। কিন্তু তাঁদের অতি স্বল্প নাট্যপ্রয়োগ আমাদের ব্যথিত করে। বিশেষ বর্তমানের দুটি নাটকের একটিকেও 'বহুরূপীর' নাট্যপ্রচেষ্টা বলতে দ্বিধা হয়। দেখে দুঃখ লাগল 'পুতুলখেলার' ধারাকে মুক্ত করার পর তাঁরা "মুক্তধারা" নিয়ে পুতুল খেললেন।

অধ্যাপক নিকল্‌ নাট্যকার Strindberg-এর অভিনয় প্রতিভা বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—His hands touch now the early romantics, now the realists and naturalists, now the expressionists, now the sur-realists and now the existentialists.

তিনি একা যত রকমের নাটক লিখতে পেরেছিলেন আমরা সমগ্রভাবে তার কিছুই পারি নি। আমাদের নাটক রোমান্টিক আর ন্যাচারালিস্টের মাঝে দোলা খায়—মাঝে মাঝে শোধ তুলি অত্যন্ত উগ্র রিয়ালিজমের অসংযত প্রকাশে। Orson Wells-এর ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে—Are we not ashamed that there is so much of him and so little of us ?

আজকাল প্রচুর নাটক লেখা হচ্ছে, তার প্রধান কারণ এই নাটুকে আবহাওয়াতে আমরা মেতে উঠেছি। সেই মাতলামির ঝোঁকে মনে হয়েছে যে কথার পর কথা সাজালেই নাটক হয়। দৃশ্যপট সাজিয়ে মুখে আলো ফেলে সে কথাগুলো কোনোরকমে বলে যেতে পারলেই অভিনয় হয়ে গেল। দেশী-বিদেশী বই বা সিনেমা ঘেঁটে একটা গল্প ঘটাতে পারলেই plot হল—উদ্ভট প্রযোজনা আঙ্গিক হল। আমরা বার বার জোর দিয়ে বলতে চাই যে নাটক যাঁরা রচনা করবেন তাঁদের কিছু জ্ঞানার্জন আবশ্যক। নাটকের মূলসূত্রগুলি শিক্ষা না করলে, অনুধাবন না করলে নাট্যসৃষ্টি বার বার ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে দুই মহামনীষী নাটক রচনা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাঁদের নাটকে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে বার বার নস্যাৎ করেছেন, সেই মহাকবি ভাস ও জর্জ বার্নাড শ'—নিজেরা দীর্ঘকাল নাটক সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন। আজ তাই সুষ্ঠু নাটক রচিত হতে হলে প্রথমে চাই জ্ঞান, বুদ্ধি আর ধৈর্য। আজ নাটকে যে ভেজাল চলেছে তাকে প্রতিহত না করতে পারলে সুষ্ঠু নাটক রচনার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বইয়ের বাজার

অনিলকুমার সিংহ

এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের বইয়ের বাজার বলতে বোঝাত মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রকাশক, হাতে-গোনা স্বল্প সংখ্যক দোকান এবং প্রায় গোনা-গুনতি জনকয়েক লেখক। আর এঁদের পৃষ্ঠপোষণা করতেন যে উৎসাহী পাঠকসমাজ তা অখণ্ড বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল শহরে, গ্রামে, গঞ্জে—বিক্ষিপ্ত অসংগঠিত হয়ে। তাও বোধহয় সাকুল্যে হাজার বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। কথাটা খুব বেশি দিন আগেকার নয়। এমন কি বিশ-পঁচিশ বছর আগেও বাংলা প্রকাশনা জগতের চেহারাটা তুলনামূলক বিচারে এমনি রিক্ত আর বিক্ষিপ্তই ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক এবং গল্প-উপন্যাস সমস্ত রকম বই ধরলেও মূলধনের পরিমাণ সম্ভবত এক লক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। খুব বড় রকমের জোয়ার-ভাঁটা খেলত না বইয়ের বাজারে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত—বই অবশ্য বের হত নানান রকম নানান থানে —কোথাও কোথাও বিজ্ঞাপনের চটকদারী ভাষাও যে একটু-আধটু চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা সৃষ্টি না করত তা নয়। কিন্তু হাজার হোক সেকালে বইয়ের আবির্ভাব ঘটত প্রায় সলজ্জ নববধূর মত, কুণ্ঠার গুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে দ্বিধাজড়িত চরণে সে হাজির হত পাঠকদের অন্তপুরে—পাঠকমনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘটত তার গোপন অভিসার। আর তার স্মৃতি অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে ঢেউ তুলত। ঢেউ মিলিয়ে যাবার পরও তার রঙ আর রেখা, সুর আর ব্যঞ্জনা সহজে মুছে যাবার অবকাশ পেত না।

আর আজ? সত্যি বলতে কি, গত বিশ-পঁচিশ বছরে বাংলা প্রকাশনা জগতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। একটা বড় রকমের বিপ্লব। আজ প্রকাশক, লেখক, বইয়ের দোকান ইত্যাদির সংখ্যা কত তা কর গুণে বলতে পারা যাবে না—ডাইরেক্টরির সাহায্য নিতে হবে। অলি-গলিতে আজ প্রকাশক, পথে-ঘাটে আজ লেখক, স্টেশনারি ও মুদি দোকানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ বইয়ের দোকানের প্রসার; বই ও

পাঠকও সংখ্যাতীত। কলেজ স্ট্রীট তো আজ সাহিত্যের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে—তীর্থযাত্রী ও পাণ্ডাদের ভিড়ে তার পথ-ঘাট মুখরিত। বই আজ আর গজেন্দ্রগামিনী নববধূর মত লজ্জাজড়িত চরণে গোপন অভিসারে বেরয় না, সালংকারা রূপসীর মত ম্যাক্স ফ্যাকটরের মেক-আপ নিয়ে সে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়, তাকে ভঙ্গিমায়-রঙ্গিমায় বিমোহিত করে প্রলুব্ধ করে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, পাঠক অনেক সময়ে নিজেও তা উপলব্ধি করতে পারে না। অবশ্য বয়ঃসন্ধিকালে এ উচ্ছলতা স্বাভাবিক। বয়সের ধর্ম বলে একে অভিনন্দনও জানাতে হবে। তবে গত বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতে বসলে একটা কথা স্বতঃই মনে হবে যে, প্রকাশনা ব্যবসায়ের এই প্রসার আর স্ফীতি তার বয়ক্রমের সঙ্গে তাল রেখে ঘটে নি। তার বয়স যতটা না বেড়েছে, তার চেয়েও বেড়েছে দেহের কলেবর। আর কলেবরের তুলনায় তার দেহ সঞ্চালনের ক্ষমতাও মাত্রাতিরিক্ত। অর্থাৎ যে কোনো কারণেই হোক কিছুটা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত স্ফীতি ঘটে গেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতির কাল থেকে বলাটা বোধহয় আরও সঙ্গত) বাংলা প্রকাশনা জগতে এত বেশি পরিমাণে ছোট-বড় প্রকাশকের সমাবেশ ঘটেছে যে এমনটা না হয়ে উপায় ছিল না। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টি পাঠকদের গ্রহণ-ক্ষমতা, ধারণ-ক্ষমতা ও জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি দৃঢ় নিবদ্ধ হবে। মানুষের জীবনে ও মননে, তার মানসে ও রুচিবৃত্তে বই—তথা সাহিত্যের প্রভাব যে কী সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্ববহ সে কথা মনে রেখেই আমরা অবহিত হতে শিখব। শিক্ষার দ্রুত প্রসার, পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি, নিত্য নতুন প্রকাশক ও লেখকের আবির্ভাব ইত্যাদির মধ্যে পড়ে আমাদের পথ হারিয়ে ফেললে চলবে না। সমাজজীবনের অন্যত্র যে প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা অপরিহার্য বাংলা প্রকাশনা জগতেও তার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাংলা পুস্তক ব্যবসায় আজ সাবালকত্ব অর্জন করেছে। সুতরাং, বয়ঃসন্ধিকালের অসংলগ্ন উচ্ছলতা অচিরে বর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বইয়ের বাজার তথা সমগ্র বাংলা প্রকাশনা জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে স্বভাবতই অনেক সমস্যার কথা উঠবে, অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে। কিন্তু এই নিবন্ধের পরিসরে তা সম্ভব নয়, হয়তো একান্ত

প্রয়োজনীয়ও নয়। তাই আমি কেবল কয়েকটি প্রসঙ্গের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখব।

প্রথমেই ওঠে প্রকাশকের কথা। তার দায়িত্বের কথা। গত বিশ-পঁচিশ বছরে অসংখ্য নতুন প্রকাশক বইয়ের বাজারে এসেছেন। আবার অনেক নতুন ও পুরনো প্রকাশক বিদায়ও নিয়েছেন। পুস্তক ব্যবসায়ের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পেরে বহু ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করেই তাঁদের অন্তর্ধান ঘটেছে। কিন্তু পুস্তক ব্যবসায়ে যাঁরা এসেছেন বা আসছেন তাঁদের অনেকের মনেই প্রবল উচ্চাশা, প্রকাশনা ব্যবসায়ের মুনাফা সম্বন্ধে অনেকেরই কাল্পনিক ধারণা। পুস্তক প্রকাশের ব্যবসা এখনো যতটা নেশা ততটা পেশা নয়—এই নির্মম সত্যটুকু সকলে সমানভাবে উপলব্ধি না করেই এই দায়িত্বশীল কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্য কোনো ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগে তাঁরা হয়তো অনেক বেশি লাভবান হতেন, মানসিক শান্তিরও অভাব ঘটত না। এবং বইয়ের বাজারও তুমুল হট্টগোলের হাত থেকে রেহাই পেত। এখানে উল্লেখ করে রাখি যে আজও অনেক প্রকাশকের কাছে প্রকাশনাটা জীবিকা নয়, আংশিকজীবিকা মাত্র।

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলা দেশে আজও বেশির ভাগ বই (গল্প-উপন্যাসের কথাই বলছি) এক হাজার বা এগার-শোর বেশি ছাপা হয় না। যে বইগুলির ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে প্রকাশক সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ কেবলমাত্র সেগুলিই বাইশ-শো বা তেত্রিশ-শো কপি ছাপা হয়। যদি গড়পড়তা হিসাব চান, একটা মনগড়া হিসাব হাজির করতে পারি :

১০০০।১১০০ কপির সংস্করণ—শতকরা ৭০%
২২০০ কপির সংস্করণ—শতকরা ২৫%
৩৩০০ কপির সংস্করণ—শতকরা ৫%

এখন দশ ফর্মার (১৬০ পৃষ্ঠা—আজকাল গল্প-উপন্যাসের বই সাধারণত নয়-দশ ফর্মার বেশি হয় না) একটা বই ১১০০ কপি ছেপে প্রকাশক যদি সমস্ত কপি বিক্রি করতে পারেন, তিনি হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে ৩০০৲ থেকে ৫০০৲ টাকা লাভ করবেন। এমনিতে হিসাব করলে দেখা যাবে যে তার ১৫ থেকে ২০% নীট মুনাফা হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো তর্ক তুলে বলবেন যে, এত মুনাফা চোরা কারবার ছাড়া আর কোনো ব্যবসায়ে হয় না। কথাটা একদিক থেকে সত্য হলেও পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। কারণ ধরুন, প্রকাশক

ভদ্রলোকটি সারা বছরে এমনি ১১০০ কপির মোট ছটি বই বের করলেন, এর বেশি তাঁর মূলধনে কুলোয়ও না। বছরের শেষে দেখলেন, ছটি টাইটেল মিলিয়ে তিনি মোট ৬,৬০০ কপি বই বের করেছেন, বিক্রি হয়েছে সর্বসাকুল্যে ৪,০০০ কপি। খাতাকলমে লাভ দেখাচ্ছে—টেনেটুনে হাজার দেড়েকের মতো। ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ভাবলেন, এর চেয়ে সরকারী আপিসে লোয়ার ডিভিশন কেরানী হলেই বা কি মন্দ ছিল। ব্যবসা গুটিয়ে যে চলে যাবেন তারও উপায় নেই কারণ ২,৬০০ কপির যে স্টক মজুত আছে তা পুরনো কাগজের দরে বিক্রি করতে হবে—বইয়ের পুরো দাম কেউ দেবে না। অন্য ব্যবসায়ে শতকরা ৫% কি ১০% কমিয়ে দিলে মজুত স্টক বিক্রি করা যায় কিন্তু বইয়ের ব্যবসায়ে তা সম্ভব নয়। অগত্যা প্রকাশক ভদ্রলোকটি প্রথম বছর বইয়ের ব্যবসাতেই রয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বছরও ছাড়তে পারলেন না, কারণ মজুত স্টকের পরিমাণ আরও বেড়েছে। তৃতীয় বছরও একই অবস্থা। ভদ্রলোক আজও বইয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ডানকুনি কি বেলঘোরে থেকে প্রতিদিন কলেজ স্ট্রীটে আসেন। নিষ্ঠার সঙ্গে দোকান খোলেন। কোন্ প্রেস কত কম টাকায় ছাপে তার খোঁজ নিয়ে বেড়ান; বছর ঘুরে গেলেও প্রেসের টাকা শোধ হয় না, কাগজওয়ালা অভিশাপ দেয়, দপ্তরী সপ্তাহান্তে পাঁচ-দশ টাকা পেলে হাসিমুখে বিদায় নেয়। ভদ্রলোক একজন পুরনো প্রকাশক। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না তিনি খুব মুনাফা করছেন কি খুব সুখে আছেন। তবে তিনি আজ আছেন, আগামীকাল খুব সম্ভবত থাকবেন। কারণ তিনি ছাড়তে চাইলেও 'কমলি তাঁকে ছাড়ছে না'।

বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ের অবস্থা এমনি ভয়াবহ, একথা আদৌ বলি না। অল্প মূলধন নিয়ে যে-সব ছোটখাট প্রকাশক বইয়ের বাজারে এসেছেন, প্রধানত তাঁরাই এই গোলকধাঁধাঁয় হাবুডুবু খাচ্ছেন। এটা একান্তই প্রকাশকের নিজস্ব সমস্যা, লেখক বা পাঠক তাঁর সমস্যা সমাধানে কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন জানি না। প্রকাশক ভদ্রলোকটি শতকরা ১৫।২০% মুনাফা করছেন সত্যি কথা কিন্তু তাতেও তিনি সুবিধা করতে পারছেন না। এই মর্মান্তিক সত্যটুকুকে চোখ ঠেরে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না।

আজকের দিনে প্রকাশকের কাছে সাধারণভাবে তিনটি সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রথমত, মূলধনের সমস্যা—বর্তমানে বেশি মূলধন ছাড়া

প্রকাশনা জগতে থই পাওয়াই মুশকিল। ধার পাওয়া ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। কাগজ ধারে পাওয়া যায় না, লেখকদের মধ্যে অনেকেই নগদ-নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, ভাল ছাপাখানা ধারের মেয়াদ কমাতে কমাতে প্রায় নগদের পর্যায়ে এনে ফেলছেন। ব্লকমেকার ও আর্টিস্টরাই বা আর কতদিনের ধার দেবেন। সুতরাং, ভালরকম মূলধন না হলে পুস্তক ব্যবসায়ে সুবিধা করতে পারা সম্ভব নয়। স্বল্প মূলধন নিয়ে নামলে দু-এক বছরের মধ্যেই কানাগলিতে এসে ঠেকতে হবে। কারণ পুস্তক ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে, মুনাফার হার আশাপ্রদ হওয়া সত্ত্বেও, বিক্রির হার বড় অল্প ও ধীরগতি। দ্বিতীয়, বই প্রকাশের সমস্যা। সারা বছর তিনি কি বই ও কি পরিমাণ বই ছাপবেন যাতে মোটামুটি ভদ্ররকম উপার্জন হতে পারে। তৃতীয়, মুদ্রিত বইগুলিকে তিনি কত দ্রুতগতি বাজারে চালাতে পারেন—মানে এক বছরে যতগুলি বই ছেপেছেন ততটা বই সে বছরে কাটাতে পারবেন কি না। বিশেষ করে বইয়ের বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। এই সমস্ত সমস্যা সার্থকভাবে সমাধান করতে পারার ওপরই তার ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, তার মুনাফার পরিমাণ, শেষ পর্যন্ত বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছুই নির্ভর করছে।

যে-সব প্রকাশক এই সব সমস্যার আশানুরূপ সমাধান করতে পেরেছেন, তাঁরা বাজারে রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা আরও বেশি উন্নতি লাভ করবেন। প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতিপত্তি সহজে বিচলিত হবে না। মূলধনের সমস্যা, কি বই এবং কতটা বই ছাপব তার সমস্যা ও সবশেষে মুদ্রিত বইগুলিকে বহুল পরিমাণে বিক্রি করার সমস্যা— সবগুলি সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতাই তাদের আয়ত্তাধীন।

প্রকাশনা জগতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেকেই এসেছেন পুস্তক ব্যবসায় অত্যন্ত সহজ ও অল্প মূলধনে সম্ভব—এই বিশ্বাসকে সম্বল করে। সাহিত্য-প্রীতি বা পুস্তক ব্যবসায়ের প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণ থেকে আসেন নি। ফলে মানসিক প্রস্তুতির অভাবে অনেক প্রকাশকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে নি। তাঁরা যে-সব বই প্রকাশ করছেন তাতেও খুব বড় রকমের পরিকল্পনা নজরে পড়ে না। বিদেশে এমন বহু প্রকাশক আছেন যাঁদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র পাঠকদের সুবিদিত। যে-সব বই তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেবলমাত্র সে-সব বইই তাঁরা ছাপেন। পাঠকের

চিন্তা এবং মনন, রুচি এবং পাঠস্পৃহাকে পর্যন্ত তাঁরা উদ্দীপিত করেন। সুতরাং একেকজন প্রকাশকের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে ; পাঠকদের কাছে সেই বৈশিষ্ট্যই তাঁর পরিচয়, তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উৎস। কিন্তু বাংলাদেশে বেশির ভাগ প্রকাশকই সবরকম ও সবজাতের বই ছাপেন। কিছু কিছু প্রকাশক অবশ্য এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। তাঁরা সক্রিয়ভাবে নতুন কিছু করতে উদ্যোগী। পাঠকদের সামনে তাঁরা নতুন কিছু নতুনভাবে উপস্থিত করতে চাইছেন। প্রকাশনা জগতের ভবিষ্যৎ তাঁদের প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণ নেই।

কি বই ছাপব এবং কার বই ছাপব—এ সম্বন্ধে প্রকাশকের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত। আমাদের জীবনের সর্বত্র নির্বাচনের পদ্ধতি চালু আছে, প্রকাশনা জগতেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন ? হাটে-বাজারে এক জাতের দোকানী আছে যারা যখন যে-সব আনাজপাতি বাজারে ওঠে, সে-সব আনাজপাতি নিয়ে বসে। বিক্রি নিয়ে হল তার কথা। কিন্তু প্রকাশকের ভূমিকাটা ঠিক সে জাতের নয়। এমনকি অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গেও তার মূলে স্থূলেই তফাত। গভীরতর অর্থে মানুষের জীবন ও মনন, বুদ্ধি ও হৃদয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। অতএব, তার গুরু দায়, গুরুতর দায়িত্ব, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কারণ বই ছাপলেই তো হল না—কী বই ছাপলাম, কীভাবে ছাপলাম এবং সবশেষে কতটা সার্থক-ভাবে ও ব্যাপকভাবে পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারলাম, সেটা একটা বড় কথা। এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে প্রকাশক মাত্রেরই দীর্ঘ দিনের মানসিক প্রস্তুতি বিধেয় নয় কি ? প্রকাশককে তো কেবল ব্যবসাদার হলেই চলবে না, তাঁকে সাহিত্যপ্রেমিক হতে হবে, সাহিত্যের সমঝদারও হতে হবে।

গত বিশ-পঁচিশ বছরে (এমনকি ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগের পর বাংলা বইয়ের বাজার বিভক্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও) বাংলা বইয়ের বিক্রি বহুল পরিমাণে বেড়েছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়েছে, সরকারী সাহায্যে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে বই কেনা শুরু হয়েছে, স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে বই কেনার বরাদ্দ প্রবর্তিত হয়েছে, বিবাহ ও অন্যান্য উপলক্ষে বই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে এবং সবশেষে কিছুটা অবস্থাপন্ন পরিবারে ব্যক্তিগত পড়ার জন্যেও গল্প-উপন্যাস কেনা হচ্ছে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বই—তথা সাহিত্য ক্রমেই বেশি বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা পাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে প্রকাশকদের অবস্থা আশানুরূপ উন্নত হয় নি। তার কারণ বাংলা বইয়ের সংকীর্ণ বাজারে এতগুলি প্রকাশক এসে ভিড় করেছেন এবং প্রতি বছর এত বই প্রকাশিত হচ্ছে যে প্রতিযোগিতার ঘূর্ণিঝড়ে অনেক প্রকাশকই দিশা পাচ্ছেন না। আর বেশির ভাগ বই-ই হালকা চটুল গল্প-উপন্যাস—রঙিন মোড়কে ঢাকা। যা পড়েও কোনো লাভ হয় না, না পড়েও কোনো ক্ষতি হয় না। এই জাতের কোনো কোনো বই ছেপে প্রকাশক হয়তো কিছু লাভ করেন, কারো কারো কপালও হয়তো ফিরে যায় কিন্তু পাঠক যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে যান। তিনি গতকাল যে বই পড়েছেন, তার এক বর্ণও তাঁর মনে নেই, না একটি চরিত্রের নাম, না একটি চমক। আজ তিনি যে বই পড়ছেন, একটি দিন আর রাত্রির তরঙ্গভঙ্গে তাও বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে যাবে। সুতরাং সেই আগের কথায় ফিরে আসি—পাঠকের কথা মনে রেখে বই প্রকাশ করতে হবে। এলোমেলো অজস্র বই ছাপলে সংকট বাড়বে বই কমবে না।

বাংলা প্রকাশনা জগতে প্রতিযোগিতা যত তীব্র হয়েছে, চাঞ্চল্য বা হুজুগ সৃষ্টির চেষ্টাও তত প্রবল হয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর আবহাওয়ায় কিছু কিছু বইয়ের কাটতি আশাতীত রকম বেড়ে গেছে সন্দেহ নেই। গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলা বইয়ের বাজারে সাহিত্যের পাল তুলে কয়েকজন লেখক এসেছেন, বইয়ের বাজারে কিছুদিনের জন্যে রাজত্ব করে গেছেন, বিজ্ঞাপনের আতশবাজি জ্বলে উঠেছে, সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে (দু-তিন দিনে একেকটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে এমন জনরবও শোনা গেছে), তারপর হঠাৎ একদিন তিনি বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু এই আবির্ভাব ও বিদায়ের তরঙ্গভঙ্গে দুলে উঠেছে সমস্ত বইয়ের বাজার। এই চলচ্চিত্র সুলভ sensationalism অবশ্য কেবল আমাদের দেশেই নয়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার বইয়ের বাজারেও ঠিক এমনটা ঘটছে। সাহিত্যের স্বাস্থ্যের পক্ষে এ লক্ষণ কতটা সৎ ও শুভ তা ভেবে দেখা দরকার।

প্রকাশকরা ও লেখকরা সংস্করণ-সজাগ হয়েছেন এটা ভালো কথা। একটা বইয়ের বিশটা সংস্করণ প্রকাশিত হোক—এতে সাহিত্যামোদী মাত্রেই আনন্দিত হবেন। কিন্তু এদিকে মজার কথা হল এই যে, একাধিক সংস্করণ

বের করতে না পারলে প্রকাশকের ইজ্জত থাকে না, লেখকেরও না। ফলে পাল্লা দিয়ে অনেকেই ভুয়া সংস্করণ বের করছে। দু-হাজার কপির সংস্করণকে কেউ কেউ দুটো সংস্করণে ভাগ করছেন, কেউ কেউ চারটে। আর এমন প্রকাশকও তো আছেন যিনি এক হাজার কপির একটি সংস্করণকে পাঁচটি সংস্করণে (দুশো কপি করে) ভাগ করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। এর জন্যে প্রকাশককে পুরোপুরি দায়ী করাটা ঠিক হবে না। প্রতিযোগিতা যত তীব্র হবে, প্রকাশও তত প্রবলভাবে বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করতে বাধ্য হবেন। সাহিত্যিকদের মধ্যেও এ প্রতিযোগিতা কম তীব্র নয়। সুনাম এবং অর্থ—উভয়ের অনুপ্রেরণায় অনেকেই তাদের বইয়ের একাধিক সংস্করণ চাইছেন। বইয়ের প্রচ্ছদপট আজকাল অনেক লেখকই দেখে দেন, প্রচ্ছদপটে কটি রঙ ব্যবহৃত হবে তাও বলে দেন। একাধিক সংস্করণ চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, কিন্তু তাতে বইয়ের বাজারের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার।

সম্প্রতি বইয়ের দাম অত্যধিক বাড়ান হয়েছে বা পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি না রেখেই প্রকাশকরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বইয়ের দাম বাড়াচ্ছেন—পাঠকদের তরফ থেকে এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। গত দু-তিন বছরে পুস্তক প্রকাশের ব্যয় সব দিক থেকে কী পরিমাণ বেড়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলে কোনো পাঠকই এ অভিযোগ আনতেন না। বরং প্রকাশের সমস্ত রকম ব্যয় যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে বইয়ের দাম আরও বাড়া উচিত কিন্তু পাছে পাঠকরা ধর্মঘট করেন এই ভয়ে সে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি করতে অনেকেই সাহসী হচ্ছেন না। আসলে বইয়ের মূল্য হ্রাস করতে পারলে যে কোনো প্রকাশকই খুশি হবেন কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়। বইয়ের দাম কমানর একমাত্র পথ হল বইয়ের বিক্রি বাড়া। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। যেদিন একজন প্রকাশক যে কোনো বই তিন থেকে পাঁচ হাজার কপি নির্ভয়ে প্রকাশ করার মতো সাহস অর্জন করবে, সেদিন বইয়ের দাম আপনা থেকে কমে আসবে। এমনকি বহু বইয়ের রীতিমতো সুলভ সংস্করণ বের করাও সম্ভব হবে।

প্রকাশকদের সামনে সাময়িকভাবে যত সংকটই দেখা দিক না কেন, বাংলা বইয়ের বাজারের ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত উজ্জ্বল একথা অনস্বীকার্য। আগামী পাঁচ-দশ বছরে শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রসারিত হবে। নতুন পাঠকের

অক্ষৌহিণী আরও অনেক বেশি বই ও ভালো বইয়ের দাবি নিয়ে প্রকাশকদের সামনে উপস্থিত হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা স্মরণে রেখে প্রকাশকরা এখন থেকেই উদ্যোগী হতে পারেন, অনেকে ইতিমধ্যেই হয়েছেন। বহু প্রকাশকই ভালো ভালো (ভালো অর্থে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিচারে একান্ত প্রয়োজনীয়) বই ছাপার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। বহু প্রাচীন বইয়ের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন নতুন বিষয়বস্তুর ওপর বই লেখানোর আয়োজন চলেছে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, প্রবন্ধ-সাহিত্য—যা এতদিন অবজ্ঞাত ছিল, তা আজ পাঠক ও প্রকাশকদের আনুকূল্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। প্রবন্ধ-সাহিত্য যেদিন নতুন নতুন ডালপালায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, বাংলা প্রকাশনা জগৎ সেদিন এক নতুন চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। তার সমস্ত দীনতা ঘুচবে, দৈন্য অন্তর্হিত হবে। সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে বইয়ের বাজার। ইতিমধ্যে প্রকাশকরা আপন আপন দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হোন। তাঁদের সামনে এই বিরাট ভবিষ্যৎ ও বিশাল ক্ষেত্র এমন সীমাহীন সুযোগ নিয়ে আর কোনোদিন উপস্থিত হয় নি।

মৃত্যুশোক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল এই খাস্তগীরকে নিয়ে। একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না। যতই ওকে বলি, 'আঃ চুপ কর্—কেউ শুনতে পাবে'—ততই আরো বেশি করে কাছে ঘেঁষে আসে। আমার পাঁজরায় একটা করে আঙুলের খোঁচা দেয়, আর বলে, 'সত্যি—এদের সব অন্য রকম—নারে? সব অদ্ভুত—তাই না?'

মুখ ফাঁক না করে যতদূর সম্ভব দাঁত খিঁচোই। ফ্যাসফেসিয়ে যতটা পারা যায় গর্জন করি। 'এরা অদ্ভুত, আর তুই ভূত। চুপ করে থাক, মারধোর খাবি তা নইলে।'

খাস্তগীর অগত্যা চুপ করে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, ভারী অস্বস্তি বোধ করছে। নিজেকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারছে না—কথাগুলো সোডার ফেনার মতো গজগজিয়ে উঠছে ওর পেটের ভেতর।

আমাদের সাহেব মারা গেছেন কাল রাত্রে। আজ একটু পরেই ওঁর শব নিয়ে যাওয়া হবে কেওড়াতলার শ্মশানে। অফিসের আরো অনেকের সঙ্গে আমরা দুজন এসেছি। শবযাত্রায় যোগ দেব।

কিন্তু খাস্তগীর সব গোলমাল করে দিচ্ছে। ক্রমাগত বিস্মিত হচ্ছে আর সেই বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে আমাকেই।

সাহেব অর্থে বাঙালী সাহেব। চীফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। রিটায়ার করার পরে নতুন করে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের অফিসে। ষাটের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন—কিন্তু দিব্যি স্বাস্থ্য ছিল। মাথার এক গাছা চুল পর্যন্ত পাকেনি। কালকেও পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করেছিলেন। তারপর বাড়ি ফিরেই কী যে হল—

সেই করোনারি থ্রম্বসিস। বেশ কায়দা হয়েছে একটা। বড় বড় লোক—দেশজোড়া নাম—দুম করে শেষ হয়ে গেলেন। খবরের কাগজগুলো জীবনী যোগাড় করার সময়টুকু পায় না—এমনি অবস্থা। কপাল ভালো

ওঁদের—এতটুকু ভুগতে হয় না। আর খাস্তগীর—হাঁপানির রোগী। কবে থেকে ভুগছে নিজেই মনে করতে পারে না বোধহয়। শুকনোর সময়টা যা হোক এক রকম থাকে, এক পশলা জল পড়ল তো আর কথা নেই। বুকের ভেতর থেকে থেমে-থাকা এঞ্জিনের মতো শাঁ শাঁ করে আওয়াজ বেরুতে থাকে। নিঃশ্বাসে একটা অদ্ভুত জান্তব গন্ধ ছড়ায়। এই মুহূর্তেই সেই গন্ধটা আমি পাচ্ছি আর খাস্তগীরের একটানা বকবকানি আরো বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। একটু আগেই দোতলার ঘর থেকে শব দেহ দেখে আমরা দুজনে নিচে নেমে এসেছি। আর সেই যে দারুণ রকম আশ্চর্য হয়েছে খাস্তগীর—তার জের আর কিছুতেই মেটাতে পারছে না লোকটা।

থাকে শ্যামপুকুর অঞ্চলের এক এঁদো গলিতে—যাকে ইংরেজিতে গম্ভীর-ভাবে বলা যায় সিউয়ার্ড ডিচ্। দেড়খানা নোনা-ধরা নিত্য অন্ধকার ঘরে ইঁদুর-ছুঁচো-আরসোলার সঙ্গে তার রাজ্যপাট। সেজন্যে খাস্তগীরের ভাবনা নেই। মরলে ওকে কাঁধে করে ওখান থেকে বের করা যাবে না, পায়ে দড়ি বেঁধে মরা কুকুরের মতো হেঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে আসতে হবে। ওঁর দুঃখটা সেই জন্যেই।

বিরক্ত হয়ে বলি, একদিন সময় বুঝে কোনো বড়লোকের দোরগোড়াতে এসে সুইসাইড করিস—তা হলে সেখান থেকেই তোকে কাঁধে তুলব আমরা। ইচ্ছে করলে হাসপাতালেও মরতে পারিস—অবশ্য যদি সীট পাস।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। দুটো ঘোলাটে চোখ মেলে দেখতে থাকে সামনের একটা চকচকে মোটরের গায়ে নিজের অস্বাভাবিক ছায়াটাকে। আমিও ওর ছায়া দেখি। মাথাটা কিম্ভুতকিমাকার চওড়া দেখায়—কান দুটোকে বটের পাতার মতো বড়ো বড়ো মনে হয়। নিজের বিকৃত ছায়া দেখবার ভয়ে আমি দু পা পেছিয়ে আসি—সিগারেটের জন্য পকেট হাতড়াই, পাই না।

খাস্তগীর বলে, 'এ সব মরণ দেখলেও সুখ আছে—না রে?'

'হুঁ।'

শুধু খাস্তগীর নয়, আমিও ভাবছি। এই তো একটু আগেই আমরা দোতলার ঘর থেকে নেমে এসেছি। দেখে এসেছি মৃত্যুকে কত সুন্দর—কত আর্টিস্টিক করে তোলা যায়। হলঘরের মোজেইক করা মেঝেতে দামী ইংলিশ খাটে শুইয়ে রাখা হয়েছে মৃতদেহ। গালে কপালে চন্দনের তিলক

পরানো। পা থেকে বুক পর্যন্ত রাশি রাশি ফুল—কত টাকার ফুল কে জানে! ঘর ভর্তি লোক—অথচ কেউ একটি কথা কইছে না, একটি নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না কারো। দুটো শ্বেত পাথরের ধূপ-দানিতে সারি সারি ধূপকাঠি জ্বলছে, আর মৃতের মুখের কাছে বসে মৃদু গলায় একটি সুন্দরী মেয়ে অপরূপ করুণ মধুর গলায় গেয়ে চলেছে :

"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক—"

মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, চোখে প্রায় জল এসে যাচ্ছে—হঠাৎ পাঁজরে একটা খোঁচা আর দুর্গন্ধ নিশ্বাসের খানিকটা ঝলক। খাস্তগীর। খোঁচাটা পূর্বাভাস। অর্থাৎ এরপরেই খাস্তগীর একটা কিছু বলে ফেলবে। রুক্ষ খরখরে গলায়—বাঙালে টানে। হয়তো বলে বসবে : 'এরা বেশ আরাম করে মারা যায়—না?' সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর সুর কেটে যাবে। আর ঘর শুদ্ধ শোকগম্ভীর লোক যে দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাবে—

সম্ভাবনাটা অঙ্কুরেই উপড়ে ফেলি। চট করে হাতটা চেপে ধরি ওর—যতটা পারা যায় শোভনতা বাঁচিয়ে বাইরে টেনে আনি ওকে। আর একটু দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল, গানটাও চমৎকার লাগছিল, কিন্তু!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনি সেই মধুর করুণ গলা বেজে চলেছে :

"মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক—"

আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এমনিভাবে মরতে পারলেই অমৃতলোকে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে তা নেই। ভাড়াটে বাড়ির নোংরা ঘরে যমদূত আমাদের জন্যে কাছি নিয়ে অপেক্ষা করবে, হিড়হিড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে কুম্ভীপাক নরকে। খাস্তগীরকে টেনে একেবারে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসি। উলটো দিকে পার্ক—নিয়ে আসি সেই ফুটপাথে। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—পার্কের সার বাঁধা ইউক্যালিপ্‌টাস্ ঝিরঝির শব্দ তুলছে মাথার ওপর। কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল—বাতাসে এখনো তার ঠাণ্ডা ছোঁয়া—সে বাতাসে আমি যেন ধূপের গন্ধটা পাচ্ছি। শুধু ঘরেই নয়—বাইরের আকাশে বাতাসেও সেই সুরভিত মৃত্যুর ছোঁয়া। খাস্তগীর একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকোয়। ওর বিকৃত মুখটার দিকে তাকিয়ে রাগ হয়ে যায় আমার।

'খোঁচাচ্ছিলি কেন তখন ?'

'তোকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম মেয়েটা কে। ওই যে গান গাইছিল ?'

কী বদরুচি লোকটার। শোক করতে এসেছে, তবু সুন্দরী মেয়ের দিকে ঠিক চোখ পড়েছে গিয়ে! এদের কখনো আনতে হয় ভদ্রসমাজে? আনা উচিত ?' দাঁত খিঁচিয়ে বলি, 'কী করে জানব! সে খোঁজ নিতে তো আসিনি।'

'তা বটে—তা বটে।'—খাস্তগীর অপ্রতিভ হয়: 'সে কথা ভেবে বলিনি। কিন্তু মেয়েটা দেখতে বেশ, গানও গায় খাসা। সাহেবের মেয়ে বোধ হয়।'

'হতে পারে।'

'আচ্ছা, সাহেবের ছেলের বৌ না তো ? শুনেছিলুম রেডিয়োতে গানটান করেন।'

'জানি না।'

কিন্তু খাস্তগীরের সমস্যা মেটে না। দেশলাইয়ের কাঠিটা দিয়ে এবার আর একটা কান চুলকোতে থাকে। তারপর বলে, 'কিন্তু ছেলের বৌ হলে তো সিঁদুর পরত। নাকি সিঁদুরটিঁদুর পরার রেওয়াজ নেই এদের ভেতর ?'

এমনা বর্বর কখনো দেখেছে কেউ ? আমার আর ধৈর্য থাকে না।

'আচ্ছা খাস্তগীর, তুই না বি-এ পাশ করেছিলি ?'

'করেছিলুম একদা। কিন্তু ইকনমিক্সের পেপারে একটু টুকতে হয়েছিল। অল্পের জন্যে ধরতে পারে নি।'

'শাট্ আপ। হাজার হোক—তুই শিক্ষিত লোক। একটা রুচি নেই ?'

খাস্তগীর খ্যা-খ্যা করে হাসে। আমি চমকে চারদিকে তাকাই—কেউ লক্ষ্য করছে কি না। চাপা গলায় শাসন করে বলি, 'এই কী হচ্ছে! হাসিস কেন ? থাম—থাম—'

খাস্তগীর থামে। একটু গম্ভীর হয়। বলে: 'হাসালি তো তুই। একশো আটষট্টি টাকা মাইনে পাই, চারটে ছেলেমেয়ে, বৌ, মা। ঘাড়ে আরো দুটো আইবুড়ো বোন—একজনের পঁচিশ, আর একজন ত্রিশ ধরো ধরো। শিক্ষা—রুচি! হেঃ! ইয়ার্কিরও একটা মাত্রা আছে।'

আমার অবস্থাও যে খুব ভালো তা নয়। খাস্তগীরের কথাটা পুরো অস্বীকার করতে পারি না। তবু—

'একটা স্থান-কাল তো আছে।'

'রেখে দে।'—খাস্তগীরের দেশলাইয়ের কাঠিটা আবার কান বদলায়। আরো বিশ্রী দেখায় মুখটা।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। মাথার ওপর ইউক্যালিপ্টাসের পাতা কাঁপে। মা-র মৃত্যুর ছবিটা মনে পড়ে। দু দিনের জ্বরে মারা গেলেন কাশীর সেই নোংরা ধর্মশালাটায়। চারদিক অপরিচ্ছন্নতায় ভরা—একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়ানো, হলদে রঙের দুটো পায়ের পাতা বাইরে বেরিয়ে আছে। তীর্থ দর্শন করাত নিয়ে গিয়ে এই বিপত্তি। সঙ্গে একা আমি। শোকের চাইতেও তখন বড়ো সমস্যা—কোথা থেকে কী করি। ধর্মশালায় আমরা ছাড়া সব অবাঙালী—সবাই অচেনা।

তবু তারাই এগিয়ে এল। খুব সাহায্য করেছিল দুটি বিহারী মজুর, একজন মারাঠী ভদ্রলোকও কাঁধ দিয়েছিলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে চিতার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল—মা যা চেয়েছেন, তাই পেলেন। কালভৈরব এসে কানে তারকব্রহ্ম মন্ত্র দিয়েছেন—কাশীপ্রাপ্তি হয়েছে মার।

কিন্তু মা-র মৃত্যুর মহিমাটা চোখের সামনে থেকে ফিকে হয়ে গেছে এখন। সেই ধর্মশালার ঘরটা। শালপাতা উড়ছে—একজায়গায় শুকিয়ে আছে খানিকটা ডাল রুটি। মা-র মাথার কাছে থুথু ফেলবার সরাটা কাত হয়ে গেছে। মা-র মুখের ওপর থেকে আমি মাছিগুলোকে তাড়াতে চেষ্টা করছি। কে একজন বাইরে অশ্রাব্য ভাষায় বাঁদরদের উদ্দেশ্যে গালাগালি করছে—খুব সম্ভব বাঁদরে তার কিছু খাদ্যদ্রব্য রাহাজানি করে নিয়ে গেছে।

কাশীপ্রাপ্তি! কে জানে। কিন্তু এখানে মোজেইক-করা মেজের ওপর ইংলিশ খাট। কত টাকার ফুল এসেছে বলতে পারি না—হয়তো আমার একমাসের মাইনের টাকাতেও কুলোবে না। ধূপ, চন্দন আর ফুলের গন্ধে চারদিক আচ্ছন্ন। আর সেই আশ্চর্য গলায় আশ্চর্য গান: "দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে—"

চমকে উঠি। আবার পাঁজরায় আঙুলের খোঁচা দিয়েছে খাস্তগীর।

'এই'—

'বল, কী বলবি।"

'আচ্ছা, কেউ মারা গেলে এরা কী করে গান গায় বল দিকি?'

'কেন—দোষ আছে কিছু?'

'না, ঠিক দোষ নয়।'—কিছুক্ষণ 'ইয়ে-ইয়ে' করে খাস্তগীর : 'মানে—আমি বুঝতে পারছি না।'

'অনেক কিছুই বুঝতে পারবি না তুই। বাজে বকিসনি।'

'চটছিস কেন ?'—খাস্তগীর ক্ষুব্ধ হয় : 'এখন তো বাড়ির ভেতরে নেই—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। দুটো মনের কথাও বলতে দিবিনে ?'

'নাঃ, তুই ইন্‌করিজিবল। কী বলবি—বলে যা।'

'এমন কিছু না'—খাস্তগীরকে চিন্তিত মনে হয় : 'আমি বলছিলুম, মানুষ মরলে তো সাধারণত কান্না-টান্না পায় আত্মীয়স্বজনের। তখন কি গলায় এমনভাবে গান আসে ? বেশ বিশুদ্ধ স্বরে, লয়ে ? আর বাড়ির লোকের তা শুনতে খুব ভালো লাগে ? বিরক্তি বোধ হয় না ?'

'সবাই তোর মতো ক্রুড্ নয়।'—গম্ভীর হয়ে জানিয়ে দিই : 'মৃত্যুকেও আর্টে পরিণত করা যায়। তার জন্যে শিক্ষা চাই, রুচি দরকার।'

'টাকাও কম দরকার নয়। বাপরে—কত ফুল! আর ধূপকাঠিগুলোই বা কোত্থেকে আনল ? খাসা গন্ধ।'

'হুঁ।'

আবার দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। সামনের চকচকে কালো মোটরটার গায়ে খাস্তগীরের বিকৃত ছায়াটা স্থির। মুখ অবিশ্বাস্য রকমের চ্যাপটা—নাক থ্যাবড়া, কান দুটোকে গাধার কানের মতো লাগে। নিজের একটা ওই রকম বিকট প্রতিচ্ছায়া দেখবার ভয়ে আবার দু পা পিছিয়ে আসি আমি। এই সব মোটরে যারা চাপে—তাদের গাড়ির সামনে আমরা আচমকা এসে পড়লে তারা অমন করে তাকায় কেন—তার অর্থটা বুঝতে পারি যেন। স্থান-মাহাত্ম্য !

আবার মুখ খোলে খাস্তগীর। 'জানিস আমার বাবার মৃত্যুর কথাটা মনে পড়ছে।'

পড়বে। পড়াই স্বাভাবিক। একটু আগেই আমিও কাশীর ধর্মশালার কথা ভাবছিলুম। জবাব দিই না—কী বলে সেইটে শোনবার জন্যে চোখ তুলে তাকাই।

'আমাদের সেই অজ পাড়া গাঁ। তার ওপর দুদিন ধরে বৃষ্টি চলছে তো চলছেই। ডাক্তারখানা নদীর ওপারে—বৃষ্টি বাদলার জন্যে খেয়া বন্ধ। শেষে গ্রামের কবরেজকে ডাকতে হল। সে এসে কী একটা বড়ি খাওয়ালে খলে

মেড়ে—ব্যস—তার একটু পরেই শেষ। বিষবড়িই খাইয়েছিল কিনা কে বলবে।’

একটু চুপ করে থাস্তগীর। সামনের একটা বাড়ির তেতলার রেলিঙে নীল শাড়ি শুকোচ্ছে—মিনিট তুই একভাবে সেইটেকে দেখে। আবার আরম্ভ করে।

‘আমার বয়েস তখন কত আর? বছর বারোর বেশি নয়। পিসিমা সন্ধে-সন্ধি চালে-ডালে খানিক খিঁচুড়ি খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছিলেন। বাড়িতে ডাকাত-পড়া কান্নার আওয়াজে ঘুম ভাঙল। তারপর কে যেন হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল বারান্দায়। দেখি একটা ছেঁড়া মাতুরে বাবাকে শুইয়ে রেখেছে। পায়ের কাছে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে দাপিয়ে দাপিয়ে কাঁদছে মা—রুক্ষ চুলগুলো গালের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে চোখের জলে। আর সেই জলের সঙ্গে সিঁথি-কপালে সিঁতুর মিশে বাবার পা যেন রক্তে মাখানো।’

আর একবার দম নেয় থাস্তগীর: ‘সারা রাত সে কি কান্নার হুল্লোড়! ভোর না হতে বাঁশ কাটার আওয়াজ। উঃ—শব্দগুলো কানে বিঁধে আছে এখনো। আজও কোথাও কেউ বাঁশ কাটলে বুকের ভেতর আমার চমকে ওঠে। তারপরে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া। নুড়ো জেলে মুখাগ্নি করেছিলুম। ওদিকে চিতার ভিজে কাঠ জ্বলতে চায় না—পুড়তে পুড়তে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সারাদিন না খেয়ে শ্মশানের টিনের চালির নিচে বসে আছি। স্নান করে বাড়ি ফেরবার পরে আবার সেই ডাকাত-পড়া কান্না!’

আমি শুনতে থাকি। ‘সত্যি বলতে কি—এখানে এসে চোখ সার্থক হল। আহা—কী শান্ত, কত শান্তি! ফুল দিয়ে কী চমৎকার সাজিয়েছে—কত দামী ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কী সুন্দর গান গাইছে! হাঁ রে, আমি যখন মরব—’

আরো কী বলতে গিয়ে থেমে যায়। একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে বাড়িতে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে লোকজন। আমরা নড়ে-চড়ে উঠি। শবযাত্রা আরম্ভ হবে এবার।

আট-দশজন মানুষের কাঁধে বেরিয়ে আসে ইংলিশ খাট। একটু শব্দ নেই—একটা কথা নেই। কয়েকজন গিয়ে নিঃশব্দে মোটরে ওঠেন। এক ভদ্রমহিলাকে বলতে শুনি: ‘কী পীসফুল মুখের চেহারা—যেন ঘুমোচ্ছেন।’

সামনের সেই বড়ো কালো মোটরটা স্টার্ট দেয়। সরে আসি আমরা—

শবযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকি। অফিসের বড়কর্তা আর সিনিয়ারদের সঙ্গে ভদ্ররকম দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকি দুজনে। আমি আর খাস্তগীর।

কিন্তু খানিক দূর এসেই আবার বিস্মিত হয় খাস্তগীর। আঙুলের খোঁচা লাগায় আমার পাঁজরাতে : 'কি রে, একবারও হরিধ্বনি দিচ্ছে না তো!'

আঃ—এই বুনোটাকে নিয়ে কিছুতেই পারা যায় না! দাঁতে দাঁতে চেপে বলি, 'চুপ—চুপ!'

ওদিকে মহাসমারোহে আয়োজন চলছে। আমাদের কোনো কাজ নেই। দুজনে এসে ঘাটের বাঁধানো জায়গায় বসে পড়ি। সিঁড়ির তলায় অনেকখানি জুড়ে কাদা। ভাঁটার টানে মন্থর পঙ্কিল স্রোত আদি গঙ্গার। বাতাসে ধূপ-চন্দনের সুরভি আর নেই, মড়া-পোড়ানোর তপ্ত বিষাক্ত গন্ধে চারদিক আবিল।

কাঠকয়লায় লেখা মৃতের নামাবলীর ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলোয় খাস্তগীর। তারপর গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। কী যেন ভাবে। তারও পরে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

'না রে, সুবিধে হবে না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকাই ওর দিকে। 'কী সুবিধে হবে না?'

'গান শুনতে শুনতে মরা। কিংবা মরে গিয়ে গান শোনা। বৌ ছেলেমেয়ে ডুকরে ডুকরে না কাঁদলে আমি কিছুতেই মরতে পারব না।'—খাস্তগীর বড়ো করে একটা দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস ফেলে : 'এরা বোধ হয় কেউ কারো জন্যে কষ্ট পায় না। এদের চাইতে আমার এঁদো গলির বৌটাই ভালো রে—সে গান গাইতে জানে না।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি থেমে যাই। মড়াপোড়ানোর গন্ধমাখা তপ্ত হাওয়ায় খাস্তগীরের রগের পাশে কয়েকটা সাদা চুল অল্প অল্প কাঁপতে থাকে। আর এবার সত্যি সত্যিই খাস্তগীরকে ভারী গম্ভীর আর গভীর বলে মনে হয়।

সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য : নতুন প্রবণতা

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের ঝোঁক এক দিকে নয়। বহু প্রবণতার আবর্ত সেখানে। তবু একটিমাত্র প্রবণতাকে এখানে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বিশেষ কারণে। প্রথম কারণ, সম্পাদক-নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত পরিসর; দ্বিতীয় কারণ, তরুণ কথাকারদের একটা বিরাট অংশ এই প্রবণতার পথে অগ্রসর; তৃতীয় কারণ, এই প্রবণতা একটি সংগঠিত আন্দোলনের আকার নিচ্ছে। অর্থাৎ প্রবণতাটির গুরুত্ব ইদানীংকালে বেড়েছে।

এই নতুন প্রবণতা চেতনা-প্রবাহ ভিত্তিক রচনারীতির। গল্পের বহির্ঘটনা এখানে গৌণ বা অবান্তর। বাইরের ঘটনা চেতনায় যেভাবে বিধৃত, তাকে প্রতিভাত করা এর উদ্দেশ্য। এই লেখায় একটি মুহূর্তের চূড়ায় সমগ্র জীবনের আলোক সংহত, গোষ্পদে বিম্বিত পূর্ণ আকাশ, সংক্ষিপ্ত খণ্ডিত কাল ধারাবাহিকতার উত্তরাধিকারে ঐশ্বর্যবান। মোটা দাগের facts of life নয়। চেতন-অবচেতনের impression of life এর উপজীব্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার অনুসারে কাহিনী logical structure ছেড়ে associative structure গ্রহণ করছে।

এই রীতির সৃষ্টি স্বাক্ষর ইদানীংকালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কিছু ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এই ছড়ানো-ছেটানো প্রয়াস এখন একটা সংগঠিত চিন্তা-চর্চায় সংহত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এই রীতির সপক্ষে প্রবন্ধ লিখিত হচ্ছে, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে নতুন পত্রিকা বার হচ্ছে। সুতরাং এখন বিনীতভাবেই এই রীতির 'নূতনত্ব' সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়—এই রীতি কি সত্যিই নতুন? দেখা যাক, ইতিহাস এর কি সাক্ষ্য দেয়।

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রীতির পত্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন হেন্‌রী জেম্‌স্ তাঁর partial portraits প্রকাশ করেন। এর আগেও টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কির লেখায় বিক্ষিপ্তভাবে এর অঙ্কুর প্রকীর্ণ ছিল। আনা কারেনিনার জীবনের চরম মুহূর্তটি বা অপরাধ স্বীকারের সিদ্ধান্ত নেবার

পূর্ব মুহূর্তে রাসকল্‌নিকফ্‌-এর চেতনাপ্রবাহ এর উদাহরণ। কিন্তু গবেষক-নিরীক্ষ্য সেই ক্ষুদ-কুঁড়োকে বাদ দিলেও হেনরী জেমস থেকে এর যে স্পষ্ট সচেতন ধারাটিকে পাচ্ছি তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই স্মর্তব্য যে stream of consciousness কথাটির আবিষ্কর্তা হচ্ছেন ঔপন্যাসিক হেনরী জেমসের ভাই দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেম্‌স্‌। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন (Mind-এর জানুয়ারী সংখ্যার একটি প্রবন্ধে) এবং পরে তাঁর The Principles of Psychology (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থের মাধ্যমে বিষয়টি জনপ্রিয় হয়। তাঁর মত অনুসারে "Consciousness, then, does not appear to itself chopped up in bits……It is nothing joined, it flows. A 'river' or a 'stream' is the metaphor by which it is most naturally described. In talking of it, let us call it the stream of thought, of consciousness or of subjective life."

বিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন হেনরী জেম্‌স্‌ এবং তিনি পূর্বতন ঔপন্যাসিক ওয়েল্‌স্‌, বেনেট, গল্‌স্‌ওয়ার্দী প্রমুখের বাস্তব রীতির বিরুদ্ধতা করেন। এঁদের গল্পের 'tight rotundity'-তে জেম্‌স্‌ বিশ্বাস করতেন না। তিনি চরিত্রের বাইরের দিক নয়, ভেতরের দিক দেখতে চাইতেন। বিষয়ের পরিপার্শ্ব নয়, বিষয়ের কেন্দ্র তাঁর উপজীব্য।

এই নিয়েই এইচ্‌. জি. ওয়েল্‌স্‌ ও হেনরী জেমসের মধ্যে সুবিখ্যাত এক সাহিত্যিক-বিতর্ক হয়েছিল।

হেনরী জেমসের 'The Ambassadors' পড়ে ডরথী রিচার্ডসনের মনে হল তিনি 'the first completely satisfying way of writing a novel' খুঁজে পেয়েছেন। কার্যক্ষেত্রে তাঁর 'pointed roofs' (১৯১৫) গ্রন্থে তিনি এর প্রয়োগও করেন। ডরথী রিচার্ডসনের এই রীতির বিশ্লেষণে মে সিনক্লেয়ার সমালোচনা-ক্ষেত্রে 'stream of consciousness' কথাটির প্রয়োগ করেন।

এ ছাড়াও সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন জেম্‌স্‌ জয়েস্‌, যোসেফ কনরাড, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, ফরাসী দেশে প্রুস্ত—সকলেই নূতন রীতিনিষ্ঠ। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ পূর্বতন লেখক আর্নল্ড বেনেটের রীতিতে অনুভব করেছেন, 'a strange feel-

ing of incompleteness and dissatisfaction'. সম্পূর্ণতার সন্ধানে তিনি নূতন রীতিতে এসে পৌঁছলেন।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সেই নাটকীয় উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'On or about december 1910 human character changed.'

আসলে মানবচরিত্র তো পালটায় নি। পালটেছিল মানবচরিত্র বর্ণনার পদ্ধতি। সময়টা ১৯১০। সাহিত্যিক প্রয়াসে দানা বাঁধবার সূচনা ছাড়াও এই কাল-চিহ্নের আর একটি কারণ আছে। ১৯১০-এর ডিসেম্বরে লণ্ডনের গ্রাফ্‌টন্ গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত Post Impressionist Exhibition-এ ভ্যান্ গগ্, গগাঁ, মাতিস, পিকাসো, সিজান প্রভৃতির ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এই চিত্র-প্রদর্শনীটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। Post-impressionism কথাটার উদ্ভবও এই উপলক্ষে। সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'post-impressionism'-এর চমৎকার ব্যাখ্যা করে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ তাঁর 'Mr. Bennet and Mrs. Brown' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

বাংলাদেশেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'-কে এই রীতির প্রাথমিক পূর্বাভাস বলতে পারি। টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কির মত বঙ্কিম-রবীন্দ্রকে যদি গবেষক-নিরীক্ষ্য বলে বাদও রাখি, তাহলেও অদূর অতীতের বুদ্ধদেব বসু, গোপাপ হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতির প্রচেষ্টাকে বিস্মৃত হবার কোনো কারণ নেই।

অবশ্যই এঁদের পরীক্ষা গল্পের ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা উপন্যাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু কাহিনী মুখ্য রচনার ক্ষেত্রে গল্প ও উপন্যাসের পার্থক্য যত স্পষ্ট, চেতনামুখ্য রচনার ক্ষেত্রে তা নয়। যেখানে মুহূর্তের চেতনাদর্পণে চিরন্তন উদ্ভাসিত, সেখানে গল্প ও উপন্যাসের মৌলিক সীমারেখা অস্বীকৃত।

যাই হোক, এই টেকনিকের সপক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি আছে তা বিশ্লেষণ করলে এর সুবিধা-অসুবিধা দুটোই নজরে পড়বে।

এ টেকনিকে চরিত্রকে শুধুমাত্র বাইরে থেকে নয়, অনেকখানি ভেতর থেকে দেখায়। কিন্তু লেখক যদি অন্তত কিছুটা অবজেকটিভ বিবরণ দেন তবে পাঠকও সেই বিবরণকে কিছুটা স্বাধীনভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারে। এ টেকনিকে তার সুযোগ নেই। বিশেষ চরিত্রের সূক্ষ্ম বাস্তবতাকে ধরবার

জন্য এ আঙ্গিক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে লেখকের সব্জেক্টিভ্ চিন্তা চরিত্রের ওপর এসে পড়ে। যেখানে লেখক-মন ও চরিত্র-মন এক ধরনের, সেখানে এর সাফল্য সহজ। যেখানে এক ধরনের নয়, সেখানে লেখকের সঙ্গে লেখকের চরিত্রের সংঘর্ষ ঘটার আশঙ্কা আছে। এই সংঘর্ষকে এড়াবার প্রয়াসে এক ধরনের চরিত্রের (লেখক-মানসের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন চরিত্রের) পুনরাবৃত্তি ঘটে ও একঘেয়েমির সৃষ্টি করে।

একটা বিশেষ ধরনের human interest এ-টেকনিকে যেমন বাড়ে তেমনি ব্যাপক ধরনের একটা human interest কমে। এ টেকনিক একটা মনের বেশ গভীরে পাঠককে নামায়, সেই মানসিক আবহাওয়ার বাইরে নূতন বাতাসে তার নিঃশ্বাস নেওয়া আর সম্ভব নয়। এ টেকনিক একটা খাতে প্রবাহিত, এবং হয়তো কিছুটা সংকীর্ণ। এ টেকনিকে ডুবুরীর মত একটা গভীরে নামা যায়, মনের তলদেশ থেকে কিছু মণিমুক্তোও সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু সংকীর্ণতা ও বৈচিত্র্যহীনতায় সে-অবতরণ অনেক সময় শ্বাসরোধী, একঘেয়ে। (বাংলা দেশে কারও কারও আত্মরতি এর মধ্যেই বেশ মর্বিড স্তরে এসেছে।)

কোনো কোনো উপন্যাস এ টেকনিকে ভালই বিধৃত হবে। আবার অনেক ধরনকে এতে ধরা দুরূহ, ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো অসম্ভব। লিরিক ঘেঁষা উপন্যাস এ টেকনিকে খুব ভাল আসবে। কিন্তু এপিক-জাতীয় উপন্যাস এই টেকনিকে লেখা সম্ভব কিনা সন্দেহ। এরেনবুর্গের পারীর পতন, বা ঝড়, তারাশঙ্করের গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, সমরেশ বসুর জগদ্দল, অমিয়ভূষণ মজুমদারের গড় শ্রীখণ্ড, সাবিত্রী রায়ের পাকা ধানের গান এই টেকনিকে লেখা যেত বলে মনে হয় না।

চিরাচরিত কাহিনীমুখ্য টেকনিকের light rotundity-কে হেনরী জেম্স্ প্রভৃতিরা বলেছেন কৃত্রিম, কারণ অমন নিটোল বৃত্তে কোনো ঘটনা বাস্তবে ঘটে না। চেতনাপ্রবাহের টেকনিকও কিন্তু আসলে কৃত্রিম, অতি-সচেতন সৃষ্টি। চেতনাপ্রবাহকে তার স্বভাবধারায় পুরোপুরি মুক্তি দিলে ফ্রি অ্যাসোসিয়েশনের একটা স্বাক্ষর পাওয়া যেত, তাতে মনোবিজ্ঞানীর মনোবিশ্লেষণে সুবিধা হত, আর্টের আনন্দ থাকত না। আর্ট মানেই সূক্ষ্ম অর্থে আর্টিফিসিয়াল।

চেতনাপ্রবাহী টেকনিকের মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে লেখকদের একটা আত্মকেন্দ্রিকতার চিহ্ন থাকে। আর এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে এই রীতির

চর্চায় বাম-দক্ষিণ শ্রেণীভেদ বলবৎ নয়। যাই হোক, এই অতিরিক্ত আত্মপ্রীতি কি বহুক্ষেত্রে বাম-বাঞ্ছিত জনপ্রীতির কিঞ্চিৎ বিরোধী নয়? বহুক্ষেত্রে জীবনধনশূন্য (বা স্বল্প) রীতিকুন্তের উচ্চধ্বনি কি একটু শ্রুতিকটু নয়?

এ লেখা যে পাঠকের কাছে দুরূহ তা এ রীতির প্রবক্তারাও স্বীকার করেন। তাঁদের বক্তব্য, রীতির নতুনত্ব, এর দুরূহতার কারণ। তাছাড়া জটিলতাকে সামান্য সূত্রে ধরার প্রচেষ্টায় লেখা দুরূহ হয়। অতএব লেখকদের দোষ নেই। পাঠকের কাছে তাঁদের দাবি কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ও শ্রম। তাহলে তাঁরা বুঝবেন যে এ রীতির লেখকরা জীবনজিজ্ঞাসু, সমাজ-জিজ্ঞাসু।

জটিলতাকে সামান্য সূত্রে ধরে প্রকাশ করবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁদের সূত্র কি সত্যিই সামান্য? বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রম এ গল্প বোঝার পূর্বশর্ত। ভাল কথা। বুদ্ধি ও শ্রম পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু এই অজুহাতকে অবলম্বন করে লেখকরা খুব অল্প পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন কি না একথাটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আর বুদ্ধি ও শ্রম সফল হলে পাঠক তো সেইখানে পৌঁছচ্ছে, যেখানে বুঝতে পারছে যে লেখক জীবনজিজ্ঞাসু। বড় জায়গায় পৌঁছচ্ছে সন্দেহ নেই, এর সঙ্গে পাঠক যে রসলোকে আনন্দলোকেও পৌঁছতে চায়, তার সে-চাহিদা পুরো মিটছে কিনা সেটাও লেখকদের ভাববার কথা, সব লেখকদের ভাববার ব্যাপার, তবে বাম-লেখকদের বোধ হয় আরো বেশী। কারণ, জনশ্রুতি, সহজবোধ্যতা বাম-বাঞ্ছিত, জনমনে আনন্দদান বামকাম্য।

এই আলোচনার উপসংহারে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—ভবিষ্যতের কথাসাহিত্য কোন্ টেক্‌নিক্ অবলম্বন করবে?

এর সঠিক উত্তর অবশ্য একমাত্র ভবিষ্যৎই দিতে পারে। আমরা বর্তমানের কূলে দাঁড়িয়ে শুধু অনুমানই মাত্র করতে পারি।

প্রথমত, একদল লেখকের সংগঠিত আন্দোলনের অবলম্বন যখন চেতনা-প্রবাহ-পদ্ধতি, তখন এ রীতির চর্চা কিছুকাল বিশেষভাবে থাকবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত, চিরাচরিত সাদামাটা পদ্ধতি একেবারে বর্জিত হবে না। তার চর্চাও বহাল থাকবে।

তৃতীয়ত, আর এক দল লেখকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কাহিনীর দাবি ও লেখকের মানসিক প্রবণতা অনুসারে দুই বিপরীত প্রথার মধ্যে প্রয়োজন মত কিছুটা সামঞ্জস্য ঘটিয়ে নেবে। এ সামঞ্জস্য নানা ক্ষেত্রে নানা রকমের ঘটবে। অর্থাৎ এরা উভয় রীতির কাছ থেকে সাহায্য নেবে, আর দুই বিপরীত পন্থার অসুবিধাগুলো যথাসম্ভব পরিহার করে সুবিধাগুলোকে গ্রহণ করবে।

বস্তুত, এই তিন রীতির চর্চাই বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে বর্তমানে বলবৎ।

পরিশেষে বক্তব্য, বিশেষ ব্যক্তি বা রীতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতা (তথা বিভিন্ন প্রবণতা) সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতই এর উদ্দেশ্য।

২৯শ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮২ ; ১৩৬৭ ॥ ১১শ সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।
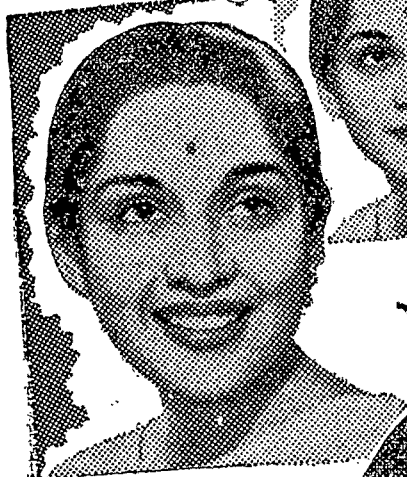
দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাড্‌ল' বলে
একটি বিশেষ ধরনের তেল মেশানো
হয়, যাতে ত্বক আরও কোমল,
আরও সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়··!
সুবাস ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ
রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন !
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী।
RP. 164-50 BG
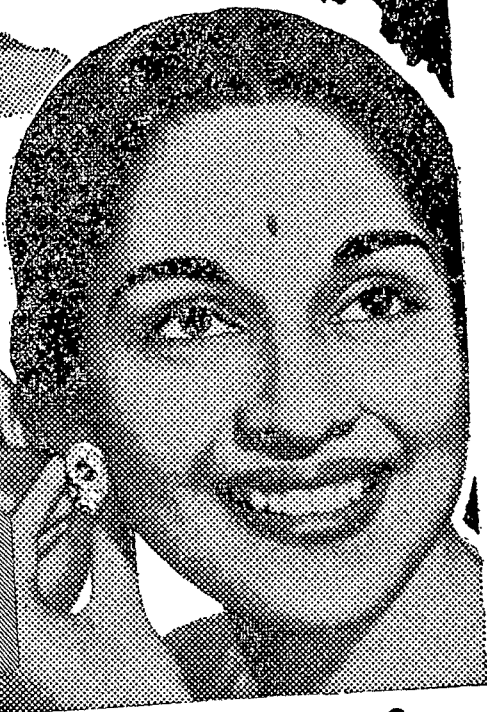
২৯ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৮৮২ ; ১৩৬৭

চীনা অর্থনীতি : বাস্তব বনাম প্রচার

রণজিৎ দাশগুপ্ত

'চীনা অর্থনীতি গভীর সংকটগ্রস্ত'—মাত্র কয়েক মাস আগে একটি সোরগোল পশ্চিমী দেশগুলিতে ও সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও যথেষ্ট পরিমাণে উঠেছিল। কিন্তু এর রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ১৯৫৯ সালে চীনা অর্থনীতির সাফল্য সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে (Peking Review, January 26, 1960, p. 9-13)। গত ২২শে জানুয়ারী এই চীনা সংবাদ-বিবরণী অনুযায়ী মাত্র এক বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের তুলনায় গত বৎসরে মোট (gross) শিল্প-উৎপাদন, মোট কৃষি-উৎপাদন ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার যথাক্রমে শতকরা ৩৯'৩, শতকরা ১৬'৭ ও শতকরা ২১'৬ ভাগ। ১৯৫৮ সালের 'লম্বা লাফের অগ্রগতি' (Big Leap Forward) গত বৎসরেও যে অব্যাহত রয়েছে প্রকাশিত সংবাদ তারই প্রমাণ। ফলে ১৯৫৮ ও ১৯৫৯—এই দুই বৎসরেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫৬—'৬২) মূল লক্ষ্যগুলি পূরণ করা, অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৭ সালের তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬২ সালে মোট (gross) কৃষি ও শিল্প-উৎপাদন, মোট শিল্প-উৎপাদন, মোট কৃষি-উৎপাদন এবং জাতীয় আয়ের পরিকল্পিত বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭৫ ভাগ, শতকরা ১০০ ভাগ, শতকরা ৩৫ ভাগ এবং শতকরা ৫০ ভাগ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের তিন বৎসর আগেই ১৯৫৯ সালের শেষে মোট কৃষি ও শিল্প-উৎপাদন, মোট শিল্প-উৎপাদন, মোট কৃষি-উৎপাদন এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৯৪'৪, শতকরা ১৩১'৫, শতকরা ৪৫'৮ ও শতকরা ৬২'৮৬ ভাগ। প্রশ্নাতীতভাবেই এই অগ্রগতি বিস্ময়কর।

নানা কারণেই এমন একটি অসাধারণ সাফল্যের সম্পূর্ণ অর্থ ও বিভিন্ন

দিক আমাদের বোঝা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালের চীন-বিরোধী উগ্র প্রচার শুধুমাত্র রাজনীতির বিষয়ে বা সীমান্তসংক্রান্ত প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই প্রচার নানা রূপ নিচ্ছে। চীনা অর্থনীতির প্রগতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীক শক্তি ও তার বিকাশে সূত্রটিকে আড়াল করা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত কল্যাণমূলক দিকটি সম্পর্কে সংশয়-উৎপাদন আশোক মেহ্‌তা—শ্রীপতি চন্দ্রশেখর প্রমুখ 'চীনা-বিশারদদের' উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস ও চীন-ভারত মৈত্রীর স্বার্থে এবং বিশেষতঃ আমাদের দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক বিকাশের তাগিদে চীনা অর্থনীতির প্রগতিমূলক ধারাটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমাদের সকলেরই প্রয়োজন।

অতিরঞ্জিত পরিসংখ্যান

জনায়ত্ত চীনা প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্যের শুরুর সময় থেকেই চীন-বিরোধী প্রচারতূণীরের অন্যতম প্রধান অস্ত্র—চীনা পরিসংখ্যান সম্পর্কে সংশয়-সৃষ্টি। প্রায়ই শোনা যায়, সাধারণভাবে প্রকাশিত উৎপাদন-সংক্রান্ত অঙ্কগুলি প্রচারমূলক, অতিরঞ্জিত, ইচ্ছাকৃতভাবে স্ফীত।

তিরিশ বৎসর আগে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ও তারও পরে বহুদিন পর্যন্ত সোবিয়েত পরিসংখ্যান সম্পর্কে অনুরূপ কথা শোনা গিয়েছিল—বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে একথা অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই স্মরণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সমান গুরুত্বের সঙ্গেই স্মরণযোগ্য, সোবিয়েত পরিসংখ্যানসংক্রান্ত উপরোক্ত গবেষণার গভীর মূঢ়তা ইতিহাসে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

সোবিয়েত বা চীনা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ও শাখা ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত। শুধুমাত্র পণ্ডিতী গবেষণা নয়, পরিকল্পনা কার্যকরী করাই পরিসংখ্যান ব্যবহারের অন্যতম—কার্যত প্রধানতম উদ্দেশ্য। এরকম ক্ষেত্রে কোনো সরকার বা পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের পক্ষেই নিয়মিতভাবে মিথ্যা পরিসংখ্যান-পরিবেশন সম্ভবপর নয়। প্রচারের উদ্দেশ্যে এক ধরনের পরিসংখ্যান-পরিবেশন, আর পরিকল্পনার নিজস্ব প্রয়োজনে অন্য ধরনের পরিসংখ্যার ব্যবহার বিপজ্জনক ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্যবিরোধী—একথা সহজ বুদ্ধিতেই বোধগম্য।

অবশ্য পরিকল্পিত অর্থনীতিতে পরিসংখ্যানগত কোনো ভুলই ঘটতে পারে না এমন নয়। চীনে ১৯৫৮ সালের কৃষি-উৎপাদনসংক্রান্ত প্রাথমিক বিবরণীতে তথ্যগত গুরুতর ভুল ছিল। "কিন্তু এগুলি যে 'প্রচারমূলক পরিসংখ্যান' ছিল—এমন কথা অনুমান করার মত কোনো যুক্তি নেই। তাই যদি হত তবে সেগুলি প্রকাশের মাত্র কয়েক মাস পরে সে সবের সমালোচনা করা এবং এই সব পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা সংশোধন করাটা অর্থহীন"—ফরাসী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক শার্ল বেতেল-হাইমের এই মন্তব্য বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। (Charles Bettelheim, 'The Chinese Leap Forward and the Revision of Statistics', Economic Weekly, Annual Number, January 1960, p. 213)

চাঁদ হাতে পাওয়া

আসলে চীনা অর্থনীতির পক্ষে বিশেষ কোনো সাফল্য অর্জন সম্ভবপর নয়—এমন একটি কথাকে প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস একেবারে প্রথম থেকে লক্ষ্য করা যায়। মাও সে-তুং আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫৩-৫৭) প্রকাশ উপলক্ষে এমন নির্বোধ রসিকতা তো বিলেতের অতি-সম্ভ্রান্ত 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেই করা হয়েছে। (The Economist, January 3, 1953)

কিন্তু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলসমূহের নানা ভবিষ্যৎবাণী শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সবকয়টি লক্ষ্য পূরণ ও কোনো কোনো পরিকল্পিত লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত। নিচের তালিকাটিই কয়লা, ইস্পাত, খাদ্যশস্য ইত্যাদি কয়েকটি দ্রব্যউৎপাদনে অতি আশ্চর্যজনক অগ্রগতির পরিচয়।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ১৯৪৯—১৯৫৯

	কয়লা	ইস্পাত	শস্য	তুলা	বৈদ্যুতিক শক্তি
	(১০ লক্ষ টন)				(১০ লক্ষ কিলোওয়াট)
১৯৪৯	৩২	০·১	১০৮	০·৪৪	৪,৩১০
১৯৫২	৬৬	১·৩৫	১৫৪	১·৩	৭,২৬০
১৯৫৭	১৩০	৫·৩১	১৮৫	১·৬৪	১৯,৩০০
১৯৫৮	২৭০	৮·০	২৫০	২·১	২৭,৫০০
১৯৬২ (পরিকল্পিত লক্ষ্য)	১৯০-২১০	১০·৫-১২·০	২৫০	২·৪	৪০,০০০-৪৩,০০০
১৯৫৯	৩৪৭·৮	১৩·৩৫	২৭০	২·৪১	৪১,৫০০

এই তালিকার থেকেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর ১৯৫৭ সালে ১৯৫২ সালের তুলনায় ইস্পাতের চারগুণ, কয়লার প্রায় দ্বিগুণ ও বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বিগুণেরও বেশি উৎপাদন বৃদ্ধি স্পষ্ট।

এমনি আরও বহু দৃষ্টান্তই আছে। সে সবের উল্লেখ বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট, ১৯৪৯ সালের আগে চীনে প্রকৃতপক্ষে প্রায় কোনো ভারী শিল্পেরই অস্তিত্ব ছিল না, অথচ ১৯৫৪ সালেই বিমান উৎপাদন, ১৯৫৬ সালে ভারী ট্রাক, জেট বিমান এবং নানা ধরনের জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির নির্মাণ শুরু হয়।

লম্বা লাফের পশ্চাৎগতি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্জিত সফেল্যের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত এবং পনেরো বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের প্রধান শিল্পসমূহের উৎপাদন ধরে ফেলার চাঞ্চল্যকর অভিযানের শুরু। এই উদ্দেশ্যসাধন ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্য ১৯৫৮ সালে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে 'সকলে মিলে কাজে বেরিয়ে পড়া, উঁচু লক্ষ্য স্থির করা এবং আরও বেশি, আরও তাড়াতাড়ি, আরও ভাল ও আরও কম ব্যয়ে ফললাভের' সাধারণ সূত্র গৃহীত হল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হল। এই এক বৎসরের সিদ্ধিলাভ প্রথম পরিকল্পনার যে কোনো এক বৎসরের তুলনায় অনেক বেশি, অনেক ক্ষেত্রে গোটা প্রথম পরিকল্পনাকালের পাঁচ বৎসরের মোট ফলেরও বেশি। তাই ১৯৫৮ সাল 'লম্বা লাফের অগ্রগতির' বৎসর।

এই একই বৎসরে ১৯৫৭ সালের তুলনায় মোট (gross) শিল্প-উৎপাদন ও মোট কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার যথাক্রমে দুই-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ। এরকম ক্রমবৃদ্ধির নজির পৃথিবীর আর কোনো দেশেই নেই।

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য গণ-অভিযানের ফলে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পেল শতকরা ৫০ ভাগ। কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়াতে চীন দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা-উৎপাদকে পরিণত হল। এই উৎপদান ব্রিটেনের উৎপাদনের থেকেও বেশি।

১৯৫৮ সালের শেষভাগে গণ-কমিউনের উদ্ভব গ্রামাঞ্চলে নতুন বিপ্লবের

সূচনা। শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক গঠনেরই নয়, সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের নতুন পথ উন্মুক্ত হল।

গণ-কমিউনের বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে এ প্রবন্ধের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইতিপূর্বে কৃষি-সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও সংহতি, তারপর গণ-কমিউনের আরও ব্যাপক, উন্নততর সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব, কোটি কোটি কৃষক জনসাধারণের উৎসাহ, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কৃষি-উৎপাদনপদ্ধতি সংক্রান্ত 'আট দফা কর্মসূচীর' (গভীর চাষ ও জমির উন্নতিবিধান, ব্যাপকভাবে জলসংরক্ষণ ব্যবস্থা, জমির স্তরে স্তরে সারের ব্যবহার, ভাল বীজ নির্বাচন, পোকা ও রোগের আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করা, কৃষিক্ষেত্রের পরিচালনা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ও কৃষি-যন্ত্রপাতির সংস্কার) প্রয়োগ কৃষি-উৎপাদনে যে পরিবর্তন সম্ভব করে তুলল তা অভাবিত, প্রায় অবিশ্বাস্য। এ সবের ফলে ১৯৫৯ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে জমির একক (unit) প্রতি খাদ্যশস্যের ফলন প্রায় দ্বিগুণ হল, আর তুলার জমির একক প্রতি ফলন বৃদ্ধি পেল শতকরা ১২৬ ভাগ। ১৯৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৮-তে শস্য ও তুলার মোট উৎপাদন-বৃদ্ধির মাত্রা যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ও শতকরা ২৮ ভাগ। এই দুটি ক্ষেত্রেই ১৯৫৮ সালের উৎপাদন-বৃদ্ধি গোটা প্রথম পরিকল্পনাকালের মোট উৎপাদন-বৃদ্ধির থেকেও বেশি। আলু, বনজ উৎপাদন, মাছের চাষ, অন্যান্য উপজীবিকা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই উৎপাদন-বৃদ্ধি রীতিমত বড়রকমের।

এই প্রসঙ্গেই অবশ্য অনেকে প্রশ্ন করবেন—প্রথমে ঘোষিত কৃষি-উৎপাদন অঙ্কের পরে কি কোনো সংশোধন করা হয় নি? এই সংশোধন কি যথেষ্ট গুরুতর নয়? এই সংশোধন কি 'লম্বা লাফের পশ্চাৎগাতর' পরিচয় নয়?

১৯৫৮ সালের কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে প্রথমে প্রকাশিত বিবরণীতে গুরুতর ভুল ছিল—একথা ঠিক। গত বৎসর আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অষ্টম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কৃষি-উৎপাদন অঙ্কের সংশোধন করা হয়। শস্য, তুলা ও মোট কৃষি-উৎপাদনের সংশোধিত পরিমাণ পূর্বের অনুমান ও ঘোষণায় তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৩ ভাগ, শতকরা ৩৬ ভাগ ও শতকরা ২৪ ভাগ কম। ভুল ও

সংশোধনের মাত্রা নিঃসন্দেহে খুবই বেশি। এর ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির উপরোক্ত অধিবেশনেই ১৯৫৯ সালের পরিকল্পনারও যথেষ্ট রদ-বদল করা হয়।

কিন্তু এই ভুল ইচ্ছাকৃত নয়। চীনের দ্বিতীয় জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গত বৎসর ২৬শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এই সংশোধন সংক্রান্ত যে বিবরণী উপস্থিত করেন তার থেকে জানা যায়, এই ভুলের কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথমত, বিরাট বিরাট অঞ্চল জুড়ে এক বৎসরেই আকস্মিকভাবে জমির একক প্রতি বড় রকমের ফলনবৃদ্ধি ঘটে। এরকম ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে অনুমানের (assessment) ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। ফলে কিছুটা বাড়িয়ে হিসেব করা হয়। দ্বিতীয়ত, বন্যা, অনাবৃষ্টি ও পোকার আক্রমণের ফলে আনুমানিক ২ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। কিন্তু এই ফসল হ্রাসের মাত্রাকে লঘু করে দেখা হয়েছিল। তৃতীয়ত, গ্রাম্যজীবনের বহুবিধ কাজে কর্মক্ষম সকল নর-নারী নিয়োগের ফলস্বরূপ কৃষিকাজে উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের অভাব ঘটে। ফলে শরৎকালীন শস্যকাটা, মাড়াই ও গোলাজাত করার সময়ে যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হয়। (Peking Review, September 1, 1959, p. 16)

এই সবের জন্যই ১৯৫৮ সালের কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কে প্রাথমিক বিবরণীতে যে হিসেব দেওয়া হয়েছিল পরে তার ব্যাপক সংশোধন করা হয়। কিন্তু চীনা অর্থনীতির শক্তি ও গতি এতই প্রচণ্ড যে যথেষ্ট গুরুতর সংশোধনের পরও ১৯৫৮ সাল 'লম্বা লাফের অগ্রগতির' বৎসর। এই প্রবন্ধে ১৯৫৮ সালের উৎপাদন-সংক্রান্ত এ পর্যন্ত যে-সব হিসেব দেওয়া হয়েছে তার সবই গত বৎসরের সংশোধন অনুসারে। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, সকল সংশোধন শুধুমাত্র কৃষি-উৎপাদন সংক্রান্ত। শিল্প-উৎপাদন অঙ্কের কোনো পরিবর্তনই করা হয় নি।

সংশোধিত তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটির উপরোক্ত অধিবেশনে ১৯৫৯ সালের পরিকল্পনার রদ-বদল করা হয়। আর সেই সঙ্গে ১৯৫৯ সালের মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যসমূহ পূরণের আহ্বান জানান হল। ঐ অধিবেশনেই 'প্রধান শিল্প-উৎপাদনগুলির ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে ১৫ বৎসরের মধ্যে ধরে ফেলার' কার্যক্রমকে ১০ বৎসরে কার্যকরী করার লক্ষ্য স্থির করা হল। (ঐ, পৃঃ ৭)

সংকটগ্রস্ত অর্থনীতি

১৯৫৮ সাল যে 'লম্বা লাফের অগ্রগতির' বৎসর তার এমন সব সুনিশ্চিত ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ সত্ত্বেও আমাদের দেশের নানা পত্রপত্রিকার অনেক লেখকই খুব চিন্তার সঙ্গে বললেন, চীনা অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

কিন্তু ১৯৫৯ সালেও 'লম্বা লাফের অগ্রগতি' সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ অব্যাহত রয়েছে—এই প্রবন্ধের শুরুতে যে সামান্য কিছু তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে একথা সুস্পষ্ট। এই সব তথ্যাদি চীনা অর্থনীতির সংকটের পরিবর্তে স্থিতি ও দৃঢ়তা, শক্তি ও ক্রমবৃদ্ধির পরিচয়।

১৯৫৯ সালে চীনা অর্থনৈতিক সাফল্যের আরও উদাহরণ দিতে হলে বলা যায়, গত বৎসরের মত তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ গত কয়েক দশকে দেখা যায় নি। দেশের মোট আবাদী জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু ১৯৫৮ সালের তুলনায় কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ যে অনেক বেশি তা আগেই বলা হয়েছে।

গত জানুয়ারীর পূর্বোক্ত সংবাদ-বিবরণীর থেকে আরও জানা যায়, ইস্পাত, কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, মেটালার্জিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধাতুকাটার মেসিনটুল, বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদক যন্ত্র, কাঠ, সুতো, সুতীকাপড়, লবণ, যন্ত্রে প্রস্তুত কাগজ, খাদ্যশস্য, তুলা—এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই গত বৎসরের উৎপাদন ১৯৬২ সালের পরিকল্পিত লক্ষ্যের সমান অথবা তারও বেশি।

ক্রমান্বয়ে প্রচণ্ড গতিতে আর্থিক উন্নতির এমন নজির ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সবচেয়ে দ্রুত বিকাশ ও প্রসারের কালেও অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ মাত্র দুই বৎসরে চীনের ইস্পাত উৎপাদন ৫০ লক্ষ ৩৫ হাজার টন (স্থানীয় উৎপাদন বাদ দিয়ে) থেকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। অথচ মোটামুটি ৫০ লক্ষ টন থেকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে পৌঁছতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯ বৎসর, যুদ্ধপূর্ব জার্মানীর ১৩ বৎসর ও ব্রিটেনের ৩৪ বৎসর লেগেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী জাপান ও পশ্চিম জার্মানীতে ইস্পাত উৎপাদনের অনুরূপ বৃদ্ধির জন্য সময় লেগেছে যথাক্রমে ৮ বৎসর ও ৩ বৎসর। আর পশ্চিম জার্মানীর প্রধান সমস্যা তো ছিল বিদ্যমান উৎপাদন-ক্ষমতার পুনর্গঠন। (Peking Review, January 26, 1960, p. 5-6)।

এই সব আলোচনার থেকে একটি সিদ্ধান্তই করা যায়। তা হল, যে-

কোনো রকম বিচারেই চীনা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব। জগতের ইতিহাসে এমন আর্থিক প্রগতির কোনো তুলনা নেই।

ভারসাম্যবিচ্যুত বিকাশ

তর্কের তবু শেষ নেই। অনেকে বলছেন, উন্নয়নের গতিবেগ স্বীকার করা গেল। কিন্তু এমন প্রচণ্ড গতির ফলে কি চীনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র, শাখা ও অংশের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয় নি? এর ফলে কি ভবিষ্যৎ বিকাশ ব্যাহত হবে না?

এ প্রশ্নের উত্তর হল, না। চীনা অর্থনৈতিক বিকাশ মূলগতভাবে ভারসাম্যযুক্ত।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র, শাখা ও অংশের মধ্যে যথাযথ পারস্পরিক সম্পর্ক ও সঠিক অনুপাত রক্ষা করা, অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন। এ বিষয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের সাধারণ নীতি নির্ধারণ করেছেন। একই সঙ্গে শিল্প ও কৃষি, ভারীশিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারী ও হাল্কা শিল্প, জাতীয় ও স্থানীয় শিল্প, বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ এবং আধুনিক ও দেশীয় (indigenous) উৎপাদন-পদ্ধতির ব্যবহারের পাঁচটি নীতিসমষ্টি বা 'দুই পায়ে চলার' (walking on two legs) নীতিই চীনের অর্থনৈতিক বিকাশের সাধারণ সূত্র (general line)।

এগুলির মধ্যে শিল্প ও কৃষি এবং ভারী ও হাল্কা শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি ক্ষেত্রে নির্ভুল অনুপাত স্থির করতে পারলেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর, এখানে-ওখানে ভুল ঘটলেও তাড়াতাড়ি সংশোধন সহজসাধ্য।

ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন মার্কসের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বর্ধিত পুনরুৎপাদন সংক্রান্ত আলোচনাতেই সুস্পষ্ট। মার্কসের ভাষায় প্রথমোক্ত শিল্প হল শিল্পের ২নং বিভাগ (Department II), আর শেষোক্ত শিল্প হল ১নং বিভাগ (Department I)। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী শিল্পের দ্রুততর বিকাশের উপর শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার নির্ভরশীল।

মূলধনী ভিত্তির প্রসার, ইস্পাত, কয়লা, বিদ্যুৎশক্তি, ভারী রাসায়নিক, ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উৎপাদনবৃদ্ধিই কৃষি ও ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ সম্ভবপর করে তোলে, সুনিশ্চিত করে। তাই শুধুমাত্র বর্তমান ক্রমবৃদ্ধি নয়, ভবিষ্যৎ-এর সম্ভাব্য বিকাশের হার, অর্থনীতির নিজস্ব গতিবেগ সৃষ্টি ও ক্রমান্বয়ে প্রগতি নির্ভর করছে মূলধনী শিল্পের ত্বরান্বিত প্রসারের উপর।

কিন্তু এটা একটা সর্বজনীন সত্য। ঠিক কোন অনুপাতটি সঠিক তা স্থির করার মত কোনো অমোঘ অভ্রান্ত ছক বা সূত্র নেই। নির্ভুল সম্পর্ক নির্ধারণ বিশেষ দেশ-কাল সাপেক্ষ। এই জটিল সমস্যার সমাধান দেশের নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞতা, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজন সম্পর্কে চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

সোবিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনের অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞদের সুহৃৎসুলভ পরামর্শ এবং চীনা নেতৃত্বের গভীর বাস্তবতাবোধ ও দূরদৃষ্টির ফলে চীনে এই সমস্যার মূলত সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ভারী ও হাল্কা শিল্পসহ অর্থনীতির সামগ্রিক ভারসাম্যযুক্ত বিকাশই একথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এমন একটি জটিল সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক অনুপাত নিরূপণে কোনো ভুল হয় নি এমন নয়। পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের ভুলের—বিচ্ছিন্ন, আংশিক ও সাময়িক ভুলের—উদাহরণ অবশ্য অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু চীনা অর্থনীতি, কোনো সময়েই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্যযুক্ত আর্থিক ক্রমবৃদ্ধির নীতি থেকে, 'একই সঙ্গে পাঁচটি বিকাশের' নীতি থেকে বিচ্যুত হয় নি। বাস্তব অবস্থার প্রয়োজন অনুসারে প্রতি বৎসর হয়তো অনুপাতের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কার্যত সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রয়েছে।

এই সঠিক নীতির ফলে শিল্প ও কৃষি এবং ভারী ও হাল্কা শিল্পের বিকাশ অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন ও ভারসাম্যযুক্ত। শিল্প ও কৃষির বৃদ্ধির অনুপাত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ৪ : ১, ১৯৫৮ সালে ২'৬৫ : ১, ১৯৫৯ সালে ২'৩৫ : ১। ভারী ও হাল্কা শিল্পের বৃদ্ধির অনুপাত প্রথম পরিকল্পনাকালে ১'৯৮ : ১, ১৯৫৮ সালে ৩'০৬ : ১ এবং ১৯৫৯ সালে ১'২৭ : ১। (ঐ, পৃঃ ১১)

উপরের এই হিসেব থেকে আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার। তা হল, কৃষির বিকাশের হারের বৃদ্ধি শিল্পের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি ; আবার,

হাল্কা শিল্পের বিকাশের হারের বৃদ্ধি ভারীশিল্পের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি।

ভারী ও হাল্কা শিল্পের এই অনুপাত সোবিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় যথেষ্ট কম। কিন্তু শত্রুমনোভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীতে, ফ্যাশিবাদ ও যুদ্ধের বিপদের মুখে এবং তীব্র আভ্যন্তরীক প্রতিকূলতার মধ্যে সোবিয়েত সমাজতন্ত্রের পক্ষে যে ঝড়ের গতিতে ভারী শিল্প গড়ে তোলা অপরিহার্য ছিল সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার বর্তমান যুগে তা বোধহয় অনাবশ্যক—চীনে সোবিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় ভারী শিল্পে কম গুরুত্ব আরোপের নানা কারণসমূহের এটা সম্ভবত অন্যতম।

শিল্পের ভৌগোলিক অবস্থান স্থির করার প্রশ্নে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালের আগে ইস্পাত শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগই উত্তর-পূর্ব চীনে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু বর্তমানে একমাত্র তিব্বত অঞ্চল ভিন্ন চীনের অন্য সর্বত্র, প্রতিটি প্রদেশে, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ও শহরে নানা আকারে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কাগজ কল, কাপড়ের কারখানা ইত্যাদি প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ এবং আধুনিক ও দেশীয় (indigenous) উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহারের নীতি ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হয়েছে—এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন। কিন্তু অতি সম্প্রতিও চৌ এন-লাই বলেছেন, চীনের বর্তমান অবস্থায় এই নীতি অনুসরণ করা "মানবিক শক্তির অপচয় নয়, বরঞ্চ যুক্তিসঙ্গত (rational) ব্যবহার; এর ফলে শিল্পায়নের গতি শ্লথ হওয়ার পরিবর্তে ত্বরান্বিত হবে।" (Chou En-Lai, 'A Great Decade', Peking Review, October, 13, 1959, p. 14)

এই নীতির যথার্থতা ১৯৫৯ সালেও প্রমাণিত হয়েছে। গত বৎসরে মোট লৌহ উৎপাদন ২ কোটি টনেরও বেশি (এই হিসেবে দেশীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন লৌহের পরিমাণ ধরা হয় নি)। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি উৎপন্ন হয়েছে মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিতে। মোট ইস্পাত উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি এই প্রতিষ্ঠানগুলিরই উৎপাদন। দেশীয় উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এমন সব প্রতিষ্ঠানেরও গত বৎসর যথেষ্ট সম্প্রসারণ,

উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ও উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হয়েছে, উৎপাদনের পরিমাণও গত বৎসরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

গণ-কমিউন

বিভ্রান্তির অন্যতম উৎস গণ-কমিউন। এই সংগঠনটি দেশ-বিদেশে অনেকেরই আলোচনার বিষয়। কিন্তু এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব যথেষ্ট। তবে এটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কারণ চীনের গণ-কমিউন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সংগঠন।

আগেই বলা হয়েছে, গণ-কমিউনের উদ্ভব ১৯৫৮ সালে। অনুরূপ সামাজিক সংগঠন আর কোনো দেশেই নেই। অনেকে হয়তো সাম্প্রতিক অতীতের আধা-সমাজতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কৃষি-সমবায়ের কিংবা সোবিয়েত ইউনিয়নের যৌথখামারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবেন। কিন্তু এগুলির সঙ্গে গণ-কমিউনের পার্থক্য আকার ও প্রকৃতি—এই দুই দিক দিয়েই। প্রথমত, চীনা কৃষি-সমবায় ও সোবিয়েত যৌথখামারের প্রতিটির অন্তর্ভুক্ত গড়পড়তা পরিবার-সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ১৬০ ও ২৬০ ; আর প্রতিটি গণ-কমিউনের অন্তর্ভুক্ত গড়পড়তা পরিবার-সংখ্যা বর্তমানে ৫ হাজারের বেশি ; অর্থাৎ মূল চীনা কৃষি-সমবায়ের তুলনায় গণ-কমিউন ৩০ গুণেরও বেশি বড়। দ্বিতীয়ত, চীনা কৃষি-সমবায় বা সোবিয়েত যৌথখামার মূলত কৃষি-সংক্রান্ত সংগঠন, এগুলির উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু গণ-কমিউনের উদ্দেশ্য বহুমুখী, কাজের পরিধি ব্যাপক। শুধুমাত্র কৃষি নয়, শিল্প, জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাণিজ্য, বনজ উৎপাদন, মাছের চাষ, পশুপালন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞানচর্চা ও স্থানীয় সামরিক ব্যবস্থাদি সবই গণ-কমিউনের কাজের এক্তিয়ারভুক্ত। এই সব বিভিন্ন কাজের পরিচালনা ও স্থানীয় শাসনের সমন্বয়সাধন গণ-কমিউনের বৈশিষ্ট্য।

কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে বা পিকিং সরকারের হুকুমনামার বলে গণ-কমিউন গড়ে উঠেছে—এমন ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। গণ-কমিউন গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের একেবারে নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের ফল। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি, জলসংরক্ষণ, সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রয়োজন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের তাগিদে এবং সমাজতান্ত্রিক কৃষি-সমবায় গঠনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ নিজেরাই গণ-কমিউনের উপযোগিতা আবিষ্কার করেছে।

প্রথম গণ-কমিউন গড়ে ওঠে ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সভায় গণ-কমিউন সম্পর্কে কোনো আলোচনা হওয়ার অনেক আগেই প্রথম কমিউনগুলি গড়ে ওঠে। আর অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই গণ-কমিউনের ধারণা ও আন্দোলন চীনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের ২৯শে আগস্ট। কিন্তু এর আগেই শতকরা ৩০ ভাগ কৃষক-পরিবার কমিউনের সভ্য হয়েছে। আরও পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব গৃহীত হয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে। ততদিনে ৭৪০,০০০ কৃষি-সমবায়গুলির পুনর্গঠন ও সংযুক্তির ফলে ২৬ হাজার গণ-কমিউন গড়ে উঠেছে, কৃষক-পরিবারগুলির শতকরা ৯৯ ভাগ গণ-কমিউনের সভ্য হয়েছে।

গণ-কমিউনের তাৎপর্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই ডিসেম্বরের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ শিল্পায়নের, কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর সমষ্টিগত মালিকানা থেকে সমাজের সমস্ত লোকের মালিকানায় পরিবর্তনের (transition from collective ownership to ownership by the whole people), কাজের অনুপাতে সম্পদ বণ্টনের ('to each according to his work') সমাজতান্ত্রিক নীতির থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বণ্টনের ('to each according to his needs') সাম্যবাদী নীতি গ্রহণের, শহর ও গ্রামের, শ্রমিক ও কৃষকের, মানসিক ও দৈহিক শ্রমের পার্থক্য এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীক কাজকর্ম প্রথমে কমিয়ে ফেলা ও তারপর একেবারে অবসানের এক নতুন পথ গণ-কমিউন দেখিয়েছে। ('Resolution on Some Questions Concerning the People's Communes', Sixth Plenary Session of the Eighth Central Committee of the Communist Party of China, p. 14—Foreign Language Press, Peking 1958)

প্রকৃতপক্ষে গণ-কমিউন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এক নতুন রূপ। উপরোক্ত প্রস্তাবেই বলা হয়েছে, গণ-কমিউন "আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মৌল সংগঠন" এবং "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও মৌল সংগঠন।"

এই নতুন সংগঠনটি সব দিক দিয়েই অভিনব। সমালোচকেরা অবশ্য গ্রামবাসীদের ব্যক্তিত্বের বিনাশ, গণতন্ত্রের অভাব, সামরিক ধরনের শৃঙ্খল ইত্যাদির কথা বলছেন। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সম্পদের পরিচালনার বিকেন্দ্রীকরণের এমন মৌলিক পরীক্ষা চীনা গণতান্ত্রিক জীবনের এক নতুন বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে। চীনের কোটি কোটি জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মাত্র দশ বৎসর আগেও নিরক্ষর ছিল। বর্তমানে তারাই গণ-কমিউনের মাধ্যমে এক একটি অঞ্চলের সমস্ত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের, জমি, খনি, শিল্প, গবাদি পশু ইত্যাদির মালিক ও পরিচালক। এদের দায়িত্ব শুধুমাত্র খাদ্য বা কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধি নয় ; বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও উন্নতিবিধান, শিশু ও অক্ষমদের তত্ত্বাবধান, সব শ্রমিককে ক্রমবর্ধমান হারে মজুরি দেওয়া, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের প্রসার, পথ-ঘাট, সেচ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির দায়িত্ব স্থানীয় জনসাধারণ ও গণ-কমিউনের।

এই সংগঠনের সাফল্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গণ-কমিউনের 'ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে' স্থানীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটছে। হাজার হাজার কল-কারখানা গড়ে উঠছে। সাধারণ ভোজনাগার, নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন ব্যবস্থার প্রসার মেয়েদের রান্নাঘরের নিরানন্দময় কাজ থেকে মুক্তি দিয়েছে। প্রত্যেককে কাজের ঘণ্টা ও ধরন অনুযায়ী মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিগত শ্রমের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। এ সবের ফলে পরিবার-প্রধানের সর্বময় কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছে। কিন্তু এতে পারিবারিক সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃত আবেগগত সম্পর্ক আরও সংহত হয়েছে। তথাকথিত 'মিলিটারী ব্যারাকের' পরিবর্তে প্রচুর আলো-বাতাস যুক্ত বাড়ি-ঘর গড়ে উঠছে—কমিউনের অনুমোদিত এই সব গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনাগুলি 'বড় পরিবার' অর্থাৎ তরুণ স্বামী-স্ত্রী, তাদের সন্তান-সন্ততি ও বাবা-মা সকলের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থাসংবলিত। সন্তান-সন্ততিহীন বৃদ্ধদের জন্য আলাদা আবাসগৃহের (Homes of Respect for the Aged) ব্যবস্থা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সকলের জন্য বিনামূল্যে খাওয়ার ব্যবস্থা—বিশেষত উপরোক্ত বৃদ্ধদের জন্য। "এ সবই কৃষক সাধারণের পক্ষে যুগান্তকারী সংবাদ।" (ঐ, পৃঃ ১৩-১৪)

জনাধিক্যের চাপ

সংশয়ের নিরসন তবু হয় না। ম্যালথাসের অনুবর্তী পণ্ডিতেরা অর্ধোন্নত দেশগুলিতে 'বিপজ্জনকভাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির' কথা বলছেন। চীনের জনসংখ্যা বিপুল, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার খুবই বেশি। সুতরাং চীনের এত সব সাফল্য কি নিরর্থক নয়? দারিদ্র্যই কি চীন দেশবাসীর একমাত্র ভবিতব্য নয়?

এমন সব প্রশ্নের মধ্যে চীনের সমস্ত সাফল্য ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার একটা ক্ষীণ আশা আর চাপা উল্লাস হয়তো আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আশাভঙ্গই ইতিহাসের লিখন।

চীনে ম্যালথাসের তত্ত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। চীন অবশ্য সবেমাত্র তার অর্থনৈতিক সম্পদাদির বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার শুরু করেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, খাদ্য উৎপাদনবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২-২'২২ ভাগ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ৫ ভাগ, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার আরও বেশি—শতকরা ১৭'৪ ভাগ। এর পরেও চীনে জনাধিক্যের কথা বলা অভিসন্ধিপ্রসূত।

এর মানে এ নয় যে চীনে জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনারই প্রয়োজন নেই। কিন্তু চীনের জনসংখ্যা পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের দেশের পরিকল্পনার পার্থক্য মূলগত, তাৎপর্য সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ সে-দেশে বিরাট জনসংখ্যা আর্থিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক নয়, বরঞ্চ সম্পদ বলেই বিবেচিত হয়।

পুরানো চীনে চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট চীনদেশবাসীর কাছে সন্তান ছিল অবাঞ্ছিত। সামাজিক অনুশাসন এমন ছিল যে মেয়ে-শিশুকে হত্যা করা প্রায় একটি সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু নবীন চীনের পরিবর্তিত অবস্থায় সন্তান গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষিত। নবজাতকের ভাগ্যে এত অভ্যর্থনা, অভিনন্দন আর খুব কম দেশেই মেলে। প্রতিদিন নতুন জন্মের সংখ্যা ৫০,০০০, প্রতি বৎসর ২ কোটি। ১৯৫৩ সালে প্রথম আদম শুমারী অনুযায়ী চীনের জনসংখ্যা ৬০ কোটি। পরবর্তী চার বৎসরে এই বিশাল জনসংখ্যা আরও ৫ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। জনাধিক্যের কথা শুনতে অভ্যস্ত আমাদের কাছে এ একটা প্রায় হতবুদ্ধিজনক অবস্থা।

এ অবস্থাতেও চীনা নেতৃবৃন্দ বা চীনদেশবাসী কিন্তু বিচলিত নন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে সে দেশে আলোচনা অবশ্য হয়। তবে এ সবের থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিকের অভাবের সমস্যার সমাধান অনেক বেশি জরুরী। মেয়েরা ঘর-কন্নার কাজ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক উৎপাদনে অংশ নিচ্ছে, অনেক অনুৎপাদক কাজ ও শ্রমের অবসান ঘটেছে। শ্রমিকের গতিশীলতা (mobility) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি বিরাট জনসম্পদ রয়েছে। তবু বর্তমান চীনের অন্যতম প্রধান সমস্যা জনাধিক্য নয়, তার পরিবর্তে শ্রমিকের অভাব। অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা সত্য। তাই এই শ্রমিক-অভাব অতিক্রম করার জন্য জনসম্পদের ব্যবহারে অপচয়-নিরোধ, আরও যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শ্রমশক্তির নিয়োগবিন্যাস বর্তমানের অন্যতম মুখ্য আলোচ্য বিষয়। (Peking Review, September 1, 1959, p. 8, 9)। মূলধন প্রগাঢ় (capital intensive) যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও ভারীশিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ—এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম অঙ্গ।

শোষণের বোঝা

সমালোচনার অবশ্য অন্ত নেই। অভিযোগ করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের উপর কমিউনিস্ট শোষণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জনসাধারণ দুর্দশাগ্রস্ত, নিষ্পেষিত।

কিন্তু অজস্র তথ্য এই সব সমালোচনার পরিপন্থী। সব তথ্য প্রমাণ করে, শ্রমিক-কর্মচারী ও কৃষকের আয় ও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষকদের করের বোঝা আপেক্ষিকভাবে কমেছে, নিত্যব্যবহার্য পণ্যের প্রসার ঘটেছে।

এখানে সামান্য কিছু নমুনা স্বরূপ বলা যায়, ১৯৫২-৫৯—এই সাত বৎসরে কৃষি-উৎপাদন শতকরা ৭১ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও বার্ষিক কৃষি-করের পরিমাণ (৩০০ কোটি য়ুয়ান) আগাগোড়াই অপরিবর্তিত রয়েছে। ১৯৫২ সালে কৃষকের মোট করের বোঝা (কৃষিকর, নানারকম স্থানীয় কর ও অন্যান্য গ্রাম্যট্যাক্স) কৃষি-উৎপাদনের শতকরা ১১ ভাগ ছিল, ১৯৫৯ সালে তা কমে গিয়ে হয় শতকরা ৮·৫৫ ভাগ। (ঐ, পৃঃ ১০)

লি সিয়েন-নিয়েনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে আরও জানা যায়, অর্থনৈতিক পুনর্বাসনকালে (১৯৪৯-৫২) ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে শ্রমিক-

কর্মচারীর গড়পড়তা মজুরি বৃদ্ধির হার যথাক্রমে শতকরা ৭০ ভাগ ও শতকরা ৪২'৮ ভাগ। ১৯৫৮ সালে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩ ভাগ। ১৯৫৯ সালে আরও শতকরা ৫ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি হয়। একই সঙ্গে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৯ সালে শ্রমিক-বীমা তহবিল, চিকিৎসার খরচ, কল্যাণ তহবিল এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের অন্যান্য যৌথ সুযোগ-সুবিধা বাবদ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৬ ভাগেরও বেশি।

অনুরূপভাবে গ্রামাঞ্চলেও ১৯৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে কৃষকদের শতকরা ৩৩ ভাগ আয় বৃদ্ধি হয়। ১৯৫৮ সালের তুলনায় গত বৎসরে গণ-কমিউনের সভ্যদের গড়পড়তা আয়বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগ (ঐ, পৃঃ ৮)। অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি বিস্তৃতির সামান্য কিছু উল্লেখ গণ-কমিউনের আলোচনা প্রসঙ্গেই করা হয়েছে।

এই সঙ্গেই মনে রাখা প্রয়োজন, গত দশ বৎসরে বিভিন্ন পণ্যের পাইকারী ও খুচরো দামের স্তর অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও দামবৃদ্ধিজনিত সমস্যাসমূহ আজকের চীনে অনুপস্থিত। (ঐ, পৃঃ ৮)

শ্রমিক-কর্মচারী ও কৃষকদের এই ক্রমবর্ধমান ক্রয়শক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরো বিক্রয়ের প্রসারে প্রতিফলিত। ইতিপূর্বে উল্লিখিত চৌ এন-লাইয়ের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে খুচরো বিক্রয়ের পরিমাণ ৩'২ গুণ বেশি ; খাদ্যশস্য, চিনি, মাছ ও অন্যান্য জলজ উৎপাদন এবং সুতীকাপড়ের খুচরো বিক্রয় বৃদ্ধির হার যথাক্রমে শতকরা ৮২ ভাগ, শতকরা ৩০০ ভাগ, শতকরা ২৪০ ভাগ এবং শতকরা ১২০ ভাগ বেশি। গত বৎসরেও এইসব দ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য পণ্যের অধিকাংশের সরবরাহ বিভিন্ন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিপুল প্রসার, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্রুত বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ, গত বৎসরে পুরো সময়ের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ছাত্রভর্তির সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার ; এইসব প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্রসংখ্যা (৮ লক্ষ ১০ হাজার) ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ২৩ ভাগ বেশি। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ ও ৯ কোটি। ১৯৫৮ সালের শেষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষ গবেষণাকেন্দ্রের সংখ্যা হয় ৮৪০টিরও বেশি—১৯৪৯ সালের প্রায়

২১ গুণ ; আর গবেষকের সংখ্যা হয় ৬২ হাজার—১০ বৎসর আগের তুলনায় প্রায় ৫১ গুণ। ১৯৫৮ সালে মোট ৫ হাজার ৬ শো হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামে নিয়মিত বেডের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের তুলনায় ৫ গুণ বেশি ; অতিরিক্ত বেডসংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ। এ রকম উদাহরণ আরও বহু দেওয়া যায়।

চীনদেশবাসীর এই ক্রমান্বয়ে বৈষয়িক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রমাণ সে-দেশের জন্ম-মৃত্যুর হার। সাধারণত তথাকথিত অর্ধোন্নত বা ঔপনিবেশিক দেশের মানুষ স্বল্পায়ু। এটা এসব দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনশন-অর্ধাশন, মহামারী, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের পরিচয়।

সাম্প্রতিককালের চীনে জনসংখ্যার অতি-দ্রুত বৃদ্ধির কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ জন্মহারের বৃদ্ধি নয়। এর প্রধান কারণ হল, চীনদেশে আজকাল আগের তুলনায় কম লোক মারা যাচ্ছে। চীনদেশবাসী দীর্ঘায়ু হচ্ছে। নীচের তালিকা থেকেই একথা স্পষ্ট।

প্রতি হাজারে	১৯৫৫	১৯৫৪	১৯৫২-৫৩	মুক্তির পূর্বে
জন্ম	৩২·৭৯	৩৮	৩৭	৩৫
মৃত্যু	১২·৩৬	১৩	১৭	২৫
স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি	২০·৪৩	২৫	২০	১০

এ-ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল, বাচ্চারা আগের থেকে কম মারা যাচ্ছে। সরকারী তথ্যের থেকে জানা যায়, পিকিংয়ে প্রতি এক হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর মৃত্যুহার ১৯৪৯ সালে ছিল ১১৭·৬ ; ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের এই মৃত্যুহার কমে গিয়ে হয় যথাক্রমে ৪৪·৫ ও ৩৫·১ জন। ধাত্রীবিদ্যা ও মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থার প্রসারের ফলে গ্রামাঞ্চলে শিশুমৃত্যু হারের হ্রাস আরও বেশী। আরও বলা যায়, ১৯৫৫ সালের ব্রিটেনে প্রতি হাজারে সব রকম বয়সের মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা যেখানে ১১·০, সেখানে ঐ বৎসর চীনে এই মৃত্যুহার ১২·৩৬। এর অর্থ, সামগ্রিকভাবে মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে চীন ইতিমধ্যেই ব্রিটেনকে প্রায় ধরে ফেলেছে। (Michael Shapiro, 'Changing China', Chap. 1, p. 11-13—Lawrence and Wishart, London)

চীনদেশবাসীর জীবনযাত্রার মান অতিক্রুত উন্নতিশীল, নিউট্রিশনযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য সকলের জন্য পাওয়া যায়, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি ক্রমশঃ প্রসারমান—উপরোক্ত তথ্যগুলি একথার নিশ্চিত নিদর্শন।

ভারত ও চীন

চীনের এই বিশাল পরিবর্তনের সম্পূর্ণ চিত্রটি বোঝা এবং চীন-বিরোধী অভিযানের আসল চেহারাটি জানার জন্য ভারত ও চীনের তুলনা খুবই সহায়ক। জনসংখ্যা, দেশের আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, মাথা পিছু আয়, সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর ইত্যাদি নানাদিক দিয়েই এ দুটি দেশ তুলনীয়। ১৯৫০ সালের দুটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (gross national product) ও মোট বিনিয়োগের (gross investment) পরিমাণ প্রায় অনুরূপ ছিল। দুটি দেশই মূলগতভাবে একই ধরনের সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী, এই প্রয়াসের শুরুও মোটামুটি এক সময়ে।

অধ্যাপক উইলফ্রেড ম্যালেনবোম সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ('India and China' : Contrasts in Development Performance, American Economic Review, June, 1959) এ-বিষয়ে অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি মার্কিন দেশের ম্যাসাচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির ভারতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর। তাঁর আলোচনাকে চীন সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করার কোনো কারণ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি চীনা সরকারী বিবরণের থেকে কম করে অনুমান (estimate) করেছেন।

অধ্যাপক ম্যালেনবোম এই আলোচনায় দেখিয়েছেন, "১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতে আসল আয়ের (real income) বার্ষিক বৃদ্ধিহার প্রায় শতকরা ৩.৫ ভাগ। মূলত এই একই সময়ের চীনে এই বৃদ্ধির হার অন্তত তিনগুণ বেশি" (ঐ, পৃঃ ২৮৫)। এ-প্রসঙ্গে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, ভারতে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৪-১.৭ ভাগ, আর চীনের হার শতকরা ২-২.২ ভাগ। ভারতের তুলনায় চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উচ্চতর হার সত্ত্বেও মাথাপিছু মোট আয় (gross income) ভারতের তুলনায় চীনেই বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। (ঐ, পৃঃ ২৮১)

ভারত ও চীন : কয়েকটি তুলনা, ১৯৫০—১৯৫৭

	ভারত		চীন	
	১৯৫০	১৯৫৭	১৯৫০	১৯৫৭
খাদ্যশস্য (দশ লক্ষ টন)	৫৩'৫	৬৭'১	১২২'৭২	১৮৫
তুলা („)	০'৫০	০'৮৩	০'৬৮	১'৬৪
ইস্পাত („)	১'০১	১'৩৫	০'৪০	৪'২৬
সিমেণ্ট („)	২'৬৮	৫'৫৮	১'৪১	৬'৬৯
কয়লা („)	৩২'৫	৪৩'৫	৪০'৯	১২০
ফার্টিলাইজার (দশ হাজার টন)	৪৭'৩	৩৮৩	৭৫	৫৩৫
বিদ্যুৎশক্তি (দশ লক্ষ কিঃ ওঃ)	৫,১১২	১০,৮৩৬	৪,৫৮০	১৯,০২৫
কাপড় (দশ লক্ষ গজ)	৩,৬৫০	২,৯৪০	২,৯৪০	৫,৮২৫

(ঐ, পৃঃ ২৯২)

উপরের তালিকাটি চীন ও ভারতের তুলনামূলক অর্থনৈতিক প্রগতির পরিচয়। প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রেই চীনের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ভারতের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। আর গত দুই বৎসরের চীনা 'লম্বা লাফের' ফলে এই ব্যবধান আরও বেড়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, উপরের তালিকায় ভারতের তুলনায় চীনের অধিকতর সামাজিক সুযোগ-সুবিধার (social amenities) প্রতিফলন হয় নি।

অবশ্য একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বিচারে বর্তমান ক্রমবৃদ্ধির হার একমাত্র নিরিখ নয়। ভবিষ্যতে এই ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গতিবেগ বিনিয়োগের পরিমাণ ও হারের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রেও অধ্যাপক ম্যালেনবোমের আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৫০-৫৮ এই আট বৎসরে চীনের মোট বিনিয়োগ (total investment) ভারতের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি। স্পষ্টতই চীনের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ক্ষমতাও ভারতের তুলনায় অধিকতর।

কিন্তু অর্থনীতির বিশেষজ্ঞদের প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিয়োগ ও অন্যান্য সরকারী ব্যয়বাবদ অধিকতর বরাদ্দ সত্ত্বেও ভোগের মান (consumption level) কমে যায় নি। শুরুতে "চীন পারিবারিক ভোগের গড়পড়তা মান ভারতের থেকে আসলে শতকরা ১০-১৫ ভাগ নীচু ছিল।…১৯৫৫ কি ১৯৫৬ সাল নাগাদ…চীনের মাথা পিছু ভোগস্তর ভারতের স্তরকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে।" (ঐ, পৃঃ ২৯১-২৯২)

এই সব তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, পৃথিবীর সর্বাধিক

জনবহুল দেশ এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির সব কয়টি প্রধান সমস্যার—দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ইত্যাদি—সমাধান সম্ভবপর করে তুলেছে। এ সবই চীনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের নিঃসংশয়িত প্রমাণ।

ছাঁচে-ঢালা সমাজ

অবশ্য কুৎসা-রটনাই যাঁদের একমাত্র পেশা তাঁরা বলছেন, চীনদেশবাসীর জীবন ছাঁচে-ঢালা, অবস্থা দাসশ্রমের সমতুল্য। কিন্তু চীনের প্রচণ্ড অগ্রগতির যে সামান্য পরিচয় বর্তমান প্রবন্ধে পাওয়া গেল তার থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট: চীনদেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন বর্তমান প্রগতি অসম্ভব হত।

উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন—সামন্তপ্রথার অবসান, কৃষকদের মধ্যে জমিবিলি, প্রথমে কৃষি-সমবায় ও গণ-কমিউনের মাধ্যমে কৃষির সমাজতন্ত্রীকরণ, ধনতান্ত্রিক শিল্প-বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের রূপান্তর—উৎপাদনী শক্তির এই বাধা-বন্ধনমুক্ত নানা বিকাশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কোটি কোটি মানুষের সৃজনীশক্তির উদ্বোধন।

প্রাদেশিক, মিউনিসিপ্যাল ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলির ক্ষমতার সম্প্রসারণ, গণ-কমিউনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক পরিচালন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রণয়নে সারা দেশ জুড়ে উদ্দীপনাময় আলোচনা, উৎপাদন ব্যবস্থার নানা স্তরে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কৃষি-খামারের পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় উদ্যোগের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা এক নতুন ধরনের গণতন্ত্রের উদাহরণ। শ্রমিক-কৃষকের অজস্র পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনা, খোলা জায়গায় বড় বড় পোস্টারের মারফত ব্যক্তিগত মতামত জানানো, সাধারণ শ্রমিক-কৃষকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমস্যা নিয়ে সারা দেশের পত্র-পত্রিকায় আলোচনা এবং পার্টির অভ্যন্তরে ও বাইরে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার নীতির ব্যাপক অনুসরণ প্রকৃত গণতন্ত্রকে সম্ভবপর করে তুলেছে।

উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ, নতুন নতুন উৎপাদনপদ্ধতির আবিষ্কারের মূলে রয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা।

এরই ফলে দেশের সর্বত্র হাজার হাজার কল-কারখানায়, ছোট-বড় নানা ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে নতুন নতুন উৎপাদন-পদ্ধতির অজস্র আবিষ্কার, উৎপাদনপদ্ধতির বিপ্লব। নতুন চীনের প্রতিটি ব্যবস্থাই—কলেরা ও অন্যান্য মহামারী, দুর্নীতি, ঘুষ ও আমলাতন্ত্র বা মাছি ও ইঁদুরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ প্রচেষ্টা, উৎপাদনবৃদ্ধি বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা—লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষকের গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এ-সবের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক রূপের পার্থক্য খুব সহজেই নজরে পড়ে।

চীনদেশবাসীর জীবনে শৃঙ্খলা অবশ্য রয়েছে এবং এ শৃঙ্খলাকে কোনো কোনো সময়ে কঠোর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ শৃঙ্খলা স্বতঃউৎসারিত, পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ফল। একদিকে শোষণ-শৃঙ্খলের অবসান, আর একদিকে উন্নততর জীবনের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা চীনদেশবাসীকে কর্মোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

অচল মতবাদ

মাত্র দশটি বৎসরের মধ্যে চীনের এই যুগান্তকারী রূপান্তরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

পণ্ডিত নেহরু অবশ্য প্রায়ই বলেন, বর্তমান কালে মার্কসবাদ অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মার্কসবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাপকতম রাজনৈতিক আলোচনা ও আদর্শগত সংগ্রাম সব কয়টি সাফল্যকে—ভূমি-সংস্কার, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কৃষি-সমবায় আন্দোলন, শিল্প-বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ইত্যাদি—সম্ভবপর করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে সব দ্বিধা, সংশয় ও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলার জন্য ১৯৫৭ সালের সংশোধনী অভিযান (Rectification Campaign) ভিন্ন ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের 'লম্বা লাফ' সম্ভব হত না।

মাও সে-তুং ও চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মার্কসীয় প্রজ্ঞা ও গভীর ইতিহাস-চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ চীনা প্রগতির গোপন কথা। প্রশাসনিক হুকুমনামা ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে জনসাধারণের সৃজনশীল প্রতিভা সম্পর্কে প্রত্যয়বোধ, চীনের বিকাশে নানা সম্ভাবনা, সম্ভাবনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিশেষ বিশেষ

তাৎপর্য এবং এগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পদ্ধতি ও পন্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, সোবিয়েত ও অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনের অভিজ্ঞতার আহরণ, জনজীবন ও গণ-মানসের সঙ্গে নিকট সাযুজ্য (মন্ত্রী, সরকারী নেতা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রত্যেককেই বৎসরের বেশ কিছুটা সময় কায়িক শ্রম ও উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে—চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গত বৎসরের এই সিদ্ধান্ত জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও সহযোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত) এক পরম আশ্চর্য রূপান্তরকে জগতের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলছে।

অবশ্য চীন কোনো স্বর্গরাজ্য নয়। ভুল-ত্রুটি, এমনকি অন্যায়ও সে দেশে ঘটতে পারে। চীনদেশবাসীর জীবন আজও কঠোর। প্রাচুর্য তো দূরের কথা, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ইত্যাদি সহজলভ্য হতে এখনো দেরি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, মাত্র দশ বৎসর আগেও এই চীনে কুলিরা ভারবাহী মানব-পশুরূপে গণ্য হত। এত তাড়াতাড়ি তাদের জীবন স্বচ্ছল হয়ে উঠবে একথা ভাবাও বাতুলতা। কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। তা হল—শুধুমাত্র টিকে থাকার জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান, অনশন-অর্ধাশনের চরম দুর্দশা ও অমানুষিক শোষণের থেকে মুক্তি। অন্তত জীবনের নিম্নতম প্রয়োজনগুলি আজ সহজলভ্য। সুখী, সমৃদ্ধ, সুন্দর জীবনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। যুগ যুগব্যাপী নিপীড়িত মেয়েরা মুক্ত, তাদের শ্রম আনন্দের, সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ বর্তমান। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত, নিজস্ব ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় আচরণ ও সংস্কৃতির বিকাশধারা অক্ষুণ্ণ। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, নাটক, সংগীত, চিত্রকলা—এক কথায়, জীবনের অজস্র সৃষ্টির উৎসবে দশ বৎসর আগের অক্ষরজ্ঞানশূন্য অপাঙক্তেয় শ্রমিক-কৃষকের স্থান অবারিত। এখানে মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত, অস্তিত্ব মহিমামণ্ডিত। অপূর্ব বর্ণসুষমাময় জীবনের আভাস দৃষ্টিগোচর।

মাও সে-তুং ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কোটি কোটি চীনদেশবাসীর আজকের সাধনা ভবিষ্যৎ প্রাচুর্যের সমাজে উত্তরণের, আত্মিক সমৃদ্ধির, শ্রী ও কল্যাণলাভের। ১৯৫৯ সালের অব্যাহত 'লম্বা লাফ' এই মহৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

কেঁচো

মিহির সেন

আমার স্ত্রীর ভীষণ কেঁচোতে ঘেন্না। ঘেন্না আর ভয়। সারাটা বর্ষাই প্রায় আধপেট খেয়ে কাটাতে হয় রমার। খেতে বসে দশ হাত দূরে কেঁচো দেখলেও খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ওর। প্রায় বমি করতে করতে উঠে আসে থালা ছেড়ে। আর কেঁচোগুলোও এমন বেলেল্লা, কোথায় যে ঘাপটি মেরে থাকে কে জানে, ঠিক ওর খাওয়ার সময়টাতেই উঠে আসতে থাকে ঢুলকি চালে। অথচ সারাটা দিন কাটে রমার এই কেঁচো সংহারে। সকাল থেকে সন্ধ্যা।

আমার পোকামাকড় কেঁচো-কেন্নোয় ঘেন্না নেই কোনোকালেই। তবু স্ত্রীর ভয়েই সচেতন থাকি সারাদিন। হাঁটা-চলার পথে কেঁচো দেখলেই ফেলে দি বা মেরে ফেলি। কিন্তু তবু স্ত্রীর অনুযোগ থেকে সব সময় রেহাই পাই না। কেঁচোর পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে অনেক সময় রমা আমার পিণ্ডিতেও হাত দিয়ে বসে: মরতে এসে বাড়িও করেছে এমন জায়গায়। কেন, প্রমোদবাবুদের পাশের অমন উঁচু জমিটা থাকতে এই খানাখন্দরে জায়গা না কিনলেই চলছিল না?

কেন যে চলছিল না—তা অবশ্য রমারও না জানা নয়। তবু মাঝে মাঝে রাগের মাথায় ভুলে যায় সেটা। কোনো সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী যে এর চেয়ে উঁচু জমিতে ওঠার শক্তি রাখে না সেটুকু সকলেই বোঝে। রমাও। তবু মেয়েদের ঠিক রাগ না হলেও অব্যক্ত ক্ষোভটা অনেক সময় এখানে এসেই জমাট বাঁধে। মরতে কেন এমন লোকের হাতে পড়েছিলাম!

রাস্তার ওপারে, বেশ কিছুটা দূরে হলেও, প্রমোদবাবুর বিরাট বাড়িটা রমার ও অভাববোধটাকে খুঁচিয়ে তোলার জন্যই যেন প্রয়োজনের বেশি হিংসুটে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রাতদিন। তার উপর আছে প্রমোদ-গৃহিণী মনোরমা দেবীর এ বাড়িতে গাভরা গয়না নিয়ে যাতায়াত। এবং

নিরাসক্ত আত্মবিজ্ঞাপন। পাশের ঘরে বসে সে-সব গল্প শুনে আমি নিজেও কেমন যেন গুটিয়ে আসি। ভয়ে তাকাই না আয়নার দিকে। পাছে সেখানে অপরাধী অপরাধী একটা মুখের প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে।

অন্তরঙ্গ যাওয়া-আসারও কোনো নির্দিষ্ট সময় মানতেন না মনোরমা দেবী। অনেক সময় রমাকে রীতিমত লজ্জায় ফেলে দিতেন ঠিক খাওয়া-দাওয়ার সময়টাতে এসে।

কেঁচোগুলোকে উস্কে দিয়ে রবিবারের ছুটিটা ভেস্তে দেবার জন্যই যেন কাল সারারাত অবিশ্রাম বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম রবিবার সকালে অসমাপ্ত গল্পটা শেষ করে ফেলব। কিন্তু সকালটা কাটল কেঁচো শেষ করার আশু কর্তব্যে। আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না এবং কেঁচোদেরও। অগত্যা মিষ্টি মিষ্টি গালগল্পে রমার মনটা নিকেঁচো রাখার প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফলকাম হলাম না। খেয়েদেয়ে ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শুনি রমা অন্যমনস্কে গুনগুন গানের মতই কখন যেন শুরু করে দিয়েছে কেঁচো বিষোদ্গার। আমি সশঙ্ক চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম কখন কেঁচো বেয়ে বেয়ে অনুযোগটা আমাকে এসে ছোঁয়। কিন্তু এ-দফা রক্ষা করলেন আমাকে মনোরমা দেবী। আমার ঘরে একবার উঁকি মেরেই তিনি মুখটা সরিয়ে নিলেন (বিড়ির গন্ধে কি-না জানি না)। তারপর সোজা রান্নাঘরে গিয়ে উঠলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম, যাক, এবার যে প্রসঙ্গ শুরু হবে, সেই শাড়ি-বাড়ি-গাড়ির গল্প বেয়ে কেঁচোর ওঠার সাধ্য নেই আর।

কিন্তু সভয়ে শুনলাম, আমার অনুমান মিথ্যে হল। মনোরমা দেবী গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নিয়মরাখা নিরুত্তাপ স্বরেই, কি দিদি, খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেল?

রমা করুণ সুরে বলল, আর খাওয়াদাওয়া! খাওয়াদাওয়া দিদি মাথায় উঠেছে। এই কেঁচোর দৌরাত্ম্যেই মারা গেলাম। আপনারা দিদি বেশ আছেন।

মনোরমা দেবী বিনায়াসে তাঁর পথ পেয়ে গেলেন। বেশ গম্ভীর তৃপ্ত স্বরে বললেন, হ্যাঁ ভাই, ওসব বালাই আমাদের নেই। সেদিক দিয়ে বেশ আছি।

বেশ আছি!

কথাটা আচমকা মনকে কেমন যেন একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। জানি

কথাটা বিরাট কিছু নয় ; অথবা গভীর কিছু। কিন্তু জীবনে এই কিছু না কথারাও কেন যেন মাঝে মাঝে আমাদের বিচলিত করে। বিবাগী করে। রবীন্দ্রনাথের লালাবাবু শুধুমাত্র বেলা যে যায় এই ছোট্ট ও সাধারণ একটা কথার আচমকা ধাক্কায় সংসার পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। লালাবাবু আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাবপ্রবণ ছিলেন বলেই বোধ হয়। বৈরাগ্য নয়, ভাবনাটা আমার কেন যেন এই বেশ আছিতে গিয়ে জড়িয়ে গেল।

বেশ আছি। এই বেশ থাকার কামনাটাই বোধ হয় মানুষের জীবনের শেষ ও শাশ্বত কামনা। কিন্তু পৃথিবীতে এই বেশ থাকার সিদ্ধিতে কি যেন এক মন্ত্রগুপ্তি আছে। কেবল বিদ্যাবুদ্ধি থাকলেই হয় না, আরো কি যেন এক গুণ থাকা প্রয়োজন এজন্য। অথবা শুধু সেই গুণটাই থাকা প্রয়োজন। তাহলে নিশ্চিন্ত মনে বেশ থাকা যায়। যেমন প্রমোদবাবুরা আছেন। মনোরমা দেবীরা আছেন।

এই বেশ থাকাটা অবশ্য প্রমোদবাবুর স্বোপার্জিত সম্পদ ; পিতৃদত্ত নয় ; প্রমোদবাবু আমার এক বন্ধুর গ্রামের ছেলে ছিলেন। ছেলে থাকা পর্যন্তই ছিলেন। কারণ কৈশোর ও গ্রাম উনি একই সঙ্গে ছেড়েছিলেন। সেই বন্ধুর কাছেই প্রমোদবাবুর ছেলেবেলার কিছু গল্প শুনেছিলাম। এখনকার মতোই তখনও নামকরা ছিলেন তিনি। অবশ্য তার রূপ কিছুটা আলাদা ছিল। এখন ইনি গণ্যমান্য। তখনও ওঁকে এক ডাকে চিনত সবাই। কারো গাছে ফলটা-আসটা থাকতে পারত না ওঁর দৌরাত্ম্যে। মেয়েরা স্বস্তিতে স্কুলে যেতে পারত না ওঁর ভয়ে। কেউ প্রতিবাদ করলে তার মাথা ও পিঠ বাঁচিয়ে চলতে হত দীর্ঘদিন। অবশ্য এসব ওঁর উঠতি-বয়সের সময়ের কথা। কিছুটা ক্ষমার চোখেই দেখা উচিত ওসবকে। কিছুদিন আগে বাংলা একটি মাসিক পত্রিকায় 'প্রণম্য পাঁচজন' বিভাগে ওঁর জীবনী বেরিয়েছিল। তাতেও ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গিই নেওয়া হয়েছিল। লেখা হয়েছিল, ছেলেবেলায় অনেকানেক মনীষীর মতোই প্রমোদবাবুও অত্যন্ত ডানপিটে ছিলেন। তাঁহার দাপটে পাড়াপড়শী সর্বদাই তটস্থ থাকিত।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল গ্রাম থেকে প্রমোদবাবু উধাও হয়েছেন। এবং একটি মেয়েও। এ দুটো নিরুদ্দেশের ভেতর কোনো যোগসূত্র নাও থাকতে পারে, তবু গ্রামের দু-চারজন সাহসী লোক এ সূত্রে আলোচনার সূত্রপাত করলেন। কিন্তু প্রমোদবাবুর হঠাৎ আবির্ভাবের ভয়েই বোধ হয়

প্রসঙ্গটা খুব বেশি সরব হয়ে উঠতে পারল না। কিন্তু প্রমোদবাবু আর গ্রামে ফিরলেন না। একেবারে যে ফিরলেন না তা নয়, ফিরেছিলেন মাত্র একবারের জন্য। তাও দীর্ঘদিন পর—মা মারা যাবার সময়। খবরটা কে দিয়েছিল জানা যায় না। নাকি পৃথিবীর অনেকানেক বিখ্যাত মাতৃভক্তের মতো মন থেকেই সাড়া পেয়েছিলেন তিনি কে জানে। তবে তিনি ঠিক সময় মতোই এসেছিলেন। এবং মামাতো ভাইরা এসে দাবি বসানোর আগেই দিদিমার নামের সম্পত্তিটা বিক্রির ব্যবস্থাটাও করেছিলেন। অবশ্য নিজের কৃতিত্বেই ইতিমধ্যে নিজের অবস্থাটা ফিরিয়ে গ্রামে ফিরেছিলেন। যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত কি যেন একটা ব্যবসার দৌলতে। গ্রামের লোক সে ব্যবসা সম্বন্ধে উৎসুক ছিল না, তাঁর দৌলত দেখে এবং তার ছিঁটেফোঁটা দাক্ষিণ্যেই বিগলিত হয়ে গেল সবাই। মুষ্টিমেয় দু-একজনের সেই মেয়েটি প্রসঙ্গে প্রবল ঔৎসুক্য থাকলেও আলোচনার ঠিক সাহস বা সুযোগ করে উঠতে পারল না। কারণ গোটা গ্রাম তখন প্রমোদবাবুর আসন্ন মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপক ও বিরাট পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে মুখরিত। তারপর মাতৃশ্রাদ্ধ মিটিয়ে সেই যে তিনি গ্রাম ছাড়লেন, সেই শেষ ছাড়া। এবং কেন যেন এবারও একই সময়ে গ্রামের তিন-চারটি মেয়েও গ্রাম ছাড়ল। এ সব ঘটনা গত যুদ্ধের সময়ের।

—এই যে শুনছ, দৌড়ে এস তো।

আপন মনে গড়িয়ে-চলা অলস চিন্তাটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরে। গিয়ে দেখি রমা স্তম্ভিত হয়ে রান্নাঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা দূরে চিনির প্লেটের উপর দিয়ে অসঙ্কোচে হেঁটে যাচ্ছে একটা বিরাট বপু কেঁচো। সহানুভূতির স্বরে স্বগতোক্তি করলাম, সত্যিই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল এরা। তারপর একটা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে তুলে ফেলেছিলাম সেটা বাইরে। মনোরমা দেবী দেখলাম কাঁচুমাচু মুখে আরো দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

আবার এসে নিজের বিছানায় টানটান হলাম। কিন্তু আগের চিন্তাটা কিছুতেই আর জোড়া লাগাতে পারলাম না। শুয়ে শুয়ে নিজের মনেই হাসি পেল মনোরমা দেবীর কেঁচোভীত মুখশ্রী মনে করে। একটু আগের বেশ-থাকা তৃপ্ত কচি মুখখানা কি করুণই না দেখাচ্ছিল।

মনোরমা দেবীর সঙ্গে প্রমোদবাবুর বয়সের ফারাকটা একটু বেশিই মনে হয়। প্রমোদ-ভক্তদের কাছে শুনেছি চির-কৌমার্যই নাকি প্রমোদবাবুর ব্রত

ছিল। নারী জাতির প্রতি তাঁর কোনো রকম আকর্ষণ ছিল না। অবশ্য প্রমোদ-বিরোধীরা এই বিকর্ষণকে অর্থনীতির 'ল অফ্ ডিমিনিশিং ইউটিলিটি'র সংজ্ঞায় ফেলত। সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটি গরিব বিধবাকে অনূঢ়া কন্যাদায়মুক্ত করার জন্যই নাকি বন্ধু ও গুরুজনদের অনুরোধে প্রমোদবাবুর ব্রত ভাঙতে হয়। ওঁর তখন বয়সের ঝরনা যৌবনের পাহাড় ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের সমতলে পা দিয়েছে। কিন্তু কর্তব্যবোধটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় মেয়েটির বয়সের দিকে না তাকিয়েই ওঁকে মেয়েটির ভার তুলে নিতে হয়। এবং ভার তুলে নেবার পর তিনি প্রথম লক্ষ্য করলেন যে মেয়েটি সবে কৈশোর ছাড়িয়েছে এবং সে অপূর্ব সুন্দরী (প্রমোদ-বিরোধীরা অবশ্য বলেন এ বিয়ের জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল ওঁর)। সত্যি-মিথ্যা জানি না, কিন্তু একটা কানাঘুষা শুনে খুব খারাপ লাগত আমার, প্রমোদবাবু নাকি স্ত্রীর প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করেন না। অবশ্য চাকরবাকরদের তিনি সব সময় ছড়ির উপরেই রাখতেন শুনেছি। মাঝে মাঝে দেখেছিও। পরস্ত্রী সম্বন্ধে নিজ স্ত্রীর কাছে সহানুভূতি একমাত্র পাগল ছাড়া কেউ সজ্ঞানে প্রকাশ করে না বলেই প্রমোদবাবুর এই ভৃত্য-শাসন প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে মতামত প্রকাশ করতাম আমি। কিন্তু রমার কাছে কেন যেন খুব পাত্তা পেতাম না। নির্লিপ্তভাবেই জবাব দিত ও, তা সবাই তোমার মতো মিনমিনে ভিজে পুরুষ হবে নাকি। রাগী পুরুষের ভাত হয়। এর উপর আর কথা বাড়ানর সাহস পেতাম না আমি। কারণ নিজের কৃতিত্বে কেবলমাত্র ভাতটুকু সংগ্রহ করতেই আমি প্রায় গলদঘর্ম। সত্যিই আমার নিরাগ পৌরুষই সেজন্য দায়ী কি না কে জানে!

আর অস্বীকার করব না প্রমোদবাবুর সত্যিই পৌরুষ ছিল। এবং পপুলারিটি। পাড়ার লোকের ভিড় লেগেই থাকত ওঁর বাড়িতে। এর চাকরি দরকার, পাঠিয়ে দিলেন প্রমোদবাবু সরাসরি কোনো মন্ত্রীর কাছেই হয়তো। এর মেয়ের বিয়ে, কিছু চালের দরকার, হোক র‍্যাশানের বা গোলমালের বাজার, ঠিক কোনোখান থেকে যোগাড় করে দেবেন তিনি চাল। পারমিটের সিমেন্টের জন্য বাড়ি আটকে আছে, ঠিক মতো ধর গিয়ে প্রমোদবাবুকে, ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে পারমিট। পাড়ার ক্লাবগুলোকে তিনি চাঁদা দেন দরাজ হাতে। ক্রিয়াকর্মে খাওয়ান পাড়া উজাড় করে। পনেরই আগস্ট তো রীতিমত এক জমকালো অনুষ্ঠান করে বসেন। দু-মাইল

দূর থেকে দেখা যায় এমন উঁচু করে পতাকা টাঙান। বিরাট উচ্চ বংশের পতাকা।

রমা এ সুযোগটাও হাতছাড়া করে না। খোঁটা দিয়ে শোনায়, আচ্ছা, তোমাদের কি শখ-আহ্লাদ বলতে কিছু নেই। বড়ো না পার ছোট একটা পতাকাও তো পকেটে করে আনতে পার অফিসফেরতা। এককালে তো শুনি খুব দেশের কাজ করতে। ঐ করতে গিয়েই আজ এই অবস্থা। যত সব হুজুক।

আমি চটি না। স্বভাবসুলভ হেসে বলি, বলতেই বলে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে। গত বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জেলেও গিয়েছিলাম। শুনেছি প্রমোদবাবু তখন গভর্নমেণ্টের কনট্রাকটার ছিলেন। আমি বোধ হয় সময়ের ধোপে টিকতে পারলাম না। তিনি টিকে ধাপে ধাপে উঠে গেলেন। আর মাছের পয়সায় পতাকা আনলে তুমিই কি উল্টে চটতে না। বেশ, অভয় দাও তো সামনের বার তাই করি।

রমা কিছু একটা হয়তো উত্তর দেয়, কিন্তু বোঝা যায় স্বর অনেক মোলায়েম হয়ে এসেছে। রমাও জানে, পতাকা কিনতে হলে চুলচেরা হিসেবের পয়সা থেকে কিছু একটা ছাঁটকাট করতেই হবে। নয়তো ধার। আমিই তখন উল্টে সাহস পেয়ে ওকে বাণী দেবার ভঙ্গিতে বলি, দেখ, দেশভক্তিটা অন্তরের জিনিস। বাইরে তার ঘোষণা না থাকলেই কি সেটা নেই বলে ধরে নিতে হবে ?

রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে বড়ো ঘরে এসে খাটের ওপর উঠতে পারলে যেন বাঁচে রমা। এ ঘরের মেঝেটা পাকা। মেঝে খুঁড়ে এখানে কেঁচো উঠতে পারে না। খাটের ওপর পা তুলে বসে প্যানপ্যান করে রমা, আর কেঁচোরও এক একটা সাইজ দেখেছ ? যেন সাপের বাচ্চা। অন্ধকারে দেখে তো মাঝে মাঝে আমি সাপ ভেবে আঁতকে উঠি।

আমি হেসে বলি, সাপকেও হয়তো কত সময় কেঁচো ভেবে অবহেলা কর।

রমা আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। তাকিয়ে কি যেন নিটিপিটি করে খোঁজে। তারপর মিষ্টি নরম একটু হেসে বলে, তুমি অনেক দিন কিছু লিখছ-টিখছ না কিন্তু। সেই গল্পটা শেষ করেছ ?

আমি পাশ ফিরে শুই, নেশার লেখা, রয়েসয়ে শেষ করলেই হবে। পেশা বলে নাকে দড়ি দিয়ে লিখিয়ে নিত লোকে। তারপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলি,

আজ একটা বড়ো ফাঁড়া কাটল কিন্তু মনোরমা দেবীর। মুখ দেখে মনে হল, কেঁচোটা আর একটু বড়ো হলেই বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন উনি।

রমা অবলীলাক্রমে আমার যোগান অস্ত্রটা আমার দিকে ফিরিয়ে হেসে বলল, কি করবেন, অভ্যেস নেই তো। প্রমোদবাবু তো তাঁর স্ত্রীকে কেঁচোর চাঁদের হাটের মেলায় বসিয়ে রাখতে পারে নি।

দেখলাম উত্তর দিতে হলেই হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রমোদবাবুকে নিয়েও কিছুটা টানাহেঁচড়া করতে হয়। সেটা খুব কাম্য মনে হল না বলে চুপ করে গেলাম।

প্রমোদবাবুর সঙ্গে আমার খুব একটা ঘনিষ্ঠতা নেই। নেহাত পথে দেখা হলে 'কেমন আছেন, ভালো আছি' পর্যায়েরই আলাপ। অবশ্য এ তল্লাটে একমাত্র ওঁর বাড়িতেই ফোন থাকায়' কালেভদ্রে কলকাতা থেকে নিরুপায় দু-চারটা ফোন এলে যেতে হয় ওঁর বাড়িতে। তাও একান্ত সংকোচে। কিন্তু প্রমোদবাবু এতে খুব খুশি হতেন না, ঠাট্টা করে বলতেন, আপনি তো মশায় একজন বড় রিসিভার দেখছি। ফোন করার দরকার-টরকার হলেও অসংকোচে চলে আসবেন। অথবা অন্য কোনো দরকার-টরকার থাকলেও বলবেন।

ঠিক বিশেষ কোনো দরকারের কথা খুলে বলেন নি তিনি, তবে আমি বুঝতাম যে, আর সবার মতোই ওঁর কাছে প্রার্থী হয়ে যাই আমি এটা ওঁর কাম্য। ওঁর চৌকাঠ না ছুঁয়েও আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তি দিনের দিনের পর দিন মাথা উঁচু করে বাস করে যাবে এটা বোধহয় খুব খুশি মনে গ্রহণ করতে পারতেন না। অথচ তিনি জানতেন যে অনেক অভাব জড়িয়ে আমার সংসার চালাতে হয়। টাকাকড়িও মাঝে মধ্যে অন্যের কাছে ধার করি। দোকানেও অনেক সময় বাকি জমে যায়। অবশ্য রমার ধারণা অন্য, বড়ো বড়ো পরোপকারীরা নাকি এভাবেই পরোপকারের জন্য মুখিয়ে থাকেন। কে জানে হতেও পারে, দোষটা বোধহয় আমাদেরই ঠুনকো অহমিকাবোধের।

ঠুনকোই তো। নাহলে সত্যিই ওঁর কাছে আমি কী? ওঁর খ্যাতি ও ক্ষমতার পরিধিতে, আমরা কতটুকু? শুধু কি জীবনের মোটা দিক, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ওঁর প্রতিপত্তি অপরিসীম। অবশ্য সেটা বিশেষ করে টের পেলাম গত রবীন্দ্রজয়ন্তীতে। দু-চার কলম লেখার জন্যই কিছু

ছেলেছোকরা আমার কাছেও আসত গল্পগুজব করতে। দু-চারজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকায় মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা সভা-সমিতির সময় আসত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্য। গত রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময়ও পাড়ার ছেলেরা এসেছিল সভাপতি ঠিক করে দেবার জন্য। এ-সব সময় সরস্বতী পুজোর পুরুতদের মতোই অবস্থা হয় সাহিত্যিকদের। পাড়ায়-পাড়ায় ঘরে-ঘরে আজকাল রবীন্দ্রজয়ন্তী। অথচ সাহিত্যিক জন্মান বোধহয় লক্ষ ঘর প্রতি একজন। সুতরাং সাহিত্যিক-সাহিত্যিক চেহারা হলেও সেদিন সভাপতিত্বের দায় এড়িয়ে পথ চলা মুস্কিল। অগত্যা প্রথম সারির কোনো সাহিত্যিককে আপ্রাণ চেষ্টায় সংগ্রহ করতে না পেরে তরুণ এক সাহিত্যিককে কোনোক্রমে ঠিক করে দিলাম। ছেলেরা আমার কাছ থেকে প্রমোদবাবুর কাছে গেল কয়েকজন শিল্পী ও প্রয়োজন হলে সভাপতিকে আনার জন্য একটু গাড়িটা চাইতে। তিনি নাকি ওদের পেট পুরে খাইয়ে হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এবার থেকে কিন্তু যিনি সভাপতি ঠিক করবেন তাঁরই গাড়ি ঠিক করে দিতে হবে। ছেলেরা ওঁর সরল রসিকতায় সহজ মনের পরিচয় পেয়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিল। এবং আমোদে হো হো করে হেসে উঠেছিল ওঁর সঙ্গে (পরে শুনে অবশ্য আমিও হেসেছিলাম মনে মনে—অনুকম্পায়)। অবশ্য গাড়িটাও তিনি দিয়েছিলেন। সারাদিনের জন্যই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিরাট একটা বিপদ থেকেও সেবার তিনি উদ্ধার করেছিলেন। উৎসবের ঠিক আগের দিন আমার খুঁজে-দেওয়া সাহিত্যিক ভদ্রলোক সংবাদ পাঠালেন, বিশেষ প্রয়োজনে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে তাঁর। ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। কিছুটা ভেবে শেষ পর্যন্ত আমিই বললাম, এক কাজ কর না, প্রমোদবাবুকে বলে দেখ না।

একজন মুখ ফসকে বলে বসল, থুঃ, সাহিত্যিকরা ওকে বাড়ি ঢুকতে দিলে তো।

ছোট্ট একটা ধমক দিলাম ছেলেটিকে, ছি ছি, ওভাবে কারো সম্বন্ধে বলা উচিত নয়। বিভিন্ন মহলে ওঁর খুব ভাল প্রতিপত্তি আছে শুনেছি। বলেই দেখ না।

আমাকে পর্যন্ত স্তম্ভিত করে দিয়ে সেবার বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে তিনি সভাপতি করে এনেছিলেন। এমনকি নিজেই গাড়ি করে

নিয়ে এসেছিলেন। চোখেমুখে সেদিন ওঁর নতুন এক দ্যুতি ফেটে পড়ছিল যেন। আদ্দিকে লজ্জা-দেওয়া খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবিতে সত্যিই সেদিন অপূর্ব লাগছিল প্রমোদবাবুকে।

রমা শেষ চুনটুকু দাঁতে কেটে বোঁটাটা বাইরে ফেলে দিল। তারপর আমার মাথার কাছে এগিয়ে এল, না, তোমার এই চুলের সঙ্গে তো পেরে উঠছি না।

আমি হেসে মাথাটা এগিয়ে দিলাম, চেষ্টারও তো অন্ত নেই।

আমার ক্রমপক্কমান চুলগুলো সম্বন্ধে আমি নিরাসক্ত থাকলেও রমা তা পারত না। সংসারে পাকা মাথার দাম থাকলেও কোনো মেয়েই বোধহয় চায় না স্বামী ত্রিশ পেরোতে না পেরোতেই পাকা মাথার মালিক হোক। তাই সময় পেলেই আমার মাথায় রমার হস্তক্ষেপ ঘটে থাকে।

আমেজে হালকা স্বরে বিশেষ কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করলাম, আজ নতুন কি গয়না দেখিয়ে গেলেন প্রমোদ-গৃহিণী ?

রমা একটা চুল আয়ত্তে আনতে আনতে বলল, ভদ্রমহিলাকে আজ একটু চিন্তিত দেখলাম। গয়না-টয়নার কোনো কথাই তুললেন না আজ।

একটু হেসে বললাম, অত উঁচু জমিতে উঁচু বাড়িতে বাস করেও তাহলে চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না দেখছি। তা চিন্তাটা কি নিয়ে ?

রমা চুলটা টেনে তুলে নিরাসক্তভাবে বলল, কি যেন সব খাদ্য নিয়ে আন্দোলন-টন হচ্ছে না, তাতে আগামী কাল সব চালের গুদাম ঘেরাও না কি সব হবে, তাই।

একটু অবাক হলাম, তা চালের গুদাম ঘেরাও হলে ওঁদের কি ?

রমা বলল, কেন, জান না, প্রমোদবাবুর তো শোভাবাজারের দিকে কয়েকটা গুদাম আছে।

ঠিক জানতাম না। কি কি যেন সব ব্যবসা আছে ওঁর তা জানতাম। এবং সেগুলো যে বেশ লাভজনক তাও বুঝতাম। এর চেয়ে বেশি জানার আগ্রহ বা উৎসাহ কোনোটাই ছিল না। তবু কেমন যেন একটু অভয় দেবার স্বরে বললাম, না না, এতে ভয়ের কিছু নেই। কোনো গোলমাল হওয়া তো উচিত নয়। গভর্নমেণ্ট থেকেই পাহারা রাখবে দরকার হলে।

রমার বোধহয় ঘুম এসেছিল। তোলা চুলটা ফেলে দিয়ে আর নতুন

করে হস্তক্ষেপ-করল না আমার মাথায়। একটা বালিশ টেনে নিতে নিতে বলল, না, প্রমোদবাবুও নাকি মোটেই ভয় পান নি। উনি নাকি বলেছেন, পুলিশ-টুলিশের দরকার নেই। দরকার হলে নিজেই উনি বন্দুকহাতে ওদের মোকাবিলা করবেন। লোকটার সাহস আছে কিন্তু, না?

এরপর সেটা সত্যিই অস্বীকার করা শোভা পায় না। বললাম, হ্যাঁ, লোকটাকে বেশ তেজী মনে হয়।

কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। দিন কয়েক পর রমা হঠাৎ চা দিতে দিতে বলল, জান, সেদিন কোনো হাঙ্গামা হয় নি, বেশ ভালয় ভালয় কেটে গেছে দিনটা।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিনটা?

রমা বলল, সেই যে, গুদামে হানা দেবার দিন।

হো হো করে হেসে উঠলাম, তাই বল, প্রমোদবাবুদের কথা বলছ। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছিল বুঝি তোমারই কোনো গুদামে হাঙ্গামা হবার কথা ছিল সেদিন।

কিন্তু হাঙ্গামাটা সেদিন না ঘটলেও পরদিনই ঘটে গেল। বরং বলা চলে পরদিন থেকেই শুরু হল। ঠিক মতো ব্যাপারটা উপলব্ধি করার আগেই একটা প্রচণ্ড রক্তাক্ত ঝড় শুরু হয়ে গেল যেন। প্রাণ হাতে করে অফিস করলাম দুটো দিন। তৃতীয় দিনে আরো উগ্র মূর্তি ধরল পরিস্থিতি। অন্যান্য কোনোবার কলকাতার এসব সাময়িক হাঙ্গামা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে না। কিন্তু এবার আমাদের শহরতলির দিকেও দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ল হাঙ্গামাটা। সমস্তটা দিন প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে, আবেগে কাটল। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে এল।

এর ভেতরই আর এক ঝামেলা রান্নাঘরের কেঁচো। কদিনের বৃষ্টিতে কেঁচোগুলো নরম মাটি ছেড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ঘরের চারদিকে। অতিষ্ঠ করে তুলল জীবন। তবু বাঁচোয়া, চারদিকের এই হৈ-হাঙ্গামার জন্যই বোধহয় কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল রমা। আরো বড় এক আতঙ্কে শঙ্কিত থাকায় ছোটখাট আতঙ্কগুলো সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

রাত ক্রমেই বাড়তে লাগল। সমস্ত তল্লাট জুড়ে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। মুহুর্মুহুঃ নতুন সংবাদ এসে আছড়ে পড়তে লাগল

পাড়ায়। উত্তেজনাও ক্রমে বেড়ে চলল। কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘরে বসে থাকা ছাড়া উপায় রইল না। রমা আগেই ভয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

রাত এগারোটা নাগাদ হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়া শুনে উঠে গেলাম। রমা নিষেধ করতে যাচ্ছিল, ওকে ধমকে থামালাম। কে এসেছে কে জানে। কোনো বিপদে পড়েও তো আসতে পারে। কিন্তু দরজা খুলে হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলাম। আপনা থেকেই বিস্মিত প্রশ্ন বেরিয়ে এল, আপনি!

প্রমোদবাবু কেমন যেন একটু বোকা বোকা হাসলেন, হেঁ হেঁ, এই একটু এলাম অশোকবাবু।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আসুন, আসুন। তারপর, কোনো খবর-টবর আছে নাকি?

কিছুটা ইতস্তত করে বললেন প্রমোদবাবু, না, এই এমনি এলাম।

একেবারে এমনি যে আসেন নি তা বেশ বুঝেছিলাম। তবু সামনা-সামনি আর জিজ্ঞেস করলাম না সেটা। ভদ্রতায় বাধছিল বলে।

প্রমোদবাবুকে এনে ঘরে বসালাম। রমা আমাদের আসতে দেখে আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ কথা হাতড়ে না পেয়ে দুজনেই চুপচাপ বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমিই অগ্রণী হলাম। স্বরে চেষ্টাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য এনে হেসে বললাম, তারপর, এ গরিবের কুটিরে হঠাৎ কি মনে করে প্রমোদবাবু?

প্রমোদবাবু কেমন যেন একটু বোকা-বোকা হেসে বললেন, ধরুন আজ রাত্রের মতো আপনার এখানে অতিথি হয়ে এলাম।

বললাম, সে তো আমার সৌভাগ্য।

প্রমোদবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর স্বর নিচু করে বললেন, ঠাট্টা নয় অশোকবাবু, সত্যিই আজ রাতটা আপনার বাড়ি থাকব ভাবছি। অবশ্য আপনার কোনো আপত্তি না থাকলে।

এবার আমি সত্যিই বোকা বনে গেলাম। প্রমোদবাবু কি গম্ভীর চালে রসিকতা করছেন, না, সত্যিই বলছেন? আর হঠাৎ ঠাট্টা করতে আমার বাড়িতেই বা এত রাত্রে আসতে যাবেন কেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, ওঁর চোখে-মুখে কিছুমাত্র রসিকতার ছাপ নেই।

—না, আপত্তি নেই কিছু। কিন্তু কেন বলুন তো, আমি কিন্তু ঠিক বুঝছি না ব্যাপারটা।

প্রমোদবাবু আমার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিলেন। তারপর স্তিমিত স্বরে বললেন, এই হৈ-হাঙ্গামার মধ্যে বাড়ি থাকাটা ঠিক সেফ্ মনে হচ্ছে না।

আমি বিস্মিত হলাম, কিন্তু আমার আপনার এতে ভয়ের কি আছে। বাড়ি থেকে না বেরোলেই হবে।

প্রমোদবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন, বলা যায় না, বাড়িটা অ্যাটাক হতে পারে ভয় পাচ্ছি।

হঠাৎ ওঁর বাড়ি কেন জনতা আক্রমণ করে বসতে পারে ঠিক ভেবে পেলাম না। কিন্তু এ আশঙ্কার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো দৃঢ় ভিত্তি আছে সেটুকু ওঁর চোখ-মুখ দেখেই বুঝলাম। কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করায় সে অবান্তর প্রসঙ্গ আর তুললাম না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়ে, তারা কোথায় ?

প্রমোদবাবু সিগারেট কেস বের করতে করতে বললেন, সকালেই ওদের মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমিও সন্ধ্যের পর চেষ্টা করেছিলাম চলে যেতে, কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে সাহস পেলাম না গাড়ি বের করতে।

একটু চিন্তা করে বললাম, আপনি পুলিশের হেল্প চাইলে পারতেন। সত্যি সে-রকম কোনো হাঙ্গামা হলে কি আমার পক্ষে আপনাকে সেফ রাখা সম্ভব হবে ?

একটু ম্লান হাসলেন প্রমোদবাবু, পুলিশেরই এখন মিলিটারীর হেল্প চাইতে হচ্ছে বোধহয়। আর তাতে ফল আরো খারাপই হত হয়তো। না হলে কিছু বড়ো বড়ো পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে তো প্রচুরই জানাশোনা আছে।

কথা শেষ করে মাথা নিচু করে নখে চেয়ারের হাতলটা খুঁটতে লাগলেন প্রমোদবাবু। আর এই নতুন প্রমোদবাবুকে অবাক দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম আমি।

কিন্তু দুজনারই ধ্যান ভঙ্গ হল রান্নাঘরের দিক থেকে একটা আর্তনাদ শুনে। কেমন যেন চেয়ারে বসেই আঁতকে উঠলেন প্রমোদবাবু। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন। আর রমা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে এল দরজার পাশে, শিগগির এস তো একবার, একটা সাপ।

প্রমোদবাবুকে বসতে বলে তাড়াতাড়ি ভেতরে গেলাম। রমা ও ঝির ঐকতানে রান্নাঘর তখন প্রকম্পিত। দূর থেকে দেখলাম একেবারে কোণের দিকে অন্ধকারের ভেতর এঁকেবেঁকে কালো মতো সরু কি যেন পড়ে আছে। কেমন যেন সন্দেহ হল। ওদের সরিয়ে সাহসে ভর করে সামনে গিয়ে দেখি, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। কিছুটা অনুযোগের সুরেই ধমক দিলাম রমাকে, ভালো করে না দেখেশুনে কি যে সিন ক্রিয়েট করে বস মাঝে মাঝে। বাইরের ঘরে ওরকম একজন লোক বসে কি ভাবলেন বল তো। দাও দেখি একটা কাঠি-ফাটি কিছু।

রমাকে ভয়মুক্ত করে ঘরে ফিরে এসে দেখি প্রমোদবাবু কেমন যেন ভেঙেচুরে বসে আছেন চেয়ারের ভেতর। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। আঙুলের ফাঁকে দামী সিগারেটটা একমনে পুড়ে চলেছে। গভীর চিন্তার ছাপ চোখেমুখে —এবং ভয়ের।

আমাকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন প্রমোদবাবু, কি, সত্যিই সাপ নাকি ?

হেসে সোজা ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কোথায়! দূর থেকে সাপ মনে করে ভয় পেয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখি সাপের মতোই দেখতে একটা কেঁচো। বন্যার ভয়ে বোধহয় নিজের গর্ত ছেড়ে আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সব।

প্রমোদবাবু কেমন যেন ভীতু-ভীতু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর কেমন যেন একটা দ্বিধান্বিত সমর্থনসূচক বোকা-বোকা হাসির রেখা ফুটে উঠল ওঁর পাংশু মুখের ওপর।

পাখিরা…

অতীন্দ্র মজুমদার

যুগ থেকে যুগান্তের ধূপের ধোঁয়ায় ডানা মেলে
অগণন অবিচ্ছিন্ন উড়ে যায় পাখিদের সারি—
নিরুপম জ্যোৎস্নায় অরণ্য-ধনুর থেকে যেন
পরিচ্ছন্ন তীরগুলি আরেক আকাশে দেয় পাড়ি।
হয়তো কপোত তারা। কিংবা দৃঢ়চঞ্চু সিন্ধুচিল,
সমুদ্রের বেলাভূমে মৃতদেহ খুঁটে ক্লান্ত যারা ;
হয়তো বা নীলকণ্ঠ, হীরানন, ভোরের কোকিল,
নীলিমার কুহকের স্নিগ্ধ মদে মত্ত আত্মহারা ॥

নরম নদীর মতো আকাশের সুবিশাল হ্রদে
বারবার ভাসে ডোবে, ডানাগুলি জ্যোৎস্নায় ধোওয়া,
হাওয়ার শয্যার পরে আছড়িয়ে অবোধ বিস্ময়ে
মেঘের ওষ্ঠের পরে দিয়ে যায় পুলকের ছোঁওয়া।
নক্ষত্রের নীল চোখ স্বপ্নের কাজলে আতুর
সে কাজল মেখে নিয়ে গ্রহদের অনন্ত বিস্তারে—
বিন্দু হয়ে মেশে তারা নীহারিকাপুঞ্জের ছায়ায়
—বিহ্বল শিশুর মতো জননীর স্তনের ভাণ্ডারে ॥

তারপর ভোর হয়। আকাশের হৃদয়ের জ্বালা
ধ্বক ধ্বক জ্বলে ওঠে একচক্ষু সূর্যের নয়নে,
গলিত তামার মতো বিবর্ণ বিতৃষ্ণাগুলি এসে
যবনিকা টেনে দেয় রাত্রির প্রমত্ত প্রাঙ্গণে।
তখন পাখিরা থামে। মুছে ফেলে ডানার আকুতি ;
তীক্ষ্ণ চঞ্চু ঘষে নেয় আলোকের ধারালো কুঠারে—
তারপর যূথভ্রষ্ট পাখিগুলি শাণিত বিশ্বাসে
ঝাঁপ দেয় তিসি, তিল, যব আর ধানের পাহাড়ে ॥

পটভূমিকা

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

॥ এক ॥

একটি মেয়ের দেহে যৌবনের আবির্ভাব হল।

নিতান্ত সামান্য ঘর সংসারের তরী টলোমলো
দৈনন্দিন ঝড়ের আঘাতে। তাই কেউ দেখতেই পেল না
একটি মেয়ের দেহে জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা
জন্ম থেকে আজ এক ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঢেলে ঢেলে
একান্ত আগ্রহভরে দুখানি ব্যাকুল বাহু মেলে
সে মাটিতে উঠে দাঁড়িয়েছে—যেখানে প্রত্যেক দিন তার
রঙিন শাড়ির তৃষ্ণা পেটের আগুনে বারবার
পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তাই এই আশ্চর্য ঘটনা
কেউ যেন ভাল করে চোখ মেলে দেখেও দেখল না।

বাংলা দেশে বহু মেয়ে, অনেকেরই এসেছে যৌবন
হঠাৎ ঘরের পাশে পড়ে-থাকা শীর্ণ নদী কবে ও কখন
নিঃশব্দ শিশিরবিন্দু পান করে অকস্মাৎ রুক্ষ বালুকার
নিষেধ উপেক্ষা করে ছুটে গেছে, সে খবরে কার
কতটুকু প্রয়োজন—যৌবন এসেছে নিত্য, হয়তো আয়নায়
কখনো নিজের মুখ নিজেকে ডেকেছে ইশারায়
রুদ্ধ কান্না স্তব্ধ রাতে কখনো বা দীর্ঘ পাথরের
পথ বেয়ে ঝরে গেছে—এমন দৃষ্টান্ত আছে ঢের।

শৈশব স্মরণে নেই, কৈশোর অনেক দীর্ঘপথ
প্রশ্নহীন ক্লান্তিকর চলা, আর বাঁচার শপথ
প্রতিদিন ভেঙে যেতে দেখে শুধু উৎকট বিস্ময়ে চেয়ে-থাকা
একান্ত অভ্যস্ত এই মেয়েটির, তাই ওর জীবনের চাকা
কখন যে মধ্য রাত্রে গড়িয়ে গড়িয়ে ঢিমে তালে
পৌঁছেছে হঠাৎ এই পাখিডাকা আরেক সকালে
সে সংবাদ বহুদিন সে নিজেই জানত না—তাই
যেদিন হঠাৎ তার মনে হল এই রুক্ষ বন্ধ্যা মাটিটাই
অজস্র ফুলের ভারে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে তার
সব দুঃখ মুছে দেবে, সেইদিন থেকে বারবার
সহস্র কাজের ফাঁকে উচ্চকিত তার দুটি চোখ
দেখেছে প্রাচীন এই পৃথিবীর নতুন আলোক
গাছের চারার মতো।

এত বড় আশ্চর্য ঘটনা
ঘটে গেল, চারপাশে কেউ যেন দেখেও দেখল না

দুটি অনুভব

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

। এক ।

সেই বৃদ্ধ ধীবরের মুখে
গান শুনি ঃ "সমুদ্র জীবন
জীবন সমুদ্র······আমি তাকে
সব দেব, আমার গোপন
চুমাগুলি ॥"

। দুই ।

তোমার অশোক অমল হোক, কবি
প্রেমের চেয়ে নিবিড় যেন তোর
শান্ত দিনগুলি
দ্বিপ্রহরে নিজেকে নত করে।

মাটির তাপ শরীরে নিয়ে মাটিকে কর
রূপসী শীতলতা ॥

ইতিহাসের কাল

শ্যামসুন্দর দে

প্রজ্ঞার গভীরে নির্বাণ লাভ
বোধি বৃক্ষ খুঁজে খুঁজে অরণ্যে পরিভ্রমণ।
অন্ধকার গুহা থেকে যে মানুষ এল
মশালের আলো ধরে পায়ে পায়ে পথ-চলা
যূথবদ্ধ জীবনের ছবি,
আপাতত ফসিলের আড়াল।
সেই সব দিনগুলো ইতিহাস
পাতায় পাতায় তার কাহিনী
আর সেই পায়ে পায়ে হেঁটে-চলা
ধূলোর পাহাড় ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে।
মানুষ একটু শান্তি চায়।
আরণ্যক যুগ থেকে আলোর সন্ধান
সময়ের ইতিহাসে কয়েকটা যুগ
পার হয়ে চলে এল মানুষ।

অন্বেষণ শেষ হল তার কোথায়!
যুগান্তরে পথ হল ভিন্ন
চৈতন্যের প্রজ্জ্বলিত দীপ
আর একটা উৎসের সন্ধানে।
সে এক দুরন্ত নদী
উজ্জীবনের গানে সে মুখরিত
শুকনো বালির স্তরে প্রসারিত প্রাণ,
মাটির আড়ালে যত কান্না
সে নদীর পলি ঢাকা দেবে।
আমি সেই নদী খুঁজি
সমুদ্রে যে নদী যাবে।

ইতিহাস শেষ হল কোথায়
কালের লেখাতে তার অধ্যায় বাড়ে।

গুণ্ডা

সুভাষ চক্রবর্তী

কৃষ্ণা গাঙ্গুলীকে নিয়ে কখনও গল্প হয়? হয় না নিশ্চয়। দেখেছি যে বহুবার! হলে অন্তত কেউ বলত। একটা গোটা গল্প কখনও চুরি করেও স্বপ্নে দেখিনি।

মনে হয় গল্প তো দূরের কথা, উপন্যাস লিখলে ক্ষতি নেই। অবশ্য যদি সে রকম জোর শর্ত আরোপ না করে কেউ।

না, শর্ত মানতে রাজী। ভক্তের সংখ্যাই তো হাজার। মশাইকে নিয়ে হাজার এক। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্রথম মুদ্রণ নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দেবে না। কাট্‌তি হবে প্রচুর।

বলা চলে উপন্যাস হয়। হ্যাঁ উপন্যাস। ফর্মাটা পরে ঠিক হবে। দেখেশুনে দুটো খণ্ড অনায়াসে লেখা চলে।

ভক্তের দল যখন তন্ন তন্ন করে দুটো খণ্ড পড়বে। গিলবে। ইতিমধ্যে তৃতীয় খণ্ডটা পাতে দিলে টেরই পাবে না। নামটা যেন বার কয়েক পাতায় গড়াগড়ি যায়। নামেই মোক্ষ, মোক্ষম।

তারপর সময় করে ভক্তদের সঙ্গে সুরুত করে মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দাও। কাকপক্ষী টের পাবে না ভক্তরা তো শিশু। নগদ তিন টাকা। আর ফালতু ছ আনা গ্যাঁটগচ্চা গেল। বইটার দাম। কৃষ্ণা গাঙ্গুলী নাম।

পাঠক নিজে তো যাবে না। তাহলে বালিশে মাথা দিয়ে ভাববে কে। কাজের ভুল হবে কার। তাই অন্য লোক দিয়ে বইয়ে বই আনবে। আসতে যেতে তার ভাড়া। আর গরম জল ও ধোঁয়া দিয়ে মুখ কুলকুচির পাওনা। তাই তিনের সঙ্গে ছয় যোগ।

পাঠক নাওয়াখাওয়া ভুলবে। বই যতক্ষণ না বউ হল। বউনি করল। বউ বউ করে ডাকল। সাড়া দিল কে।

কেউ না। ঘরের বউ এসে যতক্ষণ না খেতে ডাকল। স্নান করতে ভুল হয়ে গেল। এই যা!

অফিসে কাজ করে। তাহা মিথ্যে বলা হল। তার জন্যেই অনেকে সেখানে কাজ করে। চায়ও। পায় কি।

অনেক প্রার্থী শুভার্থী যেতে গিয়েও ঠেকে যায়। গেলেও মাসে সপ্তাহে অন্তত দুবার দেখে যায়। রেখে-ঢেকে যায়। দেখে দেখে কি পায় কে জানে।

জিজ্ঞাসা করলে ক্ষতি করে। বেশ, কিন্তু এটা কি উচিত হবে। ভাল দেখায়। অফিসের ফাংশনে গান গাইবে কিনা এ অছিলায়।

ভাল দৌড়তে জানে। তুকতাক মানে। বারটার সময় অফিসে চা খায়। শুধু শুধু চা খেতে পারে না। সঙ্গে মুচমুচে বিস্কুট নেয়।

বেশি যায় চিনি। দু বিনুনী। চিনি চিনি ভাব দেখিয়ে হেসে হেসে কথা বলবে। মনে হবে।

গত জনমের মরমের জানাশোনা। ক্রীতদাসী বিকৃত দাসের।

অফিসের অনেক সেকশনে কাজ করেছে অল্প কদিনে। ভাল কাজ জানে। খুব বোঝে কোনটা কাজের কে সহজের।

হালে এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট সেকশনে এসেছে। ইণ্ট্যারভিউয়ের খত পাঠায়। লোক এলে কায়দামাফিক রিসিভ করে।

রিলিফ দেয়। কারোকে ফেরায় না। একটু জিরোতে দেয় না।

আজকের কথা না। অনেকদিন হল তদ্বির চলছে। কোলের ভাইটাকে অফিসে ভর্তি করব। সুরাহা হচ্ছে না কিছুতেই। ইণ্ট্যারভিউ পাইয়ে দিয়েছে। ঐ পর্যন্ত কিন্তু। মনোনয়নপত্র এখনও পাচ্ছে না।

তবে কৃষ্ণা কসুর করেনি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আগেভাগে ইণ্ট্যারভিউয়ের কল দিয়েছে। কেরানীর দৌড় এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট।

বটগাছ নেই। বটের ঝুরিও নেই। মামা নেই। ঘরে ধামাও নেই।

হঠাৎ পরিচিত ডাক নামটা কানে গেল। ভড়কে থমকে গেলাম করিডোরে। এখানে এ অসময়ে কে ডাকে? দূর থেকে মুখের আদল বড় একটা দেখা যায় না।

ফের ঢুকে যাচ্ছি গোঁত মেরে এস্ট্যাব্লিশমেণ্টের ঘরে। আবার ডাকটা উঠল। দূর থেকে হাতছানি দিল।

ঘরের সামনের লম্বা বারান্দার দুপাশে সার সার চেয়ার পড়েছে। কাঁচুমাচু মুখ করে প্রার্থীরা আসছে। কাগজপত্র জমা দিচ্ছে।

গলা বাড়িয়ে ভেতরে খবর নিচ্ছে। চেয়ারে গিয়ে বসে কানাঘুষা শোনে, মন্তব্য করে।

পার ওপর আর একটা পা চালিয়ে দেয়। কনুই ভেঙে থুতনিতে হাত রাখে। ঝুলন্ত পাটা নাচায়। আরাম পায় কি, মনে পড়ে কি ?

লম্বা সারির একবারে শেষ মাথায় তরুণ বসেছিল। প্যান্টের ভাঁজ সামলায়। কাছে যেতে ঝুঁকে পড়ল সামনে। নাগাল না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জায়গাটায় চোখ রাখল। তুলল।

ছুয়ো দিল বহু। চালিয়াৎ হয়ে গেডি বলে টিপ্পনি কাটল। সিগারেট চাইল। পাশের লোকের কাছ থেকে দিয়াশলাই চেয়ে ধরায়। ভুলে পকেটে রাখতে গিয়ে ফিরিয়ে দিল। লোকটাকে ফের ঘুরে স্টাডি করল।

খালি প্যাকেট ফেলে দিল। তাকিয়ে রইল আর আছে কি না। শেষবারের মত দেখে নিল। খেয়াল করেনি তাড়াতাড়িতে।

হল যখন দেখে সিগারেট আরও ছিল। আর একটা মাত্র। বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। তুলে নিলাম। কটা মানুষ কটা মনের আচমনের কথা বলে।

ফিটফাট সায়েব কেরানী মোসাহেব। চোখের গগলস্‌টা আঙুলের ফাঁকে। গোঁফদাড়ি কামানো চুল ফাঁপানো। চুলের দুধারে পালিশ। তেল জল দুইই পড়েছে। মাথার মাঝখানটা শুকনো রুক্ষ। গোটা কয় খাড়া হয়ে রয়েছে। রিং হয়ে কপালে ঝুলছে।

হাতে ঘড়ি নেই। আংটি। বাপমায়ের মানতের আংটি। চকচকের ষ্টিলের। দূর থেকে প্লাটিনামের মত জেল্লা মারে। কেতা করে চোখ ছোট বড় করে দাঁড়ায়। পা বদলে নেয়। স্পষ্ট করে দেখার জন্যে একটু বিশেষ দূরত্ব রাখে।

"কি মনে করে এখানে", কাঁধে হাত রাখার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

সিগারেটের ছাই ফেলতে বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল তরুণ।

হাত ফসকে গলে যায় বুকপকেটে। কাগজ ঠেকতে তুলে আনি। ইণ্ট্যারভিউয়ের হলদে চিঠি। যথাস্থানে আবার রেখে দিলাম। দুজনে হাসলাম।

"শুনছেন", পিঠে কে হাত দিল মনে হল।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তরুণ।

"কিছু বলছেন ?"

"না, আপনাকে না।"

"তবে কাকে ?"

"কি বলছেন", কৃষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম।

"ভাবলাম চলে যাচ্ছেন বুঝি।"

"না চলে যাইনি, অনেকদিন পরে দেখা তাই।"

"ও।"

"আসুন আলাপ করিয়ে দি।"

আলাপ হল। নমস্কার বিনিময় হল। হাসা হল দুজনের। থামা হল। কার যে কিছু খোয়া গেল ঠাহর হল না।

"যাবার আগে দেখা করবেন", বাজে কাগজের মত কথাগুলো ছড়িয়ে দিল। হনহনিয়ে চলে গেল। কোনো জরুরী কাজ মনে পড়েছে বুঝিবা। সীটে বসল! চেয়ার টেনে নেবার আওয়াজ কানে ভেসে এল।

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হবে, গলা ভিজিয়ে আসি চ।"

"যদি ডাকে ?"

"সে হবেখন, এত তাড়াতাড়ি ক্ষেপেছিস।"

"আচ্ছা ডাকবে এখন।"

"ডাকাডাকির ব্যাপারে তিনটে বাজবে।"

"এখন কটা ?"

"বারোটা সবে।"

"এই নিয়ম।"

"না নিয়ম না। সবাই আসবে বসবে। ঠিকঠাক হবে।"

"তা এত সময় লাগবে ?"

"ধীরেসুস্থে হবে, হাঙ্গামা কম!"

সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল। রেলিংয়ে টুনটান করে টোকা মারল তরুণ। বাজনা অজানা। মাঝে মাঝে স্টিলের মত শোনায়।

একতলায় নামা হল। রিসেপ্‌শন আর কেয়ারটেকারের ঘর। পরে হাতখানেক গিয়ে ক্যান্টিন। ডি-এ-জি-পি-টি. অফিসের একতলা।

দুটো চেয়ার টেনে বসলাম। তরুণকে বসিয়ে উঠে গেলাম। সেলফ সারভিস্। চেঞ্জটা বাজিয়ে নি। চা বয়ে আনি। টাইট্ হয়ে বসা গেল।

কৃষ্ণা এসে কাউণ্টারের পাশে দাঁড়ায়। সঙ্গে সেভিংস্ বুকের কালো ঢ্যাঙা মেয়েটা।

কৃষ্ণার ব্যাগটা মেয়েটি ধরল। খুলল। কৃষ্ণা চা নিল। মেয়েটা পয়সা দিল। আর এক হাতে বিস্কুটের ডালি।

এস-বিটি সেকসনের মেয়েটি খাবে না বুঝি। এসেছে এই কত না। সঙ্গে এসেছে এই ভাল। কেন তা কে জানে?

পাশে বসবে, গল্পগুজব করবে। ছেলেদের মাথা আর মেয়েদের পা গুনবে।

কি আর করে কৃষ্ণা বাকি চাটা খায়। ফেলে ছড়ায় আর হাসে। মুখ ডোবায় নথ ডোবায়।

হাসে আর হাসে। এমনি আর চুপচাপ থাকে কেন। এমনিও হাসে দুঃসাহসে।

"চিনলি?"

"না চেনার কি আছে?"

"মেয়েটি খুব দাম্ভিক না?"

"দূর থেকে মনে হয় তা?"

"কথা বললে উত্তর দেয়?"

"কাজও করে দেয়। বেণীর সঙ্গে মাথা?"

কৃষ্ণার কাছে যখন গেলাম ভিড় নেই। একটানা কাজের পর দম নিচ্ছে। ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

"আর এলেন কেন", গলায় কোপ।

"অনেকদিন পরে দেখা।"

"উদ্ধার করে দিয়ে এলেই হত।"

"সে তো একচেটিয়া আপনাদের।"

"কিছু বলল নাকি।"

"না, এমন কিছু না।"

"ও ভারী তো, না বললেন।"

"রাগ করলেও বলছি না।"

"আরও বাড়তি কিছু আশা করেন নাকি?"

হাসা ছাড়া উপায় নেই। হাসার কোনো কারণ নেই। হাত-পা নেই। হাসতে হাসতে না ফেঁসে গেলেই হল। আস্তে।

"ভাইয়ের নাম পেলেন।"

"দেখলাম।"

"পজিসন্ কেমন ?"

"অনেক নিচে।"

"ও!"

"তা ভাবনার কি আছে ?"

"না।"

"প্যানেলে নাম তোলা রইল।"

"তারপর ?"

"ভেকেণ্ট হ'লেই ডাকবে।"

"বলছেন।"

"না আমি না। আমি কে ? অফিস বলবে।"

এত কাজ গাদা হয়েছে অফিস থেকে বেরোনো যায় না। টিফিনেও উপায় নেই। সীটে বসে বসেই সারা হয়। আর থাকতে না পেরে পা বাড়ালাম। হাতে একটা কাজ ছিল। ট্রামের মান্থলি রিনিউ করতে হবে।

অনেকের সঙ্গেই দেখা নেই। কারোর খোঁজখবর পাই না। গেলে বসলে তবে না। তা না খালি টরেটক্কা টরেটক্কা। বেমক্কা হলে একেবারে অক্কা।

মিশন রোয়ের রাস্তায় তরুণের সঙ্গে দেখা। কল দিয়েছে এক্সচেঞ্জ থেকে যাবার। অনেক আগে পৌঁছে গেছে। তাই সময় কল করছে।

ইন্সট্রাকটরশিপের জন্যে পাঞ্জা লড়বে। বেশির ভাগ পরীক্ষা ফিলডে নেমে নমুনা দিতে হবে। ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে। লোক খাটিয়ে বাধা হটিয়ে।

সে সব তরুণের দখল আছে বৈকি। নিজের ওপর বিশ্বাসও প্রচুর। আগে কবছর গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। পরে পাইলটের 'বি' লাইসেন্স পায়। প্রমোশন্ নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে গণ্ডগোল হতে চাকরি ছেড়ে দেয়।

তরুণ সব পারে। পারে না শুধু ঠিক সময়ের জন্য ধৈর্য ধরতে। পারে না আপাতত কোনো কাজ ফেলে রাখতে। কাজ স্থগিত রাখতে।

যা ভাল বুঝবে করবে। পরোয়া করবে না কোনো কিছুর। ঝাঁপিয়ে পড়ে জয় করে। আকাশচারী লণ্ডভণ্ড করবে মর্ত্যটাকে।

স্বভাবটা বড় কোঁদলে কুতূহলে। আগে থেকেই একটা সিদ্ধান্তে আসা চাই। প্রত্যয় হোক আর না হোক। সে পরে হবে এখন।

তরুণ স্কটিশের ছাত্র। ফ্রিশিপে স্কুল থেকে এসে কলেজে বসে। বাড়ির অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না। বাবা নেই। কাকার কাছে থেকে মানুষ।

ভাইবোনদের মধ্যে সেই বড়। মার আশা ছেলেকে মানুষ করবে। চাকরি করলে অভাব ঘুচবে।

গতরে খেটে ছেলেকে পড়ায়। ভিতটা যেন ভাল পাকা হয়। গাছটা যেন আগাগোড়া জল রোদে-পোড় খেয়ে যায়। বয়সে ঝড় মাথায় করতে হবে। গোটা সংসারের মুখে অন্ন গুঁজে দিতে হবে।

সেখানে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা। ছাত্র নির্বাচন নিয়ে চটাচটি। হাতাহাতি হবার উপক্রম। ছাত্র হলেই উচ্ছৃঙ্খল হবার সুবিধে। তারপর সব ইতিহাস। কৃষ্ণা গেল কলেজ স্ট্রীটের বড় থামওয়ালা বাড়িটায়। আর তরুণ খেদিয়ে বেড়াত ছাত্রছাত্রী। টিউশনি আর টিউটোরিয়াল কলেজে পার্টটাইম পড়াত। তাতে না পেট, না পকেট কোনোটাই ভরে না।

কলেজের ইলেকশনে মারমুখী হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণা। চড়িয়ে গাল লাল করে দিত। অনেককে সে টিট্ করেছে। এ আর এমন কি!

পোস্টারে আর কার্টুনে ছেয়ে গেছে কলেজের দেওয়াল আর কমনরুম। সাহায্য করুন, ভোট দিন।

কৃষ্ণা একটা কার্টুন উপভোগ করছে। তন্ময় হয়ে বুদ্ধির তারিফ করছে। চড়াও করল ছাত্রদল।

"কি দেখছেন?"

"কিছু না।"

"বারে দেখছেন।"

"তাতে হয়েছে কি?"

"না জিজ্ঞেস করছি।"

"বারন করছে কে?"

"চটেছেন।"

"না, সামনে বসে গাইবে।"

"গান না হোক, বক্তৃতা শুনি।"

"সময় আছে ?"

"আলবাত আছে।"

"কি বিষয়ে দেব ?"

"নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন যে সম্বন্ধে।"

"জানেনই তো সব।"

"তবুও।"

"আবার কেন ?"

"কার্যকারণ।"

"বলছেন।"

"একান্ত অনুরোধ।"

"ভোটগুলো পাচ্ছি।"

"সে পরের কথা।"

"আগে কথা দিন, তবে না।"

"বললেই কি দেব।"

"ক্ষতি কি।"

"লাভ আছে কিছু ?"

"এতক্ষণের আলাপের মজুরী।"

"ভারি তো, যান যান।"

"ভোট দেবেন ?"

"ভোট কেন, আর অনেক কিছু দিতে পারি।"

"দেবেন।"

"দিতে বলুন।"

অন্য কিছু মানে করতে মনে করতে পারে না। ফিক্ করে হেসে দেয়। সেই হাসি মিটিমিটি। হেসে হেসে দুজনে কুটিকুটি।

হাসিটা আর শেষ করে না। তক্কে থেকে গিলে ফেলে। ঘুরে কোমরে হাত রেখে রুখে দাঁড়ায়। কটমট করে তাকিয়ে দুচোখ দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। বদমাইশদের পিঠে শপাং করে যদি চাবুক পড়ত তাহলে রাতে একটু ঘুম আসত। পেট ভরে যেত।

আরও একবার আগে তরুণ এসেছিল কার্ড রিনিউ করতে। তখন দেখা কৃষ্ণার সঙ্গে। সঙ্গী এমবির সেই লম্বা মেয়েটি।

কোনো কাজ থেকে ফিরছে বুঝিবা। হাতখালি, ব্যাগ নেই। সোনার চুড়ি সাবানের জলে চুবিয়ে এসেছে।

দূর থেকে চিনল। নাম ধরে ডাকল। আলাপ করিয়ে দিল বান্ধবীর সঙ্গে। গল্প করতে করতে আবার চলল। অফিসের ক্যান্টিনে গিয়ে বসল।

চা অফার করল। চা খেল দুজনে। বিস্কুট নিল আগের মত। বান্ধবী আজও খেল না। একগাল কথা হল। হেসে আভাসে। বাতাস দিয়ে আকাশ ছুঁয়ে। হাত গুটিয়ে। কি মনে করে বান্ধবী উঠে গেল।

কম সময় না কাটায়। কৃষ্ণা তো কিছু টের পেতে দিল না। না, ভুলেই গেছে। ভুল করার মেয়ে তো সে না। আর কেউ হলে বিশ্বাস হত।

লোকে একবার কৃষ্ণাকে দেখলে ভুল করে, সে ঠিক। তা তো সে নিজেকে দিয়েই ভাল রকম বোঝে তরুণ।

ভবেশ বলে ফেলে যা হবার তো হয়েই গেছে আর যা হবার না। কলেজের ক্ষতটা কি এখনও ভোলে নি? জানে তো, হবে না। মিছিমিছি জের টানা কেন।

কৃষ্ণা দেবী, দোহাই আপনার! একটু সময় চেয়ে নিন কেউ বিরক্ত হবে না। কেউ কটু কথা বলবে না। নিজেকে একলা পেতে। একা একা নির্জনে যেতে। আর কেন শীগ্‌গির তো বাড়ি শাড়ি পাল্টাবেন। দেবী থেকে পদবী বদল করবেন।

অনেক তো হল। এল। চা-খাবারের সময়টা একটু এদিকওদিক করুন। ঠেরে ঠেরে হাসির ধরনটা একটু পাল্টানো যায় না।

সবাইকে দেখিয়ে যে হাসতে হবে মাথায় দিব্যি দিয়েছে কে? না হাসলে ক্ষতি কি? আপনাকে দেখে দেখে হাসতে শেখে যে অনেকে। দেখলে হাসি পায়।

সত্যি বলছি বিস্কুটের সঙ্গে চা নেন বলে সময় যায় অনেকটা। হাসিটা ছররা হয়। অনেকটা পথ সঙ্গে সঙ্গে যায়। সঙ্গ পায়। চিরকালটা চায়

তরুণ আর পারে না, "একটু জানাবেন সিলেক্‌টেড হয়েছি কি না?"

চমকে চায় কৃষ্ণা, "সে কি!"

খবরটা কেউ শোনায়নি? দৈনিক কাগজে দেখেনি। সে কি করে সম্ভব!

কড়া গণ্ডা গুণল কৃষ্ণা। চা ঠাণ্ডা হল। ডাকটা উঠল আবার। "মিস্ গাঙ্গুলী", মুখ তুলতে হয় কৃষ্ণার।

তরুণের চোখ দুটো অবিশ্বাসে জ্বলে ওঠে। কৃষ্ণা গাঙ্গুলী প্রতিশোধ নিয়েছে।

কৃষ্ণা গাঙ্গুলী তাকিয়ে থাকে। চোখ জ্বলজ্বল করছে তরুণের। আর কৃষ্ণার কেন জানি বেকারকে গুণ্ডা বলে মনে হল।

সোজা হয়ে দাঁড়ায় তরুণ। অনেক হয়েছে, গেছে। চলে যাচ্ছে তরুণ পায়ে পায়ে।

কৃষ্ণা ভাবল ফিরতে বলে। কি হবে তাতে। চেষ্টা-চরিত্র করেছে সে কেসটা নিয়ে। তার জন্যে ওয়ার্নিং খেয়েছে ওপরওয়ালার কাছ থেকে। নোট করেছে 'দুঃখিত' বলে।

ঢালাও অর্ডার এল হঠাৎ। নূতন লোক নেয়া বন্ধ। অফিসের স্টাফ একেই তো বেশী। টেনেটুনে কাজ চালাতে হবে। নাম পাঠিয়ে লাভ নেই। তবুও ফাইলটা পাঠাতে কসুর করেনি।

টমসন ও ইয়ং বেঙ্গল

অমর দত্ত

॥ এক ॥

মধ্যযুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত চিন্তাশক্তির বন্ধ্যাত্ব আমাদের জাতীয় মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ইংরেজ কর্তৃক ভারত বিজয়ের ফলে মধ্যযুগীয় তামস থেকে আমাদের জাতীয় মানসের মুক্তি ঘটেছে—ইতিহাসের নিয়মে রামমোহন এসেছেন, এসেছেন বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যান্য পথিকেরা। রামমোহন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় করে নতুন জীবনদর্শনের প্রেরণা আনলেন। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় রামমোহনের মতো অতখানি সমন্বয়বাদী ছিলেন না। এঁদের জীবনদর্শনের প্রেরণা ছিল ফরাসী বিপ্লব এবং ইংরেজের যুক্তিবাদ। এঁরা রাষ্ট্র, সরকার প্রভৃতির উৎপত্তি নিয়ে গভীর চিন্তা করলেন—ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্তির দাবি জানালেন। অতি যুক্তিবাদ, উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিপ্লবী জীবনদর্শন—এই তিন দিক থেকে রামমোহনের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট।

॥ দুই ॥

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং সমাজ-সম্পর্কের অচলায়তনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যুক্তি সীমাবদ্ধ থাকে। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পালে যুক্তিবাদের হাওয়া লাগে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনে ফাটল ধরে। ইউরোপীয় বুর্জোয়া চিন্তাদর্শে প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গলের মনে এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার করার ইচ্ছা জন্মেছিল। সেই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দেখি ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'Society for the Acquisition of General Knowledge' বা 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র প্রতিষ্ঠার মধ্যে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর পার্লামেন্টের প্রসিদ্ধ বক্তা জর্জ টমসনকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। ভারতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবন গঠন ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি টমসনকে ইয়ং বেঙ্গল

সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। এর ফলে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় বাঙলা রেনেসাঁস আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলেন। টমসন তাঁদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করলেন।

১৮০৪ খ্রীঃ লিভারপুলে জর্জ টমসনের জন্ম হয়। ১৮৩৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের কথা লণ্ডন নগরীতে পৌছলে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে জিনিয়ট * সভার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এরও আগে তিনি কাফ্রিদের দাসত্ব মোচনের জন্য সংগ্রাম করে অনেকাংশে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সপক্ষে জনমত গঠনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করার জন্যে ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি জিনিয়ট সভার সদস্যপদ ত্যাগ করে এক বিশেষ কমিটি স্থাপন করেন। তিনি বলতেন, ভারতবর্ষের সরকারের তিনি শত্রু নন, কিন্তু এদেশের জনগণের মঙ্গলের জন্যে এই সরকারের সমালোচনা না করেও উপায় নেই। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে জর্জ টমসন যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে গিয়েছিলেন, নব্য বাঙলার উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা স্বদেশপ্রেমের ইন্ধন যুগিয়ে তা উজ্জ্বলতর করে তুলেছিলেন। টমসনের চেষ্টায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'জমিদার সভা'র সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সম্মিলনে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি বা সভাতে অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, প্রবীণের সঙ্গে নবীনের সম্মিলনে দেশের উন্নতির জন্যে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার ইতিহাস যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি চিত্তাকর্ষক।

॥ তিন ॥

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'জ্ঞানোপার্জিকা' সভার প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে টমসন যোগ দিয়েছিলেন। ১১ই জানুয়ারীর (১৮৪৩) বৈঠকে টমসন, ডাঃ ডফ, মিঃ জেমস এবং প্রায় দুইশত জন এদেশীয় উপস্থিত ছিলেন।[১]

---

* 'জিনিয়ট সভা' সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা এ বিষয়ে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

১। Bengal Spectator (1842—'43).

কিশোরীচাঁদ মিত্র "মনুষ্য দেহে অস্থির বিবরণ" এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষের গত মন্দশাসন, রাজস্ব ও পুলিশের বর্তমান অবস্থা এবং প্রজাদের মঙ্গলার্থে সরকারের নিরুদ্যমতা' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। টমসন বলেছিলেন, সোসাইটি থাকলেই বিদ্যার চর্চা হয়ে থাকে এবং এতে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ হয়। তিনি আরও বলেন, এদেশীয়দের অভাব-অভিযোগের একটা সংকলন ইংলণ্ডের জনগণের সামনে তুলে ধরা হোক। সেই জনগণ পার্লামেণ্টকে প্রভাবান্বিত করবে এবং পার্লামেণ্ট নিঃসন্দেহে ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কুশাসনকে দূর করবে। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। টমসনের বক্তৃতা সম্পর্কে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র Bengal Spectator (1842-43)-এর পাতা থেকে কিয়দংশের উদ্ধৃতি তাঁর ভারতপ্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে সাহায্য করবে : So much did he desire to see some men of their own nation stepping forward as a pioneer in their cause, that he could wish himself a Hindoo, that he might consecrate himself to the good of his countrymen, and set an example of fearless and self-denying devotion to their cause." ফরাসী বিপ্লবের জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের[২] কয়েকজন এদেশে ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। টমসনের মানবতাবাদের আবেদন তাঁদের রক্তাক্ত বিপ্লবের চিন্তাকে নিঃসন্দেহে সংযত ও শান্ত করেছিল।

৩০শে জানুয়ারী (১৮৪৩) চন্দ্রশেখর দেবের বাড়িতে 'জ্ঞানোপার্জিকা' সভার এক বৈঠক হয়েছিল।[৩] টমসন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রত্যেক সভ্যকে ১৮৩৩ খ্রীঃ সনদের ৮৭ ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ঐ ৮৭ ধারায় ভারতীয়দের উচ্চতর রাজপদগুলি লাভ করার পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল। রামমোহনের মতো ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় চাকুরিতে ভারতীয় নিয়োগের জন্যে আন্দোলন শুরু করেন। টমসন সেই আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

২। ১৮৩১ খৃঃ Friend of India থেকে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক History of Political Thought গ্রন্থ (Volume—I) থেকে উদ্ধৃত।

৩। Bengal Spectator (1842—'43)

প্রভৃতি 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রখ্যাত মুখপাত্রগণ অনেক আলোচনার শেষে এক নতুন Association বা সভা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। ভারতপ্রেমিক ইংলণ্ডের নাগরিকদের এবং এদেশীয়দের সম্মিলিত চেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশের সামগ্রিক কল্যাণসাধন এই সভার উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হয়। সভা স্থাপনের প্রস্তাবক ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সমর্থক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।

৬ই ফেব্রুয়ারী (১৮৪৩) শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে এক বৈঠক হয়েছিল।[৪] তাতে দেখি—টমসন প্রস্তাবিত সভার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে বলছেন। শিবচন্দ্র ঠাকুর 'জমিদার সভা' থাকা সত্ত্বেও নতুন সভা স্থাপনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করলেন। টমসন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, জমিদার সভার উদ্দেশ্য একমুখী কিন্তু প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য বহুমুখী এবং সামগ্রিক। দক্ষিণারঞ্জন বাঙলায় বক্তৃতা করেছিলেন। এই বৈঠকে প্রস্তাবিত সভা গঠনের উদ্দেশ্যে এক কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। সেই কমিটির সদস্য ছিলেন—শাহজাদা জেলালউদ্দীন, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র ঠাকুর, মুন্সী ফজলল করি (ফজল করিম ?), হেরম্বনাথ ঠাকুর, অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী, হরিমোহন সেন, রামচন্দ্র মিত্র, গিরীশচন্দ্র দেব, আনন্দ-নারায়ণ ঘোষ, সত্যচরণ ঘোষাল ও নীলমণি মতিলাল। তার যুগ্ম সম্পাদক হন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

এক সপ্তাহ পরে ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৮৪৩) শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে আবার সভা হয়।[৫] টমসন তাতে বলেন: You are my fellow-men, and did you dwell in any other region of the globe, you would be my brethen still; for we are the children of one family, and have one common father. The world is my country, all mankind are my countrymen.······ But there are other ties, which bind you to me. We are, in a sense, one nation. The British empire is one, though composed of many parts. Our distant colonies and dependencies, as well as the British isles, are integral portions of

৪ ও ৫। Bengal Spectator (1842—'43)

one great whole"। তিনি আরও বলেছিলেন, সমস্ত রাজ্যবিজয় রাজার নামে হয়েছে এবং King in Parliament সকলের প্রকৃত শাসনকর্তা। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাদের কার্যকলাপের জন্যে তাই সমস্ত রকম কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। টমসনের এই বিশ্বমানবতাবাদ নিঃসন্দেহে ইয়ং বেঙ্গলের‌ও মনের কথার প্রতিফলন—কারণ, প্রায় পনেরো বৎসর ধরে তারাও এই আদর্শেরই দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তাই দক্ষিণারঞ্জন সেই সভায় ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর শাসনকার্যের দুর্নীতি দূর করার জন্যে জনমত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: It is public opinion and not the fear of legal consequences, which keeps the Bench in England pure.[৬],

৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৪৩) জ্ঞানোপার্জিকা সভার[৭] এক বৈঠকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'The Present Condition of East India Company's Courts of Judicature and Police under the Bengal Presidency' শীর্ষক এক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৮] হিন্দু কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ও সাহিত্যের অধ্যাপক রিচার্ডসন এবং Friend of India রচনাটি রাজদ্রোহমূলক বলেছিল। এই প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন ভারতবর্ষের দুর্দশার জন্যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দায়ী করেন। পুলিশের দারোগা থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সবাই কেমন করে দুর্নীতিগ্রস্ত তার এক জীবন্ত বর্ণনা এই প্রবন্ধে ছিল। বিচার-ব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন: The entire process is one of extortion and corruption in which the weaker and poorer parties invariably went to the wall। দক্ষিণারঞ্জনের এই বক্তৃতা টমসনকেও প্রভাবিত করে থাকবে। পরবর্তী সময় তিনিও দক্ষিণারঞ্জনের মতো তীব্র ভাষাতেই পুলিশ ও বিচারবিভাগের সমালোচনা করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারীর সভাতে টমসন এবং এদেশীয় দুইশত জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।[৯] প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। Friend of India—Feb, 1843

৭। Bengal Spectator (1842—43)

৮। প্রবন্ধটি ১৮৪৩ খ্রীঃ Bengal Hurkaraতে ২রা এবং ৩রা মার্চে মুদ্রিত হয়েছিল।

৯। Bengal Spectator (1842—'43)

জমিদারী-ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। মিস্টার স্পীডকে (Speede) পুলিশ সম্বন্ধে তদন্ত করার ভার দেওয়া হল।

৮ই মার্চ (১৮৪৩) এর Bengal Spectator থেকে জানা যায় যে, সভার এক অধিবেশনে হরচন্দ্র লাহিড়ী বিচার-ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন—টমসনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে একজনকে ইংলণ্ডে এজেণ্ট নিয়োগের প্রস্তাব করেন। শ্যামাচরণ বসুর এদেশীয়দের মুখপত্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী-ব্যবস্থার সমালোচনা মর্মস্পর্শী হয়েছিল। মিঃ স্পীড 'Planters Journal'-এ এদেশীয়দের কথা লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

১৩ই মার্চের সভায় মিঃ স্পীড বলেন, বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করে তাঁর ধারণা হয়েছে যে পুলিশ চৌকিগুলির ঘুষের পরিমাণ খুব কম করে ১০,৭০০,০০০ টাকা। সমস্ত পুলিশ-ব্যবস্থা হল 'one of mis-management, oppression and extortion।' রাজনারায়ণ দত্ত বলেন, সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধি করতে মনোযোগী সেই পরিমাণে প্রজার উন্নতির জন্য যত্নবান নয়। টমসন সেদিন 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, ইংলণ্ডের এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সভাসমূহের অপেক্ষা এই সভা কোনো দিক দিয়ে নিকৃষ্ট নয়।

এই গেল ১৮৪৩-এর মার্চের অবস্থা। এসব 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠারই উদ্যোগপর্ব বলা চলে।

॥ চার ॥

১৮৪৩ খ্রীঃ ২০শে এপ্রিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হল। সেই উদ্দেশ্যে কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। যথা—

(১) প্রস্তাবক : মিঃ জি. টি. স্পীড ; সমর্থক : রামচন্দ্র মিত্র ; প্রস্তাব : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

(২) প্রস্তাবক : মিঃ এম. ক্রাউ ; সমর্থক : মধুসূদন সেন ; প্রস্তাব : এই সভা কলিকাতাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষ এই সভায় যোগ দিতে পারে।

(৩) প্রস্তাবক : তারাচাঁদ চক্রবর্তী ; সমর্থক : চন্দ্রশেখর দেব ; প্রস্তাব : এই সভার নামকরণ 'The Bengal British India Society' হোক। ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত রকম সংবাদ সংগ্রহ এবং ভারতবর্ষের উন্নতির পথ নিরূপণ এই সভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হোক।

(৪) প্রস্তাবক : রামগোপাল ঘোষ ; সমর্থক : শ্যামাচরণ সেন ; প্রস্তাব : এই সভা প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার আনুগত্য বিরোধী নয়। সম্পূর্ণ আইনানুগ পথে দেশের মঙ্গলের জন্য এই সভা সচেষ্ট থাকবে।

(৫) প্রস্তাবক : প্যারীচাঁদ মিত্র ; সমর্থক : রামগোপাল ঘোষ ; প্রস্তাব : এই সভার গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ এর সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে।

ফৌজদারী বালখানায় Bengal British India Society-র সদস্যদের এক সভা হয়েছিল। সেই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজন।

(২) সদস্যগণ সরকারের ড্রাফট আইনসকল বিবেচনা করে মাসিক অধিবেশনে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবে।

(৩) 'Bengal British India Society'-র পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদনপত্র, মেমোরিয়াল পেশ এবং প্রতিনিধি প্রেরণের মারফত দেশের উন্নতি করবে।

'Bengal British India Society'-র জুলাই মাসের সভাতে Deputy Magistrate-দের পদচ্যুতিতে Session Judge অথবা Superintendant of Police-এর সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক, এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

॥ পাঁচ ॥

মুসলমান আমলে নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রে শাসন-ব্যবস্থার অবনতি ঘটে এবং কুসংস্কার জাতীয় মানসকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত বিজয়ে যে নতুন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল তা নিঃসন্দেহে মুসলমান আমলের তুলনায় প্রগতিশীল। ইউরোপীয় বুর্জোয়া চিন্তাদর্শ জাতীয় মানসের উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। ইউরোপীর চিন্তাদর্শের সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে

ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবনদর্শনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় এক মুক্ত সুখী ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু চিন্তার দিক থেকে বুর্জোয়া জীবনদর্শনের সমর্থক হলেও তাঁদের জীবন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শুধু তাই নয়, এই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের মতো ঔপনিবেশিক দেশে। এর ফলে দেখা দিয়েছিল স্ববিরোধ—এই স্ববিরোধ ইয়ং বেঙ্গলকে বিপ্লবাত্মক পথ থেকে দূরে রাখতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। অথচ সেই সময় উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে ছিল সারা দেশে—এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্ন কৃষক-বিদ্রোহকে সংহত করতে পারলে ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্য ধারায় প্রবাহিত হত। আর একটি ভয় ভূতের মতো ইয়ং বেঙ্গলের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তা হল, মুসলমান শাসনব্যবস্থার পুনরুত্থান। এইজন্যে একদিকে তাঁরা যেমন জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলেছেন, অন্যদিকে ইংরেজ-শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন। ইংরেজ-শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য যে শোষণ তা তাঁরা উপলব্ধি করলেও চরম বলে মেনে নিতে পারেন নি। টমসনের মানবতাবাদ তাঁদের চিন্তাকে আরো বেশি করে দ্বৈততার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। টমসন বুঝতেন কিনা জানি না, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় বুঝতে চান নি যে উপনিবেশের অধিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজ নাগরিকের সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অসম্ভব। তাঁরা ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী বেন্থাম এবং মানবপ্রেমিক অ্যাডাম ও টমসনের ইংলণ্ডকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। ক্লাইভ, হেস্টিংসের ইংলণ্ড তাঁদের কাছে চরম সত্য বলে প্রতিভাত হয় নি। কিন্তু সবশেষে একটা কথা মনে রাখা দরকার: ইয়ং বেঙ্গলের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বিকাশ সম্ভব করেছে—এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদই British Indian Association-এর পথ বেয়ে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছে।

---

* Bengal British India Society-র কার্যবিবরণীগুলি Bengal Spectator থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা ॥ আদিত্য ওহদেদার। এভারেস্ট বুক হাউস। সাত টাকা ॥

গ্রন্থখানি 'বাঙলায় একখানি নতুন ধরনের গ্রন্থ—এই জয়ন্তী-শতকের বর্ষে এ গ্রন্থের বিশেষ সার্থকতা আছে।

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের উন্মেষের কাল থেকে ১৩৬০ বাং—১৯৫৪ ইং পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারাবাহিক ইতিহাস দান, আর সেই সূত্রেই সে-সব সমালোচনারও সমীক্ষা ও মূল্যায়ন। অর্থাৎ প্রথমত পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের কাজ, তারপর বিচার ও রস-সমীক্ষার কাজ, একই লোক এক সঙ্গে দু কাজ সাধারণত করতে পারেন না। শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার তা সার্থকভাবে করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য কবিকাহিনীর (১৮৭৮) সমালোচনায় 'বান্ধব'-সম্পাদক সূচনা করেছিলেন 'সপ্রশংস, অনুরাগধর্মী, স্নেহপরবশ' সমালোচনার ধারা, এ কথা আজ কয়জন বাঙালী জানেন? 'কড়ি ও কোমলের' (১৮৮৬) কাল থেকে সপক্ষ-বিপক্ষ সমালোচনার যে ঘূর্ণ্যাবর্ত সৃষ্টি হয়, অনেকেরই তা বিদিত। কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ-কাতর মন সেকালের বিরূপ ও কুটিল সমালোচনার কথাই বাঙালী পাঠকের সম্মুখে বড় করে স্থাপন করে গিয়েছে, তাঁর মুগ্ধ ও রসগ্রাহী সমালোচকদের আলোচনা কিন্তু সে তুলনায় তখনো গুণে বা পরিমাণে কম ছিল না। অবশ্য (ওহদেদার মহাশয়ের মতে) ১৩৪০ বাং—ইং ১৯৩৪-এর পর থেকে সশ্রদ্ধ গভীর আলোচনার ধারা প্রবহমান—আর তাতে ছেদ পড়েনি। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য আজ ভিন্ন পথে প্রবাহিত বা প্রবাহে চেষ্টিত। এই প্রায় আশী বৎসরের রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার মূল ধারা সমূহের সন্ধান গ্রন্থকার নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন—সকল ধারা ও সম্পূর্ণ

সন্ধান উপস্থিত করেছেন, এমন কথা বলা হয়তো ঠিক নয়, মার্কসবাদী ও বাস্তববাদী ধারা নতুন হলেও যথোচিত রূপে উল্লেখিত হয় নি। বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের 'বস্তুতান্ত্রিক' সমালোচনার প্রতি লেখক অবিচার করেন নি—যদিও অজিতকুমার চক্রবর্তী সঙ্গত কারণেই হয়েছেন স্মরণীয় এবং গ্রন্থকারেরও মতে আদরণীয়।

দ্বিতীয় কথাটি তাই একটু আলোচনা সাপেক্ষ। শ্রীযুক্ত ওহদেদার নিপুণভাবেই এই সমালোচনাসমূহের মূল্যায়নও করেছেন। তাতে তিনি একটা সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন—"রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা এ যাবৎ যা হয়েছে তার প্রধানতম ত্রুটি হল এই যে, এ সমালোচনা প্রকৃত রস-সমীক্ষার ওপর নিজেকে অতি অল্পই প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবীন্দ্রমানস অনুসন্ধান রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস-সমীক্ষা নয়। রস-সমীক্ষার সাহায্যকারী একটা উপাদানমাত্র।" মোটামুটি সত্য কথা। গ্রন্থকারের মতে এই নীতি অনুযায়ী একমাত্র স্বর্গীয় কবি মোহিতলাল মজুমদারই রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তিনিও তা সমাপ্ত করেন নি। একথাটিও সেইরূপ সত্য। মোহিতলালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই আমরা পোষণ করি। তথাপি তাঁর আলোচনাকে একমাত্র উদ্যোগ বলতে সঙ্কুচিত হব। বিশেষত সে-আলোচনা পাঠকের সম্মুখে পরিচ্ছন্ন করে তুলে যেতে মোহিতলাল পারেন নি। আরও একটু কথা আছে—শিল্প-সাহিত্যের বিচারে নিঃসন্দেহে রস-শিক্ষা ও রস-দৃষ্টিই প্রথম কথা; কাব্য দিয়েই কবির পরিচয়। কিন্তু রস-সমীক্ষাতেই কাব্যপরিচয় শেষ হয় না। অন্তত জীবন-সমীক্ষার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তো নিশ্চয়ই নয়। এবং ইতিহাসের পারম্পর্যেও শিল্প-সাহিত্যের বিশেষ রূপ ও বিশেষ মূল্য নির্ণয়ও প্রয়োজন। অন্তত রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়ে বাঙালী ও ভারতবাসীর পক্ষে তা গৌণ বিষয় নয়। কারণ, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ সার্থকতা এইখানেই যে, আমাদের সমগ্র মূল্যবোধকেই তিনি মধ্যযুগীয় জড়তা ছাড়িয়ে নতুন জীবন-বোধ ও মানবিক চেতনার দ্বারা সঞ্জীবিত করেছেন; সাহিত্যেই শুধু মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটেনি, সর্বদিকেই তা ঘটেছে। সে মূল্যবোধ মানবিক ও আধুনিকও, আর বড় কথা বিকাশধর্মী—আপনার রূপান্তরে আপনি প্রতিশ্রুত; ক্রমাগত নবমূল্যায়নেই তার সম্পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যই অবশ্য এই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট আশ্রয়; কিন্তু শুধু রস-সমীক্ষায় কি এই মহৎ প্রতিভার পরিমাপ হয়?

তবে শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার অভাবের দিকটা নির্দেশ করে বিচক্ষণতার সঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাপ্ত করেছেন। বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যেরও একটি চমৎকার পরিচয় তাঁর এই গ্রন্থ—সমালোচক মাত্রই তাতে উপকৃত হবেন।

গোপাল হালদার

দাঁড়ের ময়না ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী। সাহিত্য। সাড়ে তিন টাকা ॥

ইতিহাসের নিয়মে পঞ্চাশের লেখক বলে চিহ্নিত, আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে অনেকেই আজ ঔপন্যাসিক হতে পেরেছেন। এটা শুরু মাত্র। লেখক-চরিত্র সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করার সময় এখনও আসে নি। তবে আপাতভাবে যা স্পষ্টই প্রতিভাত, তাতে বলা যায়, কি ছোটগল্পে কি উপন্যাসে, তারা নাগরিক। তাদের অনেকেই গ্রামবাংলায় বিচরণবিমুখ। পূর্ণেন্দু পত্রী তরুণদের একজন হয়েও ব্যতিক্রম। আলোচ্য উপন্যাস ছাড়াও পত্রান্তরে প্রকাশিত দু-একটি ছোট গল্পে গ্রামবাংলা আর ধুলো-কাদায় মাখা মানুষ প্রকৃতিকে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'দাঁড়ের ময়না' পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রথম উপন্যাস। তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল নিয়ে গড়া পৃথিবীর এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বাংলাদেশের একটি গ্রাম তার পটভূমি। যার তিনভাগ স্থল, একভাগ জল। গ্রামের নাম বাখুরী।

নায়ক রজনী। সাঁত-বংশের জোয়ান ছেলে। খেটে খায়। কখনও গান করছে, কখনও মাঠে। এই যুবকেরই ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সর্বজনীন সমস্যা, নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছে সমগ্র গ্রাম। ঘটনার প্রবহমানতায়, গ্রামীন সমাজের বহু-বিচিত্র নর-নারীর সমাবেশে, পরস্পরবিরুদ্ধ চরিত্রের সংঘর্ষে গড়ে উঠেছে কাহিনীর শক্ত বাঁধুনি। সমগ্র উপন্যাসটিকে লেখক দু-টি স্বতন্ত্র খণ্ডে ভাগ করে দেন নি। কিন্তু অন্যতম সুন্দর একটি পার্শ্বচরিত্র গঙ্গা আদকের মুখের কথায় সমগ্র উপন্যাস, বিশেষত নায়কচরিত্র দ্বিধাখণ্ডিত। সেখানে গঙ্গা আদক রজনীকে বলছেন, "তোমাকে দেখলে বাবু, আমার ভগবান শ্রীকৃষ্টোর কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর লীলাটা ভেবে দেখ একবার। বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকে বাঁশির আকুল সুরে কুলছাড়া করছেন··· আবার সেই তিনিই দেখ, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সহায় হয়ে অর্জুনের রথের

সারথি হয়েছেন।" (পৃষ্ঠা—১৭৮) বৃন্দাবন আর কুরুক্ষেত্রের সেই একক নায়ক রজনী। একদিকে তার প্রেম, অন্যদিকে রাজনীতি। একদিকে চারুবালার পিছুটান, অন্যদিকে বাইরের আকর্ষণে সে ঘরছাড়া, গ্রামের নির্জীব আবহাওয়ায় একটা বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলার অক্লান্ত কর্মী। আধুনিক উপন্যাসের দৃঢ় বনিয়াদ নির্মিত হয় যে ত্রিমাত্রিক পটভূমিকায়—(অর্থনৈতিক বিন্যাসে, সামাজিক চেতনায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) পূর্ণেন্দু পত্রী সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। ঘটনাসৃষ্টিতে, চরিত্রচিত্রণে, কিংবা পরিবেশ রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রজনী-চারুবালার প্রেমোপাখ্যানের মধ্যে লেখকের এই নিপুণতার সাক্ষ্য অনেক বেশি উজ্জ্বল। রজনীর রাজনীতি প্রসঙ্গ তত্ত্বের দিক থেকে পাঠকের মনে অনেক জিজ্ঞাসার জন্ম দেবে।

রজনী আকর্ষণীয় পুরুষ। চারুবালা তাকে ভালবাসে। এ ভালবাসা অনেক কারণে জটিল। প্রথমত, চারুবালা গ্রামের আবহাওয়ায় এক বিসদৃশ এবং রহস্যময়ী নারী। তাকে নিয়ে লোকনিন্দা-অপবাদের শেষ নেই। দ্বিতীয়ত, চারুবালা পরস্ত্রী। তৃতীয়ত, রজনী অক্ষর-পরিচয়হীন এক চাষী মাত্র। নায়ক যেখানে নিরক্ষর, সেখানে নায়কের চিন্তার মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা আয়াসসাধ্য। কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রী রজনীর প্রেমকে প্রত্যয়নিষ্ঠ স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন। এমনি একটি গ্রাম্য পরিবেশে শশী ভালবেসেছিল পরকীয়া কুসুমকে। শান্ত স্নিগ্ধ সে প্রেম। শহরে শিক্ষিত রুচিবান যুবক যেখানে নায়ক, সেখানে প্রেম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটি সচেতন মনের শাসনে (এক্ষেত্রে শশী-কুসুম প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কারণ —'দাঁড়ের ময়না'র পাঠক অনেক ক্ষেত্রেই অনুভব করবেন যে পূর্ণেন্দু পত্রীর সাহিত্য দীক্ষা মূলত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে)। কিন্তু রজনীর প্রেমের জাত এক হলেও প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। বুড়ো শীতল পরামানিকের যুবতী বৌ এবং 'কলকাতার বিশেষ পরিবেশের জল-হাওয়ায় মানুষ-হওয়া' চারুবালা জানে পুরুষমানুষকে নিয়ে কখন কিভাবে চলতে হয়। কিন্তু রজনী সহজ সরল গ্রাম্য যুবক। 'বিবি-বৌ'কে তার ভাল লাগে কিন্তু জানে না এ অনুরাগের স্বরূপ কি। এরই নাম কি প্রেম? এ প্রশ্নের উত্তরও তার কাছে স্বচ্ছ নয়। তাই দেখা যায়, রজনীর পৌরুষের শক্তি থাকলেও বিবি-বৌয়ের প্রতি তার অনুরাগে শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমের অংশই বেশি। জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে কিন্তু উদ্দামতা, উন্মত্ততা নেই। এমনকি রজনীর রক্তে অঙ্কুরিত

চারুবালার গর্ভজাত সন্তানের উল্লেখেও লেখক অদ্ভুত সংযত, পরিমিত বোধে সচেতন। রিয়ালিজমের নামে ইন্দ্রিয়-উৎপীড়ন তার লক্ষ্য নয়। কিন্তু গ্রাম্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এই অবৈধ প্রণয়। সমাজের যুক্তিহীন বিধিনিষেধের অন্ধকূপ থেকে একটি যুবতীহৃদয় নারীকে মুক্তি দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। গ্রামের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা নানাভাবে অনেক প্রস্তাব এনেছেন, কিন্তু চারুবালার প্রীতিমুগ্ধ রজনী তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং চারুবালাকেও বিয়ে করতে পারে নি। রজনীর পুরুষ-শক্তির এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এক চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছয় যখন সে আবিষ্কার করে তার ঘরের নারী মেজ-বৌদির অতৃপ্ত নারীত্বের এক গোপন বেদনা। 'নষ্টনীড়' থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য অনেক রচনাতেই দেবর-ভ্রাতৃজায়ার প্রণয় কথা বিবৃত হয়েছে কিন্তু গ্রাম্য চাষীর মনে এ ঘটনা এখনও বিদ্রোহ। লেখক পদ্ম-রজনীর প্রসঙ্গ দিয়ে সমাজের অন্য এক 'অ্যাবসার্ডিটি'কে স্পষ্ট করে তুলতে পারতেন। কিন্তু পদ্মর হৃদয়ে রজনী নিজেকে আবিষ্কার করেছে উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায়। যেখানে এ প্রসঙ্গের শুরু সেখানেই এই কাহিনীর শেষ। রজনী-চারুর প্রেমের ক্ষেত্রেও একটি গল্প থেকে যায়। পরবর্তী সময়ে রজনী যখন বৃহত্তর রাজনীতির কর্মী হয়ে ওঠে তখন চারু সম্বন্ধে লেখক একটু অবিচার করেছেন। প্রেম ও আদর্শবোধ পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়। বাইরের কাজের আহ্বান এসেছে বলেই প্রেমকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা যায় না। লেখক যতক্ষণ রজনীকে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে রেখেছেন, সেখানে রজনীর চিন্তায়-ভাবনায়-কর্মে চারুবালা প্রায় নেপথ্যচারী। যেটুকু উল্লেখ আছে প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। রজনী যখন শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন শক্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন (পৃষ্ঠা ১৭১) তখন চারু সম্বন্ধে তার চিন্তাটুকু নায়ক চরিত্রকে মহত্ত্ব দেয় নি। শুধু 'স্ত্রীলোক' বলে কর্মের ক্ষেত্রে তাকে এতটা দূরে রাখা আদর্শনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে অযৌক্তিক। অন্তত সে-পুরুষের জীবনে প্রেমের মূল্য অনেক। এর পরের প্রসঙ্গ রজনীর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক। রাজনীতি আজ সমাজের নানা সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কি শহরে, কি গ্রামে। খুব স্বাভাবিক-ভাবেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে এই উপন্যাসে। যে গ্রামের মানুষ কোনোদিন কোনো বড় রকমের মিটিং দেখেনি সে গ্রামের মানুষ রজনী। সে পুরো নেতা নয়, কিন্তু 'ছোটবাবুর' শিষ্য, গঙ্গা আদক 'লীডার' বলে সম্বোধন করে, অজ্ঞ গ্রামবাসীকে সে পরিচয় করিয়ে দেয় স্টালিনের ছবির

সঙ্গে। রজনী চরিত্রের ক্রমবিকাশ খুব স্বাভাবিক ও গতিশীল হলেও এখানেই তার ভারসাম্য কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়েছে। একজন নিরক্ষর গ্রাম্য যুবকের জীবনে এতখানি রাজনৈতিক সচেতনতার প্রবেশ একটু সময়সাপেক্ষ। রজনীর চরিত্রে এ সচেতনতা কিন্তু একটু আকস্মিক। অল্প কয়েক দিনের জন্য কারখানার ধর্মঘট প্রত্যক্ষ করার ফল এত বড় হতে পারে না। সেজন্যে আরও একটু ভূমিকা তৈরির প্রয়োজন ছিল। রাজনীতি প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য বিতর্কমূলক। খাদ্যের দাবিতে এক বিরাট কিসান মিছিল যাবে কলকাতার দিকে। প্রবল উৎসাহে, অনেক আশা-উদ্দীপনা নিয়ে, গ্রামের আরও কিছু লোককে জোর করে সঙ্গে নিয়ে রজনী সে-অভিযানে যোগ দিতে যায়। কিন্তু ব্যর্থতা, হতাশা, বেদনা আর গ্লানি নিয়ে ফিরে আসে। তার প্রথম আঘাত, পুলিশের গুলিতে একটি মানুষের অন্যায় মৃত্যু ; দ্বিতীয় বেদনা, সেই মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অকারণ আর নির্লজ্জ কাড়াকাড়ি। যে লজিক দিয়েই পূর্ণেন্দু পত্রী আত্মপক্ষ সমর্থন করুন, নিঃসন্দেহে বলা চলে, সে-লজিক সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে ছোট-বড় এমন কোনো আন্দোলনই ঘটেনি যেখানে আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় নি। ঐ রক্তদান রক্তের অপচয় নয়। ছোটবাবুর কাছে রজনীর রাজনৈতিক দীক্ষা যদি অপূর্ণ না হয় তবে এ মৃত্যু রজনীকে এত বিচলিত করবে কেন। অত্যাচারী পুলিশের বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভ জন্মেছে কিন্তু আন্দোলনের প্রতি হঠাৎ এই অনাস্থা কেন তার। 'দর্পণ' উপন্যাসে বীরেশ্বরের মৃত্যু বীরের মৃত্যু কিংবা স্মরণ করা যায় 'চিহ্ন' উপন্যাসের সেই মুসলমান যুবকটিকে, গুলিবিদ্ধ আহত শরীর নিয়ে যে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছিল মার কাছে, আবার ভোরের আগেই ফিরে গিয়েছিল হাসপাতালে। যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় রাজনৈতিক কর্মীকে মৃত্যু অবহেলা করতে শেখায়, বিশ্বাসের সে শক্ত খুঁটি অনড় ছিল তাদের চরিত্রে। মৃত শহিদের শবদেহকে পিছনে রেখে জ্যান্ত মানুষের যে অব্যাহত অভিযান, রজনী তার মধ্যে সমষ্টিগত স্বার্থপরতা আবিষ্কার করেছে। এবং তখনই মনে হয় ঐ মিছিলের সঙ্গে তার পায়ের তাল মিলছে না। সে স্বতন্ত্র। সংগ্রামী জীবন তৈরি করার আগে শহিদ-ধর্মের সঙ্গে কি পরিচিত হয় নি রজনী? সে কি শেখে নি 'বীরের এ রক্তস্রোত' কিংবা 'মাতার এ অশ্রুধারা'—এসব ব্যর্থ নয়। তার বিবেচনায় যারা 'স্বার্থপর', সেই সমষ্টির কাছে এ মৃত্যুর ঋণ অপরিশোধ্য। এখানে সে

মৃত্যু একজন ব্যক্তির মৃত্যু নয়, সমষ্টির প্রতিনিধির মৃত্যু। রাজনৈতিক দলাদলির আবিলতার সঙ্গে শহিদের আত্মদানকে এক করে মৃত্যুর মহত্ত্বকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেছেন।

ইদানীংকালে আঙ্গিকের দিক থেকে তরুণ ঔপন্যাসিকরা এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী। কাহিনীর জমাট বাঁধুনির প্রচলিত ধারায় নয়, আত্মজিজ্ঞাসার সূত্র ধরে সামাজিক রীতিনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণেই আধুনিক কথাসাহিত্যের ভিত্তি রচিত। পূর্ণেন্দু পত্রী সজ্ঞানে আধুনিক রীতি পরিহার করেছেন। সেটা তাঁর সাহিত্যিক বিচক্ষণতারই পরিচয়। বিশ্লেষণী মনের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত উন্নত সামাজিকতা। কিন্তু 'দাঁড়ের ময়না'র নায়ক বাংলাদেশের অখ্যাত গ্রামের নিরক্ষর মানুষ। এমনি একটি মানুষের চিন্তার পরিধি সীমায়িত। সুতরাং লেখকের চিন্তাকে প্রকাশ করার জন্যই লেখককে একের পর এক ঘটনা সৃষ্টি করে সে দুরূহ কাজ করতে হয়েছে। এ উপন্যাস সে কারণেই কাহিনীপ্রধান। অশিক্ষিত সহজ গ্রাম্য মানুষের মুখে গভীর-গম্ভীর কথা চরিত্রানুগ করার জন্য লেখক একটি সুন্দর রীতিকে আশ্রয় করেছেন। গঙ্গা আদকের মুখে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের উল্লেখগুলো তার প্রমাণ। কিন্তু এ উপন্যাসের লেখক আধুনিক আঙ্গিকের একটি বিশেষ গুণকে রক্ষা করতে পারেন নি। কাব্যে-সাহিত্যে লেখকের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি বা সামগ্রিক নৈর্ব্যক্তিকতার শিল্পধর্ম বহুদিন থেকেই স্বীকৃত। আলোচ্য উপন্যাসের অনেক জায়গায় লেখক নিজেকে আড়ালে রাখতে পারেন নি। 'চারুবালার কথায় পাঁচ বছর আগের ঘটনায় পিছিয়ে যেতে হয়' কিংবা 'পুনরাবৃত্তির আবর্ত থেকে কাহিনীকে মুক্তি দিয়ে এবার আরও কিছু পরের ঘটনায় পৌছোনো যাক'—এ জাতীয় উক্তি দিয়ে উপন্যাসের পরিচ্ছেদ শুরু করা যায় কিনা সেটাই আজকের প্রশ্ন। পূর্ণেন্দু পত্রীর সবচেয়ে কৃতিত্ব নিখুঁত গ্রাম্য পরিবেশ বা রচনায় এবং চরিত্রসৃষ্টির কুশলতায়, বিশেষত পার্শ্বচরিত্রের ক্ষেত্রে। সুরেন, পদ্ম, গঙ্গা আদক নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তারা প্রত্যেকেই উজ্জ্বল। ভুতু আর মাধুরীর চরিত্র সুপরিকল্পিত এবং সুচিত্রিত। 'দাঁড়ের ময়না' নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান, তরুণ ঔপন্যাসিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

সূর্যতামসী ॥ অজয় দাশগুপ্ত। ইম্প্রেশন। দু টাকা॥

শঙ্খবতী ॥ শ্রীমন্ত সওদাগর। বিংশ শতাব্দী। দু টাকা॥

সর্বাণী ॥ দীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী। চার টাকা॥

সূর্যতামসী, এক সংক্ষিপ্ত, যদিও অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা অনুযায়ী, 'একটিমাত্র দিনের আঙ্গিকে তিনটি অবিবাহিত তরুণীর উত্তাপ, উষ্ণতা, শীতলতা এবং ঋজুতা আর জীবনের অজস্র প্রশ্ন' নিয়ে রচিত। সুমনা, বাসনা আর কুন্দনা দীপ্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে, নিস্তরঙ্গ প্রত্যহের পরিমণ্ডল তাদের নিয়তই ক্লান্ত আর ব্যথাহত করে তুলছে—শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত এই ব্যাপারটি পাঠকহৃদয়ে সংবেদ্য করার জন্য আপ্রাণ করেছেন। উপরোক্ত তিনটি নারীচরিত্রের অন্তর্জ্বালা, আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশীদার আমরা, পাঠকেরা, হতে পেরেছি। বাসনা, কুন্দনা, সুমনা প্রত্যেকেই যথাযথ হয়ে উঠতে পেরেছে। এই চরিত্র তিনটির রূপায়ণে লেখক কৃতকার্য হয়েছেন। এজন্যে শ্রীদাশগুপ্ত অভিনন্দিত হবেন অবশ্যই। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। লেখকের পরিবেশরচনা, মনে হয়, সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো বাড়িতে, ভোর ছটারও আগে, (এবং তাও রবিবার) গৃহশিক্ষক আসেন—এটা বিশ্বাস করা শক্ত। দ্বিতীয়ত, বিভাসিন্ধুবাবুর চরিত্রটি। ওকালতি ক'রে, জানা গেল, মাসে হাজার টাকার ওপর আয় করেন; অথচ সমস্ত টাকা নাইটক্লাব, রেস, জুয়ায় অপব্যয়িত হয়। এদিকে তাঁর পরিবারের চোদ্দজন ছেলেমেয়ে মাত্র দুটি ঘরে বাস করে, মেয়েগুলি অনূঢ়া। এই ধরনের সংসার-উদাসীন ধনী পিতার অস্তিত্ব বিরলদৃষ্ট। তাই কাহিনীর খাতিরে, কাহিনীকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য এমন চরিত্রের অবতারণা একটা সুলভ কৌশল বলেই মনে হয়। তৃতীয়ত, শেষ দুটি পাতা। কুন্দনার স্বপ্নদর্শন পর্বটি অসংলগ্ন, যতিচিহ্নবিহীন অবচেতন মনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। লেখকের একমাত্র আঙ্গিকের কৌশল দেখানোর দুর্মর লোভটুকু ছাড়া এর কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কেননা কুন্দনাকে যতখানি দেখেছি, বুঝতে অসুবিধা হয় নি। উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী হিসেবে লেখক একে ঠিকমতোই এঁকেছিলেন। কিন্তু তারপরই অতর্কিতে স্বপ্নদর্শন পর্বটিকে উপস্থাপিত করে শ্রীদাশগুপ্ত আঙ্গিকের অবাঞ্ছিত অতিচারিতা করেছেন।

শ্রীমন্ত সওদাগরের 'শঙ্খবতী' এক উদ্বাস্তু শাঁখারি পরিবারের করুণ কাহিনী। কাঞ্চনবৌদি আর শ্রীধর হচ্ছে মূলচরিত্র। মধুর দাম্পত্যজীবন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দেশবিভাগের নিষ্করুণ প্রতিঘাতে ভেঙে যাবার পর এরা চন্দনগড়ের উদ্বাস্তুশিবিরে আশ্রিত হল। শিবিরজীবনের নানান তথ্য, সরকারী অব্যবস্থা, উদ্বাস্তুবিক্ষোভ এবং কাঞ্চনবৌদি আর শ্রীধরের প্রণয়-ইতিহাস সহজ-সরল ভাষায় বিবৃত হয়েছে। বহুচরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই কাহিনীটিতে। তার মধ্যে হলধর ভট্টাচার্য, অমিতা, কাঞ্চন—এরা আমাদের মনে রেখাপাত করে। কিন্তু 'শঙ্খবতী' শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে সুখপাঠ্য নক্সা বা রিপোর্টাজেই পর্যবসিত হয়েছে, এটা প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি। কেননা কয়েকটি টুকরো টুকরো ঘটনাই—আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এগুলি যদি সমন্বয়িত হত, যদি ঘটনাগুলি শিথিলবিন্যস্ত না হত, তাহলে তারা উপন্যাসের অঙ্গীভূত হয়ে উঠত। তবু রিপোর্টাজধর্মী রচনাও প্রসাদগুণ ছাড়া উত্তীর্ণ হয় না। এবং শ্রীমন্ত সওদাগর এ ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতকার্য হয়েছেন।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'সর্বাণী' উপন্যাসটিকে পাঠকসমাদৃত করার জন্য কয়েকজন 'খ্যাতনামা' ব্যক্তির প্রশংসাসূচক অভিমত এবং একটি 'নিবেদন' প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের সংজ্ঞা, বাস্তব ও কল্পনা সম্বন্ধে শ্রীসেনগুপ্তের ধারণা এই নিবেদনে বাণীবদ্ধ। কিন্তু তিনশো বারো পৃষ্ঠার এই বইটি, লেখকের এত আয়োজন সত্ত্বেও, সকলি গরল ভেল। সর্বাণী-দীপকের ব্যর্থ প্রণয়ই আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়। কাহিনীপরিকল্পনা চূড়ান্ত মামুলি, সিনেমাসুলভ; সংলাপরচনা হাস্যকর অবাস্তব এবং ঘটনাগুলি শ্লথগতি। তাছাড়া বইটিকে স্থূলকায় করার জন্য লেখক সংলাপগুলি অকারণ বিলম্বিত করেছেন। সুতরাং বইটি শেষ করা অনেকের পক্ষেই শক্ত হয়ে উঠবে।

শিবশম্ভু পাল

সপ্তপুরা ॥ সুকুমার দত্ত। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। আড়াই টাকা ॥

চরৈবেতি ॥ মৈনাক চট্টোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী। আড়াই টাকা ॥

স্কেচ্ ॥ মদন দাস। ইসারা প্রকাশনী। দু টাকা ॥

বুর্জোয়া ॥ নিখিল সেন। এভারেস্ট বুক হাউস। আড়াই টাকা ॥

শ্রীসুকুমার দত্ত-র সপ্তপুরা মোট সাতটি গল্পের সংকলন। অধিকাংশই লিখিত হয়েছে বৌদ্ধকালের পটভূমিকায়। সুতরাং আধুনিক ছোটগল্পে পরীক্ষিত বিভিন্ন বাচনরীতিও প্রকাশসৌকর্য—অন্তত এ গ্রন্থ বিচারে ঠিক-ঠিক আশা করা অসঙ্গত। বহু পুরনো সেই আমলের কথা বলতে গিয়ে লেখক স্বভাবতই বেছে নিয়েছেন অন্য এক কথনভঙ্গি; বিশেষণ এবং অলঙ্কারের চাপে হয়তো কোনো-কোনো অংশ ভারি লাগে, কিন্তু গল্পবস্তুর বৈচিত্র্যে এবং ধ্রুপদী আবহাওয়ায় ওটুকুও প্রয়োজনীয় মনে হয় শেষ পর্যন্ত। লেখক স্বয়ং ভূমিকায় বলছেন, প্রত্নতত্ত্বের স্বপ্নজগৎ থেকে তিনি গল্পগুলি পেয়েছেন। ফলে, ঐ দিবাস্বপ্নের fantasy সব গল্পগুলিতেই কিছু-না-কিছু জড়ানো, যার আকস্মিক অস্বাভাবিকতায় বহুস্থানের কার্যকারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বর্ণিত অংশগুলির সর্বাঙ্গে লেগে থাকে এক অলৌকিক মুডের আমেজ। কিছু উদ্ধৃত করি: "এবার তত্ত্বাবধায়ক গুলি চালাইলেন।...গুলির ধূম-ধোঁয়া মিলাইয়া গেলে দেখা গেল, পাহাড়ের কোণে ঘুমন্ত একঝাঁক পাখী ত্রস্ত হইয়া মাথার উপর দিয়া চিৎকার করিতে করিতে উড়িয়া যাইতেছে—আর সেই ছায়ামূর্তি যেন জ্যোৎস্নায় ভর করিয়া আকাশময় গৈরিক অঞ্চল উড়াইয়া সেই ত্রস্ত পাখীর ঝাঁকের ভাসমান ছায়ায় মিলাইয়া গেল।" (এষা) "সহসা কি অপূর্ব দৃশ্য! সমুদ্রের বেলা হইতে দিগন্ত পর্যন্ত সমস্ত জল সোনা হইয়া গেল। গলিত স্বর্ণ-সমুদ্রের ঠিক প্রান্তে মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া। তার মুখে-চোখে তরল স্বর্ণের ছাট আসিয়া পড়িতেছে, পায়ের উপর স্বর্ণের ঢেউ ভাঙ্গিয়া লুটাইতেছে, সোনালি বাষ্প তার আপাদ-মস্তক ঘিরিয়া।" (জগন্নাথের মন্দির)

গল্পগুলির মধ্যে বিশিষ্ট মনে হয়েছে এষা, অগ্নিদাহোদ্ধারে এবং জগন্নাথের মন্দির। অন্যগুলিও নানাদিক থেকে আকর্ষনীয়।—দু-একটা ছোটখাট নিবেদন আছে, যথা, অগ্নিদাহোদ্ধারে-র মঞ্জুদেব নির্দেশিত 'অর্ধমাগধী' ভাষার উল্লেখ উদ্ধার করতে গিয়ে দেখলাম, বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচার করেছিলেন কোশল

ও মগধে ব্যবহৃত মাঝামাঝি একটি মিশ্র ভাষায় ; যেটিকে কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত Mixed Sanskrit বলেছেন এবং যে সকল অতি প্রাচীন বৌদ্ধ-পুস্তক পাওয়া গেছে তা, না সংস্কৃত, না মাগধী, না কোশলী (বৌদ্ধধর্ম : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পৃঃ ৪)। সুকুমার বাবু কি তাকেই 'মিশ্র' না বলে 'অর্ধমাগধী' বলেছেন ? তাছাড়া Rhys-Davids তাঁর Buddhist India-য় অর্ধমাগধীকে জৈন অঙ্গের প্রাথমিক ভাষা বলে অভিহিত করেছেন (পৃঃ ৯৫); যদিও হরিচরণ শর্মা (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) স্বলিখিত 'পালিপ্রবেশ'-এ জানাচ্ছেন, বুদ্ধদেব খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করেছিলেন মগধের কথ্যভাষা পালি-তে (নামান্তরে, বৌদ্ধমাগধী)। কিন্তু, আবার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী এটিকে মাগধী প্রাকৃত বলেছেন (বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, পৃঃ ৬)। সুতরাং মঞ্জুদেবের ঐ তথ্যগত উক্তিতে বিচার-বিতর্কের অকাশ আছে'। উপরন্তু, শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থেই 'বিমলপ্রভা' নামক পুঁথির উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, প্রচলিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতেও বুদ্ধের বচন পাওয়া যায়, যেমন—মগধ, সিন্ধু, বোট, চীন, মহাচীন, পারস্য, রুক্ষভাষায় (রোমের ভাষা হতে পারে)। দ্বিতীয়ত, ঐ গল্পেই নালন্দার ভিতরে একটি সর্পদংশনের ঘটনা আছে, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ও রসায়ন বিদ্যার বিশেষ চর্চা থাকা সত্ত্বেও (রাজগৃহ। নালন্দা : অমূল্যচন্দ্র সেন, পৃঃ ৮১ ; এবং হিউয়েনচাঙ : সত্যেন্দ্রকুমার বসু, পৃঃ ৮৪) প্রতিষেধক ওষুধের ব্যবস্থা না করে আহত ব্যক্তিটিকে কেন বিগ্রহের সামনে শুধুমাত্র শায়িত রেখে বিষশোধন মন্ত্রপাঠ করলেন আচার্য অমোঘবজ্র, তা বোঝা গেল না। অবশ্য মহাযান থেকে উদ্ভূত 'মন্ত্রযানী' (প্রবোধচন্দ্র বাগচী কৃত শ্রেণীবিভাগ দ্রষ্টব্য) আচ্ছন্নতার এমন উদাহরণ অসম্ভব না হলেও, অন্তত তর্ক সাপেক্ষ বটে। নচেৎ গল্পটির মূল আখ্যানভাগের যৌক্তিকতা আছে মনে করি ; কেননা, একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে, ১০ শতকের শেষভাগে নালন্দা অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হলে পর আবার নির্মিত হয়েছিল, এবং সেটা সম্ভবত, রাজা মহীপালেরই কীর্তি (রাজগৃহ ও নালন্দা, পৃঃ ৮৪)। গল্পবর্ণিত শিলালিপিটিরও সময় ১০২৬ সন। এবং অমোঘবজ্র বোধ করি 'অমোঘসিদ্ধি' (মহাযানী বুদ্ধকল্পনার একজন) হতে পারেন।···মল্লিকা, অভিশপ্তা, সহজিয়া (বৌদ্ধ সহজযানের পটভূমিতে রচিত) মৌলিক বর্ণে উজ্জ্বল। শ্রীদত্তকে ধন্যবাদ, তিনি সব গল্পগুলিতেই মানবিক প্রেম-অপ্রেম, দুঃখ-আসক্তির সম্পর্ক

আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। কোনো সংস্কার বা অন্ধতা ও তথ্যের কূট-কচালিতে লেখাগুলিকে ভারগ্রস্ত করেন নি। অত্যন্ত সহজচালের কলমে ভারি-ভারি পৌরাণিক তত্ত্বের ঘটনাগুলি—লিরিকধর্মী উচ্ছল, অথচ উদাস মেজাজের কাহিনীতে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। আমরা এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ছটি গল্পের সংকলন, চরৈবেতি। লেখক শ্রীমৈনাক চট্টোপাধ্যায় নবাগত হলেও এই গল্পগ্রন্থে তিনি সহজ অন্তর্দৃষ্টির আভাস দিয়েছেন। তবে মনে হল সাম্প্রতিক ছোটগল্পের ধারাকে তিনি বিশেষ মান্য করেন না, কিংবা তেমন আত্মীয়তা এখনো সম্ভব হয় নি। তাঁর এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি প্রকাশ্যেই প্রতিফলিত। প্রথম থেকে পরপর জাতিস্মর, চরৈবিতি এবং সেতু-ই তার প্রমাণ। সেতু-র প্রেম অবতারণা বেশ কিছুটা স্কীমেটিক্ হয়ে গেছে (অপরাহ্নের বৃষ্টি ও কুকুর কাটা পড়ার ঘটনা স্মর্তব্য) ; একটি গল্পের খসড়ায় শেষের দিকে ডায়েরীর আমদানি সমস্ত প্রাথমিক বিশ্লেষণের চেহারাটাকে তরল করে দেয়। চোর-এ সময়োপযোগী অনুসন্ধান আছে, কিন্তু তারকের ক্রমপরিণতি—জীবিকাযুদ্ধে অবসন্ন, অথচ একরোখা কোনো মানসিকতার খবর দেয় না। সর্বশেষ লেখাটির সংস্থাপন একেবারেই খাপছাড়া। এবং প্রায় সব গল্পতেই বক্তৃতাধর্মী দীর্ঘ বর্ণনা পঠনধৈর্যের উপর অহেতুক চাপ দেয়। নতুন লিখছেন কারণে, লেখকের প্রতি আমাদের আস্থা জানাচ্ছি।

শ্রীমদন দাস-এর প্রথম গল্পের বই, স্কেচ্। বিষয়বৈচিত্র্য বইটির প্রধান আকর্ষণ ; স্কেচ্ ও বন্দর-এ তা প্রমাণিত। গল্প না বলে, বরং রচনা বলি। কেননা, গল্পবস্তুর অবিকল পরিবেশ সাজাতে গিয়ে লেখক ধারা-বিবরণীর আশ্রয় নিয়েছেন, ফলে গল্পের গঠনরীতি ও সংযম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে লেখাগুলির মধ্যে যথেষ্ট ঋজুতা লক্ষণীয়, যেমন—খেলাঘর, চোরাবালি ; যদিও এই সংকলনের ধর্মচ্যুতি ঘটাতে পারে ঐ দুটি লেখাই। কাপুরুষ প্রেম-এর দ্ব্যর্থ-বোধক সংলাপ, পড়ে যাবার গতি সঞ্চারিত করতে পারলেও, স্বতস্ফূর্ত লাগে না। স্কেচ্ নাম রচনাটির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু লেখকের নিজস্ব অভিমত প্রকাশে, তা মাত্র আরেকটি রেখাচিত্রের পর্যায়ে পৌছেছে। প্রথম সংকলন, সুতরাং শ্রীযুক্ত দাস-কে অনুরোধ তিনি এবার সঠিক অর্থে কিছু ছোটগল্প লিখুন। তাঁর চরিত্র নির্বাচনের ক্ষমতা আছে বলে মনে করি।

শ্রীনিখিল সেন-এর বুর্জোয়া ছোটগল্পের বই। বোবা ও আহত শকুনি ভালো লাগল। এই দুটি স্মৃতিচারী গল্পে লেখকের দক্ষতা অনুভব করা যায়। বহু ব্যবহৃত পদ্ধতিতে লিখিত হলেও 'আহত শকুনি'র বিষণ্ণ অন্তরটান সার্থকভাবে প্রকাশিত। এমন মেজাজের গল্প তিনি আরও লিখবেন, আশা করব। ইষ্টিশান-এর মানব ও সীতার পরস্পরকে ছেড়ে যাবার সঠিক কারণ জানা গেল না। মানবের মুখে উপযুক্ত প্রস্তাবটুকু উচ্চারিত হলে গল্পটির বাঁক ট্রেন লাইনের বাঁকে নিশ্চয় অদৃশ্য হত না। এবং বেঁচে-থাকবার টানাপোড়েনে বহুক্ষেত্রেই যখন নায়িকাকে পরিত্যাগ না করলেও চলে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

দুস্তর মরু ॥ দরবেশ। পরিবেশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। তিন টাকা ॥

মধ্যপ্রাচ্যের উষর ভূমিতে একদা মানবসভ্যতার উদ্‌বোধন হয়েছিল। কালক্রমে সে সভ্যতা একদিন হল রাহুগ্রস্ত। তারপর ভাগ্যের পরিহাসে একদিন এল শ্বেতাঙ্গ বণিকের দল—সাদা মানুষের বোঝা বইতে। মধ্যপ্রাচ্যের কণ্ঠে উঠল শৃঙ্খলের অলঙ্কার।

তারপর একদিন ভূগর্ভের কোনো স্তরে আবিষ্কৃত হল তেলের অফুরন্ত উৎস—যা সভ্যতার চাকাকে সচল রাখে। সভ্যতার আদিপীঠভূমি সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির বাঁও কষাকষিতে বিধাতা হয়ে উঠল।

আজ আবার ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে। দীর্ঘকালের বিস্মৃতির পর মধ্য-প্রাচ্য একলাফে আবার ধরে ফেলেছে খবরের কাগজের হেড লাইন।

অগ্নিগর্ভ খবর। সাম্রাজ্যবাদীদের সযত্ন লালিত পুতুল রাজাদের তাশের দেশের রাজ্যপাট হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ফারুক গেল, এল নজীব, তারপর নাসের। গ্লাব পাশাকে একদিন বিদায় নিতে হল, সিরিয়ায় ক্ষমতায় আসীন হলেন কোয়াৎলি, ইরাকে কাসেম। নবজাগ্রত আরব জাতীয়তাবাদের পতাকা পতপত করে উড়তে থাকল আকাশে।

'দুস্তর মরু' এই মধ্যপ্রাচ্যের নানা বর্ণোজ্জ্বল অন্তরঙ্গ একটি আলেখ্য।

'দরবেশ' ছদ্মনামের আড়ালে যিনি আত্মগোপন করে আছেন তিনি একজন কৃতী সাংবাদিক। পেশাগত কারণে বেশ কিছুকাল মধ্যপ্রাচ্যে

কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। সিরিয়া-লেবানন, ইরাক, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশে তিনি গেছেন। সাংবাদিক হিসেবে সে-সব দেশের উঁচুতলার এবং নিচুতলার মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মিশবার সুযোগ হয়েছে তাঁর। দুস্তর মরু তাঁর সেই অভিজ্ঞতার রোজনামচা।

দরবেশের চোখ সাংবাদিকের কিন্তু কলম সাহিত্যিকের। তুচ্ছ খুঁটিনাটিও তাঁর চোখ এড়ায় নি। অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মতোই তিনি সব তথ্যকে ঝাড়াই-বাছাই করে যথাস্থানে স্থাপন করেছেন কিন্তু লিপিকুশলতায় তা উপন্যাসের মতো রম্য হয়ে উঠেছে।

এই রম্যতা সৃষ্টির প্রয়াস দরবেশের রচনার গুণও বটে, দোষও বটে। লিপিকুশলতার প্রসাদে তাঁর অনতিক্ষুদ্র বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে পেত্রা কি ব্যাবিলনের পুরনো ইতিহাস, জেনোবীয়া-সেমিরামিসের কাহিনীতে তো রূপকথার স্বাদ পাওয়া যায়। দু-একটি মানুষের রেখাচিত্র চমৎকার হয়েছে।

কিন্তু গল্পের রস জমাতে গিয়ে 'দুস্তর মরু'র ধার এবং ভার দুই-ই অনেকখানি কমেছে। এর ফলে যা গল্প নয়, ইতিহাস—তাকেও গল্প বলে ভ্রম হয়। কতগুলি সুন্দর স্ন্যাপশট তিনি অতিদ্রুত পাঠকের চোখের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন—তাতে চলচ্চিত্রের গতির বিভ্রম সৃষ্টি করা যায় নি—বরং একটা ছবি ভালো করে পরিস্ফুট হয়ে ওঠার আগেই আর একটা ছবি এসে পড়ে। তাতে কোনো ছাপই মনের মধ্যে সুমুদ্রিত হয় না।

দরবেশের মতো অভিজ্ঞ সাংবাদিকের কাছ থেকে আমরা আশা করেছিলাম এমন একখানা বই যার মধ্যে নবজাগ্রত মধ্যপ্রাচ্যের একটা প্রামাণ্য ছবি পাওয়া যাবে। সে আশা অনেকখানি অপূর্ণ রয়ে গেল। দরবেশের ভাষা একটু 'ম্যানারিজম'-দুষ্ট হলেও, প্রসাদগুণসম্পন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, ইদানিং কালে এ ধরনের যতগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'দুস্তর মরু' একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করতে পারে।

শচীন বসু

গল্প ও ছোটো উপন্যাস ॥ আন্তন চেখভ। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো। প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ। দু টাকা চুয়াল্লিশ ন. প. ॥

তাদের সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে বিপদে পড়তে হয় এমন লেখকের সংখ্যা কম নয়। যাঁরা বিপদে ফেলেন না তাঁদের প্রথম সারির একজন আন্তন চেখভ। এর কারণ, তাঁর সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। শুধু নতুন করে বারবার পড়ার দরকার আছে। কেন আছে, এ প্রশ্নের উত্তর হল, চেখভকে প্রবন্ধ লিখে বোঝানোর দরকার হয় না, যেমন বোঝাতে হয় না বাতাস না পেলে অবধারিত মৃত্যুকে। তাছাড়া তাঁর লেখার মধ্যেও জটিল এমন কিছু নেই যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সুতরাং কেন দাবি রাখে না এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

লেখকের কারবার যে জীবন নিয়েই এ কথার মধ্যে তর্ক নেই। শুধু মতভেদ সেই জীবনকে দেখার ভঙ্গির মধ্যে। প্রতি লেখকই স্বতন্ত্র তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মারফত। জীবনে জটিলতার অন্ত নেই। সুতরাং সরাসরি জীবনকে দেখার উপায় নেই। ঘাড় বেঁকিয়ে কিংবা নিচু হয়ে দু-হাতে জট খুলতে খুলতে মধ্যের জিনিসটিকে আবিষ্কার করতে হয়।

চলচ্চিত্র পরিচালকের যেমন ক্যামেরা, লেখকের তেমনি কলম। এর মারফতই দর্শক বা পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। যেমনভাবে দেখা, তার প্রকাশও হবে তেমনি। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলে লেখার ঢঙটিও তাই বেঁকে যায়। জীবনের জটিলতা, প্রকাশভঙ্গিকেও জটিল করে তোলে। কিন্তু চেখভ নিজের হাতে জট ছাড়ান নি। জটের খুব কাছে চোখটি নিয়ে গেছেন, দেখেছেন। একজন দ্রষ্টার মতোই লিখেছেন। লেখার মধ্যে কোথাও অংশগ্রহণ করেন নি। ফলে, তাঁর গল্পের মানুষ বা প্রকৃতি তার নিজের স্বাধীনতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। লেখকের ইচ্ছানুযায়ী আপন স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করে নি। চেখভ বারবার পড়ার দরকার খাঁটি মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য।

আর মানুষগুলি যদি খাঁটি হয় তাহলে লেখককেও শুদ্ধ এবং সৎ না হয়ে উপায় থাকে না। এবং তা যে থাকে না বোঝা যায় চেখভের গল্পবুনোনের নক্সা থেকেই। যে লেখক জীবনের কথাই লেখেন, তাঁকে লেখার গড়নটুকুও জীবন থেকে নিতে হয়। জীবন কোথাও থামে না, বাঁধা পড়ে না, শুধু

এগিয়েই যায়, ফলে তার শেষও নেই। চেখভের গল্পের গড়নটুকুও হুবহু তাই। গল্প বলতে যা বুঝি তা নেই। এক জায়গা থেকে শুরু, তারপর এগিয়ে যাওয়া, যেতে যেতে এক সময় ছেড়ে দেওয়া। শেষ করে দেওয়া নয়। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতায় যদি গলদ থাকে তাহলে এভাবে লেখা যায় না। কেননা এ ধরনের গল্প চলমান জীবনেরই একটা খণ্ডাংশ। সুতরাং জীবনের অন্তহীন রূপটিও এই খণ্ডটুকুর মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই লুকনো রূপটিকেই উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে হয়। সুতরাং ব্যাপারটা বেশ কঠিন। কিন্তু কঠিন নয় তাঁর কাছে অর্থাৎ চেখভের কাছে, কেননা জীবনকে জানা ও বোঝার সৎ ও সশ্রদ্ধ প্রয়াস তাঁর ছিল। গোঁজামিল দেবার অন্যতম বুদ্ধির অভাব তাঁর প্রতিটি রচনাতেই ধরা পড়েছে।

কিন্তু শুধু জীবনকে দেখা বা তার নির্ভুল প্রকাশই মহৎ সাহিত্যের কোঠায় ঠাঁই পাবার ছাড়পত্র পেতে পারে না। শুধু দেখাই নয় তাকে বোঝাও দরকার, অর্থাৎ ব্যাখ্যার। শিল্পী, জীবন থেকে আহৃত, বাদ্যযন্ত্রের অসংহত তারের মতো অভিজ্ঞতাগুলিকে সচেতন মননের সাহায্যে বেঁধে নিয়ে একটি মূলসুরে সংহত করেন। তার ফলে শিল্পী যখনই সৃষ্টি করেন, তাঁর সৃষ্ট শিল্পে একটি মূলসুর বিচিত্র ভঙ্গিতে, তালে আমাদের মনে সুর ধরিয়ে যায়। মানবসমাজকে এইটুকুই তাঁর দান। আর কোন শিল্পী না চান মানবসমাজকে ঋণপাশে বাঁধতে! তাই মহৎ শিল্পী মাত্রই জীবনের এই মূলসুরের সাধক। এ সাধনা চেখভেরও ছিল এবং তা জানা সম্ভব তাঁর শিল্পজীবনের ক্রম-অগ্রসৃতি লক্ষ্য করলে। কিন্তু মুসকিল এই, প্রকাশক্রম অনুসারে তাঁর গল্পগুলি না পড়লে শিল্পীমানসের গতিবিধির অনুসরণ সম্ভব নয়। মস্কোর বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় মুসকিল আসান করেছেন আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করে। চেখভের সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ থেকে ৪৩ বছর বয়সের মধ্যের লেখাগুলি থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় ১৫টি গল্প ও ছোট উপন্যাস প্রকাশক্রম অনুসারে এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

"একথাটা আমার কাছে পরিষ্কার যে আমার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। অভাব রয়ে গেছে এমন কিছুর যা না থাকলে চলে না, যা আসল জিনিস। এই যে বিজ্ঞানের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা, আমার আরো বেঁচে থাকার ইচ্ছে, এক অপরিচিত শয্যায় এভাবে আমার বসে থাকা, নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা, আমার এ সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি ও

ধারণার মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। এবং নেই বলেই সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিকতায় গাঁথা হয়ে ওঠে নি। আমার চিন্তা ও অনুভূতিগুলো ছাড়া ছাড়া। বিজ্ঞান, মঞ্চ ও সাহিত্যের সমালোচনা যেভাবে করি, আমার ছাত্রদের সম্পর্কে যে ধরনের কথা বলি, কল্পনায় যে সব ছবি আঁকি তার মধ্যে দক্ষতম মনোবিজ্ঞানীও এমন কিছু খুঁজে পাবেন না যাকে বলা চলে মূলসূত্র, বা যাকে জীবন্ত মানুষ ঈশ্বরজ্ঞানে মাথায় তুলে রাখে।

"এ জিনিসটি না থাকার অর্থ কোনো কিছুই না থাকা। কোনো মানুষের জীবনে যদি এই বিশেষ জিনিসটা না থাকে যা বাইরের প্রভাবের চেয়েও জোরালো, যার স্থান বাইরের প্রভাবের চেয়েও উঁচুতে, তাহলে জোরাল সর্দি লাগলেই তার সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়, যে কোনো পাখি দেখলেই পেঁচা মনে করে, যে কোনো শব্দ শুনলেই মনে করে কুকুর ডাকছে। লোকটির শুধু আশা-নিরাশার, তার সমস্ত ছোটবড়ো চিন্তার কোনো দামই থাকে না—নিতান্তই কতকগুলো লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।"

উদ্ধৃতিটুকু 'বিরস কাহিনী' গল্প থেকে। তরুণ চেখভ, বৃদ্ধ টমাস মানকে এই গল্পের দ্বারা বিস্মিত করেছিলেন। জীবনকে ব্যাখ্যা করেন নি চেখভ, তাঁর অপূর্ণতার ক্ষোভ ও ব্যাকুলতাকেই প্রকাশ করেছেন, এবং উনত্রিশ বছর বয়সেই। ওই গল্পেরই শেষে জীবন সম্পর্কে হতাশ, বিপর্যস্ত কাতিয়া যখন কান্নায় ভেঙে বলল, "তুমি আমার বাবার মতো, তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ; দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছ তুমি। তোমার কাছ থেকে অনেকে শিক্ষা পেয়েছে। আমাকে বলে দাও—আমি কি করব।" তখন কি আশ্চর্য, উনত্রিশ বছরের তরুণ লেখক, জীবন সম্পর্কে কোনো বাণী দিলেন না, সারগর্ভ বক্তৃতাও না, শুধু বললেন, "তোমাকে সত্যিই বলছি কাতিয়া, আমি কিছু জানি না।" বর্তমানে বাংলা ভাষায় তরুণ গল্প লেখকদের সংখ্যা কম নয়। উপরের উদ্ধৃতি হয়তো তাদের কাজে আসতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে অনুবাদকের নাম কোথাও পেলাম না। অধিকাংশ গল্পেরই অনুবাদ ঝরঝরে, সুন্দর। খুঁত আছে কিন্তু তা এত সামান্য যে বলতে লজ্জা হয়। যেমন সাধারণ মানুষের সংলাপে 'এবং' শব্দটির ব্যবহার বাংলা ভাষায় আমরা করি না। তাছাড়া 'ওকে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি আদায়ের করে চেষ্টা' বা 'ডিনার পর্যন্ত হয় থাকতে'-র মতো ক্রিয়ার ব্যবহার বাংলা গদ্য রীতিতে চলে না। সংলাপেও শক্ত-শক্ত তৎসম শব্দের আধিক্য অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিকত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। চেখভের গল্প বলেই খুঁতগুলো দেখা যায় না, কেননা গল্পের অভিভূত করার ক্ষমতা তা দেখতে দেয় না।

মতি নন্দী

॥ প্রাপ্তি স্বীকার ॥

জননী ও জন্মভূমি ॥ মণীন্দ্রনাথ সেন ও অমূল্যরতন চৌধুরী সংকলিত। মহাকবি নবীনচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার। এক টাকা ॥

সুভাষিত সংগ্রহ।

অপরাধী ॥ দীপঙ্কর সরকার। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ০'৬২ ন. প. ॥

নবীন লেখকের নতুন নাটিকা।

তিব্বতের যাত্রাগান ॥ গুরুদাস সরকার। রত্নসাগর গ্রন্থমালা: পরিবেশক : গ্রন্থজগৎ। দুটাকা ॥

Tchrime Kundan, Djroazanmo ও নামসাল—কৌতূহলোদ্দীপক এই তিনটি পালা ও পরিশিষ্টসহ নাতিক্ষুদ্র পুস্তক। ফোটচিত্র থেকে ফরাসী শিল্পীর কাঠখোদাইয়ের দুটি প্রতিলিপি শোভিত।

মানুষ কি করে গুনতে শিখল ॥ গ. ন. বের্‌মান্। রুশ থেকে অনুবাদ: বিনয় মজুমদার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ১'২৫ : কাগজ বাঁধাই—০'৭৫ ॥

"বর্তমান সংখ্যাবিজ্ঞান বিরাট এবং জটিল। এই সংখ্যাবিজ্ঞান গণিতের একটি শাখা।...কি করে মানুষ ক্রমে ক্রমে গণনা-কৌশল আয়ত্ত করেছে, কি করে বর্তমান কালের সংখ্যালিখন পদ্ধতি তৈরি হয়েছে, তা এই পুস্তিকায় বিবৃত হয়েছে।" সহজ বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশনায় প্রকাশকের পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

সোভিয়েতের নানাজাতি ॥ বাবাজান গফুরভ। সোভিয়েত দেশ পুস্তিকা। ০'২৫ ন. প ॥

নিকিতা সের্গেইয়েভিচ খ্রুশ্চফ : সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥ সোভিয়েত দেশ পুস্তিকা। ০'২০ ন. প. ॥

শান্তি ও মৈত্রীর জন্য ॥ এন. এম. খ্রুশ্চফ (আমেরিকা সফরের বক্তৃতাবলী)। ০'৭৫ ন. প. ॥

পুস্তিকা তিনটি পাঠ করলে একটি মহান দেশের জাতি পরিচয়, তাদের বরণীয় নেতার জীবন ইতিহাস এবং বিশ্বরাজনীতিতে সোভিয়েতের উজ্জ্বল ভূমিকা ও আদর্শের স্বরূপ স্পষ্ট হবে।

পত্রিকা প্রসঙ্গ

প্রবন্ধ পত্রিকা॥ সম্পাদক: রামেন্দু দত্ত, চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩৬৭। এক টাকা॥

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে প্রবন্ধ পত্রিকার প্রকাশ (সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে এক স্মরণীয় ঘটনা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই পত্রিকার প্রকাশকে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করেছেন। বস্তুত, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণ যে নিছক সরকারী পরিকল্পনার ঢক্কানিনাদে বধির না হয়ে শ্রদ্ধা, বিনয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীকে গ্রহণ করছেন, তার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যাচ্ছে। 'পরিচয়' প্রথমাবধি এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই 'প্রবন্ধ পত্রিকা'র প্রকাশে আমাদের যথেষ্ট আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে।

তাছাড়া, নিছক প্রবন্ধের পত্রিকা সম্ভবত এই প্রথম। উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্টিশীল রচনার পাশেই শুদ্ধ জ্ঞানমার্গী রচনার একটি ধারা নিয়ত প্রবাহিত ছিল। ভূদেব, শিবনাথ শাস্ত্রী, বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে এ ব্যাপারে সব্যসাচীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধেই সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের জ্ঞানচর্চা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে আসে। তিরিশের যুগের কয়েকজন কবিকে বাদ দিলে (তাও তাঁদের প্রবন্ধ-চর্চার পরিমাণ যথেষ্ট নয়) সাহিত্যিকদের প্রায় কেউই এ ব্যাপারে আশানুরূপ পারদর্শিতা দেখান নি। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে বাংলা কথাসাহিত্য যেমন রবীন্দ্রনাথের পথ থেকে কিছু পরিমাণে সরে এল, ঠিক তেমনই হয়তো শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার পথ থেকেও। কারণ শরৎচন্দ্রের রচনা সমকালীন ও পরবর্তী লেখকদের কথাসাহিত্যে নতুন পথনির্দেশ দিল। কিন্তু জ্ঞানচর্চায় তিনি স্বয়ং যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন না বলেই হয়তো তাঁর উত্তরসূরীরা প্রধানত গল্প-উপন্যাস লিখেই সন্তুষ্ট রইলেন।

বাংলা দেশের সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ চর্চায় বীতরাগ আজও কমে নি। অবশ্য বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছিল এবং আছে। আমরা সাধারণ লক্ষণের কথাই শুধু বলছি। আমাদের দুর্ভাগ্য নিছক প্রাবন্ধিকের

সংখ্যা এবং তাঁদের রচনার পরিমাণ কখনোই সে পর্যায়ে পৌঁছয় নি, যার থেকে বাংলাভাষার এই দৈন্য পূরণ হতে পারত।

সৌভাগ্যের বিষয় কিছু জ্ঞানতপস্বী চিরকাল বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য কোন না কোন ভাবে অব্যাহত রেখেছেন। 'সবুজপত্র', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা এ ব্যাপারে অসামান্য। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য যে বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছে, তার পাশে বাংলাভাষার শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। যদিও ইতিমধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসকে 'পপুলার' ভঙ্গীতে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার এক দুরূহ ব্রত প্রধানত মার্কস্‌বাদী লেখক ও প্রকাশকরা গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তবু, জ্ঞানচর্চার এই দৈন্যের দিকে মৃত্যুর পূর্বে রাজশেখর বসু মহাশয়ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেন নি। আর রবীন্দ্রনাথের এতৎসম্পর্কিত আক্ষেপের তো অন্তই ছিল না।

এর ফলে সৃষ্টিশীল সাহিত্যও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। শিল্প কি, কেন লিখি, লেখকের সঙ্গে 'সময়' ও 'চিরন্তনতা'র সম্পর্ক কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নে লেখকরা অনেকেই বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। সৎ সমালোচক ও প্রাবন্ধিকের অভাবে সত্যকার মূল্যায়ন না হওয়ায় এ ক্ষেত্রেও মোটামুটি নৈরাজ্য চলছে। সর্বোপরি পাঠকদের আশানুরূপ 'সিরিয়াস' করে তোলা যাচ্ছে না।

সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রবন্ধ পত্রিকার প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী মনে করি। দুঃসাহসিকও বটে। আমরা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি প্রবন্ধের সঙ্গে একমত নই। তা সত্ত্বেও প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে মনে সংশয় রাখি না। প্রবন্ধকাররা সকলেই স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা একটি প্রবন্ধ (বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষের দশম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত) পাঠকদের অভিনিবেশের দাবী রাখে। একটি মাত্র সাম্প্রতিক উপন্যাসের আলোচনা (তাও হয়তো পুরস্কারপ্রাপ্ত বলেই) আমাদের আকাংক্ষা পূরণ করে না।

আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এই পত্রিকা মারফৎ একাধারে বিশ্বমনীষা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের যাবতীয় পরিচয় লাভ করতে পারব। উদ্যোক্তাদের সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীও নিশ্চয় ততদিনে পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

কজ্জল সেন

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

বরিস্ পাস্তারনেক দেহত্যাগ করেছেন। স্বদেশে কবি এবং অনুবাদক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। যদিও তাঁর কাব্যধর্ম সম্পর্কে চিরকালই বিতর্ক ছিল। বিদেশে তাঁর পরিচয় প্রধানত 'ঝিভাগো' উপন্যাসের রচয়িতা রূপে। উপন্যাস হিসেবে এর গুণাগুণ বিচারের চেয়ে বইটিকে আন্তর্জাতিক স্নায়ু যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত হতে দেখে স্বয়ং পাস্তারনেকও কম দুঃখ পান নি। নির্জন কবি মনের অধিকারী পাস্তেরনাক উপন্যাসে তাঁর দেশ ও সময়ের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নোবেল পুরস্কার ও 'মুক্তদুনিয়া'র আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে সোভিয়েতের মাটিতে নতুন ভাবে জীবন শুরু, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে দায়িত্বগ্রহণ এবং অবশেষে আকস্মিক মৃত্যুবরণের মাধ্যমে পাস্তেরনাক রুশ দেশ ও সংস্কৃতি এবং সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পরিচয়ই দিয়ে গেছেন।

ঝিভাগোর রচয়িতা হিসেবে দেশবাসীর সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু কবি হিসেবে সম্ভবত উত্তরকালেও তাঁর নাম মায়াকোভস্কীর সঙ্গে উচ্চারিত হবে।

অবশ্য, মৃত্যুর মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোন ব্যক্তির জীবন ও সৃষ্টির মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই সে চেষ্টা থেকে বিরত থেকে আমরা গভীর সমবেদনায় পাস্তেরনাকের স্মৃতি স্মরণ করছি।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে : রাজশেখর বসু

রাজশেখর বসু অধ্যয়ন করেছিলেন রসায়ণশাস্ত্র। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারি ছিল তাঁর জীবিকা। মধ্য বয়েসে, প্রায় খেলাচ্ছলে তিনি সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন আর আবির্ভাবমাত্রই পেয়েছিলেন খ্যাতি। সে হচ্ছে ১৯২২ সালের কথা, তখন তাঁর বয়েস ৪২। এই সময়ই তাঁর প্রথম কৌতুক-কাহিনী প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক বছর কেটেছে, পরশুরাম

গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, ধুস্তুরি মায়া ইত্যাদি প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে কৌতুকরসের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, প্রসারিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, আর কোন ভারতীয় সাহিত্যেও সম্ভবত এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফাঁকি দিয়ে সটকে শেখান পরশুরামের উদ্দেশ্য ছিল না, কোন নীতিবচন প্রমাণ করতেও তিনি চান নি। তাঁর ব্যঙ্গ রূঢ় ছিল না, ছিল না উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু তা সোজা লক্ষ্যভেদ করত, আমাদের সভ্যজীবনযাত্রার মূঢ়তা, ভণ্ডামী, কৃত্রিমতা অনাবৃত করে তুলে ধরত।

বাকচাতুরীহীন বুদ্ধির দীপ্তি, তিক্ততা এবং দ্বেষ বর্জিত ব্যঙ্গ, বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাস, অশালীনতামুক্ত কৌতুক—এই হচ্ছে পরশুরামের গল্প বলার বৈশিষ্ট্য। তিনি শস্তা ভাঁড়ামোর কারবারী ছিলেন না। তাঁর প্রত্যেকটি লেখায়—কি পরিস্থিতি নির্বাচন, কি শব্দচয়ন, কি চরিত্রসৃষ্টি—সব কিছুই অদ্ভুত সজীব-বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত। তাঁর প্রতিভায় পরিহাস ও পৌরুষের মনিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছিল। একটি বহু ব্যবহৃত বুলি আউড়ে বলা যায়, তাঁর প্রত্যেকটি 'টাইপ' চরিত্র, প্রয়োজনীয় অতিশয়োক্তি এবং তির্যক মাত্রাধিক্য সত্ত্বেও আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠত।

জীবন সম্পর্কে পরশুরামের কৌতুকদৃষ্টি একান্তভাবে যুক্তিবাদী, আর্দ্র ভাবালুতার প্রতিষেধক। পাঠকদের তিনি হাসাতেন বটে কিন্তু সেই হাসির মধ্য দিয়ে তাদের পৌঁছে দিতেন যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে। তিনি যে কুসংস্কার বা ভেকধারী সাধু-মহাত্মাকে বিদ্রূপ করতেন, ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দিতেন বা জনগণমন বিমোহন বিগ্রহ বা হুজুগের অসারতা প্রতিপন্ন করতেন তার কারণ বাস্তব জীবনে আমাদের মুখের কথা এবং কাজের মধ্যেই রয়ে গেছে শত অসঙ্গতি। অসাধারণ সাধারণ বুদ্ধিই পরশুরামের কৌতুক রসসৃষ্টির শক্তির উৎস। পরশুরামের সঙ্গে হাসা মানে আমাদের নিজেদেরই মূঢ়তা এবং অসঙ্গতিকে উপহাস করা। এই হাসি বলকারক টনিকের কাজ করে।

পরশুরাম কখনও পক্ষভুক্ত, অর্থাৎ কোন বিশেষ মতবাদে আসক্ত সাহিত্যিক ছিলেন না। রসকষহীন নীতিবাদীও ছিলেন না। সমাজের যে সমালোচনা তাঁর সাহিত্যে অনুস্যূত, তা তাঁর সচেতন ইচ্ছার ফল নয়। মানুষ মাত্রেরই একটা হাস্যকর দিক থাকে। পরশুরাম কোনরূপ তিক্ততা বা বিরাগ প্রকাশ না করেও পাঠকদের সে-কথা মনে করিয়ে দিতেন।

বায়রণের একটি পংক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায় তাঁর কৌতুক রচনা আমাদের অনুপ্রেরিত করে "more to laughter than scold, though laughter, leaves us so doubly serious shortly after."

তাঁর রচনা শৈলী আশ্চর্য সরল তো ছিলই, তাঁর শব্দ নির্বাচনও ছিল অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পরশুরাম তাঁর ব্যঙ্গ গল্পগুলিতে বাংলা-হিন্দী মেশানো যে জগাখিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করতেন তা যেমন সুপ্রযুক্ত, তেমনি যথাযথ ও জোরালো। তাঁর এমনি ধারা তির্যক কটাক্ষপূর্ণ অনেক জগাখিচুড়ি শব্দ ইতিমধ্যেই বাংলাভাষায় চালু হয়ে গেছে।

প্রথম শ্রেণীর রসসাহিত্যিক পরশুরাম, অর্থাৎ রাজশেখর বসু আবার ছিলেন বাংলা দেশের আভিধানিকদেরও পুরোধা, ভারতীয় মহাকাব্যগুলির অনুবাদক এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। এখানে রসসাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল মনীষীর কোন আত্যন্তিক বিরোধ নেই। সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং নৈরাজ্য বিষয়ে প্রায়ই তিনি ম্যাথু অরনল্ডি ধরনে প্রবন্ধ রচনা করতেন। সব বিষয়েই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একান্তভাবে ভারতীয়। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আশ্চর্যরকমের আধুনিক এবং যুক্তিবাদী। রামায়ণ-মহাভারতের সংক্ষেপিত গদ্য তর্জমা তাঁর পাণ্ডিত্য এবং মনীষার বিজয় বৈজয়ন্তী। মহাকাব্যদ্বয়ের তর্জমা ছাড়াও কালিদাসের মেঘদূতেরও তিনি সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে ছিলেন। আভিধানিক হিসাবে তিনি বাংলায় যা করে গেছেন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পক্ষে তা আদর্শ স্বরূপ। তাঁর বাংলা চলতি ভাষার অভিধান 'চলন্তিকা' বাংলা ভাষায় প্রথম এই ধরনের অভিধান; প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ।

সরোজ আচার্য

শীর্ষ সম্মেলন ও বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ

এবারে সকলেরই মনে খুব আশা ছিল যে, মে মাসের শীর্ষ সম্মেলনটি থেকে কিছু ভাল ফল পাওয়া যাবে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বরফ বেশ একটু গলতে আরম্ভ করছিল। একটা নৈতিক দ্যতাঁত-এর ঝিরঝিরে হাওয়া থেকে থেকে পৃথিবীতে বইছিল। দ্যতাঁত, অর্থাৎ জোটবদ্ধ পৃথিবীর জোটমুক্তি, কলিকালের পৃথিবীরূপিণী অহল্যার শাপমোচন। কথাটায় জাদু মাখানো আছে। মনে হয়েছিল, ক্যাম্প ডেভিড দ্যতাঁত-এর প্রথম ধাপ এবং প্যারী শীর্ষ সম্মেলনটি হবে তারই এক বিরাট দ্বিতীয় ধাপ।

কিন্তু এই সব সাধের আশায় ছাই পড়ল। শীর্ষ সম্মেলনটি বসতেই পারল না। পর পর যে সকল ঘটনার ফলে শীর্ষ সম্মেলনটির অকালমৃত্যু ঘটল তা এখন সুপরিজ্ঞাত। তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শীর্ষ সম্মেলনটির ধ্বংসের জন্যে দায়ী কে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাঁদের বন্ধুরা ও আশ্রিতেরা ক্রুশ্চভকেই শীর্ষ সম্মেলনটির অনধিবেশনের জন্যে দায়ী করছেন। খুবই দুঃখের বিষয়, নিরপেক্ষ ও শান্তিকামী ভারতের বহু বড় বড় সংবাদপত্রের বড় বড় সম্পাদক ওয়াশিংটনের পাবলিক রেলেশ্বনস অফিসের হ্যাণ্ড-আউটকেই এ-সম্বন্ধে বেদবাক্য বলে মনে নিয়েছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে আর একটু স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলে ভারতবাসীরা আনন্দিত হত এবং ভারতের সুনাম বজায় থাকত। সকল দেশের সাধারণ লোকের এবং শান্তিকামী সজ্জনদের মনে এ বিষয়ে তিলার্ধ সন্দেহ নেই যে, আমেরিকার সামরিক মহলই ঠাণ্ডা যুদ্ধের বরফকে পুনরায় শক্ত করে জমিয়ে তোলার জন্যে সুপরিকল্পিত ভাবে প্যারী শীর্ষ সম্মেলনটিকে সাবোতাজ করেছেন। এমন কি, আমেরিকার ডেমোক্রাটিক পার্টির আদলাই ষ্টিভেনসন, স্টাসেন, কেনেডী প্রমুখ নেতৃবৃন্দও পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, আইজেনহাওয়ার সরকারই প্যারী শীর্ষ সম্মেলনটিকে পণ্ড করে দিলেন।

এ কথা সুবিদিত যে, যুদ্ধের অবস্থায় বা যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বকালেই এক দেশের বিমান গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে অপর দেশের আকাশে অভিযান করে। সোভিয়েত আকাশে আমেরিকার ইউ—২ বিমানের গুপ্তচর উড্ডয়ন অবশ্যই সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার শত্রুতামূলক ও আক্রমণাত্মক অভিযান। বিমানটি সশস্ত্র না নিরস্ত্র, সে প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে অবান্তর। মূল কথা হল বিমানটির গুপ্তচর অভিসন্ধি। তারপর, এটা কেমন করে বোঝা যাবে যে, বিনা সংবাদে, বিনা অনুমতিতে, অসদুদ্দেশ্যে যে বিদেশী বিমান দেশের আকাশে অভিযান করেছে, সেটি সশস্ত্র না নিরস্ত্র? আক্রান্ত দেশটি কি করে বুঝবে যে, বিদেশী বিমানটি হাউড্রোজেন বোমা বহন করে আনছে কি না? সুতরাং এই ধরণের গুপ্তচর বিমান উড্ডয়ন হল আগুন নিয়ে খেলা করা। তার ফলে যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবীময় আণবিক যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। তাই সোভিয়েত আকাশে আমেরিকার ইউ—২ বিমান উড্ডয়ন সম্বন্ধে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশও কখনও উদাসীন থাকতে পারে না। ইউ—২ বিমান উড্ডয়নের প্রকৃত তাৎপর্যটি বোঝা যাবে

যদি এই প্রশ্ন তোলা যায়: ধরা যাক, সোভিয়েত দেশের কোনো নিরস্ত্র বিমান গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে আমেরিকার আকাশে অভিযান করল; এক্ষেত্রে আমেরিকার আচরণ কিরূপ হত? আমেরিকা কি বিচার করত বিমানটি সশস্ত্র না নিরস্ত্র? অবশ্যই করত না। একথা সকলেই জানেন যে, আমেরিকার অ্যাটম-বোমারু ও হাইড্রোজেন-বোমারু বিমানগুলিকে এমন সদাসতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে যে, কোনো বিদেশী বিমান অসদুদ্দেশ্যে আমেরিকার দিকে আসছে, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা তৎক্ষণাৎ বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের উপর বোমাবর্ষণ করার জন্যে যাত্রা করবে। আমেরিকার কর্তারা সগর্বে আমাদের জানিয়েছেন যে, আমেরিকার নিরাপত্তার জন্যে এই ব্যবস্থা আবশ্যক ও যথেষ্ট! জাতীয় নিরাপত্তার এই ব্যবস্থা বৈধ না ক্রিমিন্যাল, এ প্রশ্ন না তুলেও বলা যেতে পারে যে, এর থেকেই বোঝা যায়, ইউ—২ বিমান উড্ডয়ন সম্বন্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বাড়াবাড়ি করছে, মার্কিন সমরনায়কদের এই যুক্তিটা কিরূপ নিছক ভণ্ডামি!

জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি করে পৃথিবী থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত রেশের অবসান ঘটানো এবং নিয়ন্ত্রিত নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে চতুঃশক্তির চুক্তি সম্পাদন, প্রধানতঃ এই দুটি মহৎ উদ্দেশ্যে পারী শীর্ষ সম্মেলনটি ডাকা হয়েছিল। এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্যে সর্বাগ্রে যা দরকার ছিল তা হল পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা এবং পরস্পরের সমান অধিকারের ও সমান সুযোগের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। গুপ্তচর বিমান ঘটনাটি দেখিয়ে দিল যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি আমেরিকার বর্তমান শাসকদের সদিচ্ছা বলে কোনো কিছু একেবারেই নেই। এটা পরিষ্কার হল যে, আমেরিকার সমরনায়কদের মতে আমেরিকার পক্ষে এক আইন, এক নীতি এবং সোভিয়েত দেশের ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে অন্য আইন, অন্য নীতি প্রযোজ্য হবে। সন্দেহ রইল না যে, আমেরিকার সমরামোদীরা ক্যাঁত-এর ক্ষণস্থায়ী অকাল বসন্তের অবসান ঘটিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের গুমোটে পৃথিবীকে ভয়ত্রস্ত রাখতে কৃতসংকল্প। ইউ—২ বিমান ঘটনাটিই শীর্ষ সম্মেলনের ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

তবু শীর্ষ সম্মেলনটিকে বাঁচানো যেতে পারত যদি আমেরিকা কূটনৈতিক সদাচারের যে সকল নীতি পুঁজিবাদী জগতেও সচরাচর স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেগুলিকে মান্য করত। ক্রুশ্চভ অনেক কড়া কড়া কথা বলেছেন, এই মর্মে

ভারতের অনেকে ক্রুশ্চভের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। ক্রুশ্চভের ভাষা বিদ্যালয়ের বালকদের অনুকরণীয় কি না, সে আলোচনা করব না। কিন্তু এ বিষয়ে কি কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন যে, আমেরিকার পক্ষ থেকে দারুণ প্ররোচনামূলক কাজ হওয়া সত্ত্বেও শীর্ষ সম্মেলনটি যাতে বসতে পারে, তার সকল পথই তো ক্রুশ্চভ খোলা রেখেছিলেন! ১লা মে তারিখে ইউ—২ বিমানে পাইলট পাওয়ার্সকে সোভিয়েত আকাশে গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্যে ক্রুশ্চভ প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করেন নি। অবশ্য সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে বিমানচারী গুপ্তচরবৃত্তির কর্মসূচী আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং আইজেনহাওয়ার এই পরিষদের সভ্য। আমেরিকার কেন্দ্রীয় গুপ্তসংবাদ এজেন্সীর হাতে গুপ্তচর বিমান উড্ডয়নের সমস্ত ভার ন্যস্ত। রোজ সকালে অ্যালেন ডালেসের সহকারীরা আমেরিকার গুপ্তসংবাদ দপ্তরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারকে কুড়ি মিনিট ধরে তালিম দেন। আমেরিকার সেনাবাহিনীতে চল্লিশ বছর কাটানোর পর জি—২ দপ্তরের কার্যাবলী সম্বন্ধে আইজেনহাওয়ার যা জানেন না, তার পরিমাণ শূন্যের চেয়েও কম। সুতরাং ইউ—২ বিমান সম্বন্ধে সব কিছুই সাধারণভাবে আইজেনহাওয়ারের জানা ছিল। এ কথা স্বীকৃতও হয়েছে। ১লা মে তারিখের বিশেষ ইউ—২ উড্ডয়নটিরও নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই আইজেনহাওয়ারের ছিল কেননা শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে এই ধরনের প্ররোচনা-মূলক বিমান উড্ডয়ন বন্ধ করা দরকার, এই মর্মে কোনো আদেশ আইজেন-হাওয়ার জারি করেন নি। তাঁর এটা করা উচিত ছিল। তবু এটা একেবারে অসম্ভব ছিল না যে, আইজেনহাওয়ারকে না জানিয়েই ১লা মে পাওয়ার্সকে সোভিয়েত আকাশে পাঠানো হয়েছিল। ইদানীং আইজেন-হাওয়ার এটাই প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন যে, তাঁকে যারা "Sick man of America" বলে তারা কত অর্বাচীন! Sick man! বটে, বটে! তারা দেখুক, গলফ খেলায় আইজেনহাওয়ারের নম্বর কি রকম হু হু করে বাড়ছে! গলফবিলাসী, প্রায়-অবসর প্রাপ্ত আইজেনহাওয়ার যে পেণ্টাগনের কর্তাদের ও অ্যালেন ডালেসের হাতে অনেকটা পুতুল হয়ে পড়েছিলেন এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু ১লা মে তারিখের গুপ্তচর উড্ডয়ন সম্বন্ধে আইজেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত দায়িত্ব যাই থাক

না কেন, এটা নিশ্চিত যে তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে খালাস দিয়ে ক্রুশ্চভ একটা মহৎ 'জেসচার' করেছিলেন, অর্থাৎ পৃথিবীর লোকের সামনে তাঁর মুখরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, ৫ই মের বক্তৃতার শেষের দিকে ক্রুশ্চভ বলেছিলেন : "ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবস্থার এবং অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে প্ররোচনার অবসান ঘটানোর জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করছে। সর্বত্র পৃথিবীর মানুষ যাতে সুখ, শান্তি ও নিশ্চিন্ত জীবন ভোগ করতে পারে, এইজন্যে শান্তির সাধনার দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চালিত হওয়া দরকার।" এটা খুব কড়া কথার মতো শোনাচ্ছে কি ?

এর পরে ইউ—২ ঘটনাটির জন্যে সামান্য একটু দুঃখপ্রকাশ করলে এবং যাতে ঘটনাটি আবার না ঘটে তার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দিলেই পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে শীর্ষ সম্মেলনটি বসতে পারত। কিন্তু যা করলেন আমেরিকার বর্তমান শাসকেরা, ঔদ্ধত্য, নোংরামি ও অবিমৃষ্য-কারিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তার তুলনা মেলা ভার। প্রথমে স্রেফ অস্বীকার করা হল যে, গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে কোনো মার্কিন বিমান সোভিয়েত আকাশে প্রবেশ করেছে। বলা হল, উপরিতম আকাশের আবহাওয়া সম্বন্ধে নির্দোষ গবেষণাই বিমানটির লক্ষ্য। প্রচুর ডালপালা ও খুঁটিনাটি সমেত যে বিরাট ও বিস্তৃত মিথ্যাকাহিনী রচনা করে লিনকন হোয়াইটের মুখ দিয়ে বলানো হল, তা বোধ হয় Our Man In Havana উপন্যাসটির নায়ক ওয়ার্মওল্ডের গালগল্পকেও হার মানিয়ে দেয়! তারপর ঘটল আসল মজা! ক্রুশ্চভ ঘোষণা করলেন, বামালশুদ্ধ চোর জীবিত অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। এই খবর আমেরিকার গুপ্তচর দপ্তরে মহা আতঙ্ক সৃষ্টি করল। পরমাশ্চর্য এই লকহীড ইউ—২ জেট বিমানটি! মহাকাশের কিনারায় কিনারায় এক লক্ষ ফীট ঊর্ধ্বে প্রায় শব্দের গতিতে এই বিমানটি উড়তে পারে। বিশেষ ফরমায়েস দিয়ে এই বিমানটিকে এমন ভাবে গড়ানো হয়েছিল যাতে কোনো বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রই এর নাগাল পাবে না। চার বছর ধরে বিনা শাস্তিতে এই বিমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আকাশে গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছে। হঠাৎ এ কী শোনা গেল যে, বিমানটি শুধু যে সোভিয়েত রকেট অস্ত্রের দ্বারা ভূপাতিত হয়েছে তাই নয়, তার পাইলটও জীবিত অবস্থায় ধরা পড়েছে এবং সে যেসব ছবি তুলেছিল, সেগুলিও পাওয়া গেছে!

ঘটনা যখন প্রমাণ করে যে, আমাদের "কোয়ায়েট অ্যামেরিকান"-টি আসলে "নট-সো-কোয়ায়েট", তখন যে "ফায়ার-সাইড চ্যাট" মারফত সে স্বীকারোক্তি করে, সেটাই হয়ে পড়ে সব চেয়ে মারাত্মক! আইজেনহাওয়ার ও তাঁর পরামর্শদাতারা স্থির করলেন, এখন আর "মিথ্যা কথা" বলে লাভ নেই, এখন "সত্য কথা" বলা দরকার, এখন চাই "কোল্ড-ওয়ার ক্যানডার", অর্থাৎ ঠাণ্ডা যুদ্ধের স্পষ্টবাদিতা! স্পষ্টাক্ষরে বলা হল যে, সমাজতান্ত্রিক দেশের আকাশে গুপ্তচর বিমান উড্ডয়ন আমেরিকার জাতীয় নীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি, এই নীতি চার বছর ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে, এই নীতি চলতে থাকবে যতদিন না সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার "মুক্ত আকাশ" প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ক্রিশ্চিয়ান হার্টারের এই ঘোষণাই শীর্ষ সম্মেলনটিকে সমাধিস্থ করল। ১লা মে যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, ৯ই মে সে কাজ সম্পন্ন হল। এই সুস্পষ্ট ঘোষণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একটি নতুন ঘটনা। এর পরে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে, আমেরিকা আন্তর্জাতিক উত্তেজনার উপশম এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের সংবর্ধন মোটেই চাইছে না। আমেরিকা চাইছে ঠাণ্ডাযুদ্ধের ও স্নায়ুযুদ্ধের বাষ্পে স্যাঁতাত-এর হাওয়াকে বিষিয়ে দিতে। একথা বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার তো অবশেষে পারী শহরে এসে বলেছিলেন যে, গুপ্তচর বিমান উড্ডয়ন স্থগিত রাখা হবে। এটা অবশ্য শান্তির শক্তিগুলির জয় হিসাবেই গণ্য। আমেরিকার গৃহাগ্নিক গল্পকারদের কাছেও এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, গুপ্তচর বিমান উড্ডয়ন নিবারণ করার জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে শক্তির ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে, তার ফলে আমেরিকার এই স্পর্ধিত রাষ্ট্রীয় নীতিটা মৃত্যুদণ্ডাদিষ্ট, ওটিকে কার্যকরী করার কোনোই সম্ভাবনা নেই। পৃথিবীটা কি আমেরিকার কর্তাদের আগুনপোয়ানো গল্পস্বল্পের দ্বারা চালিত হচ্ছে? এমনটি মোটেই মনে হচ্ছে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আকাশে গুপ্তচর বিমান উড্ডয়ন আমেরিকার রাষ্ট্রীয় নীতি, এই ঘোষণাটিকে কি আইজেনহাওয়ার পারী শহরে প্রত্যাহার করেছিলেন? তা তিনি করেননি। তিনি শুধু এইটুকুই বলেছিলেন যে, তাঁর কার্যকালের অবশিষ্ট ছয় মাসের মধ্যে গুপ্তচর বিমান উড্ডয়ন স্থগিত রাখা হবে। কিন্তু সোভিয়েত দেশের প্রতিনিধিরা তো আইজেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত অনুগ্রহের প্রার্থী হয়ে পারী শহরে যাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, মাকিন রাষ্ট্রের ঘোষিত জাতীয় নীতিটি প্রত্যাহার করা হোক, প্ররোচনামূলক বিমান উড্ডয়ন নিন্দিত হোক এবং অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হোক। আমাদের বন্ধুরা অনেকে হয়ত শুনে অবাক হবেন যে, সোভিয়েত সরকারকেও জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। আইজেনহাওয়ারের একটি ক্ষুব্ধ, ত্বরিত ও আন্তরিকতাহীন উক্তির উপর নির্ভর করে ক্রুশ্চভ কি

সোভিয়েত জনসাধারণকে বোঝাতে পারতেন যে, আমেরিকা সোভিয়েত রাষ্ট্রের আকাশকে আক্রমণ করার নীতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে সোভিয়েত দেশকে যে অপমান করেছে এবং যে গুরুতর বিপদের সম্মুখীন করেছে, তার যথেষ্ট প্রতিকার সাধিত হয়েছে ? এমন কথা ভারত সরকার অনুরূপ অবস্থায় ভারতের জনসাধারণকে বললে চব্বিশ ঘণ্টাও তো টিঁকতে পারত না!

যাই হোক, আইজেনহাওয়ারের শেষ উক্তিটি সম্বন্ধে টীকাটিপ্পনির ধোঁয়ায় এই মূল সত্যটি ঘুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রকৃত দ্যতাঁত-এর মনোভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ যদি বৈঠকে বসেন, তবেই সেই বৈঠক সার্থক। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বা তথাকথিত স্নায়ু-যুদ্ধের পুনঃপ্রবর্তন করে আমেরিকা বর্তমানে শীর্ষ সম্মেলনকে অসম্ভব করে তুলেছে। বর্তমান অবস্থায় প্যারী শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনায় যোগদান করলে শুধু পৃথিবীর মানুষকে প্রতারণা করা হতো। কি দেখা যেত এই তথাকথিত শীর্ষ সম্মেলনে? ঠাণ্ডা যুদ্ধের সেই বাসি ও পচা নাটকটির পুনরভিনয়, পাশ্চাত্য ঐক্যের সেই পুরনো ভড়ং, সেই শক্ত ঠাঁই নীতির অসহ্য একঘেয়েমি, নিরস্ত্রীকরণের নামে অস্ত্রসজ্জা সম্বন্ধে তথ্যনির্ণয়ের সেই ভণ্ড কূটকচালি, জার্মান ঐক্যের নামে পূর্ব জার্মানির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সেই অবাস্তব ভাঁড়ামি! এই অসহ্য নাটকটিকে যে দিনের পর দিন আমাদের দেখতে হয়নি, তার জন্যে নিকিতা ক্রুশ্চভকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁর ১৬ই মে তারিখের ভাষণটি মানবশত্রুর প্রতি মানববন্ধুর, বর্বরতার প্রতি সভ্যতার উক্তি। এবং ক্রুশ্চভ যখন দুঃখের সহিত বলেন, সমান অধিকার ও সমান সুযোগের ভিত্তিতে যদি আলোচনা হয়, তবেই আমরা তাতে যোগ দিতে পারি, অন্যথা নয়, তখন হঠাৎ যেন আমাদের চোখ খুলে যায়। বুঝতে পারি, প্রকৃতই কি কারণে শীর্ষ সম্মেলনটি বসতে পারল না।

কিন্তু এটা মনে করলে খুব ভুল হবে যে, সব গেল! আজ বহু প্রকৃত শান্তিকামীরই হয়ত মনে হচ্ছে যে, দ্যতাঁত একটা অলীক স্বপ্ন! মনে হচ্ছে যেন ফাউস্টের মতোই আমরা মেফিস্টোফেলিসের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি এবং আমাদের ধিক্কারের উত্তরে ভদ্রলোক মেফিস্টোফেলিস চোখা চোখা ভাষায় আমাদের বলছে :

> Ah, now you're put about,
> And claim the moral right to cry 'for shame',
> Because chaste ears must never hear the name
> Of things chaste hearts will never go without.
> But patience, friend, and let us still be lenient :
> Lie to yourself whenever it's convenient.

মনে হতে পারে, শান্তি যদি হয় শুধু চিত্তসুখদায়ক, সুবিধাজনক

অসত্য, কাজ নেই এ অসত্যে! কার্যতঃ এই মনোভাবটাই যুদ্ধবাদীরা আমাদের মনে সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু শান্তি কি অবাস্তব অসত্য? এটা মোটেই ঠিক কথা নয়। সম্প্রতি এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, যুদ্ধের শিবিরে রীতিমতো ভাঙ্গন ধরেছে এবং যুদ্ধবাদীরা ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছেন। নরওয়ে, তুরস্ক, পাকিস্তান ও জাপান, এই চারটি দেশ আমেরিকার কাছে এই মর্মে আপত্তি জানিয়েছে যে, তারা মার্কিন ইউ-২ বিমানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতে চায় না। দক্ষিণ কোরিয়ার লোক সীংম্যান রীকে তাড়িয়েছে। জাপানের লোকেরা জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম চালাচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী কিশি পার্লামেণ্ট ভবন থেকে সকল বিরুদ্ধবাদীদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে রুদ্ধকক্ষে ভোট গণনা করে ঘোষণা করলেন যে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি "সর্বসম্মতিক্রমে" জাপানী পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে! এই ধরণের ফাশিস্ত কার্যকলাপ জাপানের লোক আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। জাপানী স্বাদেশিকতা আজ যে সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব না করে তার শত্রুরূপেই নিজেকে ঘোষণা করছে, এটা সমসাময়িক পৃথিবীর একটা সব চেয়ে বড় সুলক্ষণ। তুরস্কের লোক আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালের অসহ্য চাপে অশান্ত, অস্থির! কিউবার গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরাট পরাজয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ অত্যন্ত হুঁশিয়ার! সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে তারা বদ্ধপরিকর। ব্রিটেনের ও ফ্রান্সের শাসকগণ এখনও পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে মানছেন, একথা সত্য। কিন্তু বিশ্ববিশ্রুত "পাশ্চাত্য ঐক্য" আজ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসুস্থ এবং তার রোগ দুশ্চিকিৎস্য!

শান্তি ভিক্ষালভ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই না করে বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। লেনিন বলেছিলেন, শান্তির লড়াই সুদীর্ঘ ও সুকঠিন লড়াই। সুতরাং শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক্ষণকালের জন্য ব্যর্থ হয়েছে বলে নৈরাশ্যের কোনো কারণ নেই। যুদ্ধের বিপদ রয়েছে একথা সত্য। কিন্তু শান্তির শক্তিসমবায় যুদ্ধবাদীদের চেয়ে অনেক প্রবলতর, একথা আরো বেশী সত্য। আজ হোক, কাল হোক, শান্তির শক্তিগুলির সহিত বৈঠকে বসে সাম্রাজ্যবাদীদের কথা বলতেই হবে। সুতরাং ছয় মাস বা আট মাস পরে আর একটি শীর্ষ সম্মেলনের যে কথা ক্রুশ্চভ বলেছেন, তার সম্ভাবনা অনুজ্জ্বল বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং সেটাই হওয়া উচিত এখন থেকে আমাদের কর্মসূচী। যাতে ছয় মাস বা আট মাস বাদে ভারতের ও চীনের প্রধান মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর একটি শীর্ষ সম্মেলন ডাকা হয়, সেই বিষয়েই আমাদের চেষ্টিত হওয়া উচিত।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

সূচীপত্র

২৯শ বর্ষ ॥ আষাঢ়, ১৮৮২ ; ১৩৬৭ ॥ ১২শ সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

জন্ম : ১৯০১ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যু : ১৯৬০
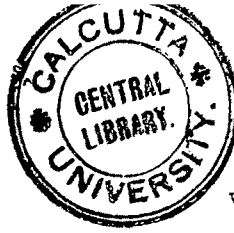
২৯ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা
আষাঢ় ১৮৮২ ; ১৩৬৭

সুধীন্দ্রনাথ স্মরণে

'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর নেই। তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যজগতের একটি দীপ নির্বাপিত হল।

সুধীন্দ্রনাথ কবি, মনস্বী, আত্ম-সচেতন ব্যক্তিত্বের আজন্ম অধিকারী। 'পরিচয়'-এর পক্ষে এ সত্য ঘোষণা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু 'পরিচয়'-এর আবির্ভাবের পূর্বেও এ সত্য গোপন ছিল না, আর তাঁর জীবনান্তেও আজ তা পুনঃপুনঃ স্মরণীয়। জন্মগত মনীষাকে সুধীন্দ্রনাথ আকৈশোর সাধনায় সুস্থিত রূপ দান করেন। সাহিত্য-ধর্মের এরূপ সাধনা বাঙলা সাহিত্যে যেমন বিরল তেমনি আবশ্যক। আশ্চর্য নয় যে, পরিমাণের প্রাচুর্য এ-জাতীয় সাহিত্য-ধর্মের প্রার্থিত নয়। প্রতিভার পর্যাপ্ত প্রকাশই ছিল সুধীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। সেই প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যে জুগিয়েছে অভিনব দানঃ কবিতার ক্লাসিক গঠন, সংযম ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা, অভিনব শব্দ-চয়নে ও শব্দ-উদ্ভাবনায় তৎপরতা। এ সার্থকতার স্থির পরিমাপ এখনো সম্ভব নয়, এ মুহূর্তে তা অনাবশ্যকও। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতার পথ-নির্বাচনে সুধীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় সৃষ্টি ও দৃষ্টি অনুবর্তীদেরও এখনও আদরণীয়—একথা সুবিদিত।

সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা, তার প্রথম সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। 'পরিচয়' একাদশ বৎসর কাল শুধু তাঁর সৃষ্টি-শক্তিরই সাক্ষ্য বহন করে নি, বহন করেছে তাঁর সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধের, অক্লান্ত পরিশ্রমের ও সুমার্জিত পরিশীলনেরও প্রমাণ। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' বাঙলা সাহিত্যপত্রের জগতে ও যুগ-ভাবনার বিকাশে এক অভূতপূর্ব প্রকাশ—মাসিক পত্রাকারেও সুধীন্দ্রনাথ ও

তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী সে গৌরব অম্লান রাখতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সে ঐতিহ্য দীর্ঘদিন অব্যাহত রাখা কালের নিয়মেই হয়তো অসম্ভব। তথাপি সেই প্রথম যুগের ঐতিহ্যকে নতুন কালের ইতিহাসের বাহকরূপে লাভ করাই 'পরিচয়'-এর প্রার্থিত। সেই ঐতিহ্যের যাঁরা স্রষ্টা, সুধীন্দ্রনাথ ও বন্ধুগোষ্ঠী, তাঁদের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর সম্পর্ক যেমন ঐতিহাসিক, তাঁদের নিকট 'পরিচয়'-এর কৃতজ্ঞতাও তেমনি অপরিশেষ। সুধীন্দ্রনাথের জীবন-শেষেও তাই 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হয় না।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন 'পরিচয়-গোষ্ঠীর' মধ্যমণি এবং তাঁর কালের বিদগ্ধ-সমাজের শ্রেষ্ঠ সতীর্থ। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-ভাবনার এমন ব্যাপক বৈদগ্ধ্য নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে ইদানীং আর কেউ প্রবেশ করেন নি; তাঁর কালে এমন সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব নিয়েও আর কেউ সাহিত্যক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন না।

'পরিচয়-গোষ্ঠীর' সহযোগিগণ আজ শোক-বিহ্বল। বন্ধুকৃত্য তাঁরা যথাসময়ে পালন করবেন। 'পরিচয়' আজ শোকার্ত হৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

জীবনপঞ্জী

জন্ম: ১৯০১, ৩০শে অক্টোবর; পিতা স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শিক্ষা: বারাণসীতে অ্যানি বেসান্তের তত্ত্বাবধানে; কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে; বি-এ—১৯২২।

সাহিত্য-জীবন: রবীন্দ্র-সান্নিধ্য; আমেরিকা ও বিদেশ ভ্রমণ ১৯২৯। 'পরিচয়' প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা—১৯৩০-১৯৪১ (প্রথম ১১ বৎসর কাল)।

রচনা: তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তরফাল্গুনী, সংবর্ত, প্রতিধ্বনি, দশমী (কাব্যগ্রন্থ); স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ (প্রবন্ধ পুস্তক)।

কর্মজীবন: সাময়িকভাবে পিতার এটর্নী আপিস, বীমা কোম্পানি, যুদ্ধকালে এ-আর-পি, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (১৯৪৯), ইনস্টিটিউট অব্ পাব্লিক ওপিনিয়ন (১৯৫৫), এবং সর্বশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫৬) যোগদান করেন—১৯৫৭-৫৯এ শিকাগোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপকরূপেও নিযুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু: ১৯৬০ ইং ২৫শে জুন, প্রত্যূষ-কাল।
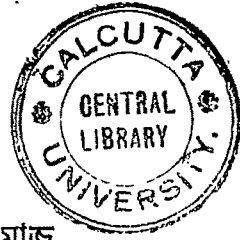
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অধ্যাপক হোয়াইটহেড্ ইউরোপের ইতিহাসে ১৭ শতককে বলেছেন "দি সেঞ্চুরি অব জিনিয়াস্" অর্থাৎ প্রতিভার যুগ। বাংলাদেশে 'প্রতিভার যুগ' নিশ্চয়ই উনিশ শতক। এমন সৃষ্টিশীল ও যুগান্তকারী কাল বাংলার ইতিহাসে বেশি আসেনি। এ যুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতির উন্মেষ। সমাজ ও ধর্মজীবনে এ যুগে নূতন আলোড়ন। জ্ঞানে, কর্মে, সাহিত্যে, নাট্য-আন্দোলনে—সর্বত্র, এ যুগে নূতন সৃষ্টিশীল প্রয়াস। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, বিভিন্নভাবে জাতীয়তার অঙ্কুরোদ্গম। এই অঙ্কুর পরবর্তীকালে শাখাপ্রশাখা সংবলিত বিরাট মহীরূহের রূপ ধারণ করেছে। শুধু ইতিহাসের সন তারিখ মিলিয়েই এ যুগের বিপুল বিস্তারের পরিচয় দেওয়া সম্ভব। এবং ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে এ যুগ অনেকখানি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয়, আন্তরধর্মের বিচারে।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে (১৮২০—১৮৯১) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের যে-আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক, সে-আন্দোলনও এই যুগে দানা বেঁধে ওঠে। উত্তরপুরুষদের জন্য বিদ্যাসাগর যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের অসামান্য চারিত্র মর্যাদা, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা, অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। অথচ, শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির, এমনকি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিরিখে তাঁর

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)। বিনয় ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

চরিত্রের সামগ্রিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। ১৮২০ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত, বিদ্যাসাগর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের তরঙ্গায়িত গতির মধ্যে বাংলার সামাজিক জীবন কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, বাঙালী সমাজের রূপান্তরের ঐতিহাসিক দিক্‌নির্ণয় বিদ্যাসাগর তাঁর জ্ঞানকর্মসমৃদ্ধ জীবনে কতখানি করতে পেরেছেন, হয়তো এ প্রশ্নই শুধু আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক। যে নূতন বাংলার গোড়াপত্তন রামমোহন আরম্ভ করেছিলেন এবং যে চিন্ময় বাংলার পূর্ণাঙ্গরূপ আজও কুহেলিকা-আবৃত, অথচ যে বাংলা ইতিহাসের ধারাপথে, অলক্ষ্যে সৃজন হচ্ছে—সেই বাংলার ক্রমবিকাশে বিদ্যাসাগরের দান কতটুকু, ইতিহাসের রায় বিদ্যাসাগরের স্বপক্ষে না বিপক্ষে গেছে, এ সব প্রশ্ন আজ সঙ্গতভাবেই এসেছে। আজ যদি বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হতেন, তাহলে তাঁর চিত্তলোকে কোন্ কোন্ সমস্যা মুখ্যরূপ নিত, কোন্ কর্মযোগে তিনি আকৃষ্ট হতেন, এ কল্পনা হৃদয়গ্রাহী তো নিশ্চয়ই, হয়তো একেবারে নিরর্থকও নয়। বিদ্যাসাগরের যুগের সমস্যা—সমাজসংস্কারের ও শিক্ষাসংস্কারের আন্দোলন আজও পূর্ণতা লাভ করে নি। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে, আজও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিষ্পন্ন হয় নি। এ দৃশ্য দেখে বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই যুগপৎ পুলকিত ও ব্যথিত হতেন। পুলকিত হতেন একথা ভেবে যে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের যে শুভকর্ম তিনি আরম্ভ করেছিলেন, সেই কর্মযোগ জাতির মানসলোকে স্থান পেয়েছে। ব্যথিত হতেন অসমাপ্ত কর্মের কথা ভেবে। অবশ্য যে পার্থক্য বিদ্যাসাগরের সন্ধানী দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ত, সে পার্থক্য এরূপ। আজ সামাজিক মুক্তি-আন্দোলন অনেকাংশে রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত। এবং এই মুক্তি-আন্দোলনে আজ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী অংশীদার—শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা নন। বিদ্যাসাগরের যুগে, ঐতিহাসিক কারণে, নূতন জ্ঞানকর্মযোগের নেতৃত্ব ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর হাতে। আজ অন্যান্য নেপথ্যচারী শ্রেণীও ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আবির্ভূত। যে জ্ঞানকর্মযোগে, উনিশ শতকে, এঁদের যোগাযোগ ছিল যৎসামান্য, আজ সেই জ্ঞানকর্মযোগে এ সব শ্রেণীর ভূমিকা ক্রমবর্ধমান।

"বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" প্রধানতঃ উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস। বিদ্যাসাগরের জীবনকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থ রচনার হেতু

এই যে, এত বিচিত্র ও বিরোধী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে উনিশ শতকের আর কোনো বাঙালীর জীবন ও চরিত্র গড়ে ওঠে নি। এবং উনিশ শতকের মধ্যাহ্নকাল বিদ্যাসাগরের জীবনেরও মধ্যাহ্নকাল। বাংলার রেনেসাঁস-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে বিদ্যাসাগরের স্থান। তার মধ্যগগনে তিনি দীপ্যমান। অর্থাৎ বাংলার রেনেসাঁস-এর ইতিহাসের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবন ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। এবং সেজন্য বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করতে গেলে রেনেসাঁস যুগধর্মের সঙ্গে পরিচয় বোধ হয় অত্যাবশ্যক।

একথা সত্য যে কোনো জাতির জীবনে রেনেসাঁস বিভিন্নযুগে নূতনভাবে হয়তো দেখা দেয়। এবং একযুগ যেহেতু অন্যযুগ থেকে রীতিমত ভিন্ন, তাই সব দেশেরই, সেই-সেই যুগের কালগত বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে। ফলে, কোন্ যুগের 'রেনেসাঁস', কি তার বিলক্ষণতা এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশেও রেনেসাঁস বিভিন্ন যুগে সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু উনিশ শতকী রেনেসাঁসের বিলক্ষণতা এতই স্বপ্রকাশ, যে অন্য যুগের সাধনার সঙ্গে একে অভিন্ন মনে করবার কোনো ঐতিহাসিক হেতু নেই।

কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক অবশ্য উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসকে 'হিন্দু ভাগ্যবন্তদের খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত আত্মসচেতনতা,' 'সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায় নেহাত-ই সীমাবদ্ধ', 'দ্বিধাগ্রস্ত ধর্ম ও সমাজসংস্কার-আন্দোলন', 'সমাজ-জীবন বিচ্ছিন্ন পরগাছা বাবুদের নিজেদের অস্তিত্বের অলীক মোহ তৈরী', ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে নিপুণ-ভঙ্গিতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। এঁদের মতে, 'রেনেসাঁস' শুধুই ইউরোপ নামে এক বিশেষ দেশের, এক বিশেষ যুগের (১৫।১৬ শতক) বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে রেনেসাঁসী যুগ কোনো কালেই আসেনি, আসা সম্ভবও ছিল না। 'রেনেসাঁস' আলোচনার মূল প্রশ্নই হল, রেনেসাঁস কাদের জন্য? কারা রেনেসাঁস আনলেন?

সমালোচকেরা তাই বলেন, দেশের মৌল চরিত্রের পরিবর্তন ছাড়া রেনেসাঁস নেহাত-ই বাবু-বিলাস, অন্য কিছু নয়। এবং বাংলাদেশে এই বাবুবিলাসী রেনেসাঁসী-প্রেতেরই সাক্ষাৎ মেলে উনিশ শতকে।

প্রবন্ধকারের মতে, 'রেনেসাঁস' শব্দটির দেশগত ও কালগত তাৎপর্য এত সুগভীর, যে, ইউরোপ বহির্ভূত দেশের নবজাগরণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথম থেকে,

নূতন পরিভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়ই হত। বাংলার উনিশ শতকের 'রেনেসাঁস', ইতালী তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর সঙ্গে অভিন্ন নয়, বরং আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে বহুলাংশে ভিন্ন, যেমন কেলটিক-জাতির রেনেসাঁস ইতালীয় রেনেসাঁস থেকে ভিন্ন।

'রেনেসাঁস' শব্দটি বর্জন না করেও শ্রীঅরবিন্দ ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

"The word (Renaissance) carries the mind back to the turning point of European culture to which it was first applied ; that was not so much a reawakening as an overturn and reversal, a seizure of Christianised, Tutonised, feudalised Europe by the old Graeco-Latin spirit and form with all the complex and momentous results which came from it. That is certainly not a type of renaissance that is at all possible in India." (The Renaissance of India—পৃ ২।৩)।

ইতালীর রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার রেনেসাঁসের ভিন্নতা ও বিলক্ষণতা ঐতিহাসিকভাবে অনুশীলনযোগ্য। কিন্তু অধুনা ইউরোপীয় ইতিহাসের নাম নিয়ে বাংলার রেনেসাঁস-এর রিক্ততা উদ্‌ঘাটনে যেহেতু অনেকেই ব্রতী, সেইজন্য রেনেসাঁস প্রসঙ্গে কয়েকটি জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। Michelet, Burckhardt থেকে শুরু করে আধুনিককালে Russell পর্যন্ত বিদেশী মহাপণ্ডিতেরা রেনেসাঁসের স্বরূপলক্ষণ, সীমা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই চিন্তার ও আলোচনার কয়েকটি সিদ্ধান্ত অনুধাবনযোগ্য।

রেনেসাঁস (Renaissance) শব্দটির আভিধানিক অর্থ—পুনর্জন্ম (ল্যাটিন, re+nasci, to be born)। তবে, ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন যুগের চিত্ত-জাগরণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইতালী ও ইউরোপে যে চিত্তমুক্তির পালা শুরু হয়েছিল, সেই চিত্তমুক্তিকে বোঝাবার জন্য 'রেনেসাঁস' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। Michelet শব্দটি চয়ন করেন এবং Burckhardt (১৮৬০) শব্দটিকে ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা দেন। Burckhardt-এর মতে (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (খ) ধ্রুপদী অতীতের আবিষ্কার (গ) জগৎ ও ব্যক্তিমানুষের আবিষ্কার—রেনেসাঁসের এই হল ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য।

এই বৈশিষ্ট্য হেতু রেনেসাঁস-যুগ মধ্যযুগ (Middle Age) থেকে স্বতন্ত্র-ভাবে চিহ্নিত। অবশ্য Burckhardt-এর সময় থেকেই রেনেসাঁস-এর অর্থ, তাৎপর্য, যুগসীমা এমনকি রেনেসাঁসের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা, প্রতি-আলোচনা চলে এসেছে এবং এই আলোচনা, প্রতি-আলোচনা অহেতুকও নয়। সংস্কৃতির কোন্ রাজ্যে সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে, রেনেসাঁস আন্দোলনে কোন্ দেশের অবদান কতটুকু, এসব প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করে, শেষ পর্যন্ত সমগ্র রেনেসাঁস-যুগের ভাষ্যই স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। এবং অনেকেই আজ মনে করেন যে রেনেসাঁসের মতো বিচিত্র-জটিল ঐতিহাসিক ঘটনাকে কোনো এক সহজ, অমূর্ত সংজ্ঞায় বেঁধে দেওয়া অসঙ্গত। তাছাড়া, এ রকম সংজ্ঞা দেওয়াও হয়তো অসম্ভব।

ইতিহাস-অনুশীলনের ফলে দেখা গেছে যে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ শুধুই Dark Age নয় এবং মধ্যযুগের সঙ্গে রেনেসাঁস যুগের স্বাভাবিক পারম্পর্য আছে। আগে যেমন ভাবা হত যে রেনেসাঁস যুগের সমস্ত কিছুই মহৎ এবং উদার, আধুনিক পণ্ডিতেরা সেই অবাস্তব ভাবনা ক্রমশই পরিহার করে আত্মস্থ হচ্ছেন। কি বিজ্ঞানের দিক থেকে, কি চিত্তমুক্তির প্রশ্নে, ইতালীর রেনেসাঁসও যে বহুলাংশে খণ্ডিত, এ সত্য আজ পাশ্চাত্যের ভাবুকেরা অনেকেই স্বীকার করেন। নীতির মানদণ্ডে, কিংবা জনসাধারণের অংশ গ্রহণের দিক থেকে বিচারে, ইতালীর রেনেসাঁসও নিরন্ধ্র মহত্ত্ব দাবি করতে অক্ষম। Russell তো "ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস"-এ বলছেনই :

(1) "The Renaissance was not a popular movement; it was a movement of a small number of scholars and artists encouraged by liberal patrons, especially the Medici and the humanist popes.

(2) Italians of the Renaissance, with the exception of Leonardo and a few others—had not that respect for science which has characterised most important innovators since the Seventeenth Century; with this lack is associated their very partial emancipation from superstition, especially astrology.

(3) The Renaissance was not a period of great achievement in philosophy, but it did certain things which were essential preliminaries to the greatness of the Seventeenth Century" ইত্যাদি।

এ-সব সীমা ও স্ববিরোধ সত্ত্বেও, ইতালীর (তথা ইউরোপীয়) রেনেসাঁস-এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পণ্ডিত-সম্মতি আছে সেগুলি পুনরুল্লেখযোগ্য। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ :

১। মানুষের মূল্য ও মানুষের শ্রদ্ধেয়তায় আস্থা।

২। মধ্যযুগীয় কতকগুলি মানদণ্ড ও সে-যুগে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্জন।

৩। নবাবিষ্কৃত বিশেষ কতকগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের স্বীকৃতি।

৪। দার্শনিক মতামত প্রকাশের জন্য নূতন সাহিত্যরীতি ও নূতন রচনাশৈলীর প্রচলন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-আন্দোলনের বহু সম্প্রদায় আছে এবং এদের ঐতিহ্য সর্বাংশে এক ধরনেরও নয়। রেনেসাঁস একটি সামান্য, যা অনেক বিশিষ্ট ধারায় অনুগত। রেনেসাঁস অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ধারা এস্থলে উল্লেখযোগ্য—মানবপ্রেম (humanism), দুঃখবাদ (pessimism), সংশয়বাদ (scepticism), প্রাকৃতিক দর্শন (natural philosophy), আরিস্ততলীয় মতবাদ (Aristotlianism), প্লেটোবাদ (Platonism) ইত্যাদি। অর্থাৎ রেনেসাঁস-প্রবাহের শাখা, উপশাখা বিচিত্র এবং এই বিচিত্রতার রসে সিঞ্চিত সাংস্কৃতিক (ব্যাপক অর্থে) আন্দোলনই "রেনেসাঁস"।

ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করেছেন এবং বলছেন যে, উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে একটা বিশেষ যুগ। বাংলাদেশে নূতন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপিত হয় এই যুগে। এই রেনেসাঁস-আন্দোলনের পর্ব আছে, পর্যায় আছে, ওঠা-নামা আছে, আছে জোয়ারের অতিবেগ এবং পরবর্তীকালের ভাঁটার ঘোলাটে ক্ষীণধারা। এ আন্দোলনের সীমা ও স্ববিরোধও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবুও, উনিশ শতকেই বাংলার রেনেসাঁসের উন্মেষ, জ্ঞানে, কর্মে, সামাজিক, শিক্ষা ও সাহিত্যিক আন্দোলনে।

আমরা একথা জানি যে ভারতবর্ষে, মধ্যযুগে (১৩০০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দু রেনেসাঁস আরম্ভ হয়েছিল। কে এম পানিক্কর বলেছেন :

"In the sphere of religion and moral thinking, in law, in literature and even in political ideas, a new life came into

being in India by the middle of the 16th century, which was justly be termed the first Indian Renaissance." রাজনীতি, আঞ্চলিক সাহিত্য ও চৈতন্য, রামানন্দ, কবীর, নামদেব, বল্লভাচার্য ও নরসিংহ মেহতা প্রভৃতি সাধকভক্তদের ভূমিকা আলোচনা করে শ্রীপানিকর দেখাচ্ছেন, এ যুগে হিন্দুমানসের অভিনব রূপান্তর ঘটেছিল। সংস্কৃতের প্রাধান্য বজায় থাকলেও, এ যুগে স্থানীয় ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। মিথিলায় বিদ্যাপতি, বাংলায় চণ্ডীদাস, কবীর, মীরা, নাথস্বামী এবং আরও অনেকে, নূতন সাহিত্যের পত্তন করেছেন। শ্রীপানিক্করের ইতিহাস আলোচনা যে অর্বাচীনের ছেলেমানুষী নয় এবং সত্যই যে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টিশীল চিন্তা ও ভাবপ্রবাহের ধারা দেশের মানসলোক উদ্ভাসিত করেছিল, ইতিহাসের ছাত্রের এ কথা জানাই আছে।

তবুও, উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে এই প্রথম রেনেসাঁসের তুলনা চলে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন :

ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে ; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। উনিশ শতকে, ইংরেজ আমলে চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই ; এবং রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের বাঙালী প্রধানদের সঙ্গে যখন প্রথম ইংরেজী সাহিত্যের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে তাঁরা অভিনব রস আহরণ করেছেন তা নয়। তাঁরা পেয়েছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ ; শুনতে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা। তাঁদের কাছে এই ভাবজগৎ ছিল নূতন, কিন্তু বাস্তব। সেদিনকার যুগনায়কদের চেতনায় ইউরোপের সংস্রব একদিকে এনেছিল বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে খণ্ডিত হতে পারে না।

আমাদের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রাণের, চিন্তার ও মননের যে চেষ্টা

সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই চেষ্টাই অঙ্কুরিত হতে থাকে উনিশ শতকে। সেই অঙ্কুর শাখাপল্লব বিস্তার করেছে, বিকশিত হয়েছে, কোনো শাখা হয়তো জরাজীর্ণ হয়ে স্খলিত হয়েছে, তবুও, সমগ্রভাবে দেখলে বলতে হয় যে, বিকাশের ধারা সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত না হলেও, আজও অব্যাহত, যদিচ সেই ধারা আজও পূর্ণতালাভ করে নি।

যদিও মানবতাধর্ম বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সাধনা, তবুও উনিশ শতকে এক বিশেষ অর্থে আধুনিক চেতনার প্রতিষ্ঠা, অবিমিশ্র মানবিকতাবোধে। বিদ্যাসাগরের জীবনে ও মননে এই মানবতাবোধ তাঁকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তোলে নি। অনাধুনিক যুগের চিন্তা ও ভাবনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং ঐ যুগের মানবিক উপাদানকে বর্জন তিনি করেন নি। অথচ আধুনিক মানসের আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রীতি, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা প্রভৃতিও তাঁর মহনীয় জীবনকে চিহ্নিত করেছে।

"বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ"-এর লেখক বিশ্বাস করেন যে বাংলার রেনেসাঁস ও ইউরোপীয় রেনেসাঁস গতিপ্রকৃতির দিক থেকে—আন্তরধর্মের দিক থেকে, প্রায় অভিন্ন। "তুলনামূলক পদ্ধতিকে" আশ্রয় করে গ্রন্থকার বাংলায় রেনেসাঁসের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে, বিদ্যাসাগরের জীবন-আলেখ্য অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি বিনা দ্বিধায় ইউরোপীয় নজীরের উল্লেখ করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে বাংলার রেনেসাঁসের সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্য অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। গ্রন্থকার বিবিধ তথ্য আহরণ করে দেখিয়েছেন :

১। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার প্রাচীন সমাজবিন্যাসে ভাঙন ধরেছিল এবং এ-যুগে বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক উচ্ছিষ্টভোগী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে ও বাল্যজীবনে, কলকাতার বাঙালী সমাজে এই অস্তগামী বিকৃত নবাবী কালচারের যে কোনো জের ছিল না তা নয়।

২। ১৯ শতকের প্রথম পাদে কলকাতা শহরে, বাঙালী সমাজে নূতন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর বিকাশ হচ্ছিল। এই ভদ্রলোকেরা চাকুরি ও ব্যবসাবাণিজ্য করতেন এবং এবং এঁরা ছিলেন 'বিত্তবান' ও 'ভদ্রলোক' —দুই-ই। এই ভদ্রলোকদের আবির্ভাবে এক নূতন সমাজবিন্যাস সৃষ্টি হল,

যে সমাজবিন্যাস মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। এ যুগে শ্রেণীমর্যাদা বিত্তগত হল, পূর্বে ছিল কুলগত বা বংশগত। নবযুগের শ্রেণীমর্যাদা যখন বিত্তগত হল, তখন বাংলাদেশের শ্রেণীবিন্যাসের ধারারও পরিবর্তন হল।

৩। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে, নবযুগের নতুন শিক্ষাসংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে উঠছিল। এই যুগপর্বে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ডিরোজিওর শিক্ষকতায় 'ইয়ং বেঙ্গল' দল নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন। রামমোহন বাংলাভাষায় প্রথম বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বিচারবিতর্কও আরম্ভ করেছেন পূর্ণোদ্যমে। পটলডাঙ্গার কলেজ গৃহে, ডিরোজিওর বৈঠকখানায়, বেকন-লক-হিউমের জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন নিয়ে বিতর্কসভা বসছে। সব মিলিয়ে বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে ও মানসলোকে তখন আলোড়নের আভাস। তাছাড়া, বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনে (ক) অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন, (খ) জ্ঞানসন্দীপন সভা, (গ) সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা, (ঘ) সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, (ঙ) তত্ত্ববোধিনী সভা ও আরও অন্যান্য সভা-সমিতি স্থাপিত হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে এই সব সভা-সমিতিতে আলোচনা হত। এবং নবযুগের সামাজিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হল এই সভাসমিতিগুলি।

৪। এ-যুগপর্বে নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা। অবশ্য এই প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতার জীবনে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিলাস-ব্যভিচার প্রকট হচ্ছিল। অন্যদিকে বাংলার গ্রামীণ সমাজের ও সাধারণ গ্রাম্য মানুষের—কৃষকের ও কারিগরের অবস্থা দুর্দশার চরমে উঠছিল। কাজেই কলকাতায় নবযুগের, নবজাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম্যজীবনের শোকসঙ্গীতের বিষাদের সুরের মধ্যে তার মাদকতা আপামর সাধারণের কাছে পৌঁছয় নি।

৫। গ্রামীণ জীবনে ভাঙন, দুর্দশার ঘনকৃষ্ণ মেঘ, অন্ধকারের কালো রেখা। তথাপি এ-যুগের জীবনমন্ত্র হল মানবমর্যাদাবোধ, অন্যায়, অযুক্তি, কুযুক্তি ও যুক্তিহীন মোহাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব। এই মনোভাব গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় নি, জনজীবনে এর প্রভাব সে-যুগে ছিল যৎসামান্য। তবুও সমাজ সংস্কারের চেতনা এ যুগে ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজে প্রবল হয়েছে, যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা বেড়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সভাসমিতি, স্বাধীন আলোচনা

ইত্যাদি নূতন চেতনা ও মূল্যবোধকে প্রকাশ করেছে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের সূচনায় এই সংস্কারোন্মুখ সামাজিক পরিবেশ, মধ্যবিত্তসমাজে স্পন্দিত নূতন প্রাণশক্তির বন্যা—তাঁর জীবন ও চরিত্রকে বহুল পরিমাণে রূপায়িত করেছে।

৬। পরবর্তী পর্বে, কর্মজীবনে, সমাজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার অধ্যবসায়ের সঙ্গে ও অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বিদ্যাসাগরের "শিক্ষাচিন্তা," "বাংলাশিক্ষা," "স্ত্রীশিক্ষা," "সমাজ সংস্কার" প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও সংগ্রামের কাহিনী আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ১৮৫০ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম দশবছর বিদ্যাসাগর ছিলেন নতুন সামাজিক আন্দোলনের কর্ণধার। সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের দান অবিস্মরণীয়। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে বাংলা সাংবাদিকতাকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বিদ্যাসাগর বৃহত্তর ও মহত্তর সমাজ-জীবনের দর্পণস্বরূপ করে তুলেছিলেন। এই কারণে তাঁকে বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক সাংবাদিকতার অন্যতম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক বলা যায়।

যে পরিবেশে বিদ্যাসাগরের চৈতন্যের ও কর্মের ফসল ফলেছিল, গ্রন্থকার সেই পরিবেশকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন। পরিবেশ ও তৎকালীন সমাজ যে ব্যক্তিচরিত্র নানাভাবে প্রভাবিত করে এ তত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থকারের ঔৎসুক্য সর্বত্র পরিস্ফুট। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিনবত্বও যে উপেক্ষণীয় নয়, একথাও গ্রন্থকার স্মরণ রেখেছেন। কোন্ মনস্তাত্ত্বিক জমিতে চিন্তাভাবনার ফসল ফলেছে, এ প্রশ্নও গ্রন্থকার উত্থাপন করেছেন। ফলে, বিদ্যাসাগরের দেশীয় ও কুলগত চারিত্রিক ঐতিহ্যের প্রশ্নও স্বভাবতই গ্রন্থকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যা কিছু মহৎ এবং নূতন, নাগরিকসমাজের যা কিছু গতিশীল, তাই, বিদ্যাসাগর আপন প্রজ্ঞাবলে সাদরে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছেন। অন্যদিকে, দেশীয় ও কুলগত বিভিন্ন গুণাবলী যথা—প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, বিনয়, আচার এবং অহংবোধ, এই চরিত্রের উপাদান।

ইতিহাসের বিচারে বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও কর্মকীর্তির গুরুত্ব কতখানি? বিদ্যাসাগরের চরিত্র কি সব রকমের সীমা ও স্ববিরোধ থেকে মুক্ত ছিল?

গ্রন্থকার দেখাচ্ছেন যে, বিদ্যাসাগরের সামাজিক ব্যক্তিত্ব সবল ও সমুন্নত হলেও তার প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর সংস্কার-চিন্তার মধ্যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধের দোষও ছিল। "সীমা ও স্ববিরোধ" পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার এই স্ববিরোধের লক্ষণ ও হেতুনির্ণয় করতে চেয়েছেন।

তথাপি বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের অদ্বিতীয় পুরুষ। প্রাচীন ঋষিদের মতন জ্ঞান ও ইংরেজের মতন কর্মশক্তি তো বিদ্যাসাগরের ছিলই, তদুপরি তাঁর চরিত্রে যুগসুলভ প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানববোধ, সমাজ-চেতনা ও জাগতিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলার রেনেসাঁসের এই সমস্ত মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ বিদ্যাসাগর চরিত্রে হয়েছিল। ফলে তিনি বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন।

শুধু ব্যক্তিগত চারিত্রমর্যাদার দিক থেকেই নয়; উপরন্তু কিছু কিছু অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগর ইতিহাসের গতিমুখেই চলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন হয়েছিল। সেইখানের তাঁর ঐতিহাসিক সার্থকতা।

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নানাদিক থেকেই উপাদেয় গ্রন্থ। গ্রন্থকার সমাজবিজ্ঞানের আলোকে উনিশ শতকের বাংলাসমাজকে বুঝতে চেয়েছেন। সামাজিক শক্তি ব্যক্তিজীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বিদ্যাসাগরের জীবনে তৎকালীন সমাজজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কতখানি প্রভাব রেখেছে, এবং বিদ্যাসাগর সমাজকে কতটা প্রভাবিত করেছেন, এই দ্বৈতশক্তির গতি-প্রকৃতির অনুশীলন গ্রন্থকারের মূল উপজীব্য। এতৎসত্ত্বেও, গ্রন্থকারের মূল উপাত্ত সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

বাংলার রেনেসাঁস-এর গতিপ্রকৃতি আলোচনায় আজও দুটি একদেশদর্শী প্রবণতা লক্ষণীয়। একদিকে আছে নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা, যে প্রবণতার ফলে অনেক সমালোচক 'রেনেসাঁস' প্রত্যয়টি বর্জন করতে উন্মুখ। যথা, "It was this class of proprietors, enriched by the plunder of millions of poor peasants, who brought about a cultural resurgence in the city. This resurgence has often been mistakenly called the Indian Renaissance……"

"The renaissance was, characteristically enough brought

to fruition by an alliance with the ruling power by a class of absentee landlords and Banians aspiring to be 'junior partners' away from the village."

"The country at large did not exist for this renaissance." (Census of India, Vol. 6, pp. 442). অন্যদিকে আছে যান্ত্রিক অনুকৃতির প্রবণতা, যে প্রবণতার ফলে অনেক পণ্ডিত দেশকালের বিভিন্নতা উপেক্ষা করে বাংলার রেনেসাঁসে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সব লক্ষণ আবিষ্কারে উদ্যোগী। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজের লেখকের এই দ্বিতীয় প্রবণতা সুস্পষ্ট। ফলে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে ফ্লোরেন্স যদি আধুনিক ইউরোপের 'প্রোটোটাইপ' হয়, তাহলে নবযুগের কলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে ভারতের ফ্লোরেন্স বলা যেতে পারে।

গ্রন্থকার স্বীকার করছেন যে, ইউরোপের 'বুর্জোয়াশ্রেণী' কিংবা 'ক্যাপিটালিস্ট' শ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। ফলে, নবযুগের আদর্শের ধারক ও বাহক বাংলাদেশে শিল্পবিপ্লব-সঞ্জাত 'নতুন নাগরিক মধ্যবিত্ত' নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে বাংলাদেশে নতুন এক জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। তাঁদের বংশধরেরাই আধুনিক বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ। বাকি অংশ বিদ্যাবুদ্ধিজীবী ও চাকুরিজীবী।

ইউরোপীয় নাগরিক মধ্যবিত্তের সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্তের মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেও, গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করেছেন—নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীই রেনেসাঁস প্রভৃতির উদ্যোক্তা। এ সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক তথ্যসঞ্চয়ন প্রয়োজন, মনে হয় গ্রন্থকার সে প্রয়োজন স্বীকার করেন নি। বাংলার সমাজেতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ইতালীর রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার রেনেসাঁসের সাদৃশ্যই শুধু খুঁজেছেন, দেশগত কালগত বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন নি। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার যদি ভারতীয় তথা বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের অভিনবত্ব স্মরণ রেখে অগ্রসর হতেন, তাহলে বোধ হয় বাংলাদেশের রেনেসাঁস গবেষকেরা আরও উপকৃত হতেন। অধ্যাপক ডি. ডি. কোশাম্বী (ভারতীয় ইতিহাস-পাঠের ভূমিকা, পৃ ৩৭০) বলছেন :

"The considerable hiatus caused by the British conquest in the steady development of the Indian bourgeoisie has to be taken into account. It was not the merchant princes, finan-

ciers, monopolists of the late feudal period who turned into the new Indian bourgeois. They were neatly cleaned out as soon as the feudal governors in whose shadow they had carried out their lucrative practices were supplanted by the British."

"The new class that rose in the second-half of the 19th century……developed out of the go-between dalals who were ultimately based on machine production, but production mostly in England, supplied by India with raw materials and a market."

প্রশ্ন হবে কেন এমন হল ? অধ্যাপক কোশাম্বী বলেছেন :

"The Indian pre-capitalist accumulation could not give rise immediately to mechanisation nor to an advanced proletariat as had the British in England. Machines, technique and the first technicians had to be imported.

This accounts for India's backwardness……".

গ্রন্থকার বাংলার নবজাগরণের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব এবং স্ববিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত। বৈদেশিক শাসনাধীনে এই জাগরণের বাস্তব ভিত্তি অনেকটাই যে রচিত হয় নি, এ সত্য স্থানে স্থানে তিনি স্বীকারও করেছেন। কিন্তু তবুও পাঠক অনুভব করেন যে গ্রন্থকার এই সত্যকে স্বীকৃতি দিতে অল্পাধিক কুণ্ঠিত।

বাংলার রেনেসাঁস-সংস্কৃতি যে পুরাতন সংস্কৃতির শুধু ক্রমবিকাশ নয়, কৃষিপ্রধান পল্লীসংস্কৃতির সঙ্গে এর বিচ্ছেদ যে আত্যন্তিক, বহুলাংশে এ সংস্কৃতি যে শিক্ষিত, হিন্দু মধ্যবিত্তের (ইউরোপীয় middle class নয়) মানস সম্পদ এবং এ সংস্কৃতি যে মনোজগতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রন্থকার এইসব প্রতিজ্ঞা হয়তো গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় এগুলি যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে নি।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বাংলার রেনেসাঁস-প্রেরণা আন্তরিক, যদিও এই প্রেরণার মূলে মাটি নেই। গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এই যে, সীমা ও স্ববিরোধ-সহ, রেনেসাঁস-যুগের অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। এই ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের সাধনা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবার দাবি রাখে।

• •

বর্ষার জানলায়

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কাঠকয়লায় লেখা নাম
বৃষ্টিতে মুছতে মুছতে, মেঘগুলো পালাচ্ছে।

জানলার জনান্তিকে
অবিরাম বৃষ্টির কাটাকুটি, আর
ঝাপ্সা হাওয়ায় অস্পষ্ট দেহাতি গন্ধ।

হাঁটুতে মুখ-গোঁজা দিন
অন্ধকারের দাওয়ায় গোঁজ হয়ে বসে ;
কাঁঠালবিচি পোড়ার গন্ধে
ঠাকুরমার ঝুলি থেকে গল্প বেরুলে
এখুনি সে গোগ্রাসে গিলবে।

এখন দীর্ঘশ্বাস
আকালের দাওয়ায় নড়েচড়ে বসছে।
আর জানলার জনান্তিকে ঠায় বসে
গালে হাত-দেওয়া অন্ধকার।

অনেক দূরে দাঁড়িয়ে নিরীহ আকাশটা
সারাক্ষণ ভিজছে।
কাঠকয়লায় লেখা নাম বৃষ্টিতে মুছতে মুছতে
মেঘগুলো, মেঘের আড়ালে পালাচ্ছে।
বর্ষার হিজিবিজি জানলায়
অবিরাম বৃষ্টির কাটাকুটি ॥

বাণিজ্যযাত্রা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

বাণিজ্য দূরের যাত্রা ; এই পথে বাল্য যায় কৈশোরের বেলা।
আবার ঢাকের শব্দ, মহাজনী নৌকা লাগে ঘাটে ;
আকাশে নবীন মেঘ ডাক দেয়, কোথা পরবাসী
কে কোথায় দ্বিধা কর বেলা হলে সূর্য যাবে পাটে।

এ-যাত্রা কি নিয়ে ফিরি ; বল বুকে কি তৃষ্ণা রেখেছ :
তরঙ্গ ?   উতলা দৃশ্য ?   কিম্বা নীল স্থির ঠাণ্ডা জলে
বৃন্তচ্যুত কোনো ফল—রক্তিম স্থপক্ক সূর্য,
লাল রঙ খুঁটে খায় মাছ।
সেই মনোহর ফল ?—চিরবন্ধ্যা দু-সতীনে ভাগ নিয়ে কি কলহ,
দিন গেলে চতুর্দশী রাত্রে তারা দুই সখি দুই চোখে সুখের পূর্ণিমা
এর কোলে জলে চাঁদ, ওর কোলে ভাসে চাঁদ, আকাশে ধরে না !

হয়তো এ-সব কথা ভুলে যাব, তুমি দেখবে সাদা পাল ফিরে এল হাওয়ায় একাকী
কে সুন্দরী পাটাতনে বসে আছে, বুঝি বিভা, মুক্তকেশ অপর চেতনা।
থাক, তিক্ত চিন্তা থাক !   মনে পড়ে বাল্যকাল যাত্রার আসরে সেই গান :
এ-ভবে কেবল মেলা, এ-বেলার পুতুল ওবেলা
ভেঙ্গে যায়, দুঃখ ছাড় যৌবন বয়সে কেউ কণ্টকে কাঁদে না।

বাল্য, তুমি পিছে আছ, সঙ্গে আজো যাত্রার বিবেক।

একটি কবিতা

উৎপলকুমার বসু

জানি অন্ধকার তুমি বহুদূর যেতে পার—জানি নীরবতা তুমি
যতদূরে যাও সেই পথের দুপাশ ছুঁয়ে মৃত বা অমৃত
কল্প গাছের সারি—ভোল মৃত্যু খোল মায়াজাল
শূন্যে বাতাস জুড়ে আমি এক প্রবাসী কঙ্কাল শুয়ে আছি।

তবে কি তোমার রথ অস্তগোধূলিপারে ডুবে গেল ?
তবে কি তোমার রথে ঘূর্ণমান পশ্চিমসূর্যের গতি ম্লান দেখে দেখে
আমি আরেক দিগন্ত পারে হাজার স্ফুলিঙ্গে গড়া জ্যোৎস্না পেয়ে যাব ?
এ মৃত্যু সেখানে শেষ। এই মায়া অনৃত সেখানে।
কল্প গাছের সারি ততদূর ফিরে যায়। ততদূরে তুমি যাও
নীরবতা। তুমি ডাক সমস্ত পথিকে—যেন রুদ্র অন্ধকার

সমুদ্ররেখার তীরে নিয়ে গেল লক্ষ উল্কাপাতে
যা কিছু শ্রমের দান, এই দেশ, রাজ্য যেন, সংসার,
অগণ্য রাজার দল, সভাসদ, লুণ্ঠিত শত নাগরিক
সমস্ত নীরব হ'লে প্রাচীন ঘণ্টার মত 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' শোনা গেল।

আরোগ্যের পর : স্যানাটরিয়মের স্মৃতি

গোবিন্দ গোস্বামী

কখন সে রক্তমুখ উত্তরণে নিঃশব্দ ক্রন্দন
বিস্তৃত আকাশ জুড়ে পশ্চিমের শেষ পরিচ্ছদে
সূর্যরশ্মি চিত্রায়িত ক্ষতপট আহত জীবন
নিয়ে মৃদু কানাকানি করে অনতিদূরের এক হ্রদে।

এখানে এলাম কবে, শূন্য চোখে বিক্ষত হৃদয়
যতদূর চেয়ে থাকে, ছাখে—এক নির্জন নিবিড়
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জুড়ে সমুদ্রের ঢেউ বিনিময়,
দৃশ্যান্তের পটভূমি, ছায়া, এ বাতাস আশ্চর্য গভীর !

নিঃসঙ্গ ঘাসের গন্ধ সূর্যশুভ্র শিশিরের স্তবে
এ রুগ্ন জীবন চলে পায়ে পায়ে গতি নিয়ে পথে
যেখানে অসংখ্য চোখে নগরীর জীবন্ত উৎসবে
রেখে যায় আলো-দেহ, দেয়ালির নীলাভ জগতে।

ফিরে এসে চলে যাই, কী আশ্চর্য এই দিন গোনা
কত অশ্রু, কত রক্ত কার স্বাদ সবচেয়ে লোনা ?

শিকার

মলয় বসু

নিমুদা সাইকেলটা নিয়ে পাকা রাস্তা থেকে বাঁদিকের ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়লেন। বাঁদিকে দিগন্তবিস্তারী ধানের ক্ষেত। চলতে শুরু করলেন আলের উপর দিয়ে। বাঁ কাঁধে একটা ছিপ, ডানহাতে ধরা সাইকেল।

একটু পিছনে আরেকটি সাইকেল থেকে নামল মতি আর খোকা। দুজনের মুখে তখনও হাসি। কি একটা প্রসঙ্গে দুজনের হাসি এসেছিল এখনও রেশ যায় নি। একজনের বয়স বাইশ, আরেকজনের একুশ। দুজনের পরনে ফুলপ্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট, পায়ে স্যাণ্ডাল।

নিমুদা অনেকটা এগিয়ে গেছেন।

সাইকেল থেকে নেমে খোকা দু কোমরে হাত রেখে বুকটা টানটান করল। মুখটা বিকৃত করল।

বলল, উঃ, শ্যালা ডান পা-টা চিনচিন করছে—কি সাইকেলরে বাবা—এতদূর রাস্তা—

মতি সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। সাইকেলটাকে কোমরের পেছন দিক দিয়ে আটকে রেখেছে। বাঁ হাতে লম্বা লম্বা দুটো ছিপ। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো একটা কালো রঙের থলে। মাছের টোপ। কাঁধে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক। চা—

মতি বলে, নে নে এতক্ষণে তো সিনেমা হলে বসে মেমদের চেহারা দেখে পয়সা দিতিস। নিয়ে আসলাম ভালো জায়গায়—এতদূর রাস্তা প্যাটেল করে—নে ছিপ দুটো ধর—

—এই মতি, বিড়ি এনেছিস তো—ছিপ দুটো মতির হাত থেকে নিতে নিতে খোকা বলে।

—এনেছি কিন্তু সাবধানে খাবি—নিমুদা আছেন।

—ও অনেক দূরে। দে—

মতি বিড়ি আর দেশলাই বের করে খোকার হাতে দেয়। খোকা ফস করে দেশলাই ধরায়। বলে, কিরে তুই ধরাবি না?

—না, পরে। মতি উত্তর করে।

খোকা একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। সামনের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের দিকে একবার তাকায়। তারপর ছিপ দুটো হাতে নিয়ে ঢালু জমিটার উপর দিয়ে তরতর করে নেমে একদম আলের উপর নিয়ে ওঠে।

কাঁধে ফ্লাস্ক, হাতে সাইকেল নিয়ে মতিও পেছনে পেছনে নেমে আসে। উঁচু থেকে নীচে নামার জন্য সাইকেলটা ঘটাং ঘটাং দু-তিনটে শব্দ করে।

খোকা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। রাস্তাটা এখান থেকে অনেকটা উঁচুতে।

দুপাশে ধানক্ষেত।

লালচে রঙ ধরেছে ধানের গাছে। মাথাগুলো নুয়ে পড়েছে শিষের ভারে। গাছে গাছে লেগে শর শর শর করে শব্দ উঠছে। দুপুরের নির্মেঘ আকাশে দুটো চিল মতি আর খোকার আর ধানক্ষেতের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়ছে।

এই শর শর শর শব্দটা খোকা প্রথমে খেয়াল করেনি। যখন করল তখন বিড়িটায় শেষ একটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বলল, অ্যাই মতি, এই শব্দটা কিসের রে?

প্রশ্নটা করলেও নজরটা ক্ষেতের দিকে দেখে মতি বলে, যেখানে তাকিয়ে আছিস ঐ ক্ষেতের ভিতর থেকেই উঠছে। গাছে গাছে লাগলে ওরকম শব্দ হয়।

—বাঃ, বেশ নাইস শব্দ তো—শর শর শর, মুখ দিয়ে শব্দ করে খোকা।

হাত বাড়ালেই পাকা ধানের শিষ। খোকা একটা শিষ ছিঁড়ে আনে। শিষ থেকে ধানগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে বাঁ হাতের তালুর উপর রাখে। তারপর একটা তুলে নিয়ে মুখে দেয়।

পরক্ষণেই বলে, কিরে মতি, ভেতরে যে কিছু নেই!

—সব ধানেই কি চাল থাকে নাকিরে? দেখ অন্যটায় আছে, মতির নজর নিমুদার দিকে।

অনেকখানি চলে এসেছে তারা ক্ষেতের ভিতর দিকে। পাকা রাস্তার উপর দিয়ে একটা ট্রাক বিকট শব্দ তুলে চলে যায়। খোকা পেছন ফিরে দেখে।

তারপর বলে, কিরে আর কদ্দুর? ধানক্ষেতেই মাছ ধরবি না কি?

—চল না, এই তো সামনে। দেখবি জায়গাটা খুব সুন্দর। ছোট্ট একটা নদী এসে পড়েছে একটা বিরাট খালে—এখানকার লোকেরা বলে ওটা গদাধর নদী। ঐ সামনের বড কুলগাছটার ঠিক পেছনেই—

খোকা একবার চোখ তুলে জায়গাটাকে বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর আরেকটা ধান মুখে ফেলে। একটা গানের সুর ভাঁজে—হু হু হু উ—হু হু হু উ-উ···

ধানগাছগুলো আলের গা ঘেঁষে। খোকা ডান হাত দিয়ে ধানগাছের শিষগুলোকে নুইয়ে দেয়। কোনোটার শিষকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে।

আকাশ পরিষ্কার।

খোকা উপরের আকাশের দিকে একবার তাকায়। তারপর চারপাশের বুক সমান উঁচু ধানগাছগুলোর দিকে একবার তাকায়।

গানের গুনগুনানি থামে।

তারপর হঠাৎ মতিকে বলে, দেখ মতি, ধানগাছগুলো কত উঁচু—প্রায় বুক সমান—না?

দূরে নিমুদাকে লক্ষ্য করে বলে, দেখ, নিমুদার শুধু মাথাটা আর ছিপটা দেখা যাচ্ছে।

খোকা আর মতির চারপাশে ধানের ক্ষেতটা চক্রাকারে যেন ঘিরে ফেলেছে তুজনকে। খোকা সেটা লক্ষ্য করে।

চারপাশটা একবার দেখে খোকা কি ভেবে যেন বলে ওঠে, মতি, একটা জিনিস দেখবি? ধানক্ষেতটা যেন ঘুরছে আমাদের চারপাশে—ছাখ—

মতি এতক্ষণে বিরক্ত হয়। বলে কি আরম্ভ করেছিস বাচ্চা ছেলের মতো—এটা ঘুরছে, সেটা নড়ছে—একটু তাড়াতাড়ি চল। ছাখ তো নিমুদা কতটা এগিয়ে গেছেন, বলে মতি খোকার আগে আগে দ্রুতপদে চলতে থাকে।

খোকার তেমন গরজ নেই জোরে হাঁটার। তবুও অপেক্ষাকৃত জোরে পা চালায়।

কিছুটা হাঁটে চুপচাপ।

তারপর বলে, শহর থেকে ক-মাইল হবেরে এ জায়গাটা?—মাইল পাঁচেক তো হবেই। বেশ গ্রাম গ্রাম—লোক নেই, জন নেই।

কে বলল তোকে পাঁচ মাইল ? মতি উত্তর দেয় কিন্তু হাঁটা বন্ধ করে না। সাইকেলের চেনে কেমন একটা ক্যার-ক্যার শব্দ হয়।

—তবে ক-মাইল ?

—মাইল তিনেক হবে।

—তাই নাকি ? আমি তো ভাবলাম কোন অজ পাড়াগাঁয়ে চলে এসেছি।

কলকল শব্দটা দুজনেই পাচ্ছিল কুলগাছটার কাছাকাছি এসে।

মতি বলে, ঐ যে জল পড়ার শব্দ।

—কোথায় ?

—এই উঁচু জমিটা ডিঙ্গাতে হবে। খোকা এতক্ষণে যেন কিছু করবার সুযোগ পায়। একবার উঁচু ডাঙ্গা এবং উঁচু ডাঙ্গার কুলগাছটার দিকে তাকিয়ে লাফাতে লাফাতে উঁচু জমিটার উপর ওঠে।

মতি সাইকেলটা জমিটার গায়ে হেলান দিয়ে রাখে।

খোকা উঁচু ডাঙ্গার কুলগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মতির দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে, অ্যাই মতি, ঠিক ঝরনার মতো জল পড়ছে রে—মতি কথা না বলে উঁচু জমিটার উপর উঠে আসে। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ায়। তারপর খোকাকে বলে, নে এবার নাম।

ছিপ দুটোকে নিয়ে একরকম দৌড়ে নীচে নেমে যায় খোকা। নালার মতো ছোট্ট গদাধর নদীটাও লাফ দিয়ে পার হয় সে।

আবার ওপারে এপারের মতো উঁচু জমি।

খোকা নীচে থেকে চেঁচায়।

মতি তরতর করে নীচে নেমে আসে। দুজনে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। তাদের দুজনের ঠিক সামনে গদাধর নদীর ধারাটা শেষ হয়ে গেছে। তারপর সে জায়গা থেকে হাত সাতেক নীচে বিরাট এক পুকুরের মতো গোল জায়গায় কলকল করে জল পড়ছে।

খোকা একদম ধারে গিয়ে নীচটাকে ভালো করে দেখে।

বলে, দেখছিস মতি, এই খালটার ভিতর থেকে আরেকটা নালা বেরিয়ে সোজা চলে গেছে।

—হুঁ। কিন্তু অত ধারে যাস না। তুই যেখানে দাঁড়িয়েছিস তার নীচটা ফাঁপা—ধ্বসে নীচে পড়ে যাবি।

সেইদিকে একবার তাকিয়ে চার-পা পিছনে সরে আসে খোকা—

মতি ততক্ষণে ছিপের গা থেকে সুতো খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পায়ের পাশে ভিজে জমির উপর রাখা কালো রঙের থলেটা—

—নিমুদা কোথায় রে? খোকা চারিদিকে তাকিয়ে বলে।

—ঐ তো ঐ পাথরটার আড়ালে।

নিমুদার হাত আর ছিপটা শুধু দেখা যাচ্ছে। ঐ খালের হাত সাতেক উপরে হাত দুয়েক চওড়া একটা চাতালে উটকো মেরে বসেছেন নিমুদা।

—এর মধ্যে এসে ছিপ ফেলে বসে গেছেন নিমুদা!—মতি কথা শেষ করে।

নিমুদার দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই খোকা মতিকে বলে, দাঁড়া এদিককার উঁচু ডাঙ্গার উপরটা একবার দেখে আসি। বলেই দ্রুতপদে নয় একরকম দৌড়েই উঁচু ডাঙ্গার উপরে গিয়ে উঠল।

এদিকেও তেমনি দিগন্ত বিস্তারী ধানক্ষেত। খোকা দুচোখ মেলে দেখল। আবার এপাশে ঘুরল। এদিকেও তেমনি ধানক্ষেত—উঁচু ডাঙ্গার উপর কুলগাছটা।

মতি বুঝি একবাব খোকার দিকে তাকাল। নিমুদার পিছন দিকটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত গদাধর নদীটাকে দেখা যায়, খোকা দুই হাত কোমরে রেখে ভালো লাগার একটা ভঙ্গি করল।

উঁচু ডাঙ্গার গা বেয়ে নামতে নামতেই বলল, আমরা বসব কোথায়?

—এই ডানদিকে আরেকটু এগিয়ে। এই নে ছিপ, টোপ গেঁথে দিয়েছি—ফেলে বসে থাক ঝোপটার সামনে।

খোকা ছিপ নিয়ে ঝোপটার পাশে বসে। মতি আরেকটু এগিয়ে একটা পাথরের উপরে বসে।

খোকা ছিপ ফেলে জলে। উঁকি মেরে জলটা দেখে।

—এই খোকা, তোর ছিপের জল বাড়িয়ে দে। নিজের ছিপ জলে ফেলতে ফেলতে মতি বলে।

ছিপটা জল থেকে তুলতে তুলতে খোকা বলে, জল আবার বাড়ায় কেমন করে?

—ফাতনাটা টেনে উপরের দিকে নে—মতি চেঁচিয়ে বলে।

—ফাতনাটা স্থতোর উপর দিকে কিছুটা উঠিয়ে খোকা বলে, গ্যাখ তো মতি—বাড়াব ?

—না, ঠিক আছে এবার ফেল।

ফত করে একটা শব্দ হয়। নিমুদা একটা মাছ উঠিয়েছেন। ছিপটা জলে ফেলে খোকা সেদিকে তাকিয়ে থাকে। নিমুদাকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিমুদা দাঁড়িয়েছেন। পরনে ধুতি, গায়ে আধময়লা একটা পাঞ্জাবি। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। নিমুদা মাছটাকে খুলে একটা ছোট সাদা ন্যাকড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর টোপ গেঁথে স্থতোটা একটু দুলিয়ে ছিপটা ফেললেন।

মতি বলল, পাফদা ধরলেন নিমুদা। কটা হল ? কেঁচোর টোপে নিশ্চয়ই ?

খোকা ভাবে : কই আমি তো চিনতে পারলাম না কি মাছ ওটা ? অথচ এতদূর থেকে মতি ঠিক বুঝেছে, কোন মাছ উঠেছে ছিপে ! ব্যাটা আচ্ছা মেছুয়া হয়ে উঠেছে আজকাল।

নিমুদা ছিপটা ফেলে একবার ঝুঁকে পড়ে জলের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন। আকাশটার দিকে একবার তাকালেন। তারপর খোকার মাথার পেছন দিয়ে উঁচু ডাঙ্গার কুলগাছটার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করলেন।

খোকা দেখে ভাবল, নিমুদা দেখছেনটা কি ? নিজেও পিছন ফিরে একবার কুলগাছটাকে দেখল।

নিমুদা বসেছেন। সামনে নিমুদাকে আড়াল-করা বড় পাথরটা। নিমুদার হাত আর ছিপটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

তিনজনে ছিপ ফেলে বসে আছে।

খোকার নজর সাদা সুঁচলো ফাতনার দিকে। জলের স্রোতে একটু একটু নড়ছে। খোকা লক্ষ্য করছে কেমন করে যে জায়গাটায় সে ছিপ ফেলেছিল, ফাতনাটা সে জায়গা থেকে জলের তোড়ে ডানদিকে সরে আসছে।

খোকা ছিপটাকে তুলে আবার আগের জায়গায় ফেলে। নিমুদা ও মতির দিকে একবার তাকায়। তারপর আবার লক্ষ্য করে ফাতনাটা কেমন করে, বোঝা যায় না এমন জলের তোড়ে ক্রমে ক্রমে ডানদিকে সরে আসে।

ঝরনার মতো যেখানে জল পড়ছে সেদিকে তাকায় খোকা। ফেনা উঠছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। জলগুলো ঘুরতে ঘুরতে এগুচ্ছে। খোকা দু হাঁটুর মাঝখানে থুতনিটা চেপে অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

খোকার যেন মনে হয়, তার কোনো কাজ নেই—অস্বস্তিকর ভাবটা যেন দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছে। সে যেন স্পষ্ট অনুভব করল তার শরীরের ভেতরে একটা শিরশিরানি চলছে—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—

ফস্‌স—মতি কি একটা মাছ তুলেছে এবার। মাছটা বঁড়শির মাথায় তখনও নড়ছে।

খোকা দেখে।

—ধ্যাত তেরি—নিমুদা ট্যাংরা দিয়ে বউনি, মাথাটা একটু নেড়ে মতি বলে।

—কিরে, তোরটার খবর কি ? খোকার দিকে চেয়ে মতি বলে।

—ধ্যুত ! খায় না—ফাতনার দিকে একপলকে একটু দেখে খোকা বিরক্তি মুখে উত্তর করে।

—প্রথম প্রথম অত তাড়াতাড়ি হয় না—অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, মতি বিজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়।

—তার চেয়ে সিনেমাটা দেখলেই ভালো হত—কবে মাছ খাবে তার জন্য হাঁ করে বসে থাক—খোকার মেজাজটা যেন আবার খারাপ খারাপ লাগে।

মতি হাসে। আর টোপ গাঁথে নতুন করে।

উটকো মেরে আর বসা যায় না। খোকা পকেট থেকে রুমাল বের করে পেতে তার উপরে বসে। একটা আরামের ভঙ্গি করে। একটা বিড়ির দরকার। গলা খাকারি দেয় খোকা। মতি তাকায়। ডান হাতের দুটো আঙুল ঠোঁটের উপর চেপে ইঙ্গিতে জানায় খোকা। মতি এক পলকে নিমুদাকে দেখে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে।

ছিপটাকে পাড়ের উপর রেখে খোকা মতির দিকে এগিয়ে যায়। মতির ঠিক পেছনটিতে গিয়ে বসে। বলে, কটা বাজে দেখতো ?

হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে মতি বলে—দুটো। তারপর বলে প্যাণ্টের ডান পকেটে আছে—নে।

দুটো বিড়ি ও দেশলাইটা বের করে নিয়ে খোকা মতির ফাতনার দিকে একটু চেয়ে দেখে—তারপরে নিমুদার দিকে একবার তাকিয়ে বলে, তা হলে তুই ধর, আমি জায়গায় গিয়ে বসি।

মতি উত্তর করে না। একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিজের জায়গায় বসে মৌজ করে বিড়িটা ধরায় খোকা। তারপর ফাতনার দিকে তাকায়।

আবার অনেকটা সরে এসেছে ফাতনাটা।

হঠাৎ চোখ ছুটো বড় হয়ে উঠে খোকার। ফাতনাটাকে জলের নীচে টানছে।

বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডানহাত দিয়ে শক্ত করে ছিপটা চেপে ধরে। চোখের অপলক দৃষ্টি ফাতনার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে খোকা।

আরেকবার টানলেই—

চোখের সামনে খোকা দেখতে পায় যেন তার বঁড়শিতে ঝুলছে—সাদা বেশ বড় একটা পাফদা—

ফাতনাটা একটু একটু কাঁপছে। খোকার চোখের মণি ছুটো উত্তেজনায় চকচক করছে—

আবার টান—

খোকা প্রচণ্ড জোরে ছিপটাকে উপরের দিকে টানে। তার মাথার পিছন দিয়ে বঁড়শি সুদ্ধ সুতোটা শব্দ করে ঘুরে আসে।

—অ্যাই, ঐভাবে টানলে মাছ ওঠে—আগেই ছুটে যাবে। মতি ভর্ৎসনার স্বরে বলে।

—ফাতনা তো ডুবিয়েছিল—খোকা বলে।

—ডোবাক না। একবার বাধলে যাবে কোথায়—বাপ বাপ বলে উঠে আসবে তখন। আগে টানবি না। অতজোরে টানলে টোঁপ সুদ্ধ পড়ে যাবে।

খোকা সুতোটা বা হাতে চেপে দেখে টোঁপটা সত্যি পড়ে গেছে কিনা। না পড়েনি। আবার জলে ফেলে।

—ফস্‌স—আবার আরেকটা শব্দ।

মতি আরেকটা কি মাছ তুলেছে।

—নিমুদা এবার মাগুর—মতির কথা শেষ হবার আগেই নিমুদা ছিপ টানেন—আরেকটা পাফদা।

খোকা ভাবে, নিমুদা আর মতিটা দেখি টপাটপ তুলছে। অথচ তার ফাতনা চুপচাপ। তিনজনেই চুপ। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই। শুধু গদাধর নদীর জল পড়বার শব্দ—কলকল কলকল।

খোকা চেয়ে থাকে ফাতনার দিকে। জলটা খুব পরিষ্কার। তার ফাতনাটার নীচে সাদা সাদা ও মাঝে কালো গোল গোল কি সব। খোকা বোঝে সাদা সাদাগুলো মাটি আর কালোগুলো হচ্ছে শুধু গর্ত। কালো রঙ দেখে মনে হয় ওখানে জল অনেক।

খোকা এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি তার ফাতনার ঠিক নীচে লতানো অনেকগুলো শেওলা। জলের রঙের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ে না। খোকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল এক রকম ছোট ছোট পোকা, কালো রঙের, জলের মধ্যে ছুটাছুটি করছে। অনেকগুলো।

একটা তিনরঙ্গা পাখি তার ফাতনার উপর দিয়ে কোনাকুনি ছুটে ছুটে যায়। খোকা চেয়ে চেয়ে দেখে।

তার ফাতনার চারপাশের জলটা নিথর। বোবা। কিছুটা নীল, কিছুটা কালো। খোকা একদৃষ্টিতে ফাতনার চারদিকের ঐ বোবা জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেওলাগুলো একটু একটু নড়ে।

জলের গায়ে মেঘের ছায়া। খোকা একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে। সারা আকাশটায় মেঘ নেই। অবশ্য এখানে বসে যদ্দুর দেখা যায়। অথচ কেমন করে এক টুকরো মেঘ ঠিক এই খালটুকুর উপরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। তার ছায়া জলে। দুটো বক উড়ে আসছে।

খোকা তাড়াতাড়ি জলের দিকে তাকায়। জলের ছায়ায় বক দুটোকে কেমন লাগে দেখবে। বকদুটো উড়ে গেল। দুটো খুব সাদা উড়ন্ত ছায়া। মৃদু একটা শব্দ। খোকা শুনল। খোকা আগে শোনেনি এত ভালো করে।

ফাতনাটা একটু একটু কাঁপছে। ঐ তিনরঙা নাম না-জানা পাখিটা জল ছুঁয়ে আবার উড়ে গেল। জলে কয়েকটা সূক্ষ্ম তরঙ্গ উঠল। খোকা লক্ষ্য করল। আস্তে আস্তে ঐ তরঙ্গ বড় হতে লাগল। তার ফাতনায় লাগল। আরো এগিয়ে এল। খোকার মনে হল ফাতনাটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। সেও যেন ক্রমশ জলের দিকে এগিয়ে চলেছে। সত্যি যেন সে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে—সত্যি—

—ফস্‌স—নিমুদা আরেকটা কি মাছ তুললেন। এবার কেউ কথা বলল না। খোকা তাকিয়ে দেখল। ফাতনাটা আর তার দিকে এগিয়ে আসছে না। সেও আর জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না।

খোকা ভাবল—তার তো এরকম কোনো দিনও হয় না। আশ্চর্য! সত্যি যেন মনে হচ্ছিল ঐ জল তাকে টানছে। অবাক হয়ে জলের দিকে তাকায়। দোষটা কি তার, না ঐ জলের ?

তার দোষ থাকতে যাবে কেন? সে তো শুধু জলের দিকে তাকিয়ে ছিল—ফাতনার দিকে—জলে ঝাঁপ দেবার ইচ্ছা তো ছিল না।

—কিন্তু জল? ঐ জলেরই বা দোষ কি? সে তো আর কথা বলতে জানে না বা মন্ত্র জানে না। তবে কি তার নিজের মাথাই ঘুরে উঠেছিল?

—কি আজেবাজে ভাবছে সে। জোর করে খোকা ভারমুক্ত হতে চায়। মতির দিকে তাকায়। কই, ওর তো এসব হয় না! তবে তার হল কেন? তবে কি চুপচাপ একজায়গায় বসে থাকার জন্যই এরকমটা হল?

—কিরে খোকা, খাচ্ছে না?

মতির আহ্বানে চমক ফিরল খোকার।

—এত চুপচাপ কেন?

—কি করব?

—ছিপটা তুলে ছাখ টোপ খেয়ে গেল কিনা?

মতির কথামতো ছিপটা তুলে দেখে খোকা। টোপ ঠিক আছে।

আবার জায়গা মতো ছিপটা ফেলে।

—চা খেলে এখান থেকে খেয়ে যা—মতি বলে।

—কেন, কটা বাজে?

—তিনটে বেজে গেছে।

খোকা অবাক হয়, এর মধ্যেই তিনটে বেজে গেল। এই তো কিছুক্ষণ আগে শুনল মতির মুখে—বেলা দুটো। আশ্চর্য! এতক্ষণ সে এই সব কথা ভাবছিল তাহলে।

—তুই খেয়েছিস? খোকা বলে।

—এক রাউণ্ড হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কি ভাবছিলি জলের দিকে তাকিয়ে? আমি আবার ভাবলাম বুঝি তোর সিনেমার কাউকে দেখছিলি জলের ভিতরে—তাই আর ডাকিনি। তুই খা এবার—

—এই টান, টান খোকা—চীৎকার করে ওঠে মতি।

খোকা চমকে জলের দিকে তাকায়। তার ফাতনা খুঁজে পায় না। হঠাৎ দেখে ফাতনা জলের উপর পলকের জন্য ভেসে উঠে আবার একটানে অনেকটা

নীচে চলে গেল। খোকা উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরেই ছিপটা টেনে তোলে। একটা কি যেন বঁড়শির সঙ্গে উঠে আসে অনেকটা। খোকার বুকটা ধ্বক্ করে উঠে।

—যা ফসকে গেল! মতির কথায় খোকা তাকিয়ে দেখে বঁড়শিটা শুধু দেখা যাচ্ছে। যে জিনিসটা ঝুলছিল সেটা নেই।

—আটকায়নি ভালো করে হয়তো—মতি ক্ষোভ প্রকাশ করে। বলে, এদিকে নিয়ে আয় টোপ গেঁথে দি।

আবার ছিপ ফেলে খোকা। সূর্য পশ্চিমাকাশে হয়তো প্রায় হেলে পড়েছে। জলটা কালো হয়ে উঠেছে আরো। খোকা পিছন ফিরে উঁচু ডাঙ্গার কুল গাছটাকে দেখে। কুলগাছটার মাথায় সোনালী রোদ ভীড় করেছে। জল পড়বার শব্দটা আরো স্পষ্ট।

চারটে বেজে গেছে—তাই তো কিছুক্ষণ আগে বলল মতি। এখন নিশ্চয়ই সাড়ে চারটে। মতি এর মধ্যে আট-দশটা নানা রকমের মাছ ধরে ফেলেছে, নিমুদা নাকি আরো বেশি।

আর কিছুক্ষণ পরেই উঠতে হবে।

কিন্তু খোকার এই জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। আরেকটু এগিয়ে বসে খোকা। চারিদিকে দেখে।

ফাতনাটা কাঁপছে। জলটা কালো হচ্ছে। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখে সাদা জলের ফেনাগুলো আরো সাদা হয়ে উঠছে। সাদা—সাদা—সাদা। খোকার মনের ভিতরটা কেমন করে। তাকিয়ে থাকতেই কেমন যেন ভালো লাগছে। খোকা মাথাটা তুটো গুটোনো হাঁটুর মাঝখানে রাখে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নীচের দিকে। পায়ের পাতা দিয়ে চেপে ছিপটাকে আঁটকে রাখে মাটির সঙ্গে। তার চোখের সামনে শুধু সাদা ফেনা, জলের কলকল কলকল, শেওলার পাতলা পাতলা দাম—সাদা সাদা, কালো কালো, গোল গোল, গর্ত গর্ত, কালো জল, সাদা ফাতনার সুঁচালো মুখ। খোকার দৃষ্টি নিস্পলক, নিথর, বোবা।

খোকা দেখছে অনেকক্ষণ থেকেই একটা মাছ টুক্‌টুক্ করে ফাতনাটাকে টানছে।

খোকা দেখছে। টানুক। আরো টানুক। একদম একটানে নীচে নিয়ে যাক···।

একবার নীচে টানল। দুইবার। আবার টানছে…আবার। খোকা এবার আর উঠল না। বসে বসেই ছিপটাকে টেনে তুলল। সুতোয় একটু টান। একটা মাছ। বঁড়শির মাথায় নড়বড় করছে।

উঠে দাঁড়াল খোকা। একটু খুশী। একটু হাসি। খোকা একটু হাসল ঠোঁট চেপে। তাকাল মতির দিকে।

—কি রে সারাদিন বসে শেষে ঐ পুঁচকে বেলে!—মতি হাসে।

বাঁ হাতে ছিপের সুতোটা চেপে ধরে ছিপটা মাটির উপরে রাখে। মাছসুদ্ধ বঁড়শিটাকে বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। হাতের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা —মৃদু একটা শিহরণ সারা শরীরে। মাছটা একবার নড়ে উঠল। তার হাতের মুঠোয় মাছটা কতটুকু! মাছটার জীবনের স্পন্দন খোকা যেন অনুভব করল হাতের পাতলা তালুতে।

…বঁড়শিটা মুখ দিয়ে ঢুকে কান্‌কোর পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, বাঁ হাতে চেপে ধরে মাছটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে খোকা।

—ঐটুকু মাছ কিন্তু হা'টা কত বড়! খোকা ভাবে বঁড়শিটা মুখ দিয়ে ঢুকবার জন্যও মাছটা হা'টা বন্ধ করতে পারেনি, খোকা মাছটাকে ঘুরিয়ে দেখে—ভাবে, এটা আবার কি রকমের মাছ? ভেতরের সব কিছুই তো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে দেখি!

মাছের মুখের হা'টার ভিতর দিয়ে খোকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে দেয় ভিতরে। সাদা, লাল, নীল নীল কতকগুলি সুতোর মতো কি সব। রক্ত নেই বুঝি এই মাছটার।

ডানহাত দিয়ে বঁড়শিটাকে খুলে আনতে চাইল খোকা, কিন্তু পারল না। একটু জোরে টান দিতেই মুখের অনেকটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।—ইস্! খোকার মুখ দিয়ে হঠাৎই শব্দটা বেরিয়ে যায়।

মাছটা খোকার হাতের ভিতরে আরেকবার নড়ে উঠল। এবার একটু জোরে।

—এদিকে নিয়ে আয় ছিপ—টোপ গেঁথে দি। মতি বলে।

আবার ছিপ ফেলে খোকা। এবার ছিপটা ডানহাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি ফাতনার দিকে। শেওলাগুলোকে আর দেখা যায় না। জল আরো কালো। খোকা ভাবে মাছ বুঝি এই টানল—ঐ ফাতনা ডুবল…।

—এবার উঠতে হবে রে খোকা—নইলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে, মতি বলে উঠে।

খোকার নজর তখন ফাতনার দিকে।

একটু একটু কাঁপছে…। খোকার সমস্ত সত্তা ভাবছে—এই বুঝি মাছ এল…খেল—

ছিপটাকে তোলে। আবার সরিয়ে ফেলে খোকা।

—অ্যাই, একটা ধরেই অত ফুর্তি, অত জায়গা বদলালে মাছ খায় না—মতি বুঝি বিদ্রূপ করে।

খোকা উত্তর দেয় না।

—নে, এবার ছিপ গুটো—নিজের ছিপ গুটোতে গুটোতে মতি বলে।

—কেন রে, হয়ে গেল? খোকা জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, এখন আর মাছ খাবে না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে—তাছাড়া শীত পড়লে মাছ কম খায়। মতি উঠে দাঁড়িয়ে ছিপের গায়ে সুতো জড়ায়।

এগিয়ে আসে খোকার দিকে।

—নিমুদা এবার উঠুন, দেরি হয়ে যাবে, খোকার দিকে এগুতে এগুতে মতি বলে।

খোকার একদম পাশে এসে দাঁড়ায় মতি। ফাতনাটা একবার দেখে। তারপর খোকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, নে ওঠা—অনেক ধরেছিস। আরেক দিন আসা যাবে।

খোকা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখে ফাতনা ডুবল কি না। ফাতনা আর ডোবে না।

একটানে ছিপটাকে তুলে ফেলে খোকা। তারপর ছিপের গায়ে সুতো জড়ায়।

মতি গদাধরের জলে হাত ধুচ্ছে, এদিকে খালের দিকে পিছন ফিরে। নালার মতো নদীটা। হাত দুয়েক চওড়া। মতি এপারে এক পা, ওপারে এক পা রেখে হাত ধুচ্ছে। মতিটাকে যেন কেমন লাগছে। তার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে সাদা জলের রেখা।

খোকা এগিয়ে যায়।

—ছিপটা রেখে হাত ধুয়ে নে—মতি বলে।

ছিপটা পাড়ে রেখে সেও মতির মতো দুপা ফাঁক করে একটু ঝুঁকে পড়ে

ত্বু হাতে গদাধরের জলকে স্পর্শ করে। একদম ঠিক মতির মতো ভঙ্গি করে। ঠাণ্ডা গতিসম্পন্ন একটা স্পর্শ—জলটা বেশ জোরেই আসছে। খোকা সেটা বোঝে।

মতি বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে। হাত চারেক দূরে। খোকা ঘাড় বেঁকিয়ে একটু দেখে। মতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে—ঠিক যেমন করে সে বঁড়শিতে আটকানো মাছগুলোকে দেখে।

খোকা মুখে জলের ঝাপ্টা দেয়।

মতি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, নিমুদা আপনি আসুন—আমরা আলের ধারে অপেক্ষা করছি। নিমুদা তখন ছিপ গোটাচ্ছিলেন।

দুটো ছিপ নিয়ে খোকা মতিকে অনুসরণ করে।

হেলানো সাইকেলটা উঁচু ডাঙ্গার গা থেকে তুলতে তুলতে খোকার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ দুটো নাচিয়ে হাসি মুখে মতি বলে, কেমন লাগল মাছধরা ?

—জায়গাটা খুব সুন্দর বুঝলি ? রোদমাখা উঁচু ডাঙ্গার কুলগাছটার দিকে তাকিয়ে খোকা উত্তর করে।

—খুব না বলছিলি এখানে এসে ভেরাণ্ডা ভাজার চেয়ে সিনেমা দেখা ভালো, তাস পিটনো ভালো। মতি হাত দিয়ে সাইকেলের সিটের ময়লা পরিষ্কার করে।

খোকা একবার মতির দু চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকায়। সে দৃষ্টি যেন বলতে চায় : কি আর বলব বল—কিচ্ছু বলার নেই।

মতির থলেতে অনেক মাছ। হাসিমুখে থলেটা একবার দুলিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে দেয় মতি।

খোকা চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখে।

বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। হাত দুটো আরো ঠাণ্ডা। হাওয়া নেই। ধানগাছগুলি একদম স্তব্ধ। একটুও শরশরানি নেই। খোকা সেটা লক্ষ্য করে।

মুখোমুখি পশ্চিমাকাশে খণ্ডখণ্ড মেঘের স্তূপ। কালো আর লাল রঙের ছড়াছড়ি সেখানে। পাকা রাস্তাটার ওপারে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে অন্ধকারের মধ্যে আকাশটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

খোকা বলে, তোরা কি প্রত্যেক রবিবারেই আসিস নাকি রে ?

—কেন তুইও আসবি নাকি ? রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মতি বলে।

—আসতে পারি, খোকা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলে।

—সিনেমা ? কথাটা বলে মতি হাসে খোকার মুখ চেয়ে।

—ঐ যে নিমুদা আসছেন, চল হাঁটা শুরু করি। মতি সাইকেলটা নিয়ে চলতে শুরু করে। খুব খুশি-খুশি ভাব মতির। খোকা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মতির হাসিটাকে।

"আকাশ আর এই মাটি, ঐ দূ-উ-রে যেথায় মে-লে···" মতি গান গাচ্ছে। খোকা শোনে কিন্তু চোখ ফেরায় না সেদিকে।

সেই কুলগাছটার নীচে নিমুদা এসে দাঁড়িয়েছেন। খোকা চোখ তুলে দেখে। নিমুদা—তার পিছনে কুলগাছ—তার নীচে গদাধর নদী—সাদা ফেনা—শেওলা দাম—গর্ত, কুলকুল শব্দ—ফাতনার সুঁচলো মুখ। খোকা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়।

—টিং টিং টিং। এই খোকা আয়, ওখানে হাঁ করে কি দেখছিস ?

মতির চীৎকারে আর বেলের আওয়াজে চমকে ওঠে খোকা।

বেশ খানিকটা দূরে ধানক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে মতি। একটা হাত সাইকেলের বেলের উপর।

নিমুদা ঢালু জমি বেয়ে নেমে আসছেন।

ছুটো ছিপ নিয়ে খোকা এবার মতির দিকে এগোয়—

মতি যেন তাকে উদ্দেশ্য করে আরো কি সব বলছে—খোকা যেন কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না স্পষ্ট করে।

আইনস্টাইন ও কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতির স্বরূপটি কি? এই মহাবিশ্বের সমস্ত কাজ চলছে কোন্ কোন্ শক্তির ক্রিয়ায়? দেশ, কাল আর পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় যে অভিকর্ষ আর মহাকর্ষ, যে-শক্তির টানে প্রত্যেকটি গ্রহ নিখুঁত আর সুনির্দিষ্ট একেকটি কক্ষপথে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে, সেই শক্তিটিরই বা স্বরূপ কি? এসব প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বচিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে-শাখায় সমগ্রভাবে মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা-অনুশীলন করা হয়, সেই শাখাটির নাম ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বা "কস্‌মোলজি"। এই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের তত্ত্বগত ভিত্তিটি হল আইনস্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদ বা "জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি"। এই আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারাই আইনস্টাইন সর্বপ্রথম দেশ (স্পেস্), কাল (টাইম) আর জড়ের (ম্যাটার) পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রয়োগ করার আগে ওই তত্ত্বটিকে আমাদের যাচাই করে নিতে হবে; অর্থাৎ, আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্তগুলি কতটা সঠিক সেটা জানা চাই। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সেটা খুব চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি—কারণ, এই তত্ত্বের সঙ্গে যে নতুন নতুন কার্যকারণগুলি সংশ্লিষ্ট এবং যে-কার্যকারণগুলির পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ) যাচাইয়ের সম্ভাবনা আছে, তা নিতান্তই কম। বৈজ্ঞানিকরা যে আইনস্টাইনের তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই করার জন্যে অনবরত নব নব পদ্ধতি অনুসন্ধান করে চলেছেন, এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একটি নতুন আর রীতিমত নির্ভরযোগ্য সূত্র পেয়েছেন এই আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে। মানুষের হাতে-গড়া অনেকগুলি কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হবার পর তাঁরা মনে করছেন যে এর থেকে সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-যাচাইয়ের কাজে তাঁরা বিরাট সাহায্য পাবেন।

মূল নীতি

আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-যাচাইয়ের ব্যাপারে স্পুৎনিক আর ল্যুনিক যে কি-ভাবে কাজে লাগতে পারে সেটা বুঝতে গেলে আগে আইনস্টাইনের ওই তত্ত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চাই। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এই ধারণা করাটা অসম্ভব। তাই, খুব ভাসাভাসাভাবে এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে অতি সরল করে নিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা জেনে নেবার চেষ্টা করা যাক। বলে রাখা ভালো, এর থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা খুব স্পষ্ট না হলেও, গ্রহগুলির সূর্য-প্রদক্ষিণ আর বিশেষত স্পুৎনিকগুলির পৃথিবী-প্রদক্ষিণ থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে লেভেরিয়ে নামে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বুধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন: অন্যান্য গ্রহের মতোই এই বুধ গ্রহ তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে একবার করে সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে এসে পৌছয়, আবার ক্রমশ দূরে সরে যায়। গ্রহদের এই কক্ষেরও একটা গতি আছে—যদিও এই গতি অত্যন্ত মন্থর। সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে গ্রহের এই অবস্থানকে বলা হয় অনুসূর বা "পেরিহিলিয়ন"। কক্ষের গতি আছে বলে এই অনুসূরেরও গতি আছে। লেভেরিয়ে লক্ষ্য করলেন, বুধের এই অনুসূরের গতিটা বুধের গতিমুখের (ডিরেক্‌শন) দিকে অতি সামান্য পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। লেভেরিয়ে প্রথমে ভাবলেন যে বুধের অনুসূরের এই গতিবৃদ্ধির কারণ হল অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়া। কিন্তু তিনি অঙ্কের হিসাব কষে দেখলেন যে অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়ায় বুধের অনুসূরের যতটা গতিবৃদ্ধি হওয়া উচিত, আসলে তার চেয়ে বেশি গতিবৃদ্ধি হয়েছে। ব্যাপারটা সমস্ত দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর পদার্থবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, কেউ এটার ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না।

এর অনেক পরে, ১৯১৫ সালে, আইনস্টাইন তাঁর সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দেন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে বুধের এই কক্ষের ঘূর্ণ্যন-গতি অত্যন্ত কম। বুধ-কক্ষের ৩৬০ ডিগ্রি অর্থাৎ সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরতে সময় লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। সুতরাং এই গতিকে যথেষ্ট সঠিকভাবে মাপিতে গেলে বুধ গ্রহের

গতিবিধি আর এক অনুস্থর প্রায় দু-শো বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে কাজে লাগাতে হবে।

এই তো গেল বুধ-কক্ষের ঘূর্ণ্যন-গতি। অন্যান্য গ্রহের বেলায় তাদের কক্ষ-ঘূর্ণ্যনের গতি এতই কম যে এখনও পর্যন্ত হিসাবই করে ওঠা যায় নি।

সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিও প্রমাণ করা কঠিন। সূর্যের অথবা কোনো তারকার কাছ দিয়ে যখন একটা আলোক-রশ্মি চলে যায় তখন সেই রশ্মির গতিপথ কিছুটা বেঁকে যাবেই—এই হচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই সিদ্ধান্তের মূল কথাটি হল—আলোর এনার্জি রয়েছে, অতএব তার একটা ভর বা "ম্যাস্"ও রয়েছে ; এবং মহাকর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আলোর এই ভর সূর্যে বা তারকার ভরের টানে আকৃষ্ট হয় বলেই আলোক-রশ্মির পথটা বেঁকে যায়। আলোক-রশ্মির এইভাবে বিপথচালিত হবার ব্যাপারটাকে বলা হয় বিক্ষেপ বা "ডিফ্লেক্‌শন"। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই-যে, এই বিক্ষেপের মাত্রা—অর্থাৎ কতটা পরিমাণে আলোর পথটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—জানা না থাকলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু দূরের তারকাদের সঠিক স্থিতিস্থানকে তাঁদের দূরবীণ ইত্যাদির মারফতে নির্দেশ করতে পারেন না।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের তৃতীয় আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রমাণ করা আরও কঠিন। এই তৃতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিভিন্ন নক্ষত্র তারকা ইত্যাদি থেকে পৃথিবীতে যে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গ এসে পৌছয় সেই তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা) অভিকর্ষ-শক্তির প্রভাবে বদলে যায়। জ্যোতির্মণ্ডলীয় অবস্থাধীনে এই পরিবর্তন কি পরিমাণে ঘটে সেটা বৈজ্ঞানিক এ পর্যন্ত হিসাব করে উঠতে পারেন নি।

সৌর-পরিবার ও মহাব্রহ্মাণ্ড

আইনস্টাইনের তত্ত্বের এই নতুন কার্যকারণগুলি যদি এতই যৎসামান্য হয়, তাহলে এই তত্ত্বটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব অপরিসীম এই জন্যে যে আমাদের সৌর-পরিবারের পক্ষে এই তত্ত্বের কার্যকারণগুলি যৎসামান্য হলেও মহাব্রহ্মাণ্ডের সুবিপুল বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-প্রয়োগ নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে যায়।

আর, এই মহাব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের তুলনায় আমাদের এই সৌরমণ্ডল হল গিয়ে এক পুকুর জলের মধ্যে একটি জলবিন্দুর মতো।

আমাদের এই সৌর-পরিবার যে "মহাজাতিক মাপকাঠি"র হিসাবে কত ক্ষুদ্র, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই উদাহরণটি থেকে : সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে লাগে আট মিনিট ; সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে এমন নক্ষত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে লেগেছে ১০০ কোটি বছর! অর্থাৎ, সেই নক্ষত্র থেকে যদি কোনো মানুষ পৃথিবীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেত, তাহলে সে ১০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অবস্থা চাক্ষুষ জানতে পারত। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, সৌর-পরিবারের তুলনায় মহাব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কত বিপুল।

কিন্তু তবু, সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বকে মহাবিশ্বের অনুশীলন-ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারি না—যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশে এই তত্ত্বের পরিমাণগত কার্যকারণগুলিকে একেবারে নিখুঁতভাবে আমরা যাচাই করে নিতে পারছি।

কিভাবে এই যাচাইটা করা যেতে পারে ?

কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলির সাহায্যে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব-যাচাইয়ের জন্যে এক্ষেত্রেই ল্যুনিক-স্পুৎনিকের অন্যতম কার্যকারিতার প্রশ্ন উঠছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষের ঘূর্ণ্যন-কোণ গ্রহগুলির কক্ষের ঘূর্ণ্যম-কোণের চেয়ে ঢের বেশি—বুধের কক্ষের ঘূর্ণ্যন-কোণের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণ বেশি। ইতিমধ্যেই এই স্পুৎনিকগুলির সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকৃতিটা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পৃথিবীর ভেতরে পদার্থ কিভাবে ছড়িয়ে আছে আর কোন্ জায়গায় তার ঘনত্ব কতটা, তাও জানা গেছে। স্পুৎনিকের গতিবিধির ওপরে চাঁদের মহাকর্ষ আর পৃথিবীর আবহমণ্ডল কতটা আর কি-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটাও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। এইসব হিসাব নিখুঁতভাবে পাওয়ার পরে, কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলি বিজ্ঞানীদের হাতে এমন নিখুঁত আর সূক্ষ্ম যন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে যা দিয়ে আইনস্টাইনের ওই তত্ত্বটির উপরোক্ত কার্যকারণগুলিকে যাচাই করে নেওয়া যাচ্ছে, মহাব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই, আপেক্ষিকতাবাদের তৃতীয় সিদ্ধান্তটিকে—অর্থাৎ, স্পুৎনিক থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গগুলির ফ্রিকোয়েন্সি পৃথিবীর অভিকর্ষ-ক্ষেত্রের

প্রভাবে কতটা আর কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—সেটা কৃত্রিম উপগ্রহ-গুলির সাহায্যে অনেকখানি যাচাই ও নির্ধারণ করা গেছে।

সময় ও গতি

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের আরেকটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের কথাও বলা দরকার। এটা হল : গতির ওপরেই সময় নির্ভর করে। অর্থাৎ গতি যত বাড়বে সময়ও ততই মন্থর হয়ে আসবে—আলোর গতিতে যদি কোনো মানুষ মহাশূন্য দেশে চলে, তাহলে তার কাছে সময়ের প্রবহমানতা প্রায় থাকবে না বললেই চলে। ধরা যাক, এমন একটা মহাব্যোমযানে চেপে আমরা চলেছি যার গতি আগের গতির নয়-দশমাংশ বা সেকেণ্ডে ১,৬৭,৪০০ মাইল। সেক্ষেত্রে এই মহাব্যোমযানের ভেতরে আমাদের কাছে সময়ের মাত্রা দাঁড়াবে পৃথিবীর সময়ের মাত্রার অর্ধেক মন্থর—অর্থাৎ পৃথিবীর এক দিন হবে এই মহাব্যোমযানের ভেতরের ১২ ঘণ্টার সমান ; পৃথিবীতে যে-মানুষের ৮০ বছর বাঁচার কথা, সেই মানুষ যদি আজীবন এই মহাব্যোম-যানের ভেতরে থেকে যায় তাহলে সে বাঁচবে পৃথিবীর হিসাবে ১৬০ বছর। —অবশ্য সে নিজে এ সম্বন্ধে সচেতন থাকবে না।

কিন্তু স্পুৎনিকের বেলায় সময়ের এই তারতম্যটুকু নিতান্তই নগণ্য। আমাদের কাছে কৃত্রিম উপগ্রহের সেকেণ্ডে ৫ মাইল গতি প্রচণ্ড হলেও, আলোর গতির কাছে সেটা কিছুই নয়। তাই লাইকার পক্ষে সময়ের মন্থরতা মোটেই লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি—কারণ সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল গতিতে যে চলেছে, তার কাছে সময়ের প্রবহমানতার মাত্রা কমে আসবে এক বছরে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। তা সত্ত্বেও, পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে সময়ের এই অতি সূক্ষ্ম তারতম্যটুকুও ধরা সম্ভব। ইদানিং সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এমন নিখুঁত পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করেছেন, যার সাহায্যে তিন হাজার বছরে এক সেকেণ্ডের তারতম্য ধরা যায়। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ মহাব্যোমযান ও স্পুৎনিকগুলির গতিও আরও বাড়ানো যাবে। এর ফলে আইনস্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের তৃতীয় কার্যকারণের সিদ্ধান্তগুলিকেও যাচাই করা চলবে—যা এ পর্যন্ত প্রয়োগ-পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী ভিতালী গিন্‌সবুর্গ লিখিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে।

কুয়াশা

কার্তিক লাহিড়ী

বাস থেকে নেমে পুলিন এগিয়ে আসছিল বিষ্ণুর বাড়ির দিকে।

'এই তোর সাড়ে আটটা?'

বিষ্ণুর আকস্মিক প্রশ্নে পুলিন থতমত খেল, 'না মানে, বাসটা বড়—' নিজেকে ঠিক করে নিতে নিতে একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করল।

'আজও তোর দেরি করে উঠতে লজ্জা করল না।' বিষ্ণুর কথায় উষ্মা।

পুলিন হাসল। জানে, বিষ্ণু রাগ করে নি—দেরি করার জন্যে বকছে।

'আবার হাসছিস। অশোক এতক্ষণ বসে থেকে থেকে—'

পুলিনের হাসি হঠাৎ চুপসে গেল। অশোকের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কার ঢেউ বুকে আছড়ে পড়ল।

'অশোক কি…?'

'না, ভাবনার কিছু নেই। ও, সব ঠিক করে এসেছে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পুলিন। একটু দম নিয়ে বলল, 'রাস্তায় এমন করে বকবি, না, বাড়িতে গিয়েও কিছু হবে?'

বিষ্ণু হেসে ফেলল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ঠিক ছটায় যেতে হবে।'

'ছটায়?'

'আগে যেতে চাস?' বিষ্ণু থামল, 'রেজিস্ট্রার যে সময় দিয়েছেন তার আগে গিয়ে কি কিছু উপরি লাভ হবে?'

পুলিন কথা খুঁজে পেল না। বিষ্ণুর পাশাপাশি নিঃশব্দে চলতে লাগল। এক সময় থামল বিষ্ণু, 'আমি আবার ফিরছি কেন? তুই যা। সব ঠিক আছে।'

'তোর কাজ আছে?'

'হ্যাঁ, শালা আবার ডেকেছে। না গেলে'—মনে মনে বিজ বিজ করল বিষ্ণু।

পুলিন হাসল, 'দেখ, এবার লাক খুলে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। বেশ আহ্লাদ আর কি! আনন্দ ধরছে না যে?'

দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে বিষ্ণু হাঁক দিল, 'মা—চা।'

বিছানায় বসতে বসতে পুলিন বাধা দিল, 'থাক চা। এই মাত্র—'

হেসে উঠল বিষ্ণু, 'ইকনমি ড্রাইভ! রত্না শেখাচ্ছে বুঝি?'

পুলিন উত্তর দিল না। হাসল। একটু চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের বাড়িতে কোনও......'

'কিচ্ছু না। অশোক যখন আছে, তখন,' ইঙ্গিতে কথা শেষ করল।

'তবে ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

'কেন?' প্রশ্নটা ফস করে মুখ থেকে বেরুতেই লজ্জা পেল পুলিন। লজ্জা ঢাকার জন্যে প্রশ্ন জুড়ল, 'তোর না গেলেই কি চলবে না?'

'না। আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। তুই স্নান সেরে খেয়ে-দেয়ে নে। তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ ফিরব।'

বিষ্ণু যেতে গিয়ে থামল, 'নিখিলবাবুকে বলেছিস?'

'না', পুলিনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'নিখিলদা বোধ হয় রাগই করেছেন।'

'কেন?'

'বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন কোথায় যাচ্ছি, কি ব্যাপার, কি কাজ। আমিও থাকতে না পেরে আচ্ছা করে—'

'ওই তো তোর দোষ। একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়িস।'

বিষ্ণুর কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল পুলিন। রত্না? রত্নার প্রতিধ্বনি!

'তুমি বড্ড অস্থির। সব কথা ভেবে চিন্তে—'

রত্নার ভ্রূ—চোখ। বিরক্ত। রত্না বিরক্ত হয় আমার ওপর?

'তুই রেডি থাকিস।'

পুলিন কোনোমতে সম্মতি জানাল।

'আমার যদি আসতে দেরি হয়, স্ট্রেট্ চলে যাস।'

'না। তুই না এলে...আমার কেমন ভয় করছে।'

'হুঁ।' ছদ্ম গাম্ভীর্যে বিষ্ণু বলল, 'প্রথম প্রথম এমন হয়।'

'সকলের?' পুলিন ভুলেই গেল বিষ্ণুর এ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। বিষ্ণু উত্তর দিল না। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল এমন সবার হয়।

'মাসিমাকে জানিয়েছিস ?'

'না। সময় পাই নি। আর তুই করছিস লুকিয়ে বিয়ে সে-কথা জানতে পারলে মা আর ·'

পুলিনের বুক ধ্বক করে উঠল। লুকিয়ে বিয়ে! রত্না যদি ছুটে না আসত তবে কি এত তাড়াতাড়ি···

বিষ্ণু চলে গেল। সমস্ত ঘরটা থম মেরে আছে। পুলিন যেন অকুল পাথারে।

'তোমার বাবাকে এ বিষয়ে না জানিয়ে—'

'না-না, তুমি তো জান না বাবা-মা জানলে'···রত্নার চোখে জল। দাদার ওই রকম অসুখ তারওপর···' রত্নার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করলে—'

'ওদিকে দিন ঠিক। এঞ্জিনিয়র পাত্র—ছশো টাকা মাইনে। বাবার বাল্য-বন্ধুর ছেলে।'

রত্নার মুখে আশ্চর্য করুণা। রত্না করুণ। আমি থাকতে পারলাম না।

'কিন্তু আমার আয় ?'

'তাতে কি ? আমি তো লেখাপড়া শিখেছি। দুজনে মিলে—'

'তবু ছশো টাকা থেকে দুশো টাকার—'

'ছি-ছি, মুখে কিছু আটকাল না। আমি এমন অবুঝ যে—'

রত্নার চোখে অঝোর ধারা। না-না। আমি ভুল করি নি। রত্না এসেছে সব ত্যাগ করে।

যদি কিছু হয় ?

ছি—পুলিন! রত্নাকে না তুমি ভালোবাসো ? ভালোবাসার জন্য মেয়েটা ছুটে এসেছে এতদূর, অথচ···ধিক তুমি···ধিক···

উত্তেজনায় সরে এল পুলিন। অচেতনেই এগিয়ে এল রেগুলেটারের দিকে। পাখা চালিয়ে দিল। ভুলে গেল, এটা শীতকাল।

'স্নান করবে না ?'

মাসিমার কথায় সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি পাখা বন্ধ করে দিল।

'বাথরুমে সব রাখা আছে। খোকার যা পাগলামি—'

পুলিন হাসল। হাসল, কারণ না হেসে কি বলবে।

'তোমাদের দুটি বন্ধুর যা কাণ্ড-কারখানা। কি দরকার ছিল—'

পুলিনের বুক কেঁপে উঠল। মাসিমা কি তবে জেনে ফেলেছেন ? ছি-ছি, বিষ্ণুটা যে কি···এমন বিশ্বাসঘাতকের মতো কাজ করে ?

মাসিমা দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিন পালাতে পারলে বাঁচে।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।'

মাসিমা হাসলেন, 'অশোক আবার না খেয়েই বেরিয়ে গেল। বললাম খেয়ে নাও দুটি, তা কি শুনবে। কেবল ছন্‌মন্ ছন্‌মন্।'

আশ্চর্য ! অশোকটা সত্যি আশ্চর্য ! বুকে এমন জ্বালা, অথচ··· ; ওর মতো ছেলেকে কি করে নীলা···

অশোকের চোখ। কালো, করুণ। রত্না কাঁদছে। নাকি রত্নার চেহারার সঙ্গে ওর একটা মিল আছে ? বিষ্ণু। বিষ্ণুর কি হয় ? আমি আর রত্না যখন···

মাসিমা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে দৃষ্টি ফেলল। মাসিমা চলে গেছেন। মাসিমাকে এত ভালো লাগে। বিষ্ণুটা সত্যি ভাগ্যবান। এমন মা !

বিছানায় গা এলিয়ে দিল। আহ্—! রত্না যদি এ-সময় আসত একবার। রত্না কি করছে এখন ? কাল সারারাত ঘুম হয় নি। বিয়ে করার আগে সবার এমন হয় ? বিষ্ণুর হবে ? বিষ্ণু কি ভাবে আমাদের, বোকা ? বিষ্ণুর মন নেই ? প্রেমের কথা শুনলে কেবল হাসে।

সিলিঙে দৃষ্টি পড়ল। তিনটে ব্লেড। ফ্যান। বাতাসে নড়ছে। এক-দুই-তিন। ধীরে ধীরে ঘুরছে।

বিষ্ণু। অশোক। রত্না। বিষ্ণুর এতটুকু ঈর্ষা নেই ? আমি আর রত্না যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করি,···বিষ্ণু মানুষ নয় ? বিষ্ণু প্রেমে পড়ে নি ? নাকি লুকোয় আমাকে ?

'সব কথার উত্তর দিতে নেই।'

'আমাকেও না ?'

'না।'

বিষ্ণু আমার এতদিনের বন্ধু অথচ আমাকেও সব বলে না। রত্না কি বলে ? অশোক তো লুকোয় নি কিছু। কিন্তু নীলা ? নীলা খেলালো অশোককে। রত্নার তিল। ওগো দুঃখ জাগানিয়া। রত্না কি আমায়—

'আমি যাবো সোনারপুর।'

সোনারপুর! সোনারপুরের কথা ওকে বলতে পারি না। রত্না জিজ্ঞেস করলে কিন্তু আমি ··আমি কি···

'শুয়ে পড়লে যে?'

মাসিমার গলা শুনে উঠে বসল পুলিন।

'চান করে এসো। ভাত একদম জল হয়ে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল পুলিন। মাসিমার সামনে দাঁড়াতে কেমন লজ্জা করছে। মাসিমার হাত থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কোনোমতে পাশ কাটিয়ে প্রায় দৌড়ে ঢুকল বাথরুমে।

ভাত খেতে খেতে মাসিমা একসময় প্রশ্ন করলেন, 'তুমিও কি বিষ্ণুর মতো প্রতিজ্ঞা করলে?'

'কি?' ভাত থেকে মুখ তুলে চোখ মেলল মাসিমার মুখে।

'বিয়ে করবে না?'

মাসিমার মুখে হাসি। হাসিটা খুব ভালো লাগল পুলিনের। বহুদিন পর মনে হল মা-র সামনে বসে ভাত খাচ্ছে। মা-র সামনে, মা-র কথা মনে পড়তে বুকে একটা হাহাকার উঠল। কতদিন, কতদিন সোনারপুর যাইনি।

আস্তে করে বলল, 'জানেনই তো। বাবা অথর্ব, তারপর বিবাহযোগ্যা দুটি বোন। বিধবা বোনের ভার আমারই ওপর। ভাইগুলি মানুষ হল না। সব দায় আমাকেই টানতে হয়।'

'সে তো সবারই। তবু এর মধ্যে লোকে সংসার করছে। বিষ্ণুকে কত বলি···'

পুলিনের ইচ্ছে করল, বলে, মাসিমা—বিষ্ণু আমার চেয়ে মাইনে বেশি পায় আর সংসার বলতে আপনি আর সে···তবু বলতে পারল না। একটু থেমে বলল, 'তা করছে। কিন্তু আমি যা মাইনে পাচ্ছি—এই একশো নব্বুই টাকায় নিজেরই চলে না, তারপরে বিরাট সংসার···'

বলতে বলতে থেমে গেল পুলিন। মাসিমাকে নির্বিবাদে বললাম সব কথা, অথচ রত্নাকে? রত্নাকে বলতে ভয় পাই? কতটুকু সে জানে আমাদের সংসারের। সে কি জানে বড়দি···বললেই বলবে, টাকা কি একটা বড় ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে ··

বুঝি, বুঝি। প্রেম সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু শুধু আমাকে নিয়েই রত্না খুশি? রত্না কত কথা জিজ্ঞেস করে আমাদের, তবু আমি…

'কি হল, খাচ্ছ না যে?'

'এই খাই।' খাওয়ায় মন দিল পুলিন। রত্না সব বোঝে। তবু কি বুঝতে পারবে, বড়দি একটা জঘন্য কুৎসার জন্য বিতাড়িত হয়েছেন। মেজদি বিধবা, তার কথা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তোলে। ভাইবোনরা সব …শুধু আমি…আমিই একমাত্র…

'মাছ দিয়ে ভাত মেখে নাও।'

যন্ত্রচালিতের মতো আদেশ মান্য করল। বাবা আমায় ভালোবাসেন কিন্তু যখন মাথা বিগড়ে যায়—

'আর একটু ভাত দি?'

'না। আজ এমনিতেই।' পুলিন হাসল।

'আজকাল ছেলেদের ওই এক ধরন। কিছুতেই ঝুঁকি নেবে না। বলবে মাইনে কম। মেয়েরাও হয়েছে তেমনি। ওরাও আজকাল—'

মাসিমা বলছেন। পুলিন অন্যমনস্ক। সংসারে অর্থ-ই কি সবচেয়ে বড় ঘটনা? রত্নারা বড়লোক নয়। রত্নার ভাইয়ের…ভাবতেই থমকে গেল। রত্নার ভাইয়ের যে অসুখ, মনে মনে শিউরে উঠল পুলিন। রত্নার যদি ওই রোগের…না-না। তাড়াতে চাইল ভাবনা।

'তোমাদেরও বলি টাকাপয়সা খুব একটা…'

মাসিমা বলে যাচ্ছেন—ঠিক মার মতো। সব মা-ই এমন বলেন? রত্না যখন এমন হবে, চিন্তা আসতে লজ্জা পেল।

'পেট ভরেছে তো?'

'বাপ। এত খেয়েছি।' বলেই উঠে পড়ল।

মুখ ধুয়ে ঘরে এল। কেমন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আজ সকালে দিব্যি খোশ-মেজাজে ছিল। কিন্তু এখন, ঠিক খাওয়ার পর, মাসিমার সঙ্গে কথা বলার সময় থেকে, সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

অশোকটা কি? বিয়ে করবে না? মাসিমাকে সব বললাম অথচ রত্নাকে…রত্না, আমার ভাবী-স্ত্রী। তাকে আমি…রত্নাই কি সব কথা বলেছে আমায়। ভাবতে ভাবতে থামল পুলিন, না-না। সব কথা সবাইকে বলা যায় না। বিষ্ণু ঠিক। তবু আমি বলেছি।

মিছে কথা। তুমি বল নি।

নিশ্চয়ই বলেছি। রত্না জানে। রত্না বলেছে সে মানিয়ে নেবে।

'আমার তো কোনো কথাই তোমার অজানা নয়।' ময়দানের নির্জনতা। অজানা? কেন?

'যারা দেহকে মূলধন করে তারাই এমন রহস্য করে দেহ নিয়ে।' রত্না হাসছে। রত্নার তিল—রত্নার ঠোঁট।

'আমি যদি পালাই?'

'পালাবে?' রত্না পাগলের মতো হাসছে, 'পালাও দেখি?'

এত জোর রত্নার? আমি তো পালাতে পারলাম না। কেন? এত দৃঢ় রত্না? একেই কি বিষ্ণু ব্যক্তিত্ব বলে? পুলিন কথাটা মনে মনে আবৃত্তি করল।

রত্নার মুখ। রত্নার চোখ। রত্নার সমস্ত শরীর···সব কিছু ছাপিয়ে, পুলিন ভাবল, কি আছে যা আমাকে পাগল করে, উদ্দীপ্ত করে, এগিয়ে নিয়ে যায়। রত্না উজ্জ্বল, হাস্যময়। কিন্তু ওর কথা···গান। প্রেম কি তবে ব্যক্তিত্ব? তবে কি দেহ? দেহ ফুরিয়ে গেলে···আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে···।

পাখা খুলে দিল পুলিন। শুয়ে পড়ল বিছানায়। ব্লেডগুলোর অস্তিত্ব মিশে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে। এক···দুই···।

প্রেম। ব্যক্তিত্ব। দেহ। রত্না। মন। অশোকের, বিষ্ণুর···রত্নার মধ্যে কি আছে? রত্নার জন্যে ফ্ল্যাট। নির্জনতা।

পাশ ফিরল পুলিন।

রত্না কত সহজ আমার কাছে কিন্তু আমি যে পারি না। লুকিয়ে বিয়ে—পাশ ফিরল আবার।

'জানই তো বাবা-মার কাছে আমি কেমন দুর্বল। ওখানে যেন—'

'কিন্তু বাবা-মাকে জানিয়ে করলে কত ভালো হত।'

'সে তো জানি। তুমি তো বুঝতে পারছ ওই একজায়গায়—'

বাবা-মাকে ভয় করে রত্না? আমি ভয় করি বাবাকে। ভয়, না ভালোবাসা?

ভয় থেকে ভালোবাসা। রত্নাকে আমি ভয় করি? ভয়! জোরে হাসতে চাইল পুলিন। চিত হলো। রত্নাকে নিজের মতো গড়ব। সবার রঙে রঙ

মেশাতে হবে। গান। শুধু গান। কতদিন এমন লুকিয়ে···থমকে গেল আবার। না। এই ভালো। সেই ভালো, ওগো সেই ভালো। অশোক, বিষ্ণু। থাক না লুকনো। বিষ্ণু কি বলে? অশোকটা অস্থির, চঞ্চল। আমার বিয়ে—রত্না আমার···না-না। ভয় করব না।

পুলিনের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল, ঘুম পাচ্ছে। আজ ঘুম পাচ্ছে! ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করল। রত্না কি ঘুমুচ্ছে?

পুলিনের চোখের সামনে ভেসে উঠল রত্নার মুখ···রত্নার ছবি···রত্নার মন ···রত্নার শরীর।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটে নির্দিষ্ট স্থানে যখন বিষ্ণু আর পুলিন এসে পৌছল, তখন ছটা বেজে গেছে। ঘরে ঢুকতেই নিমেষে শরীর ভার হয়ে উঠল। বুকের ভেতর গুরগুর করতে লাগল। সমস্ত ঘরটা যেন ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি। চোখ মেলল সামনে। অশোক ততক্ষণ এগিয়ে এসেছে।

'কিরে?' অশোকের চোখে কৌতুক।

পুলিন হাসল। জোর করেই হাসল এবং অশোককে ওই হাসিতে জবাব দিয়ে খুঁজল রত্নাকে।

রত্না মুখ নিচু করে বসেছিল। গুঞ্জন শুনেই বোধহয় সামনে তাকাল। পুলিনের চোখে রত্নার চোখ। রত্না হাসল। হাসিটা কেমন ভীরু-ভীরু।

পুলিন একটু এগিয়ে এল। পা কাঁপছে। এগিয়ে এসে রত্নার কাছে বসতে চাইল।

'কিরে', ঠেলা মারল অশোক। 'বেড়ে ছিলি। আমি তো ভাবলাম', অশোক পুলিনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আর একজনকে ইঙ্গিত করল। একটা ছেলে। ছেলেটা ভেতরে গেল।

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্।'

পুলিন ঠিক কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এ-ঘরে ঢোকা অবধি কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। টেবিল, চেয়ার, ছবি, অশোক, বিষ্ণু, কার্পেট—সব, সব যেন চেপে ধরছে পুলিনকে। আমি ভয় পাচ্ছি কেন, দৃঢ় হতে চেষ্টা করল। তাকাল রত্নার দিকে। রত্নার মুখ হাসি-হাসি। রত্না অমন হাসছে কেন? এতে হাসির কি হল?

অশোককে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে কেউ জানতে পারে নি তো?'

'তা তোর জানার দরকার কি ?'

অশোক তাকাল রত্নার দিকে। পুলিন দেখল, রত্না তির্যকভাবে তাকাল অশোকের দিকে। রত্নার তাকানোর ভঙ্গি ওই রকম। কিন্তু এখন দৃষ্টিটা বিশ্রী ঠেকল পুলিনের কাছে। এমন জোর করে স্মার্ট হবার দরকার কি··· কি এমন হল যে···

এমন সময় রেজিস্ট্রার ঘরে ঢুকলেন। চোখে চশমা, গায়ে কালোকোট। বেশ সৌম্য, শান্ত।

'বসুন, বসুন।'

অশোক রত্নার দিকে এগিয়ে গেল। রত্না উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে এবং ইচ্ছে করেই যেন মুখের হাসিটা বজায় রেখে (পুলিনের মনে হল) এগিয়ে গেল টেবিলের সামনে। পুলিনের শরীর রি রি করে উঠল রত্নার আচরণে। এ কি অসভ্যতা !

'আয়, এখানে বোস্।'

পুলিন, রত্না বসল ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রারের সামনে টেবিলের উল্টো দিকে। রেজিষ্ট্রার ডানহাতি ড্রয়ার টানলেন। একটা ফাইল বের করলেন। ফাইল খুলে কয়েকটা কাগজ উলটে বললেন, 'রত্না মুখোপাধ্যায়, পুলিন মিত্র ?' অশোক দাঁড়িয়েছিল রেজিষ্ট্রারের পাশ ঘেঁষে, 'হ্যাঁ—এরা দুজন।' রেজিষ্ট্রার দেখলেন। কাগজ সামনে ধরলেন, 'দুজনেই সই করবেন।'

সই করল পুলিন, রত্না। তারপর এগিয়ে দিল কাগজ। রেজিষ্ট্রার অশোকের দিকে তাকালেন, 'এবার উইট্নেসের ঘরে আপনারা—'

পুলিন দেখল, রেজিস্ট্রার একটা খাতায় কি যেন লিখছেন। আশ্চর্য ! আমরা এখন···। রত্নার দিকে তাকাল। রত্নার মুখ অস্বাভাবিক লাল। কানের লতি কাঁপছে মৃদু মৃদু। সমস্ত মুখ থরথর করছে। এত আনন্দ রত্নার অথচ আমার। আমি যে কিছুতেই—

'আচ্ছা। এবার দুজনে একটু উঠে দাঁড়ান।'

রেজিস্ট্রার আদেশ করলেন যেন। দুজনে উঠে দাঁড়াল।

'হাত ধরুন।'

হাত ধরল দুজন। রত্নার হাত ধরতেই অবাক হয়ে গেল পুলিন। কেমন ঠাণ্ডা, অনুভূতিহীন। এই কি সেই রত্না, যাকে আমি···

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পুলিন।

'বলুন, ঈশ্বরের একান্ত নির্দেশে—'

রেজিস্ট্রার বলে চললেন, পুলিন অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। এই মেয়েটি আমার গৃহিণী। এতক্ষণ যে ···যে মেয়ের জন্য প্রতীক্ষা করেছি আমি। অশোক, বিষ্ণু—সবাই পঞ্চমুখ অথচ আমি···পারবে সংসারে মানিয়ে নিতে নিজেকে। বাবা, মা, ভাই···

পুলিন ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ল। চোখ বেয়ে জল পড়বে যেন। রত্না ঠায় তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পুতুল। বাবা যখন ওকে···পারবে মা-র মতো কষ্ট করে সবাইকে আপন করে নিতে ? পারবে বড়দি, মেজদির···

'থ্যাঙ্ক ইউ। সুখী জীবন কামনা করি।'

রেজিস্ট্রার নিয়মমতো শপথ গ্রহণ শেষ করালেন। তারপর নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে।

রাস্তায় নেমে অশোক বলল, 'তাহলে ফেস্টিভ্যালটা রেস্টুরেণ্টেই হোক।'

বিষ্ণু লাফিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই। থ্রি চিয়ার্স ফর—'

পুলিনের লজ্জা করতে লাগল। ও একবার রত্নার দিকে তাকাল।

'চল্। তাহলে আর দেরি নয়।'

এবং দ্বিরুক্তি না করে এগিয়ে এল ধর্মতলার দিকে।

'কেবিনে বসা যাক।' বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করে অশোক রত্নার দিকে চাইল, 'কি বল দেবী ?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই অশোক কেবিনে ঢুকল। তারপর ঢুকল রত্না, তারপর বিষ্ণু—সবশেষে পুলিন।

'পর্দাটা টেনে দে পুলি।'

পুলিন উঠতে গেল, তার আগেই একটি ছেলে ঢুকল কেবিনে।

'কি খাবে রত্না ?'

রত্না একটু চুপ থেকে বলল, 'তোমরা কি খাবে ?'

'তুমি কি খাবে বল।'

'চা।'

'শুধু চা!'

রত্না কথা বলল না। মাথা নাড়াল।

'তবে আমরাও চা খাব।'

'কেন ? তোমরা খাও না, আমার খেতে ভালো লাগছে না।'

পুলিনের চোখে চোখ মিলতেই থেমে গেল রত্না।

'চারটে চা ঝট করে নিয়ে আয়।'

ছেলেটা চলে গেল পর্দা টেনে।

'কি দেবী, কেমন লাগছে?' অশোকের প্রশ্ন।

'কেমন আবার যেমন সবার।' রত্না সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

পুলিন দেখতে পেল, রত্না কারণে-অকারণে হেসে উঠছে। ভারি বিশ্রী লাগছে পুলিনের। এত হাসির কি আছে? অশোকটাই বা হাসছে কেন? নাকি হাসি দিয়ে ঢাকছে নীলার বেদনা?

'কি রে? অমন করে কি দেখছিস?'

পুলিন চুপ।

বিষ্ণু ফুট কাটল, 'কি আর ভাবতে পারে,' বলে রত্নার দিকে তাকাল বিষ্ণু।

'আঃ বিষ্ণুদা, তুমি মানে—'

বিষ্ণুর ইঙ্গিতের চাইতে রত্নার ওই ভঙ্গি সারা শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি করল পুলিনের। অশোক জোরে হেসে উঠল। পুলিন সঙ্কুচিত হতে থাকল। রেজিস্ট্রারের ঘর থেকে কেমন একটা···আর রত্নাটা এমন করছে, এমন হাসছে যে···

'এমন বোকার মতো করছিস যে,' বিষ্ণু বলে উঠল।

পুলিন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, বেয়ারা ঢুকল ঘরে।

ঠক্ ঠক্ শব্দ করে কাপগুলো রাখল। পুলিন দেখল, ঠিক একই রকম ভাবে চারটে কাপ নামাল ছেলেটা, বেরিয়ে গেল ঠিক একইভাবে।

চায়ে দীর্ঘ চুমুক দিল পুলিন, 'মোস্ট বাজে'—

'তা তো লাগবেই, এখন মন পড়ে আছে অন্যদিকে। চা খেতে কি···'

'রত্না তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো। মাসিমা বলেছেন নটার মধ্যে।'

বাধ্য শিশুর মতো সম্মতি জানাল রত্না। রত্নার ভঙ্গিগুলো ক্রমেই অস্থির করে তুলছে পুলিনকে। এই হাসছে, আবার এই বিষ্ণু, অশোকের কথা পুতুলের মতো মেনে নিচ্ছে। আশ্চর্য! চায়ে মন দিল পুলিন। সবাই চুপ।

আমি কি অবিচার করছি, পুলিন মনে মনে সমালোচনা শুরু করল। বিষ্ণু, অশোক এদের সামনে যদি···কিন্তু ওর ভয় করছে না? বাড়ি থেকে পালিয়ে এল, অথচ···

'চল্, ওঠা যাক।'

আবার রাস্তা। রাস্তায় নেমেই অশোক ঘোষণা করল, 'এবার কপোত-কপোতী তোমরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর।'

'তোরা ?' পুলিন অসহায়ের মতো প্রশ্ন করল।

'আমরা এখন কাফিহাউসে যাব ?'

'আমিও চলি না কেন তোদের সঙ্গে ?'

'থাক্! কথায় কথায় সময় বয়ে যাচ্ছে। তোরা যা, ময়দানের শীতে একটু—'

বিষ্ণু অশোকের হাত টানল, 'আহ্ কি হচ্ছে। আমরা যাই, কি বল রত্না ?'

'চল না এক সঙ্গে।'

রত্নার কথা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বিষ্ণু বলল, 'কিস্সু দরকার নেই। শেষে অভিশাপ কুড়োব আমরা···ওরে বাস্।' বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করল দুজন।

'এই অশোক, এই বিষ্ণু,' পুলিন ডাকল। ও কিছুতেই রত্নার সঙ্গে একলা থাকতে চাইছে না। কেমন ভয় করছে। রত্নাকে কিছুতেই আগের মতো মেনে নিতে পারছে না।

'থাক্। ন্যাকামি করিসে নে,' হাঁটতে হাঁটতে বিষ্ণু বলল।

অশোক একটু দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে এল কাছে, 'আমি তোদের বড়। আশীর্বাদ করি তোরা সুখী হ।'

পুলিন দেখতে পেল অশোকের চোখ চিকচিক করে উঠল। তবে কি নীলার দুঃখ ভুলতে পারে নি অশোক ? পুলিনের বুক মোচড় দিয়ে উঠল। হাত বাড়াল, বিষ্ণু তত ক্ষণ এগিয়ে গেছে। পুলিন দেখল, অশোক হাঁটছে, বিষ্ণুও। আরও···অ রও লোক।

দৃষ্টি ফেরত এল, পাশে রত্না। অগণিত জনস্রোত, ট্রাম, বাস। শব্দ, শব্দ, আর আলো।

রত্না পুলিনের দিকে তাকাল। পুলিন কোনো কথা বলল না।

'ওদের যেতে দিলে কেন ?' রত্না একটু হালকা হতে চাইল।

পুলিন তীক্ষ্ণভাবে তাকাল রত্নার দিকে। নিমেষে রত্না ছাই হয়ে গেল। পুলিন দৃষ্টি সরিয়ে আনল। নিঃশব্দে এগুতে থাকল ধর্মতলা বেয়ে।

রত্না পুলিন পাশাপাশি হাঁটছে। অথচ দুজনে যেন দুজনের চেনা নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত। রত্না মুখ নিচু করে চলছে। পুলিন এ-ধার ও-ধার তাকাচ্ছে, কখনও বা রত্নার দিকে।

·　　·　　·

রত্না এমনভাবে হাঁটছে কেন? ও কি পারবে আমাদের সংসারের ভার নিতে? মা-বাবাকে পারবে সন্তুষ্ট করতে? নিজের বাবা-মাকে ভালোবাসে অথচ তাঁদের না জানিয়ে বিয়ে করার সময়…নাকি ভুল করেছে আমাকে বিয়ে করে?

রত্নার দিকে তাকাল আবার। জড়োসড়ো হয়ে হাঁটছে। অবাক হচ্ছে পুলিন। বিষ্ণু, অশোক থাকলে ভালো হত। এমন একটা…

বরফ ভাঙল পুলিন, 'কি? কথা বলছ না যে?'

রত্না তাকাল, উত্তর দিল না।

'মনে হচ্ছে, খুব ঠকে গেছ।'

রত্না চমকাল। পুলিন তার চমক দেখতে পেল। আবার চুপ।

'এঞ্জিনিয়রের সঙ্গে বিয়ে হলে বোধকরি,' ঠাট্টা করতে চাইল। রত্না চুপ। রত্না যত নিশ্চুপ, পুলিন ততই অধীর। এমন চুপচাপ করে হাঁটছে—বিষ্ণু, অশোক-টা আচ্ছা কায়দা করল দেখছি।

'কি? কথা বলছো না যে।'

'কি বলব?' পুলিন দেখল, রত্না একটা দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিনের মনে একরাশ বিছে নড়ে চড়ে উঠল।

'আজ কি কোন কথা নেই তোমার? সব শেষ হয়ে গেছে?'

রত্না চুপ। পুলিনের সহ্য এবার সীমা অতিক্রম করবে।

রত্না, আমার স্ত্রী। ভালোবেসে বিয়ে করেছি। ভালোবাসা। রত্নার সঙ্গে শুধু…ছি, ছি। এ কি ভাবছি। রত্না যদি ভালোই না বাসে, তবে…

একটু শান্ত হল পুলিন, 'শীত করছে নাকি?'

রত্নার স্বর বেরুতে চায় না। কোনমতে বলল, 'না।'

'আচ্ছা রত্না, তুমি কি ভাবো…' বলতে বলতে থেমে গেল। আজ এ মুহূর্তে ওসব কথা বলা উচিত হবে না। এই শুভদিনে…একেই শুভদিন বলে? সারাদিন ধরে, আজ এতদিন যার প্রতীক্ষা করলাম সে যখন এলো…নাকি ফাঁকি দিয়েছি? ফাঁকি!

তাকাল রত্নার দিকে। রত্না হাঁটছে নিঃশব্দে।

এতদিন রত্না আকর্ষণ করেছে চুম্বকের মত। ওর কথায় উঠেছি, বসেছি। কিন্তু আজ!

রত্নার ব্যক্তিত্ব আছে? বিষ্ণু একটা পাঁঠা। বিষ্ণুর মতো ছেলে…সবাই

আমাকে ভুলিয়েছে ? ব্যক্তিত্ব ? কোথায় ব্যক্তিত্ব ? একটা জড়, মাংস পিণ্ড। আজ দুবছর ওকে ভালোবাসলাম···সেই···

পুলিন মনে মনে উত্তেজিত হতে লাগল।

এত কাছে এসেছে বলেই কি···। কাছে এলে প্রেম উপে যায় ?

'এতো কি ভাবছ ?' রত্না প্রশ্ন করল।

পুলিন নিমেষে জল হয়ে গেল। রত্নার চোখ ছল ছল। পুলিনের বুক গুমরে উঠল, ওই তো রত্না···রত্না···

তবু নিজেকে সংযত করে বলল, 'না, কিছু না।' রত্না এগুতে থাকল।

'আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হও নি ?'

একটা তীক্ষ্ণ আঁচড় রত্নার প্রশ্নে। এ কি প্রশ্ন ? এতক্ষণ এই প্রশ্নের জন্য আকুল হয়েছিল পুলিন। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। সুখী হয়েছি, সুখী হয়েছি—কিন্তু রত্নার দিকে তাকিয়ে বলতে পারল না।

রত্নার সে-জোর কোথায় ? পুলিন আবার বলতে চেষ্টা করল, হাসতে চাইল। বৃথা ! পারল না।

না, না তুমি সুখী হও নি।

যাকে চেয়েছি তাকেই তো—

ভুল।

কেন ? কেন এই ছলনা—আমি রত্নাকে—

হাত বাড়াতে গেল পুলিন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিল। কেন ? কেন বলব ? রত্না জোর করে আদায় করতে পারে না ? আর, সব কথা বলব কেন ? সব কথা বলা যায় ?

স্ত্রীকে ? স্ত্রী ! কে স্ত্রী ? রত্না। বাবা-মাকে যে ফাঁকি দিয়েছে সে যদি আমাকে—

ভাবতে ভাবতে থমকে গেল পুলিন। দাঁড়িয়ে পড়ল।

'থামলে যে ? আমিনিয়া যাবে ?'

'কেন ?' একটু এগিয়ে বলল পুলিন।

'কিছু খেলে না, তাই—' রত্না ম্লান হাসল।

'তাই ওখানে যেতে হবে।' রূঢ় কণ্ঠ পুলিনের।

রত্না নিরুত্তরে এগুতে থাকল।

মেট্রো ছাড়িয়ে আবার রত্না মুখ খুলল, 'ময়দানে বসবে ?'

'ময়দান। আচ্ছা চলো।'

কিন্তু ময়দানে বসতে কিছুতেই মন চাইছে না। রত্না প্রস্তাব দিল বলেই কি…। অথচ পরশু দিন, থমকে যাচ্ছে পুলিন। আর্মিনিয়া থেকে খেয়ে গেলাম ময়দানে। কত জল্পনা, কল্পনা—অথচ আজ এখন, জীবনের সমস্ত বাস্তবতা ধাওয়া করে এসেছে। আহ্, জীবন।

জল্পনা, কল্পনা! মনে মনে হাসল পুলিন, রত্না চাইছিল না, আমিই ওকে… প্রিয়া স্ত্রী হলে এমন বদলে যায়, নাকি আমি…। বিষ্ণু, অশোক বাড়ি পৌঁছে গেছে।

পুলিন থামল রাস্তা পেরুবার জন্যে। রাস্তা পেরিয়ে ময়দান মুখো হলো। পা-পা এগিয়ে এল মনুমেণ্টের দিকে। তারপর চলতে লাগল ময়দানের মধ্য দিয়ে।

নিঃশব্দ দুজন—নির্বাক।

শীত। চারপাশে কুয়াশার পাতলা আস্তরণ। আলো…গাছ…স্তব্ধ, ঝাপসা, কুহেলীময়। শীত। পুলিন বসে পড়ল। রত্না বসল পাশে, কাছেই।

সামনে, দূরে—আলো। নিবে-আসা দ্যুতি। সবুজ, লাল, নীল—ফ্যান …কেৎলি…চা। কুয়াশার চাদরে অস্পষ্ট, আবছা। একটা রেখা। কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। ঋজু। মানুষটার চোখ দেখা গেল না। চলে গেল—মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

রত্না মুখ গুঁজে বসে আছে। পুলিন তাকিয়ে আছে। চোখ বিঁধিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পায়ের শব্দ দ্রুত এগিয়ে এসে মিলিয়ে গেল।

নিঃশব্দ পুলিন, নিস্তব্ধ রত্না।

মনুমেণ্ট ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা, কালো-লম্বা-দাঁড়ি-চিহ্নের মতো। ওখানে একটা ছেদ। জোরালো আলো ছুটে আসছে। ভিজে ভিজে কুয়াশায়—ভিজিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। আলোটা কালো হয়ে গেল। আর ধীরে ধীরে উঠে আসছে শব্দ। সাঁই…সাঁই…। এগিয়ে আসছে শব্দটা। একটা, তারপর একটা…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ।

রত্না, পুলিন চুপ। সময় বয়ে চলল—চুপ।

কাছে, দূরে যেখানে চোখ পড়ছে, না-পড়ছে সেইখানেই আলো আর

আলো, কুয়াশা আর কুয়াশা। দুটি রেখা···চা···গ···স্বরগুলো মিলে যাচ্ছে··· মিশে যাচ্ছে কুয়াশায়।

দুটো মোটা রেখা···। গন্ধ···শব্দ নয়। শুধু গন্ধ। ছড়িয়ে গেল আর দু-চারজন···। তুমি···চিনে···ক্র্যাশ···ভাঙা ভাঙা শব্দ। একটা বিরাট শব্দ। মোটর ব্রেক কষেছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটল চৌরঙ্গীতে।

কেঁপে কেঁপে উঠল মানুষের মন, মানুষের শরীর। কলকাতার আকাশে তারা নেই। তারা অকম্পিত। গাছপালা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমন্ত, অবোধ শিশু। কুয়াশারা ঘিরে ধরেছে গাছপালা, রত্না, পুলিন, মনুমেণ্টকে—।

নিশ্চুপ দুজন। নির্বাক।

মনুমেণ্ট অকম্পিত। আলোর ছুটোছুটি—স্টেডিয়ামের মস্ত মস্ত খাঁচা। ঢঙ···ঢঙ। পোঁ-পোঁ। মানুষ। ট্রাম-বাস। শব্দ। আলো। গান। ময়দান। মনুমেণ্ট। রত্না। পুলিন। কুয়াশা—

হা-হা করে উঠল চারধার। একটা বেদনার জন্ম। চোখের সামনে, চোখের বাইরে—ডান পাশ, বাঁ-পাশ—সব পাশে কুয়াশা। কুয়াশা জড়াতে থাকল মানুষ-জন, মাঠ-ঘাট, গাছপালা—ট্রাম-বাস। জড়াতে থাকল আলো। লাল, হলুদ, শীত, ঠাণ্ডা—হিম-হিম।

শব্দ উঠছে। আরও আরও শব্দ।

নিঃশব্দ দুজন। রত্না আর পুলিন।

রত্না উঠে পড়ল। পুলিন দেখল রত্না ঝুঁকে পড়েছে। ঘড়ি দেখছে। উঠে দাঁড়াল।

তারপর হাঁটতে থাকল দুজন পাশাপাশি।

কুয়াশারা এবার শরীর নিয়ে খেলা করতে লাগল। চোখ, বুক, মুখ, পা—সমস্ত শরীরে কুয়াশার স্পর্শ। নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দূরে, কাছে আলো—সবদিকে শব্দ।

পুলিন, রত্না হাঁটতে থাকল—চুপ। শুধু ঘাসে চটিতে শব্দ উঠল, শপ শপ।

পুলিন, রত্না হাঁটতেই থাকল। যত এগিয়ে আসছে চৌরঙ্গী—আলো, শব্দ, ব্যস্ততা—ততই চুপ, আরও চুপ ওরা দুজন পাশাপাশি এগিয়ে আসতে লাগল।

কেউ কারুর দিকে তাকাল না, একটা কথাও বলল না। শুধু এগিয়ে আসতে লাগল আলোর মধ্যে, শব্দের মধ্যে—ব্যস্ততার মধ্যে।

কোন্ পথে?

কর্নেলি জেলিন্স্কি

[বিষয়টি সোভিয়েত দেশে আলোচিত হলেও সকল দেশেরই। আধুনিক সভ্যতারই এই জিজ্ঞাসা। টেকনোলজির বিপ্লবে সমাজতন্ত্রী দেশে জিজ্ঞাসাটা নতুন করে জেগেছে—পৃথিবীতে কারুবিদ্যার বিজয়ের অর্থ কি সুকুমার কলানুশীলনের অবসান? নতুন সমাজে কি ভাবে প্রশ্নটা আলোচিত হচ্ছে তার আভাস বহন করছে এই রুশ লেখার অনুবাদটি।
—পরিচয় সম্পাদক]

কোন্ পথে? বিজ্ঞানের পথ, না কবিতার পথ? এই প্রশ্নটা হঠাৎ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আর কাব্যিক ভাবধারার মধ্যে তীব্র বিরোধের ব্যাখ্যা করা যায় কী ভাবে? এই প্রশ্নের গুরুত্ব আজ আরও বেশি করে সোভিয়েত দেশে; যে-দেশ এক সাম্যবাদী সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুতবেগে। পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা এই বিতর্ক সম্পর্কে অসংখ্য চিঠিপত্র পাচ্ছেন। বিতর্কের বিষয়: "ইলিয়া এরেনবুর্গ, না পলেতায়েফ?" এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন বহু শ্রমিক, বহু ইঞ্জিনীয়ার, বহু ছাত্রছাত্রী।

ইঞ্জিনীয়ার পলেতায়েফ জোর গলায় জানিয়েছেন: "কথাটা শুনতে আমাদের ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, মানতেই হবে যে, আমাদের মনের উপর কবিদের প্রভাব কমে আসছে, তাঁদের কাছ থেকে আমাদের শিখবার মতো বিশেষ কিছু নেই। আবেগের সৃষ্টির দ্বারা বিমোহিত হলে আমাদের চলবে না—আমাদের চলতে হবে মননের সৃষ্টির দ্বারা, তত্ত্ব ও তথ্যের কবিত্বের দ্বারা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিজস্ব সৌন্দর্যের দ্বারা। এ যুগের ধর্মই এই।"

বক্তা যুবক। তাঁর এই উক্তিকে আজকের দিনের বহু যুবকেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি বলে ধরে নেওয়া যায়। বস্তুত বিতর্কের আসরে আরো অনেকে ইঞ্জিনীয়ার পলেতায়েফকে সমর্থন করেছেন।

বিপক্ষ ইলিয়া এরেনবুর্গ পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "পলেতায়েফ যা বলেছেন তা একটা স্বল্পস্থায়ী ব্যাধিরই লক্ষণ। বলা যায় এ এক সাময়িক সর্দি জ্বর।"

শিল্পকলার পক্ষ নিয়ে এরেনবুর্গ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রতি অন্ধ, উদগ্র ভক্তির বিরুদ্ধে যে সব কথা বলেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের পূজা আর শিল্পকলার প্রতি কালাপাহাড়ী অবজ্ঞাকে তিনি যখন সামান্য একটা সর্দি জ্বরের স্তরে নামিয়ে এনে সমস্যাটা জলের মত সহজ করে দিতে চেয়েছেন, তখন তাঁর সেই বক্তব্যে সায় দিতে পারি নি। সমস্যাটা এত সরল নয়। সর্দির মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বিষয় মনে করলে ভুল হবে। সমগ্র প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে সমাজগত ও তত্ত্বগত প্রশ্ন। আজ আমাদের চারদিকে দেখছি বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল, অদম্য আকর্ষণ। ব্যাপকভাবেই চোখে পড়ে এক যন্ত্রবিজ্ঞানগত মনস্তত্ত্ব।

এই সত্য প্রথমে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তারপর চলুক তার মূল্যবিচার, চলুক চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ। আদপে এ সর্দি জ্বর নয়। বরং বলতে পারি এ যেন এক জ্বলন্ত দেশলাই এক রাজ্যের খড়কুটোর মধ্যে। জানতে হবে কী উপাদানে গঠিত এই খড়কুটো যার জন্যে তারা এমনতর দাহ্যমান। ভাবতে হবে কেন এই নতুন মনস্তত্ত্ব এত ব্যাপক, এত প্রবল হয়ে চলেছে। আসল জবাব খুঁজতে হবে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বাস্তব স্ববিরোধের মধ্যে, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসম বা বিষম বিকাশের মধ্যে, বিশেষ করে আবেগজাত ও অনুভূতিগত সমস্যাগুলির মধ্যে।

কথাটা অনেকেরই ভালো না লাগতে পারে, তবু এ সত্য থেকেই যাচ্ছে যে, বর্তমান কালে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটি মাত্র বিভাগ—গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান—আর সকল বিভাগকে কমবেশি নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। পি. আন্তোকল্স্কি তাঁর "কাব্য ও পদার্থবিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন : এই সমস্যা নিয়ে অনেকেই আজ মাথা ঘামাচ্ছেন, রীতিমতো উদ্বেগ বোধ করছেন। অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, সব চেয়ে বেশি দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে পদার্থ বিজ্ঞানের উপর—কেবল পদার্থ বিজ্ঞানই নয়, সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর। সুনাম আর সম্মান লাভের জন্যে অসম্ভব ভিড় জমেছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। কাব্য, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্র তুলনায় অনাদৃত। কারো দ্বিতীয় স্থান, কারো তৃতীয় স্থান। প্রথম স্থান বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন শাখার একচেটে অধিকারে।

অবশ্য সোভিয়েত দেশে কবিতা উচ্চ সম্মানের স্থান পেয়েছে। তাই বলে কাব্য এখনো এমন দেশজোড়া বা রাষ্ট্রজোড়া গুরুত্ব লাভ করে নি যাতে করে

তা লোহা আর ইস্পাতের উৎপাদনের মতো পার্টি কংগ্রেস বা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জরুরি আলোচনার বিষয় হতে পারে।

তবে কবিরা এই কথা জেনে অনেকটা সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, কবি আর নাট্যকারের চেয়ে অনেক বেশি কম স্বীকৃতি পান সমালোচকের দল। সোভিয়েত এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায় বা সোভিয়েত বিশ্বকোষে সাহিত্য ও শিল্পকলার জন্যে বেশি জায়গা পাওয়া না গেলেও ওরই মধ্যে যা হক করে বহু লেখকের নামধাম দেওয়া গেছে। সোভিয়েত দেশের শত শত সমালোচকের একজনেরও সম্পর্কে একটি লাইনও খুঁজে পাবেন না। সোভিয়েত বিশ্বকোষের সম্পাদকমণ্ডলীর রসজ্ঞান একেবারেই নেই একথা ঠিক নয়।...

বি. তোমাশেভ্‌স্কি গণিতশাস্ত্র নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন। লেনিনগ্রাদে গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বিস্তর লেক্‌চারও দিয়েছেন। এ-হেন ব্যক্তিকে একদিন প্রশ্ন করে বসলাম: বিশুদ্ধ গণিত চর্চার আনন্দের পথ ছেড়ে হঠাৎ আপনি কবিতা নিয়ে মেতে উঠলেন কেন, ভাষাতত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়লেন কেন?

মৃদু হেসে আমার এই প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি বাবাতিন্‌স্কির কবিতার দুটো লাইন আবৃত্তি করে। ভাবার্থ এই: জীবন যাতে নিরানন্দ হয়ে না পড়ে তারই জন্যে এ রকম পালা-বদলের প্রয়োজন।...

এবার আর একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক—বৃত্তি বা পেশার প্রশ্ন। আমাদের যুগ চায় গণিতশাস্ত্রী, চায় বিজ্ঞানীর দল। ভালো কথা। কিন্তু কেউ যদি কবি হয়ে জন্মান কিংবা ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনের দিকে একটা সহজ আকর্ষণ যদি কারো থাকে, তা হলে? মুশকিল এইখানে। এই সমস্যা নিয়ে একখানি সংবাদপত্র এক বিতর্কের আসর খুলেছিল। আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামাটি ছিল সুন্দর: "মানুষ যা সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে সেই ক্ষেত্রে সে দৈত্যের মতো বিরাট।" তা হলে এ কথা মেনে নিতে হয় যে, যা ভালো লাগে না সে কাজে লেগে থাকতে হলে মানুষ বিরাট হতে পারে না। তা হলেই প্রশ্ন দাঁড়ায়: কোন্ পথে? কোন্ দিকে? শ্রমের, জ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ শাখায়?

বাইরের বাধা বড় বড় প্রতিভার ক্ষেত্রে হয় তো অনতিক্রম্য নয়। প্রতিভা তার নিজের তেজে পথ তৈরি করে এগিয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকে

আর্কএঞ্জেল্স্ক-এর পাড়াগাঁয়ের ছেলে লোমনসফ কত বাধা ঠেলে সরিয়ে একদিন পণ্ডিত হিসেবে জগৎজোড়া খ্যাতি আদায় করে নেন। অনগ্রসর রিয়াসান জেলার এক বালক উত্তর কালে সমকালীন বহু শক্তিশালী কবির খ্যাতি ম্লান করে দিয়ে একদিন কবি-সার্বভৌম হলেন। কবি ইয়েসেন সম্পর্কে গর্কি মন্তব্য করেছেন: তিনি মানুষ ছিলেন না—ছিলেন কেবল কবিতারই জন্যে বিশেষভাবে তৈরি একটা অর্গেন বাদ্যযন্ত্র। প্রতিভার ক্ষেত্রে স্বধর্ম বা আপন বৃত্তির শক্তি এমন অদম্য, অপরাজেয় হতে পারে।

কিন্তু মানুষের অগ্রগমনের পথ কেবল প্রতিভাবান লোকেরাই তৈরি করে দেন এ-কথা ঠিক নয়। অগ্রগতির পথ রচনায় অসংখ্য সাধারণ মানুষেরও প্রভূত দানঅবদান থাকে। অধিকাংশ মানুষেরই জীবন-কাহিনী লেখে তাদের কাল, সেই কালের সমাজ-ব্যবস্থা, সেই যুগের দাবি—এক কথায়, বহিস্থ শক্তি, আভ্যন্তরীণ শক্তি নয়। এই বাইরের "কণ্ঠস্বরই" বহু ক্ষেত্রে মানুষের সৃজনী শক্তির প্রকাশে-বিকাশে তার নিজের চেয়েও অধিকতর ও সঠিকতর নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।...

দেখা গেছে বড় বড় পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেকে রম্য রচনার ভক্ত। এঁদের মধ্যে অনেকের আবার এমন ধারণাও আছে যে, "বাইরের শক্তিগুলি" তাঁদের ভিন্ন পথে স্থাপন না করলে তাঁরা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের সেবক হতে পারতেন।

আমাদের ইঞ্জিনীয়ার পলেতায়েফ কবি ও কবিতা সম্পর্কে অমন উগ্রভাবে বিরূপ হলে কী হবে, স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইন কাব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সব চেয়ে বেশি। আইনস্টাইনের সহকর্মী এ. মশকোভস্কি লিখেছেন:

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। অত বড় একজন বিজ্ঞানী কিনা বললেন: বিজ্ঞানকে তিনি সব চেয়ে বড় আনন্দের উৎস বলে মনে করেন না।

"আইনস্টাইন স্পষ্টই বললেন: ব্যক্তিগতভাবে আমি শিল্প-সাহিত্য থেকেই বেশি আনন্দ পাই। সব চেয়ে বেশি আত্মিক পরিতৃপ্তি পাই শিল্প-সাহিত্যেই, আর কোনো ক্ষেত্রে নয়।...বর্তমানে আমি কাব্য নিয়েই বেশি মাথা ঘামাচ্ছি।

"সাধারণভাবে কাব্য, না বিশেষ কোনো কবির কবিতা ?"

"সামগ্রিক কাব্যের কথাই ভাবছি। এখন আমায় সব চেয়ে কে বেশি আকর্ষণ করছেন এ প্রশ্ন যদি করেন, তবে বলব : দস্তয়েভ্স্কি।"

"তিনি বার বার দস্তয়েভ্স্কির নামোচ্চারণ করলেন। আমাকে আপত্তি জানাবার সুযোগও দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই জানালেন : দস্তয়েভ্স্কির কাছ থেকে আমি যা পাই অতখানি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোনো মনীষীর কাছ থেকেই পাই নি।"

আইনস্টাইন আর মশকোভস্কি এ দুজনেই বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন যে, দস্তয়েভ্স্কি কেবল "দি ডাব্ল" আর "ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশ্মেণ্ট" গ্রন্থের লেখকই ছিলেন না, তিনি একজন মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারও ছিলেন—ছিলেন বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রের একজন ছাত্র।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মন জ্ঞানের উৎস হিসাবে জীবন ও জগতের আবেগগত ও সৌন্দর্যানুভূতিগত অভিজ্ঞাকে আদৌ অস্বীকার করে না। আইনস্টাইনও করেন নি। দার্শনিক কাণ্টের এই বিখ্যাত সূত্র তিনি মানেন নি : "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের পরিমাণ সেই ক্ষেত্রের গাণিতিক পরিমাণের সমান।" গ্যালিলিওর এই উক্তির সঙ্গেও তিনি একমত নন যে, "প্রকৃতির গ্রন্থ আমাদের সামনে উন্মুক্ত। এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে বর্ণমালার অক্ষরগুলি দিয়ে নয়—লেখা হয়েছে ত্রিভুজ, আয়ত ক্ষেত্র, বৃত্ত ইত্যাদি জ্যামিতিক অক্ষরের দ্বারা।" কথাগুলি শুনতে বেশ, কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি সায় দেয় না।

মানুষ আজ চাঁদের অপর পিঠের আলোকচিত্র তুলে এনেছে। মহাকাশের কাছ থেকে একটা রহস্যের যবনিকা ছিঁড়ে ছিনিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে প্রকৃতি-জয়ের অভিযানের অভূত অগ্রগতির কল্যাণে। এ কথা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান, প্রথমত ও প্রধানত পদার্থবিজ্ঞান আর গণিত, আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের মন টানছে একটা বিরাট চুম্বকের মতো। এ নিয়ে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। দোষ যদি কোথাও থাকে তো তা রয়েছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে, বিজ্ঞানেরই অগ্রগতি সাধনের মধ্যে। আজ মুখ্য বিপ্লব চলছে সামাজিক ক্ষেত্রে, উৎপাদনগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চলেছে আর একটি বিপ্লব।

ভাবীকালের বিজ্ঞান সম্পর্কে একজন পণ্ডিতের ভাষায় বলা যায় : "মানুষের জয়যাত্রার পথে যথার্থ বাস্তব জ্ঞান যখন তার কাছে সর্বময় হয়ে উঠবে,

সেই দিন ভবিষ্যৎ তার সমস্ত সৌন্দর্য-সম্ভার নিয়ে ধরা দেবে মানবকল্যাণময়ী বিজ্ঞান লক্ষ্মীর কাছে। তখন বিজ্ঞানও ফিরে আসবে মানুষের কাছে, তার সৃজনাত্মক অনুভূতির কাছে। তখন সেই নতুন জগতের প্রবেশদ্বারে বিজ্ঞানের দানঅবদানগুলি সত্যই মহিমময় হয়ে উঠবে। সেদিন মানবিক সত্তা রূপান্তরিত হবে বৈজ্ঞানিক সত্তায়।"

এইভাবে, প্রতিটি চিন্তাক্ষম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে বৈজ্ঞানিক মানুষ, হবে এক চিন্তাশীল মানুষ। কবিরা এই রূপান্তরের কাজ ত্বরান্বিত করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানের নতুন সঙ্গীত নতুন সৌন্দর্যের অন্তরলোকে পাঠক সমাজের প্রবেশের ছাড়পত্র কবিদেরই হাতে। বিজ্ঞানের এই মহিমা, এই সৌন্দর্য এখনো অনেকেরই কাছে রহস্য হয়ে আছে। সেই রহস্যলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন কবি।...

মানব সমাজ এখন নব নব বিস্ময়কর আবিষ্কারের দ্বারদেশে। বিজ্ঞান আমাদের হাতে এনে দেবে জৈব ও অজৈব বস্তুর অভ্যন্তরস্থিত প্রক্রিয়ার সহিত নিবিড় পরিচয়ের স্বচ্ছ চশমা। কবি ও দার্শনিককে কিন্তু স্বধর্মচ্যুত হলে চলবে না। ঐ জয়যাত্রার মিছিল যেন তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়।...

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক বিষয়। এই দুই শাস্ত্র নিজেরা যদিও কোনো ভোজবাজির প্রতিশ্রুতি কখনো দেয় না, তবু তাদের কাছে থেকে আমরা কত বিস্ময়কর জিনিস পেয়েছি। প্রকৃতি জয়ের ক্ষেত্রে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান যেন "চিচিং ফাঁক" বা গুপ্তদ্বার খোলার মন্ত্র, মহাশূন্যে অনুপ্রবেশেরও চাবিকাঠি বিজ্ঞানের এ দুইটি শাখার হাতে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রতি মানুষের মোহ স্বাভাবিকও বটে, সঙ্গতও বটে।

কিন্তু গণিতের সূক্ষ্ম প্রতীকচিহ্নগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে, প্রকৃতি-বিজয়ে তার অপরিসীম দানঅবদানের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আমরা যদি আমাদের জগতটাকে কেবল ডিফারেন্শিয়াল্ ক্যালকুলাস্ ও ইন্টিগ্রাল্ ক্যালকুলাসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে রাখি তা হলে আমরা মস্ত বড় ভুল করব। তা হলে দর্শন, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র ও শিল্পকলার কী দশা দাঁড়াবে? সাম্যবাদ আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, সবই চাই—মানুষের মধ্যে যা কিছু মানবিক তারই পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ চাই। এই কারণেই পলেতায়েফ ও তাঁর সমর্থকদের উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ইলিয়া এরেনবুর্গের হাতে হাত মেলাতে আমার আপত্তি নেই।

সভ্যতার একপেশে বা বিষম বিকাশের ফলে আমাদের এই যুগ মানুষের মনের পরদায় ভারসাম্যের অভাবের একটা ছায়া ফেলতে পারে এবং ফেলেও। আবার এই যুগেরই জোর দাবি: আমাদের লক্ষ্য হতে হবে এক সুস্বর সমন্বয়, এক সুসমঞ্জস ঐকতান। অধিকাংশ মানুষকেই, এমন কি যাঁরা গাণিতিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে মেতে আছেন তাঁদেরও, তাকাতে হয় গোটা মানুষের দিকে—মানুষের ভগ্নাংশের দিকে নয়। রাজনীতি, চন্দ্রলোক, সঙ্গীত, বসন্তের কোকিল, সূর্যাস্তের সোনালী সমারোহ, প্রেমবিহ্বল চোখের চাওয়ার অগাধ মাধুর্য—এ সবই অধিকাংশ মানুষের কাছে দু'য়ে দু'য়ে চার এই সূত্রের চেয়ে ঢের বড় গাণিতিক প্রমাণের কবিত্ব বা সৌন্দর্যের চেয়ে ঢের বেশি রমণীয়, বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের অবদানও অধিকাংশ মানুষের কাছে রমণীয়, বাঞ্ছনীয় হতে পারে। সেই সম্ভাবনার যুগ আমাদের সামনে। চাঁদের বুকে গিয়ে পৌচেছে সোভিয়েত দেশের প্রতীকচিহ্নিত ফলক। মানুষের প্রতিভা কত অজানাকে জানছে, কত অচেনাকে চিনছে। ফলে জন্ম নিচ্ছে এক নূতন সৌন্দর্যশাস্ত্র, নূতন কান্তিবিদ্যা।

এইখানেই কবির ডাক পড়বে। কবিকে কেবল তাঁর চিরাচরিত কল্পনা আর সঞ্চার আশ্রয় নিলেই চলবে না। চাই নতুন দৃষ্টি, নতুন সম্বল। গণিত আর কাব্য আছে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে। জ্ঞান ও বোধের এই উভয় ক্ষেত্রকেই পরস্পরের কাছ থেকে নতুন আদবকায়দা শিখতে হবে, নিতে হবে নতুন ভাববস্তু।

এরেনবুর্গ ঠিকই বলেছেন। কবিতার মৃত্যু হবে এমন ভয় নেই। অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি এবং ঐক্য ও অনৈক্যের এমন সব সূক্ষ্ম দিক, সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা প্রবন্ধে বা উপন্যাসে ঠিক মতো প্রকাশ করা যায় না। তা প্রকাশ করা যায় কেবল কাব্যেই। কবি ও মনীষী গ্যেটেও এই রকম অভিমতই ব্যক্ত করে গেছেন।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

The First Indian War of Independence 1857-1959 by K. Marx and F. Engels. Foreign Languages Publishing House, Moscow. প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। এক টাকা দু আনা॥

সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তন করে গেছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল, তার সংহারমূর্তি, "অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের যন্ত্ররূপে" তার বিপ্লবী ভূমিকা, ভারতকে "পুনরুৎপাদক দেশে" রূপান্তরিত করবার আয়োজন, আধুনিক শিল্পের প্রকৃত অগ্রদূত হিসাবে রেলপথের ভূমিকা, ভূমি-ব্যবস্থার স্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে নূতন আলোকসম্পাত এবং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন মার্কসই করেছেন। পরিণত বয়সে রচিত (এবং তাঁর মৃত্যুর পরে এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত) ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে ভারতের অর্থনীতি প্রসঙ্গে মার্কস যে মূলসূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার যথার্থতা এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফলে স্বীকৃত। দীর্ঘকাল ভারত প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাবলী অপ্রকাশিত এবং অবজ্ঞাত ছিল। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অনুসন্ধিৎসুরা (বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও যাঁরা মার্কস-কে অচ্ছুৎ এবং অপাঙক্তেয় মনে করেন তাঁরা ছাড়া) ক্রমশ এই রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের ভারত সম্পর্কিত রচনাবলী প্রকাশের প্রধান কৃতিত্ব মস্কোর "ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস"-এর প্রাপ্য। আলোচ্য পুস্তিকাটি এঁরাই প্রকাশ করেছেন।

১৮৪৮ সনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পরে মার্কস ও এঙ্গেলস তৎকালীন নির্বাসিত বিপ্লবীদের চক্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং কালিফোর্নিয়ায় ইউরোপীয় পুঁজিবাদের নূতন প্রসারের তাৎপর্য

অনুধাবনের গবেষণায় নিবিষ্ট হন। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্ন উত্থাপিত হবার সময় নিউ ইয়র্কের "ডেইলী ট্রিবিউন" পত্রিকায় মার্কস ধারাবাহিক ভাবে ভারত সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধাবলী রচনা করতে থাকেন। চার বৎসর পরে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সুরু হলে, প্রধানতঃ সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মার্কস বিদ্রোহের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলে। সামরিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এঙ্গেলস সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে "ভারতে ব্রিটিশ ফৌজ", "লক্ষ্ণৌর পতন" প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। ঐতিহাসিক ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটনে মার্কস-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর সম্ভবত "The class struggles in France, 1848-50" (১৮৫০ সনে প্রকাশিত) এবং "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparti" (১৮৫১-৫২ সনে প্রকাশিত)। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রবন্ধমালা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস মহাবিদ্রোহের আলোচনা করেছেন। বিদ্রোহের বহু ও বিচিত্র ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের দখল এবং বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি শত বর্ষ পরেও অনুসন্ধিৎসুদের অনুপ্রাণিত করবে।

মহাবিদ্রোহ সুরু হবার কিছু পরে, ১৮৫৭ সনের ৩০শে জুন, মার্কস বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"There had been mutinies in the Indian army, but the present revolt is distinguished by characteristic and fatal features. It is the first time that Sepoy regiments have murdered their European officers; that Mussalmans and Hindus, renouncing their mutual antipathies, have combined against their common masters; that "disturbances beginning with the Hindus, have actually ended in placing on the throne of Delhi a Mohammedan Emperor"; that the mutiny has not been confined to a few localities." (পৃঃ ৪০)।

৩১শে জুলাই তিনি লিখলেন :

"By and by there will ooze out other facts able to convince even John Bull himself that what he considers a military is in truth a national revolt." (পৃঃ ৫৬)

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের দ্রুত প্রসারে লণ্ডনে ভীতি, স্টক এক্সচেঞ্জ-এর গতি, ব্রিটিশ পত্রিকায় বিদ্রোহ দমনে ছোটখাট সাফল্যের অতিরঞ্জন, ব্রিটিশ সৈনিকদের বর্বরতা এবং লুটতরাজ, বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত ব্রিটিশ অফিসার এবং সৈনিকের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদ্রোহের শেষ দৃশ্যে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ ("bitter dissensions among rebels") বিদ্রোহীদের ভ্রান্ত সামরিক কৌশল প্রভৃতির বর্ণনায় মার্কসের ঐতিহাসিক ঘটনার উপর দখল এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রকাশিত। সিপাহীদের "বর্বরতা" এবং "হত্যাকাণ্ড" সম্পর্কে ইউরোপের সংবাদপত্র জগৎ যখন সংশয়হীন, মার্কস তখন লিখেছিলেন ঃ

"However infamous the conduct of the sepoys, it is only the reflex in a concentrated form, of England's own conduct in India.···There is something in human history like retribution." (পৃঃ ৯১)

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সাভারকর ছাড়া ভারতের প্রবীণ এবং "নিরপেক্ষ" ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে বিদ্রোহী সিপাহীদের কার্যকলাপের মূল্যায়নে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের একপেশে বক্তব্য হৃদয়হীনভাবে সমর্থন করেছেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের স্কুল-কলেজ পাঠ্য বইগুলির কথা অনেকের মনে পড়বে। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ ফৌজদের নৃশংসতা সম্পর্কে মার্কস কিন্তু তিতিক্ষার মনোভাব দেখাতে পারেন নি। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত না হলে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ-এ ব্রিটিশ ফৌজের লুটতরাজ, গৃহদাহ, পাশবিক অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নীরব থাকা সম্ভব নয়।

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে এঙ্গেলসের ছয়টি প্রবন্ধ এই সংকলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। প্রধানত সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধগুলি রচিত। যতদূর জানি এঙ্গেলসের প্রবন্ধমালার প্রকাশ এই প্রথম। লক্ষ্ণৌ-র পতনের পরে বিদ্রোহীদের গঙ্গা অতিক্রম করে দোয়াব অঞ্চলে প্রবেশ, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করবার প্রয়াস, জগদীশপুরে গভীর অরণ্যে অমর সিংহের গেরিলা যুদ্ধ, কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে অচল করে দেবার আয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য এঙ্গেলসের লেখায় পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে মার্কসের কয়েকটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের

ছাত্ররা "British Incomes in India," "Lord Canning's Proclamation and Land Tenure in India", "Taxes in India"—এই প্রবন্ধগুলি থেকে নতুন আলোক ও তথ্য পাবেন। মহাবিদ্রোহের অর্থনৈতিক পটভূমি বুঝতেও এই প্রবন্ধগুলি সাহায্য করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের প্রবন্ধাবলীর মূল্য শত বর্ষ পরেও অম্লান আছে। দুঃখের কথা অনেক পণ্ডিত এই প্রবন্ধগুলি আদৌ পড়েন নি।

সুনীল সেন

ভ্রম সংশোধন

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রবন্ধ পত্রিকা'র সমালোচনায় দুটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। ১০৫৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারার প্রথম পংক্তিটির শুদ্ধপাঠ হবে: তাছাড়া, প্রথম প্রকাশকাল থেকে নিছক প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা সম্ভবত এই প্রথম।

একই প্যারার শেষ পংক্তির শুদ্ধ পাঠ হবে: কিন্তু নিজের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চায় তিনি স্বয়ং যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন না বলেই হয়তো তাঁর উত্তরসূরীরা প্রধানত গল্প-উপন্যাস লিখেই সন্তুষ্ট রইলেন।

'দুস্তর মরু' গ্রন্থটির সমালোচনায় একটি মুদ্রণ প্রমাদ আছে। ১০৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সমালোচনাটির দ্বিতীয় প্যারার শেষ পংক্তির শুদ্ধপাঠ হবে: সভ্যতার আদিপীঠভূমি সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির বাঁও কষাকষিতে বিষাক্ত হয়ে উঠল।

পুস্তক পরিচয়

আমেরিকায় শিশিরকুমার ॥ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। পরিবেষক : বুক এণ্ড বুক। পাঁচ টাকা ॥

বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম নানাবিধ তাৎপর্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 'সীতা'র নাট্যকার হিসেবে তিনি শিশিরকুমারকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। অভিনয়ে যদিও তিনি ভাদুড়ী মহাশয়ের শিষ্য, তবু তাঁর নিজস্বতা শম্ভু মিত্রকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে, 'বাংলাদেশের নতুন অভিনয়-পদ্ধতির তিনিই প্রথম প্রবর্তক-পিতা' ··। নাট্যশিক্ষক হিসেবেই বা তাঁকে কে অস্বীকার করবে?

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঐতিহাসিক। ভাদুড়ী মহাশয়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় নাট্যসম্প্রদায়ের আমেরিকা গমন এবং সেখানে সতু সেনের ত্রাণকর্তারূপে আকস্মিক আবির্ভাব পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগাভিনয়ের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে। সম্প্রতি যখন নাটক-অভিনয় ও প্রয়োগশিল্পের চর্চায় বাংলাদেশে নাট্যবিষয়ক নবজাগৃতির সূচনা দেখা দিয়েছে, তখন আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলা চলে।

১৯৩০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, ভাদুড়ী মহাশয় পরিচালিত 'নাট্যমন্দির-লিমিটেড-থিয়েটার'-এর এগারোজন অভিনেতা নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে খিদিরপুর বন্দর ত্যাগ করেন। এই দলে কোনো অভিনেত্রী এবং স্বয়ং ভাদুড়ী মহাশয় ছিলেন না। তাঁরা অন্য দলে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে জাহাজে নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে মাস দেড়েক সময় লাগত। আমাদের দুর্ভাগ্য শিশিরবাবুর কোনো সঙ্গী যোগেশচন্দ্রের মতো জাহাজের ডায়েরী রাখেন নি। চৌধুরী মহাশয়ের দলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি ছিলেন।

১৯৩০ সাল ভারতবর্ষের জীবনে এক স্মরণীয় সময়। একদিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, অন্যদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ভ্রমণরত। পাশ্চাত্ত্যের কাছে ভারতবর্ষ ক্রমশ এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে নিজের আসন করে নিচ্ছে।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ডায়েরীতে এই সময়ের এক সুন্দর চেহারা পাই। দেখতে পাই তাঁর প্রবল জাতীয়তাবোধ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা, দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, নতুন নাট্যআন্দোলন—তথা জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্গঠন এবং পাশ্চাত্ত্যের কাছে আপন স্বরূপ উদ্ঘাটনের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও পুব-পশ্চিম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের মহৎ ব্রত। ভাদুড়ী মহাশয় ও 'নাট্যমন্দির-থিয়েটার-লিমিটেড'-এর আমেরিকা গমনের পরিপ্রেক্ষিত যোগেশচন্দ্রের মানসিকতার এই প্রতিফলনেই স্বতঃপ্রকাশিত।

সেই তিরিশ সালেই আমেরিকা তাঁদের মোহভঙ্গ করেছিল। তার প্রমাণ চৌধুরী মহাশয়ের ডায়েরীর দ্বিতীয়ার্ধ। এই দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের মনে কি নির্মম তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তারও পরিচয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর এ যাবৎ অপ্রকাশিত ও অনভিনীত নাটিকা 'মার্কিনীমার'। নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার পথে এই তীব্র ব্যঙ্গ নাটিকাটি তিনি জাহাজেই রচনা করেছিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের রোজনামচার সঙ্গে নাটিকাটি প্রকাশ করে অরুণ চৌধুরী ও অশোক পালিত একাধারে গবেষকের নিষ্ঠা ও রসিকের সৎ রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

নিউ ইয়র্কে ভাদুড়ী মহাশয়ের দল যে লাঞ্ছনা, অনির্দেশ্যতা ও অর্থবিপাকে পড়েছিলেন—সেই অভিজ্ঞতা, তথা দেশের পরাধীনতার গ্লানি ও মার্কিনী সভ্যতার ক্লেদ—দুইই এই নাটকে তীব্রভাবে পরিস্ফুট। নাটিকাটি এ যাবৎ অপ্রকাশিত ও অনভিনীত থাকার কারণ আমাদের কাছে রহস্যের সৃষ্টি করেছে। সৌভাগ্যবশত চৌধুরী মহাশয় এটি ৩০ সালেই লিখেছিলেন এবং তিনি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিলেন না। স্মরণীয় যে, একই কালে রবীন্দ্রনাথও আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মর্মান্তিক প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিলেন।

রোজনামচায় যোগেশচন্দ্রের ব্যক্তিমনের বিশেষ অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই রসিক নাট্যপুরুষের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয়

আমরা ইতিপূর্বে পাই নি। প্রসঙ্গত তাঁর দলের এবং আমেরিকার বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং সতু সেন মহাশয়ের আবির্ভাব, নানাবিধ বিপাকের মধ্যে শিশিরবাবুর নায়কোচিত দার্ঢ্য রোজনামচার দ্বিতীয়ার্ধকে সমৃদ্ধ করেছে।

রোজনামচার নায়ক যোগেশচন্দ্র স্বয়ং। তা সঙ্গতও হয়েছে। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না 'মার্কিনীমার' নাটিকার নায়ক শিশিরবাবু। এইখানে তিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও নাট্যরসিকের ভূমিকা পালন করেছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য শিশিরবাবুর মতো বাংলা নাট্যজগতের এক যুগান্তকারী পুরুষ সম্পর্কে বহু তথ্যই বিনষ্ট হয়েছে। সচেতনভাবে তা সংগ্রহ করে রাখার ব্যাপক চেষ্টাও কোনোদিন দেখা যায় নি। হেমেন্দ্র রায় ও হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত মহোদয়ের গ্রন্থে ঐতিহাসিক আমেরিকাবাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আশানুরূপ তথ্য নেই। সেইদিক দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি শিশিরবাবুর অনুরাগী ও এতৎ-বিষয়ক গবেষকদের নানাভাবে সাহায্য করবে।

সুতরাং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমারকে এক বিশেষ পর্যায়ে বোঝার পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। মনে রাখা দরকার, আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শিশিরবাবু বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পূর্ণ-ভাবে পালন করেন। সুতরাং বিদেশ-ভ্রমণ, বিদেশী নাটক অভিনয় ও প্রয়োগকৌশল নিশ্চয়ই ভাদুড়ী মহাশয়কে প্রভাবিত করে থাকবে। চৌধুরী মহাশয় তাঁর ডায়েরীতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত না করলেও বাংলা নাট্যজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে এই আমেরিকাগমন এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সম্পাদকদ্বয়ের লেখা গ্রন্থপরিচিতিটি সুলিখিত। পরিশিষ্টে যোগেশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থতালিকা এবং যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে বাংলাদেশের সাহিত্য ও নাট্যজগতের কতিপয় বিশিষ্ট পুরুষের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এবং সর্বোপরি আমেরিকায় 'সীতা' অভিনয় সন্দর্শন করে সেই ৩০ সালে তদ্দেশীয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনার পুনর্মুদ্রণ এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়েছে। সম্পাদকদ্বয় সত্যই বইটির সম্পাদনায় গভীর নিষ্ঠা ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখোমুখি ॥ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তক প্রকাশক। আড়াই টাকা ॥

এখানি শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম গল্পগ্রন্থ। মোট ছটি গল্প আছে, কিন্তু মুখোমুখি নামে কোনো গল্প নেই। অর্থাৎ মুখোমুখি শব্দটা এই গল্পগুলির থীমের পরিচয় দিচ্ছে। বই শুরু হবার আগে চার লাইনে লেখক বলেছেন, "আজকের এই জীবনের মুখোমুখি হচ্ছে, জীবনের মোকাবিলা করছে, জীবনের হাতে মার খাচ্ছে এমনই কয়েকটি যুবক-যুবতীর কাহিনী।"—এ মুখবন্ধটুকু সত্য নয়—জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ানো কঠিন। আমাদের মতো যাঁরা সীমা-খণ্ডিত মানুষ—তাঁরা জীবনযাত্রায় খোঁড়া পায়ে চলছে, কখনও বা অকেজো সৈনিকের মতো পিছনে পড়ে থাকছে। হয়তো জীবিকা কিংবা জীবন-ধারণের নানা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে—কিন্তু শান্তিরঞ্জনবাবু, আমরা অনেকেই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি নি, এ গল্পগুলির যুবক-যুবতীরাও পারে নি। পারে না। আসলে, জীবনযাপনের সমস্যার মুখোমুখি এরা দাঁড়াতে চেয়েছে।

মুখোমুখি দাঁড়াবার পর, প্রতিরোধ। এবং কি সেই প্রতিরোধের ফলাফল? শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, 'জীবনের হাতে মার খাচ্ছে।' অর্থাৎ অস্তিত্বের সমস্যায় বিষমভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছে। এ কথা সত্য, নিষ্ঠুর হলেও সত্য। আজকের পৃথিবীতে তৃপ্তি কিংবা মুগ্ধতা দুষ্প্রাপ্য। প্রেম, প্রীতি, নীতি, বন্ধুত্ব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি ক্রমশ এলোমেলো এবং বেসুরো হতে শুরু করেছে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইটাই বিষয়, এবং অত্যন্ত বড় বিষয় নিয়েই তিনি গল্প লিখতে শুরু করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখতেন তিনিও সেই ধারারই মানিকবাবুর পরবর্তী লেখকদের অন্যতম। কিন্তু মানিকবাবুর ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর কিছুটা প্রভেদ আছে—সেকথা পরে বলছি।

শান্তিরঞ্জনবাবুর গল্পের গঠন অত্যন্ত নিখুঁত। কোথাও তুচ্ছ ভাবালুতার নামগন্ধ নেই, ভাষা আবেগবর্জিত কিন্তু ঋজু, স্পষ্ট। লেখকের চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। গল্পগুলি হঠাৎ আরম্ভ হচ্ছে মাঝখান থেকে, ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে, আস্তে আস্তে বিষয়ের নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা পাঠকের শ্বাসনালী চেপে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করছে। শুধু তাঁর এইটুকু মাত্র দুর্বলতা আছে যে, তাঁর

এখনও ধারণা নিচুশ্রেণীর লোক—কুলি-মজুর, ফিরিওয়ালা-পকেটমার—এরাই শুধু নির্ভেজাল, সৎ আর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মাত্রই কুচক্রী-বদমাস। এ জন্যই তিনি মন্তব্য করেছেন, "কারণ এই পাঁচ বছর যাদের সঙ্গে ও থাকবে তারা ক্রিমিনাল হলেও নির্ভেজাল মানুষ। তারা আর যাই করুক ভাই হয়ে বোনের সর্বনাশ করে না! বন্ধু সেজে বন্ধুর!"—না, একথা ঠিক নয়। যেখানে লেখকের বিষয়বস্তু জীবন এবং মানুষ—সেখানে এ সব মন্তব্য একটু অকিঞ্চিৎকর।

এই বইয়ের প্রত্যেকটি গল্প নিটোল, নিখুঁত—প্রতিটি গল্পের পটভূমিকায় ভয়ঙ্কর সর্বনাশ টাঙানো। গল্পের চরিত্রগুলিও পূর্ব পরিচিত মনে হয়—কারণ এদেরই আত্মীয়স্বজন মানিকবাবুর গল্প-উপন্যাসে আছে। কিন্তু এ গল্পগুলি মোটেই মানিকবাবুর তুল্য হতে পারল না, তার কারণ, শান্তিরঞ্জনবাবুর নিষ্ঠুরতার প্রতি একটা অকারণ প্রবণতা আছে। তিনি স্বেচ্ছায় এদের ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর-তরতে নিয়ে গেছেন। মানিকবাবু নির্লিপ্ত, তাঁর নায়ক-নায়িকা আঘাতে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে—তবু বেঁচে থাকা যে কত রমনীয় মানিকবাবু তা কখনও ভুলতে দেন নি।

কিন্তু শান্তিরঞ্জনবাবু শুধু রামনিধিকে মারেন নি, যতীন দত্তকে তন্মুহূর্তে চোর বানিয়েছেন, 'মা' গল্পে একটি অসাধারণ করুণ বিষয়কে বারবার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, শচীবিলাসকে কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে দিলেন না তিনি। শান্তিবাবু মানুষকে বেঁচে থাকতে দিন, দুর্বল হোক তবু মেরুদণ্ড সোজা রাখতে দিন, বেদনার পাশে সম্ভাবনা মুখ গুঁজে শুয়ে থাকুক।

আমি আশাবাদের স্থূল প্রচারক নই। কিন্তু নির্মম দুঃখকষ্টের হুবহু চিত্র তুলে ধরার চেয়ে কেন এই দুঃখ—সেই দিকে গল্পের মুখ ফেরাতে বলি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকিত সমন্বয় ॥ আলোক সরকার। মিত্রালয়। দু টাকা ॥

পঞ্চাশের তরুণ কবিদের মধ্যে ইতিমধ্যেই যাঁরা স্বকীয় মর্যাদায় যশস্বী হয়েছেন, কবি আলোক সরকার তাঁদের অন্যতম। 'আলোকিত সমন্বয়' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'উতল নির্জন'-এর প্রায় এক দশক পরে প্রকাশিত হল।

যখন পঞ্চাশের যুগের অনেক কবিকে ঠিক একই রকম কবিতা লিখতে দেখা যায়, তখন অনুত্তর-তিরিশ এই কবির কণ্ঠস্বর, ছন্দ ও শব্দ চয়নের স্বকীয়তা, এবং তৎসহ নিজের একটি কাব্যজগৎ নির্মাণ করার মতো মৌলিকতা লক্ষণীয়। কখনও কখনও অধিক রক্তক্ষরণে আহত, পাণ্ডুর কবিহৃদয়ের রক্তহীন বেদনার প্রকাশ তাঁর কবিতায় দেখা গেলেও, মৌলিক অর্থে কবি আলোক সরকার প্রেম, স্মৃতি, নিসর্গ ও মিষ্টিক-ধর্মী কবি। কিন্তু প্রতি পঙক্তি উচ্চারণের মধ্যে শিশুর কণ্ঠস্বর শোনবার মতো বিস্ময়কর অনুভব পাঠক পাবেন। বর্তমান-বিখ্যাত বহু চিত্রীর মধ্যে যেমন শিশুর চোখ দিয়ে জগতের রহস্যময়তার আদিম বিস্ময়ে ফেরবার প্রবণতা ও তপশ্চর্যা দেখা গেছে, আমাদের বাংলাদেশে কবিতা রচনার জগতে অনুরূপ প্রচেষ্টা (ও সাফল্য) লক্ষ্য করা গেল। 'বিশেষণ'কে বিশেষ্য গড়ে নেবার মৌলিক চেষ্টাও সেই দৃষ্টিকোণের পরীক্ষানিমিত ফলশ্রুতি। তবু একটি কাব্যগ্রন্থে প্রায় একই ছন্দের ও একই পরিমণ্ডলজাত কবিতা সাজানোর বিশিষ্টতা হয়তো বহু পাঠকের ক্ষেত্রে একঘেয়েমির অভিজ্ঞতা আনতে পারে। তবু এরকম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে, বাজারের দিকে চোখ রাখা, কিংবা কবি কাব্যরচনায় কত চতুর তা দেখানো যখন প্রায় বহু কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের চটকদারী নৈপুণ্য, তখন একজন তরুণ বিশিষ্ট কবির আড়ম্বরবিহীন প্রচ্ছদপটের নিরাভরণ সুদূরত্ব ও একাকীত্ব, একই মানসিক পরিমণ্ডলের রূপচিত্র, কবিকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। কবির স্পন্দিত হৃদয় স্পর্শ করার মতো মাদকতা মনে সঞ্চারিত হয়।

তবুও কবিতা আলোচনার বেলায় বহু প্রশ্ন বাকি থেকে যায়, সমবয়সী কোনও কবির সম্পর্কে আলোচনা করারও বহু অসুবিধা থাকে। বস্তুত সমকালীন বাংলাদেশে জন্মে ও বেঁচে থাকা সত্ত্বেও কবি আলোক সরকারের কাব্য ও বক্তব্য, প্রশ্ন ও আনন্দ-বেদনা বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সম্ভব নয়। এ নিয়ে ব্যক্তিগত বহু প্রশ্ন তোলা সম্ভব। আমার কাছে বিশ শতকের দেশবিদেশে মানবমুক্তিসংগ্রাম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যথার্থ মানবিকতার বিকাশ শ্রেণী শোষণহীন সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। সাহিত্য, শিল্প ও মানসিক নক্সার নানা অভিক্ষেপময় সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষ দেশে উৎপাদন সম্পর্কের বিভিন্ন সংঘাত-প্রতিসংঘাতে নির্মিত হয়। একটি বিশেষ সময়ে কবির জীবনে পরিবেশ বা পরিমণ্ডল লালনকার্যে নিসর্গচিত্রই

একমাত্র আশ্রয় নয়। অনাহার, অবিচার, দুর্নীতির লীলাক্ষেত্র স্বদেশের দুঃখজয়ী মানুষের জীবনযাপনের যুদ্ধে নিত্য প্রতিসংঘর্ষে রণক্ষেত্রে তাদের পাশে দাঁড়ানো আধুনিক কবির মানবিকতার শ্রেষ্ঠনিদর্শন। মানবধর্মে যেহেতু কবির দীক্ষা হয়, তাই কবির সমাজের দিকে সহজ চোখে তাকানো নিতান্ত প্রয়োজন। সামাজিক পরিমণ্ডল ও নিসর্গ পরিমণ্ডল মৌলিক মূল্যে পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। তবুও বর্তমান বাংলাদেশের বিধ্বস্ত হতাশায় যখন বহু কবিই প্রায় 'অযৌক্তিকতাবাদী', তখন নিসর্গও শৈশবের স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া এই কবির কবিতা পড়ে তৃপ্ত হওয়া চলে। বেদনাতুর শিশুর চোখে দেখার জগৎ, যেখানে বিকৃতি, সমাজের দুঃখবেদনা পৌঁছয় না, সেই জগতে কখনও কখনও চোখের সামনে এমন অদৃষ্টপূর্ব রহস্যময়তার সমারোহ ধরা পড়ে যে, মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। একই কথা, শব্দ ও কণ্ঠস্বরের পৌনঃপুনিকতা ক্লান্ত করলেও চমকে উঠে আত্মস্থ হয়ে যাই যখন তাঁর প্রথম কবিতাতেই :

আমি তোমার পাগল বন্ধু আকাশ অন্ধকারে।

এই ধরনের পংক্তি চোখে পড়ে। বহু কবিতাই অনাবশ্যক দীর্ঘ বলে মনে হয়েছে। কখনও কখনও কোনো কোনো কবিতা আদৌ কবিতা কিনা সন্দেহ হয়েছে। আবার বহু কবিতা পাঠ করে দীর্ঘশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে ভেবেছি এই কবির কবিত্ব কত অনাবিল, আশ্চর্য ও অভ্রান্ত।

আলোক সরকারের এই গ্রন্থখানি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর চরিত্র পাওয়া যায় নীচের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাটিতে। পাঠকই বিচার করুন এই স্নিগ্ধ, সুদূর ও একা কবির কণ্ঠস্বর :

মাগো, আমার খেলার পুতুল অনেকদিন হারিয়ে গেছে
সমস্ত ঘর এখন একলার।
উঠোন ভ'রে হাওয়া আসে ভালোবাসবে ব'লে
ওদের মুখ। আমি কী করে আর পাতব সংসার!
এলোমেলো রাঙা-শাড়ি ছড়িয়ে আছে ঘরের মলিন কোণে
কাকে ঘিরে আনবে আমার আকাশ-ভরা দিন ?
সকল আয়োজনই আমি ভাসিয়ে দেবো ধুলোর ম্লান কোলে
একলা তারা করুণ অর্থহীন।

তরুণ সান্যাল

আলোর আকাশ ॥ সুশীলকুমার গুপ্ত। দু টাকা ॥
চালচিত্র ॥ চিত্ত সিংহ। এক টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥
কথা ও ছাই ॥ বিতোষ আচার্য। দু টাকা ॥
কান্নার রং ॥ মহুয়া। দু টাকা ॥
আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন ॥ বি. বিশ্বনাথন। এক টাকা ॥

কবিতা-আন্দোলন বাংলাদেশে দিনের পর দিন বাড়ছে। শুধু নতুন নতুন কবির সংখ্যাই নয়, পাঠকের সংখ্যাও বেশ এক নির্ভরশীল গরিষ্ঠতায় দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের কবিতা এখন ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা আক্রান্ত নয়। শুধু মানসিকতায় নয়, রক্তমাংসের পদচারণার ফলে বিভিন্ন দেশের কাব্য-ভাস্কর্য তার চোখে প্রত্যক্ষ হয়েছে। ইউরোপীয় কবিতা-আন্দোলনের ঢেউ এখন বাংলা কাব্যের দেহে পাওয়া যায়।

"আলোর আকাশ" গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত বাংলা কবিতার পাঠকদের মহলে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। অন্তরঙ্গ শব্দ-ব্যবহার এবং সংগীতধর্মী মেজাজের জন্যে তাঁর কবিতা বেশ স্বাদু হয়ে ওঠে। নিজের অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু পঙক্তি পাঠ করতে ইচ্ছে করে। সুশীলবাবুর কাব্য-বক্তব্য সরল এবং ঋজু। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের কথা, দুর্ভাগা দেশের কথা এবং মানবিক মমতায় গাঢ় হয়ে-ওঠা তাঁর কণ্ঠধ্বনির অখাদ সততা যে কোনো মনকেই স্পর্শ করবে।

বিভিন্ন সময়ের জন্যে বিভিন্ন মেজাজের কবিতা আছে। কিছু কবিতা আবৃত্তির যোগ্য, কিছু কিছু মনে মনে পড়ার জন্যে। দুটোরই প্রয়োজন আছে। দেশকাল এবং জনসাধারণের দিকে চেয়ে এই প্রয়োজন মেটাতে হবে। এ-ছাড়া একথা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে বাংলা-কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরো করা দরকার। প্রবীণ থেকে নবীন, কেউই এ-ভাবনা থেকে বাদ নেই। নবীনদের জন্যে বিশেষ করে আরো স্বাধীনতা, আরো অন্তরঙ্গতার প্রশ্রয় দিতে হবে।

"চালচিত্র" এবং "কথা ও ছাই" গ্রন্থদ্বয়ের কবিগণ এখনো অনুসন্ধান-ব্যাপৃত। ছন্দ, শব্দ এবং বক্তব্যের ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য তাঁরা ব্যস্ত। জায়গায় জায়গায় চমকপ্রদ চিত্রকল্পের ব্যবহার, ছন্দ এবং বিশেষণের তাৎপর্য উপলব্ধিতে উভয়েই মগ্ন। এর মধ্যে চিত্ত সিংহের অটোবায়োগ্রাফি

ধাঁচের কবিতাগ্রন্থ একটু নতুনত্ব আনতে পেরেছে। যদিও "কথা ও ছাই"-এর কবির কিছু কিছু অভিজ্ঞ মানসিকতা কবিতা ছাড়াও এক বিশেষ উপলব্ধি। কবিতা এখানে একটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। তা হল স্বষ্টিমূলক নবীন ভাবনার সংযোজন।

উপরোক্ত তিনজন কবি মূলত রোম্যাণ্টিক। যদিও তাঁদের মধ্যে গভীর উপলব্ধির তারতম্য আছে।

ছন্দোবদ্ধ পদ লিখলেই কবিতা হয় না, এক একটা কবিতা হল এক একটা ভাস্কর্য স্বষ্টির মতো। একটা কবিতা লিখতে অনেক কবিতা-লেখার রক্তাক্ত প্রয়াস করতে হয়। শুধুমাত্র ছন্দ ভাবনার রাসায়নিক সংমিশ্রণেই ফল পাওয়া যায় না। এ-ছাড়া আরো একটা বস্তুর প্রয়োজন, তা হল কাল-চেতনার উপলব্ধি। "কান্নার রং"-এর লেখক সম্পর্কে একটু আশাবাদী হতে চাই।

"আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন" মনে দাগ কাটার মতো কোনো সংকলন-গ্রন্থ হতে পারে নি। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কবিতা-আন্দোলনের কোনো আশাপ্রদ চেহারা অন্তত এই সংকলন-গ্রন্থে উপস্থিত হয় নি। আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক ও অনুবাদকের কাছে সেই আশা করব যাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি কোনো পরিণত সংকলনে হাত দেন।

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা ॥ দিলীপ বসু। পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ। বার আনা ॥

সত্যসন্ধানী মানুষের অগ্রগতির বিজয়কেতন বহন করে যাত্রা শুরু করেছে মানুষের হাতে-গড়া মহাব্যোমযান। পৃথিবীর মহাকর্ষ-জনিত বল (gravitational force)-কে পরাজিত করে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রের আকর্ষণের গণ্ডী অতিক্রম করে সূর্যের উদ্দেশে তার যাত্রা সার্থক। মানুষ স্বপ্ন দেখে গ্রহান্তর অভিযানের, নক্ষত্র জগৎ বিচরণের ; এ দশকের বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর আবিষ্কার রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের সে স্বপ্নকে সার্থক করেছে ; মানুষকে করেছে আরও আশাবাদী। সেই আবিষ্কারের কথা, সেই আশার কথা শ্রীদিলীপ বসু এই পুস্তিকায় ব্যক্ত করেছেন।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হলে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক দেশবাসীরই

দায়িত্ব হবে বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করা। দেশবাসীর মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ ও প্রেরণা জাগানোর উপায়গুলির মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানালোচনা ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা অন্যতম। তাই 'মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা' পুস্তিকার মতো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ একান্তভাবে স্বাগত ও আশাপ্রদ। শ্রীবসু এইজন্য ধন্যবাদার্হ।

এ পুস্তিকায় সংক্ষেপে মহাকাশ অভিযানে দু বছরের প্রগতির ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মহাকাশে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ স্থাপনের প্রক্রিয়াটি বর্ণিত হয়েছে। চন্দ্রলোকে যাত্রা পথে মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান স্টেশন এবং গবেষণাগার নির্মাণ, নূতনভাবে সজ্জিত হয়ে সে স্টেশন থেকে যাত্রার কথা, পথের নানা বিপদের কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবন্ত কুকুর লাইকা বহনকারী দ্বিতীয় স্পুটনিকের বর্ণনা, গ্রহান্তরে এবং নক্ষত্রলোকে ভ্রমণের সম্ভাবনা এবং আনুষঙ্গিক অসুবিধার কথা স্থান পেয়েছে। 'মহাকাশ ভ্রমণের রাজনৈতিক ও আইনগত সমস্যা' অংশটিও সুলিখিত।

আন্তর্জাগতিক ভূপদার্থ বর্ষের প্রয়োজনীয়তা এবং সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের অবদান পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সৌরজগতের নূতন সদস্য কৃত্রিম গ্রহ প্রেরণ, পুস্তিকা প্রকাশনাকালীন মহাকাশ বিজয়কথার সর্বশেষ অধ্যায়। আশা করি, নূতন সংস্করণে পরবর্তী প্রগতির ইতিহাস রচিত হবে।

প্রসঙ্গত লেখক চন্দ্রজয়ের প্রথম মার্কিন প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে সংক্ষেপে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রয়োজনীয় চিত্রাবলীতে পুস্তিকাটি শোভিত। প্রচ্ছদপটে চিত্রকর চেস্‌লি বনস্টেলের আঁকা সম্ভাব্য চন্দ্রলোকগামী ব্যোমযানের চিত্রটি চিত্তাকর্ষক।

পরিশেষে বক্তব্য যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কয়েকটি অবশ্যলক্ষণীয় বিষয়ের প্রথম এবং প্রধান হল পরিভাষা। বাংলায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নিবন্ধ অপ্রচুর, তাই রচয়িতাকে এর শৈশবস্থায় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে বাংলা সাহিত্যের এই শাখার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কিন্তু এ পুস্তিকায় এ ব্যাপারে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। '......উপগ্রহের নিজের গতিবেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল—এই গতিবেগ তার কেন্দ্রাতিগ শক্তি।'—এরূপ উক্তি বিজ্ঞানালোচনা ক্ষেত্রে ভুল বোঝার সৃষ্টি করে। Force-এর অনুবাদে কোথাও কোথাও লেখা হয়েছে—'শক্তি', যা ত্রুটিপূর্ণ। 'পৃথিবীর সঠিক চেহারা নির্ণয়' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—"পৃথিবী বিষুবরেখার কাছে ১৩।১৪ মাইল চওড়া···"—এ কথাটির অর্থ বোঝা গেল না।

আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কবিতার উদ্ধৃতি একস্থানে নিবন্ধের আদর্শ-বিচ্যুতির কারণ হয়েছে বললে অন্যায় হবে না।

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরবার পথে জাহাজে হ্যারি পলিট্-এর মৃত্যু হয়েছে, এ সংবাদে আমরা ভারতবর্ষের লোকেরাও একটি সশ্রদ্ধ বেদনাবোধ করছি।

সাফল্যেরই সম্মান পৃথিবীতে। যে স্বল্প সংখ্যক মানুষ সার্থকতা অপেক্ষা আন্তরিক সাধনা-বলে মানুষের কাছে সম্মানিত হয়েছেন হ্যারি পলিট্ তাঁদের অন্যতম। বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সেক্রেটারি হিসাবেই তাঁর নামের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ দিনের পরিচয়। যুদ্ধান্তে তাঁকে আমরা ভারতবর্ষেও দেখেছি, কলকাতার বিরাট ময়দানে তাঁর অবিস্মরণীয় ভাষণও শুনেছি। কিন্তু বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টি সংখ্যায় ক্ষুদ্র, বিলাতের রাজনীতিতে তার প্রভাবও সামান্য। পলিট্ ও তাঁর সহকর্মীরা সেই গণনায় নিশ্চয়ই সাফল্য-মণ্ডিত। অবশ্য আজকের গণনাকে কালকের অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই হিসাব উল্টে যেতেও পারে। সেই সম্ভাবনা দিয়েই এঁদের পরিমাপ—কালকের জন্যই এঁদের আজকে বাঁচা। এই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় পলিটের বাগ্মিতায় ও আত্মজীবনীতে—দুএর মধ্যেই আন্তরিক আস্থায় দৃপ্ত সহৃদয় শ্রমিক সন্তান সমুজ্জ্বল। মানুষকে ভালোবাসলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেই হয়।

রবীন্দ্রোৎসবের সাহিত্যিক-সংকল্প

অসংখ্য রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জোয়ারের মধ্যে কলকাতায় সকল মতের সাহিত্যিকেরা মিলিত হয়ে মহাবোধি হল-এ শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনের পৌরহিত্যে যে কবিপূজা উদ্‌যাপন করেন তা ছিল গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা। রবীন্দ্র রচনা পাঠে ও আবৃত্তিতে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিবেশনেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর অন্তত প্রধান দিনটি যে উৎসর্গ করা বিধেয়—এ আমাদের সুদৃঢ় মত। সাহিত্যিকরা যে পথ প্রদর্শিত করলেন তা জন-সাধারণকেও গ্রহণ করতে তাঁরা প্রবুদ্ধ করবেন, এই আমাদের কামনা। উদ্যোক্তাদের আমরা তাই অভিনন্দিত করি।

তার অপেক্ষাও বড় অভিনন্দন সেই উদ্যোক্তাদের প্রাপ্য। সেদিনের প্রস্তাবানুযায়ী আহূত সাহিত্যিক পরিষদ সম্প্রতি এক বৈঠকে প্রস্তাব করেছেন যে, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব বাঙলা সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে তাঁরা উদ্‌যাপিত করবেন—(১) কলকাতায় আগামী পঁচিশে বৈশাখের শেষে এক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন করে—সে অধিবেশন হবে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যসেবীদের যুগ্ম অধিবেশন এবং তাতে আন্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্য আলোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট থাকবে; (২) গান, পাঠ, আবৃত্তি ছাড়াও সে সময়ে সাহিত্যিকরাই একটি রবীন্দ্রনাটক অভিনয় করবেন, (৩) এবং রবীন্দ্রস্মরণে একখানি আলোচনা সংকলনও প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারী কার্যক্রমে বাংলাভাষা প্রয়োগের জন্যও তাঁরা দাবী জানান।

এই উদ্দেশ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি পরামর্শ পরিষদ ও একটি কর্মী পরিষদ গঠিত হয়েছে, 'মিত্রালয়' (১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা) তার কার্যালয়; শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই লেখক মণ্ডলীর সম্পাদক। পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্য কর্মীদের এই অনুষ্ঠানের সদস্য হতে পরিষদ আহ্বান জানিয়েছেন।

এই আহ্বানে সকলে সাড়া দেবেন, এই আমাদেরও প্রার্থনা। আর, এঁদের সংকল্প সর্ব রকমে জয়যুক্ত হবে, এই আমাদের কামনা।

নাট্যপ্রসঙ্গ

গণনাট্য সঙ্ঘের সম্মেলন ছাড়াও অন্তত আরও দুটি বিরাট নাট্যোৎসব সপ্তাহাধিক কাল ধরে বর্ষে বর্ষে বাঙালীকে নাট্য-সচেতন করে; রঙ্গালয়ে শতাধিক রজনী সগৌরবে অভিনীত হয় একাধিক বাঙলা নাটক। এমন কি নাটক অভিনয় ও প্রযোজনা নিয়ে বিতর্ক চলে গুণী ছেড়ে সাধারণের মহলে। তথাপি প্রশ্ন ওঠে—বাঙলা নাটক কোথায়? কারণ, ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙলা দেশেই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। অথচ, পাশ্চাত্য বহু দেশের তুলনায় নাট্য রচনায় আমরা এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছি না। আশার কথা এই যে, আমরা নিরুৎসাহও নই, নিশ্চেতনও নই।

সেই আশার এক আলো 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের নূতন

অভিনব পরীক্ষা ও প্রয়াস। 'অঙ্গারের' শততম অভিনয় ও তাঁদের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনে তাঁরা নতুন দৃষ্টির পরিচয় আরও সার্থকভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। দুর্ঘটনায় সুদীর্ঘ সংগ্রামে জয়ী খনি মজুরদের তাঁরা সেদিন ন্যায়সঙ্গতরূপেই প্রধান অতিথির সম্মান দান করেছেন—তাঁদের সঙ্গে পরিচিত করেছেন দর্শকদের—যারা অচিরেই 'অঙ্গারে' অনুরূপ এক দুর্ঘটনার নাট্যাভিনয় দেখতে পাবেন! মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তা ছাড়া দর্শকদের পরিচিত করিয়ে দেন তাঁদের নেপথ্যচারী কর্মীদের সঙ্গে ; আর, নিজেদের বৈষয়িক সার্থকতার ফলভোগী করে নিম্নতর কর্মীদের দেন এক মাসের বোনাস। আমার সর্বান্তঃকরণে বলছি—এই নাট্য-সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

'অঙ্গারের' অভিনয়ে মিনার্ভা বৈষয়িক ভাবে কতকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সাফল্য তাঁরা অর্জন করেছেন নিজেদের সাহসে ও শিল্প-দৃষ্টিতে। বিতর্কের কারণ আছে জেনেও আমরা বলতে পারি—'অঙ্গার' বাঙলা রঙ্গমঞ্চের একটি স্মরণীয় প্রস্তাবনা—যেমন প্রস্তাবনা গত দুই দশকের মধ্যে হয়েছে 'নবান্ন', হয়েছে 'রক্তকরবীর' অভিনয়ে। প্রত্যেকবারই নতুন প্রশ্ন উঠেছে, কারণ নতুন দিগন্তেরও সন্ধান তাতে পাওয়া গিয়েছে। 'অঙ্গারে' এ সন্ধান বহন করে এনেছে প্রধানত দুটি বস্তু—এক মজুর জীবনের কঠিনতম বাস্তবতা ও নীরন্ধ্র অমানুষিকতা আমাদের রঙ্গমঞ্চে এভাবে উত্থাপিত হল এই প্রথম। দুই—তার প্রযোজনার দিক, এমন অদ্ভুত প্রযোজনা আলোক-শিল্পের এই সার্থক প্রসারের পূর্বে অগোচর ছিল। এই প্রসঙ্গেই তাই বলা যেতে পারে—'অঙ্গারের' প্রধান রচয়িতা আলোক-শিল্পী শ্রীযুক্ত তাপস সেন—নাট্যকার নন, অভিনেতারাও নন। তাঁদের কর্তব্য তাঁরা পালনে কার্পণ্য করেন নি ; কিন্তু আলোকশিল্পই তাঁদেরও প্রধান নির্ভর। বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, শুধু এই মাত্র বলতে পারি—আমরা এই অভিনব প্রযোজন-সৌকর্যে আপত্তি দেখি না। সভ্যতা যখন নতুন উপকরণে আমাদের বলিষ্ঠ করছে শিল্পকলা তখন তার সহায়ে নিজেকে পরিপুষ্ট করবে না কেন? কে না জানে, এরূপ সব শিল্প-প্রয়োগেই মাত্রাজ্ঞান অলঙ্ঘনীয়? তা ছাড়া, শিল্প-আয়োজন হিসাবে 'অঙ্গার' আর-একটি সংশয়ও আমাদের মনে জাগিয়েছে। 'অঙ্গার' নাট্যকলায় বাস্তবের আত্মপ্রকাশ—শুধু আত্মপ্রকাশ নয়—প্রতিশোধাত্মক অভিযান। 'অনুকম্পা-আশঙ্কায়

চিত্তশুদ্ধির' অবকাশও দেয় না, চৈতন্যকে পরিক্লান্ত করে। শিল্পের অর্থ কি, ট্র্যাজিডির সার্থকতা কিসে? কিন্তু এ প্রশ্নও আলোচনা-সাপেক্ষ। তাই, আমাদের কামনা—'অঙ্গার' বাঙালী জনসাধারণের মত নাট্য-রসিকেরাও দেখবেন—তা স্মরণীয় এক প্রকাশ।

বাঙলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ চিরদিনই সৌখীন নাট্যদলের থেকে আপনার শক্তি সঞ্চার করেছে। আজ যাঁরা সৌখীন, কাল তাঁরাই হন সু-সিদ্ধ রঙ্গ-শিল্পী। যাঁরা তা হন না, তাঁরাও রঙ্গমঞ্চের কম সহায়ক নন। সম্প্রতি আমরা দুটি মঞ্চাভিনয় দেখে তা আরও অনুভব করেছি। একটি ঘণ্টা দেড়েকের 'প্রহসন' বা কৌতুক নাট্য—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ও প্রযোজনা—তিনিই তার অভিনয়ের অন্যতম শিল্পীও। অন্য সকলে সৌখীন অভিনেতা—প্রায় সকলেই প্রথম দাঁড়িয়েছেন দর্শকের সম্মুখে। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে এঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি না থাকাই আশ্চর্য। কিন্তু কতকটা রচনার গুণে, কতকটা অভিনয়ের গুণে, অনাবিল হাসি হেসেছি এবং মধ্যে মধ্যে একটু ভেবেছিও।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর 'মরুঝঞ্ঝা' বড় নাটক, তার বিষয় ও পদ্ধতি দুইই গভীর; তা ছাড়া 'পাব্লব ইনষ্টিটিউটের' বার্ষিক সম্মেলনে অভিনীত এই নাটকখানা উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কুণ্ঠাহীন। নাটকের বিষয়বস্তু—মধ্যপ্রাচ্যের একটি কল্পিত রাজ্য সামরিক একনায়কত্বের পতন-পূর্ব উগ্র দমন-কাণ্ড। অতি বিশ্বস্ত ও নিপুণ ভাবেই তাই নাট্যকার উদ্ঘাটিত করেছেন—কি কি কৌশল, গুপ্ত হত্যা, প্রবঞ্চনা, দেশীয় কায়েমী স্বার্থের ও বৈদেশিক-শক্তির গোপন ষড়যন্ত্রের যন্ত্ররূপে 'সামরিক একনায়কত্ব' ক্ষমতা হস্তগত করে, দেশকে বিক্রয় করে, জনস্বার্থকে দলিত করে, গণতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে—এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লবকেই অনিবার্য করে তোলে। একনায়কত্বের এই বিশেষ কুটিল পর্বের সম্বন্ধে ভারতবর্ষেরও যে সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তা না বললেও চলে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি আছে ভাববস্তু—একনায়কত্বের সমস্ত পীড়ন একটি সাধারণ ভীত-চিত্তা সামান্য নারীও আপনার মনের জোরে সহ্য করে মানসিক ও রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন—মানুষের মনের শক্তিও এমনি আশ্চর্য, তার সীমাশেষ এখনো জানা যায় না। এই মানবীয় পাব্লব-তত্ত্ব ও প্রতিপক্ষের ফ্রয়েডীয় বিরত-তত্ত্বের ব্যর্থতাও নাটকের বিষয়। এরূপ বিষয়-বাহুল্য সত্ত্বেও যে নাটকখানি

বিশৃঙ্খল হয় নি, তাই প্রবীণ নাট্যকারের প্রধান সার্থকতা। ঘটনা যোজনায়ও নিপুণতা আছে। সৌখীন দলের শিল্পীদেরই তাই ছিল অভিনয়ে কঠিন পরীক্ষা। তাঁরা যে অভিনয়গুণে নাটকের বিষয়-সমূহকে দর্শকের চেতনায় পৌঁছে দিতে পেরেছেন এতেই তাঁদের কৃতিত্ব। আর আমরা তা বিশেষভাবেই অনুভব করেছি।

গোপাল হালদার

সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়'-এর জন্মকথা

বর্তমান যুগের পুরশ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অকাল আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙলার সাহিত্যজগৎ মুহ্যমান। তাঁর বয়স ষাটও হয় নি ; এবং তাঁর দেহে ও মুখমণ্ডলে অটুট স্বাস্থ্যের দীপ্তি নিত্য বিরাজিত ছিল। যেমন কাব্যে ও সাহিত্যে তেমনি বহুবিষয়ে জ্ঞান ও চর্চা এবং বহু ভাষায় দখল তাঁকে বিগদ্ধ ও গুণীসমাজে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী করেছিল। তিনি ছিলেন আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর এরকম আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি একান্ত বিমূঢ়। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সমূহ বলবার বা বিচার করবার যোগ্যতাও আমার নেই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্যবীণায় তিনি নিজস্ব একটি তন্ত্রী যোজনা করেছিলেন : তৎসম ও সংস্কৃত শব্দ-সমৃদ্ধ, ভাব ও ছন্দের গাঢ়বদ্ধতার তন্ত্রী। ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি নিশ্চয় আলোচনা করবেন। আমি একটি বিষয়ে যৎসামান্য বলতে ইচ্ছুক—সে 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। একদিন আমারই কাছে, তিনি একটি নূতন ধরনের বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প প্রথম ব্যক্ত করেন ও ঐ কাজে আমার সাহায্য চান। আমাদের উভয়ের একত্র চেষ্টার ফলে 'পরিচয়' জন্মলাভ করে। 'পরিচয়'-এর এই জন্মকথা লিপিবদ্ধ করে আমারও বহুলোকের প্রিয় কবির স্মৃতি-তর্পণ সমাধা করতে পারব, এই আশা।

১৯৩০, মে-জুন মাস। একদিন বন্ধুবর প্রফেসার সত্যেন্দ্রনাথ বসু ডালহৌসি স্কোয়ারে আমার কর্মস্থানের আপিসঘরে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই। যেমন তুমি একদিন কবিগুরুর সঙ্গে একত্রে বিলাত যাত্রার ভাগ্যলাভ করেছিলে, সুধীন্দ্রও এবার তেমনি কবির সঙ্গে একত্রে ইংলণ্ড-আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। এছাড়া এর আপিস তোমার আপিসের সংলগ্ন। তোমাদের আলাপের খুব সুবিধা হবে।

সানন্দে সুধীন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, তাঁর পিতৃদেব ছিলেন আমার দাদামশায়ের বন্ধু।

সেই দিন থেকে আরম্ভ হল আপিস-ফেরত একত্রে গৃহপ্রত্যাবর্তন। সুধীন্দ্রের আপিস ছিল আমার আপিস কামরার একেবারে পাশেই। তিনি ছিলেন লাইট অফ এশিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির সেক্রেটারি। আপিসের ছুটি হলে আমার কামরায় আসতেন ও অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না আমি নিষ্কৃতি পেতাম। তার পর হত তাঁদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে কফি সেবন ও বিশ্রম্ভালাপ। তাতে এসে যোগ দিতেন কবি-প্রিয়া—তাঁর প্রথমা স্ত্রী। সুধীন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ হল ফটোগ্রাফিতে ও আমাদের আফিসের সর্বোচ্চমূল্যের এর্নেমান এফ/১.২ ক্যামেরা কিনে রঙীন ছবি তোলা আরম্ভ করলেন। আমার এ বিষয়ে যতটুকু বিদ্যা ও কারিগরি ছিল তা তিনি অনায়াসেই আয়ত্ত করলেন।

একদিন সন্ধ্যায় সুধীন্দ্র হঠাৎ ফটোগ্রাফির পরিবর্তে খাতা খুলে তাঁর রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনালেন। মনে হল এক অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার। তাঁকে তা বলতে দ্বিধা করলাম না। সে সময়ে বাংলা কবিতা পড়তে যা সুযোগ পেতাম পড়ে মনে হত রবীন্দ্রবন্ধনী ছাড়িয়ে যায় নি। অবশ্য প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সনেটে নতুনত্বের রসোপলব্ধি হত; এবং মোহিতলাল মজুমদারের "বিস্মরণী" বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল প্রচুর। তখন বিষ্ণু দে-র কবিতা নিশ্চয় দু-চারটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু তা পড়ার আমার সৌভাগ্য হয় নি। সুধীন্দ্রের কবিতার গাঢ়বদ্ধতা ও কঠিন সৌন্দর্য সহজেই আমাকে বিমুগ্ধ করল। স্পষ্ট মনে হল রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথের অনুবর্তন করেও নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন—এ কবি। এর পর থেকে ফটোগ্রাফির সঙ্গে সমান পাল্লা দিল সুধীন্দ্রের স্বরচিত কবিতাপাঠ। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপূর্ব ভঙ্গিতে পড়ে শোনাতেন। সুধীন্দ্রনাথকৃত কবিতাপাঠ অনেকেই ইদানিং শুনেছেন; নিশ্চয় তাঁরা আমার বক্তব্যের সাক্ষ্য দেবেন যে সুধীন্দ্রের কবিতাপাঠ-কলা অসামান্য।

এর আগেই তাঁর 'তন্বী' প্রকাশিত হয়েছিল ও তিনি তা কবিগুরুকে দিয়েছিলেন। বোধ হয় কিছু উপদেশ মিশ্রিত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। 'তন্বী'র কবিতাগুলি থেকে বাছাই করে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে লিখতেন এই সময়, ও নতুন অনেকগুলি কবিতা লেখা হল যা পরে 'অর্কেস্ট্রা'য়

প্রকাশিত হয়। একদিন তিনি আমাকে তাঁর 'উটপাখী' কবিতাটি পড়ে শোনালেন। আমার প্রশংসা বাক্য বোধহয় সেদিন এতই উচ্ছ্বসিত হয়েছিল যে তিনি স্বয়ং সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর আমি একদিন প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার লেখা 'নৌকাডুবি'র প্লট পড়ে শোনালাম। জমে উঠল কাব্যালোকের মোহময় সন্ধ্যাগুলি।

১৯৩০-এর শেষের দিকে অথবা ১৯৩১-এর গোড়ায় এমনি এক সন্ধ্যায় সুধীন্দ্র বললেন, আমি এক পত্রিকা বার করতে চাই, যদি আপনি সাহায্য করেন। এর কিছুকাল আগে আমাদের একটি আসর বসত, নাম ছিল, সোসিয়েতে অঁ্যাদো ল্যার্তাঁ। প্রথম মহাসমরের পরে অনেকে ফ্রান্সের শিল্প-কলা-জ্ঞান বিদ্যা ও ভাষা প্রভৃতির প্রতি বাঙলা যুবকদের একটা নেশা জন্মে। আন্দাজ ১৯২৬ অব্দে ডক্টর প্রবোধ বাগচীর চেষ্টায় ফ্রেঞ্চ ভাষা ও শিল্পকলার অনুরক্ত ও ফ্রান্স প্রত্যাগতদের নিয়ে উক্ত আসরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। আসর বসত আশুতোষ বিল্ডিং-এর একটি কামরায় ও শেষের দিকে ডক্টর প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে; দু-একদিন আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে। মনে পড়ে, অন্যান্যদের মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ির আসরে হাজির হয়েছিলেন সন্থ নামকরা, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সন্থ অক্সফোর্ড প্রত্যাগত হুমায়ুন কবীরও আমাদের আসরে যোগ দিয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ আমায় অঁ্যাদো ল্যার্তাঁর সভ্যদের কাছে নতুন কাগজের জন্য আবেদন জানাতে পরামর্শ দিলেন। ও আসরের তখন সমাপ্তি হয়েছে। আর কিছুদিন জল্পনা-কল্পনার পর সুধীন্দ্র বললেন, আপনার বন্ধু নীরেন রায়কে চাই, তাঁকে বলব কাগজ সম্পাদনার অংশীদার হতে। অচিরে নীরেনের কাছে সুধীন্দ্রকে আমি নিয়ে গেলাম। ডক্টর প্রবোধ বাগচী, ডক্টর সুবোধ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে আনলাম। এ হল ১৯৩১-এর গ্রীষ্মাবশেষ সময়। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রফেসার ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন; তাঁকেও ডেকে আনলাম সুধীন্দ্রের বৈঠকখানায়। এই সময় সব চেয়ে উৎসাহী হয়েছিলেন পূজনীয় চারু দত্ত (I. C. S.) মহাশয়। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম বিনা 'পরিচয়' বার হত কিনা সন্দেহ। পরে পরিচয়-এ তাঁর অতুলনীয় "পুরানো কথা" প্রকাশিত হয় ও কৃষ্ণ রাও প্রভৃতি গল্পও লেখা হয়।

নীরেনই নামকরণ করলেন 'পরিচয়'-এর ও তাঁরই পরামর্শে কাগজটি

ত্রৈমাসিক হবে স্থির হল। কিন্তু তিনি সম্পাদকের নাম গ্রহণ করতে বিরত হলেন। সাক্ষাৎভাবে সম্পাদনার অংশগ্রহণ না করলেও কার্যতঃ নীরেনবাবু সম্পাদনার অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ও পরিচয়-এর জন্য লেখক ও লেখা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনিই নিয়ে এলেন হিরণকুমার সান্যালকে, বিষ্ণু দেকে, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষকে—ইত্যাদি। অবশেষে ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশিত হল, সুধীন্দ্রর সম্পাদনার স্বাক্ষরে, নীরেনের 'সম্পাদকীয়' যোগে ও আমার হাতে আঁকা 'পরিচয়' নামাঙ্কিত প্রচ্ছদপটে আবৃত হয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি সে সময় শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম।

আজ ইহলোকে সুধীন্দ্র নেই ; কিন্তু যাঁরা যাঁরা 'পরিচয়' বৈঠকে যোগদান করেছেন তাঁদের কাছে 'পরিচয়ে'র জন্য সুধীন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

ধন্য জাপান

শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানব সভ্যতার জন্যে জাপানের মানুষ আজ বৎসরাধিক কাল একটানা যে নিরস্ত্র গণসংগ্রাম চালিয়ে আসছেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় ও আপিসে, বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে ও অঙ্গনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাভবনে, বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরাটরিতে, জাপানের প্রত্যেকটি বাড়িতে, প্রতিটি রাস্তায়, মাঠে মাঠে, হাটে হাটে, নিরন্তর চলেছে নিরস্ত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ, অক্লান্ত লড়াই। সভা, সমিতি ও জনসমাবেশ, বক্তৃতা ও আলোচনা, সই সংগ্রহ ও দরখাস্ত, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন এই সবের ভিতর দিয়ে জাপানের এই অপূর্ব লড়াইয়ের অষ্টাদশ পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। এখনও অনেক পর্ব বাকি আছে এই লড়াইয়ের কেননা এই সেদিনও জাপানের নেতারা আমাদের বলেছেন, লড়াইয়ের এই সবে শুরু হয়েছে।

জাপানের এটা ন্যায় যুদ্ধ। সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ তাই জাপানীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। জাইবাৎসুর প্রতিনিধি নোবুসুকে কিশি ও তাঁর ছোট্ট একটি উপদলকে হাত করে আমেরিকা চাইছে জাপানের উপর একটি 'সংশোধিত' জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি চাপিয়ে দিতে। এ বিষয়ে তিলার্ধ

সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই চুক্তিটি জাপানকে পুনরস্ত্রীকরণের পথে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তে জাপানকে জড়াতে চায় এবং জাপানকে আমেরিকার একটি যুদ্ধঘাঁটিতে ও আণবিক সেতুবন্ধে পরিণত করতে চায়। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে :

"দুই পক্ষ, স্বতন্ত্রভাবে ও পরস্পরের সহযোগিতায়···সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সংবিধান অনুযায়ী তাদের প্রতিরোধশক্তিকে রক্ষা করবে ও বাড়িয়ে তুলবে·· "

"চুক্তিটিকে কার্যকরী করার জন্যে দুই পক্ষ পরস্পরের সহিত পরামর্শ করবে এবং জাপানের নিরাপত্তা ও সুদূর প্রাচ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে যে কোনো এক পক্ষের অনুরোধেই পারস্পরিক পরামর্শ অনুষ্ঠিত হবে।

"···জাপানের নিরাপত্তার জন্যে এবং সুদূর প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার স্থল, জল ও বিমান বাহিনীগুলিকে ব্যবহার করার সুযোগ ও আঞ্চলিক অধিকার দেওয়া হল।"

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, চুক্তিটি জাপানী সংবিধানের বিরোধী। জাপানী সংবিধানের নবম ধারায় লিখিত আছে : "জাপানী জাতি চিরদিনের মতো যুদ্ধকে বর্জন করছে···আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার উপায় হিসাবে বলপ্রয়োগের পথকে পরিত্যাগ করছে ; যাতে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে, সেইজন্যে স্থলে, জলে ও আকাশে সামরিক বাহিনী কদাচ রক্ষিত হবে না।" জাপানী সংবিধানের এই নবম ধারাটির সঙ্গে জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটির কোথাও কোনো মিল নেই। জাপানী সংবিধান এই সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, জাপান নিরস্ত্র থাকবে, কোনো সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অনুশীলন করবে। জাপানী জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্যে অবিলম্বে জাপানের মাটি থেকে আমেরিকার সমস্ত সামরিক বাহিনীকে অপসারণ করা আবশ্যক, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানের শান্তিচুক্তির সম্পাদন আবশ্যক এবং চতুঃশক্তির পক্ষ থেকে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এই গ্যারান্টি দেওয়া আবশ্যক যে, কদাচ কোনো অবস্থাতেই জাপানের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হবে না। জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি কি এইসব দিকে জাপানকে

নিয়ে যাচ্ছে? অবশ্যই যাচ্ছে না। এই চুক্তি জাপানী সংবিধানের নির্দেশ লঙ্ঘন করে জাপানের তথাকথিত "প্রতিরোধশক্তিকে" অর্থাৎ আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে চায়। এই চুক্তির "নিজ নিজ সংবিধান অনুযায়ী" কথাটি জাপানী সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি এবং জাপানী জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতি একটা নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র। এই চুক্তি জাপানের সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিচুক্তির পথ বন্ধ করতে চায় এবং এশিয়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহ্নিশেষে ইন্ধন জুগিয়ে সেটিকে চিরস্থায়ী করতে চায়। এই চুক্তি জাপানী জনগণের শান্তি-কামনাকে ও নিরপেক্ষতা-কামনাকে পদদলিত করে জাপানকে মার্কিন সামরিক জোটে সামিল করতে চায়, জাপান থেকে আমেরিকার সামরিক বাহিনীকে অপসারণ করার পরিবর্তে জাপানকে আমেরিকার একটি বৃহত্তর সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করতে চায়। জাপান যাতে হয় এশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার আণবিক ও নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সেতুবন্ধ, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তির তাই-ই উদ্দেশ্য।

একথা সুবিদিত যে, সান ফ্রানসিস্কো চুক্তি অনুসারে আমেরিকা জাপানী সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই যে কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জাপানের ভূমিকে ব্যবহার করতে পারে, অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা সমেত যে-কোনো অস্ত্র যে কোনো পরিমাণে জাপানে নিয়ে আসতে পারে। আমেরিকা এতদিন জাপানকে একটি উপনিবেশ ও সামরিক ঘাঁটি হিসাবে প্রকাশ্যে যে ভাবে ব্যবহার করে এসেছে, সে সম্বন্ধে, প্রতিবেশী জাতিগুলির প্রতি জাপানীদের এই একটা কৈফিয়ত অন্তত দেওয়ার ছিল যে, জাপানী জনগণের ইচ্ছাক্রমে এটা ঘটছে না। তথাকথিত সংশোধিত জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীকে দেখানো হবে, সোভিয়েত দেশের ও এশীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে আমেরিকার পরার্ধপতিদের যুদ্ধ চক্রান্তে জাপানের মানুষ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে। চুক্তিটিতে অবশ্য "পারস্পরিক পরামর্শের" কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে আমেরিকা নিজের যুদ্ধঘাঁটিগুলিকে ব্যবহার করা সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ-টরামর্শ করবে, নোবুসুকে কিশির ও তাঁর অন্তরঙ্গদের এই আজগুবি গল্প জাপানে কেউই বিশ্বাস করে না।

বলা হচ্ছে যে, জাপানের প্রতিরক্ষার ও নিরাপত্তার জন্যেই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এটা একটা গালগল্প। আমেরিকাকে ও জাপানকে কেউই

আক্রমণ করতে চাইছে না এবং ভয় দেখাচ্ছে না। ইতিহাস বরং এটারই সাক্ষ্য দেয় যে, পঞ্চাশ বছর ধরে জাপানই এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল। জাপানের প্রতিরক্ষার বুলিটা যে নিছক ভণ্ডামি, এটা প্রমাণিত হয় যখন পড়ি যে, "সুদূর প্রাচ্যে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা" জাপ-মার্কিন চুক্তির লক্ষ্য। চুক্তিটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টিয়ান হার্টার বলেছেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সুদূর প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে সুদূর প্রাচ্য বলতে বোঝায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তো বটেই, উপরন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি—তথা ভারত। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ। এই চুক্তি চাইছে যে, আমেরিকা হবে সমগ্র এশিয়ার পুলিশম্যান এবং জাপান হবে সেই পুলিশম্যানের পুলিশী কুকুর।

এই সম্ভাবনাটা কি জাপানী জনগণের কাছে খুব মহিমময় ও গৌরবময় বলে মনে হচ্ছে? মোটেই হচ্ছে না এবং হওয়ার কথা নয়। চুক্তিটি আর কিছু হোক বা না হোক, চূড়ান্ত রকমের অবাস্তব। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের স্বপ্ন আজ মহাশূন্যে বিলীন। এশিয়ার জাতিগুলির বিরুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধের জন্যে জাপানী জনগণকে চরম প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে হিরোশিমার ও নাগাসাকির মহাহত্যার আগুনে এবং তার পরেকার ম্যাকআর্থারীয় তাণ্ডবের কালে নিজেদের মূক, বেদনাবিদ্ধ আত্মজিজ্ঞাসায়। সেই প্রায়শ্চিত্তের আগুনে শুদ্ধ ও কঠিন হয়ে বেরিয়ে এসেছে এক নতুন জাপান। এই নতুন জাপান পূর্বেকার ভ্রান্ত পথ বর্জন করে নতুন পথে বড় হতে চায়। তার সামনে বড় হওয়ার কোনো পথ কি খোলা নেই? অবশ্যই আছে। সে পথ হল জাতীয় স্বাধীনতার ও সার্বভৌমতার পথ, নিরস্ত্রীকরণের ও শান্তির পথ, এশিয়ার ও পৃথিবীর সকল জাতির সহিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ। এই পথে গেলে পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, ব্যবস্থিতচিত্ত, সাহসী ও সৌন্দর্য-প্রেমিক জাপানী জাতি পুনরায় বড় হতে পারে এবং এশীয় প্রগতির পুরোভাগে নিজেদের স্থাপিত করতে পারে। এটাই হল জাপানের বড় হওয়ার বাস্তব পথ। এই পথেই জাপানী জনগণ এগুতে চায়।

কিন্তু জাইবাৎসুর কর্তারা ও নোবুসুকে কিশিচক্র—এই মুষ্টিমেয় পাগলের

দল আবার দেখছে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সেই অতীত ও অলীক স্বপ্ন। জাপানের মানুষ দেখতে চাইছে নতুন জাপানে নতুন প্রভাতের আলো কিন্তু কিশিশাসিত জাপানে তারা দেখতে পাচ্ছে শুধু দুঃস্বপ্নোত্থিত অজীর্ণ রোগীর উদ্‌গার। এই জিনিসটার একান্ত নোংরামি ও মূঢ়তা জাপানী জনসাধারণের কাছে অসহ্য। খুব অল্পবুদ্ধি লোকেরাও আজ পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, সমাজ তন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তার শক্তি পূর্বের চেয়ে এখন হাজার গুণ প্রবলতর। জাইবাৎসু ও কিশিচক্র ৬০০ কোটি ডলার পরিমাণ মার্কিন "সাহায্যের" বিনিময়ে আমেরিকার উন্মত্ত বিশ্বজয়ের অভিযানে জাপানকে অংশীদার করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বলি হবে অবিকল জাপানী জনগণ নিজেরাই। নিরাপত্তা চুক্তি!! হায় ভগবান্! বরং এর নামকরণ হওয়া উচিত জাপানের আপদ্‌বর্ধন চুক্তি! ইতিমধ্যেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটিকে সোভিয়েত সরকার শত্রুতামূলক আচরণ বলে মনে করে। ১৯৫৬ সালের সংযুক্ত সোভিয়েত-জাপ ঘোষণায় সোভিয়েত সরকার হাবোমাই ও শিকোতান দ্বীপ দুটিকে জাপানীদের হাতে ফেরত দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি প্রকাশিত হওয়ার পর সোভিয়েত সরকার জাপ সরকারের কাছে এই মর্মে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেছেন যে, উক্ত দ্বীপদ্বয় ফেরত দেওয়া হবে যদি জাপ রাষ্ট্রের ভূমি থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয় এবং যদি জাপান ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোয়ার্দলভাস্কের ওপরে আমেরিকার ইউ-২ বিমান ভূপাতিত হওয়ার পর সোভিয়েত সরকার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছেন যে, জাপানের কোনো ঘাঁটি থেকে ইউ-২ বিমান উড়ে সোভিয়েত আকাশে অনধিকার প্রবেশ করলে সোভিয়েত সরকার সেই ঘাঁটি ধ্বংস করে দেবেন। অবশ্য মার্কিন সরকারও সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, এমন ঘটনা ঘটলে তাঁরাও ওই ঘাঁটিকে "রক্ষা" করার চেষ্টা করবেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু তাতে জাপানের কি মঙ্গল ঘটবে? এক হিরোশিমার জায়গায় হাজার হিরোশিমা জাপানে অনুষ্ঠিত হবে।

সুতরাং জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানের মানুষ যে গণসংগ্রাম চালাচ্ছেন তার মধ্যে কোনো কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র নেই। এই লড়াই জাপানীদের জাতীয় আত্মরক্ষার ও জাতীয় স্বাধীনতারই লড়াই। এই লড়াই

সমগ্র জাপানী জাতির ঐক্যবদ্ধ লড়াই। এই লড়াই পরিচালনা করার জন্যে যে জাপানী জাতীয় পরিষদ স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ১৪০টি জাপানী রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন। শ্রমিক, কৃষক, আপিস-কর্মচারী, নারী, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি সকল স্তরের লোক এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন তো বটেই, উপরন্তু সকলেই বেশী বেশী করে রাস্তায় নেমেছেন। যে সকল শিক্ষিত লোক জাপ-মার্কিন সামরিক মৈত্রী সম্বন্ধে আগে শুধু মাথা নেড়ে বলতেন, ইয়াস্থ উও এনাই, উপায় নেই, উপায় নেই, তাঁরা আজ সক্রিয়-ভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। দুই লক্ষ শ্রমিকের শোভাযাত্রার ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনে জাপানীরা দেখেছেন ২০টি জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য গবেষণাগারের ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ১,৫০০ অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, লেখক ও শিল্পী রাস্তায় নেমে চেঁচামেচি করছেন। ছাত্রেরা ও অধ্যাপকেরা একই সঙ্গে রাস্তায় নেমে যখন হুল্লোড় করেন তখন বুঝতে হবে যে সমগ্র জাতির টনক ভয়ানক নড়েছে। সোশ্যালিস্ট দল, এমনকি গণতান্ত্রিক সোশ্যালিস্ট দলও বলছে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি ছিঁড়ে ফেল, কিশি পদত্যাগ কর, বর্তমান ডায়েটের অবলোপ চাই। চুক্তির বিরুদ্ধে কত যে দরখাস্ত পড়েছে ও সই সংগ্রহ হয়েছে, সত্যিই তার লেখাজোখা নেই।

ক্রমশই এই আন্দোলন কিশিবিরোধী আন্দোলনের স্তর অতিক্রম করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। ঘন ঘন এই ধ্বনি উঠছে জাপান থেকে মার্কিন সৈন্যবাহিনী অপসারিত হোক, আমেরিকা ওকিনাওয়া ছাড়। সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা জুড়ে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জোয়ার বয়ে চলেছে, তার সঙ্গে জাপানের আন্দোলন এক হয়ে গেছে। জাপানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে এমন কোনো বড় সামাজিক শক্তি নেই। একথা সত্য যে গত সাধারণ নির্বাচনের পর কিশির লিবারাল গণতান্ত্রিক দল জাপানী পার্লামেণ্টের উচ্চ কক্ষে ও নিম্ন কক্ষে, উভয় কক্ষেই সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিল। জাপানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত দ্বিতীয় ডগলাস ম্যাকআর্থার শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ বালক কিশিকে এই মর্মে আদেশ দিয়েছিলেন যে, লিবারাল গণতান্ত্রিক দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে আইজেন-হাওয়ার জাপানে আসার আগেই পার্লামেণ্টকে দিয়ে জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটিকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে এবং আইজেনহাওয়ার জাপানে

আসামাত্র তাঁকে এই অনুমোদন পত্রটি উপহার দিতে হবে। কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন করতে গিয়ে কিশিকে জাপানী পার্লামেণ্টের রীতিনীতি পদদলিত করে যে নগ্ন ফাশিস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হল, তা দেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করছেন। জাপানী লোকসভা থেকে সমস্ত বিরোধীদলকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে কিশি রাতারাতি লোকসভাকে দিয়ে "সর্বসম্মতিক্রমে" চুক্তিটি পাশ করিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর নিজের দলের অধিকাংশ সভ্যই ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন নি। তারপর পার্লামেণ্টের অধিবেশনকালকে অবৈধভাবে পঞ্চাশ দিন বাড়িয়ে দিয়ে কিশি আইজেনহাওয়ারের আগমনের পূর্ব মুহূর্তে চুক্তিটিতে পার্লামেণ্টের শেষ অনুমোদন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করলেন।

এই কাজটা কিশি নামেমাত্র করতে পেরেছেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটিকে জাপানের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে ঠেকানো গেল না। কিন্তু এটা খুব ভুল দৃষ্টি। কিশির এই ফাশিস্ত আচরণের পর মুহূর্ত থেকে চুক্তিবিরোধী আন্দোলনটি দশগুণ প্রবলতর হয়েছে। এই আন্দোলনের পক্ষ থেকে এখন আওয়াজ উঠেছে, পার্লামেণ্ট কর্তৃক জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে তা মানি না, কিশি পদত্যাগ কর, বর্তমান পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে নতুন সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা হোক। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, কিশির রাজনৈতিক দলে যে আটটি উপদল আছে, তাদের মধ্যে কিশি ভ্রাতৃদ্বয়ের দুটি উপদল ব্যতীত বাকী ছয়টি উপদলই কিশির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিশি যে কতদূর বিচ্ছিন্ন ও একাকী হয়ে পড়েছেন, এটা তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তারপর কিশি আইজেনহাওয়ারকে জাপানে আনতে পারলেন না। এটা তাঁর ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরাট পরাজয়। আইজেনহাওয়ারের জাপান আগমন রুদ্ধ করে দিয়ে জাপানী ছাত্রসংগঠন জেনগাকুরেন একটা বিরাট কীর্তি স্থাপিত করেছেন। বাইশ বছরের ছাত্রী শহীদ মিচিকো কাম্বার স্মৃতিস্তম্ভ সেই কীর্তির সাক্ষ্যস্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে। কিশি যখন মানিলায় তার করে জানালেন যে আইজেনহাওয়ারের জাপান আগমনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি অক্ষম, তখন ১৪,০০০ জাপানী ছাত্রছাত্রীদের যে সপিল মিছিলনৃত্য এই আনন্দবার্তাকে দিকে দিকে ঘোষণা করল তা কবিদের কবিতা লেখার জিনিস। জাইবাৎসুর কর্তারা ও কিশিচক্র ইদানীং জাপানী

ছাত্রছাত্রীদের বুশিদো (জাপানী জাতীয় ভাব) ও ইয়ামাতোদামাশি (জাপানের আত্মা) ইত্যাদি খাঁটি জাপানী আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের নৈতিক শিক্ষার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারগতিক দেখে মনে হচ্ছে, ইয়ামাতোদামাশির কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। পরম রমণীয় ইয়ামাতোদামাশি সামুরাইয়ের বংশধরদের দেহকে পরিত্যাগ করে আজ যেন জাপানী শ্রমিক-কৃষকের ও জাপানী ছাত্রছাত্রীদের দেহকে আশ্রয় করেছেন বলে মনে হচ্ছে!

চেস্টার বোলস প্রমুখ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া পুরোহিতগণ আজ আমাদের এই আশ্বাস দিতে চাইছেন যে, এশিয়ায় গণতন্ত্রকে দৃঢ়তর করা এবং এশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশকে বন্ধুভাবে সাহায্য করাই আমেরিকার লক্ষ্য। এটা হলে অবশ্যই খুব ভাল হত। ১৮৬০ সালে কমোডোর পেরীর প্রশস্তি গান করে ওয়াল্ট হুইটম্যান লিখেছিলেন :

I chant commerce opening, the sleep of ages
having done its work—races
reborn, refresh'd ;
Lives, works, resumed—the object I
know not—but the old, the Asiatic
resumed as it must be....

মহাকবি হুইটম্যানকে স্মরণ করে আমরা এশিয়াবাসীরা আন্তরিকতার সহিত একথা বলতে পারি যে, যদিও এশীয় জাগরণে স্টারস অ্যাণ্ড স্ট্রাইপসের পজিটিভ ভূমিকাকে আমরা স্বীকার করি না, তবু আমরা এশিয়াবাসীরা পাশ্চাত্যের সহিত অসহযোগিতা করতে চাই না এবং পাশ্চাত্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে চাই না। জাগ্রত এশিয়াবাসী আমেরিকার তথা সমগ্র পাশ্চাত্যের সহিত বন্ধুভাবেই বসবাস করতে চায়। জাগ্রত এশিয়াবাসী চায় যে, আমেরিকা এশিয়াবাসীদের জাতীয় স্বাধীনতার, গণতন্ত্রের ও অর্থনৈতিক বিকাশের কামনাকে মান্য করুক। কিন্তু জাপানের ও আমেরিকার এ কী "বন্ধুত্ব" আমরা দেখছি দ্বিতীয় ডগলাস ম্যাকআর্থার ও নোবুসুকে কিশির পারস্পরিক ষড়যন্ত্রে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই "বন্ধুত্বের" স্বপ্নই কি হুইটম্যান দেখেছিলেন? আজ জাপানী গণতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রচারবার্তায় যে ধরনের নগ্ন সীনিসিজম পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে, তা দেখে

চেস্টার বোলসদের "গণতান্ত্রিক" উপায়ে ভারত বিজয়ের চেষ্টা সম্বন্ধে ভারতবাসীরা যদি একটু সন্দেহ বোধ করে, সেটা খুব দোষের হবে কি? স্পষ্টতই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ চাইছে জাপানী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে সেখানে একটি সামরিক ফাশিস্ত রাজ প্রতিষ্ঠিত করতে।

যাতে এটি না ঘটতে পারে সেইজন্যে জাপানী জাতি আজ অদ্ভুত প্রজ্ঞার সহিত অপরিসীম বিক্রমে লড়ছেন। ফাশিস্ত রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে যে সকল সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান থাকা দরকার, সেগুলি জাপানে আজ নেই। চুক্তিবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিশি হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছেন বটে কিন্তু এই আন্দোলনকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া কিশির পক্ষে এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। সুতরাং মাভৈঃ! এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে জাপানী জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে গভীর রাজনৈতিক পরিপক্কতার সহিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তার জয় অনিবার্য। এই লড়াই সমগ্র এশিয়ার স্বার্থের অনুকূল, আমেরিকার জনগণের স্বার্থের অনুকূল এবং প্রকৃত জাপ-মার্কিন বন্ধুত্বেরও অনুকূল। ধন্য জাপান!

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র